বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা

উত্তর ভাগ—প্রথম পর্ব

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল

সম্পাদিত ॥

॥ মহাজাতি প্রকাশক ঃ কলিকাতা ১২ ॥

॥ প্রকাশ করেছেন ঃ শ্রীমহীতোষ বসু,
১৩নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ॥

*

॥ ছেপেছেন ঃ শ্রীবিমলকুমার ব্যানার্জি
তারকনাথ প্রেস, ২নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট ॥

*

॥ বেঁধেছেন ঃ দি সিটি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৯৭নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥

*

॥ দাম ঃ ছ' টাকা ॥

আষাঢ় ঃ তের শ' তেষট্টি ॥

এই গল্প-সংকলনে যাঁহারা নিজেদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুমতি দিয়া ইহার প্রকাশ সম্ভব করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যের সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গল্প রচয়িতার প্রতি সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশক উভয়েই গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের সোৎসাহ সহযোগিতা ও সাগ্রহ অনুমতিদানই এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল প্রেরণা যোগাইয়াছে।

॥ সমাজ-চিত্র ॥

॥ সমাজ-জীবনের ব্যতিক্রম ॥

॥ পাতাল জীবন ॥

॥ যুদ্ধোত্তর বিপর্যয় ॥

॥ ব্যক্তি-পরিচয় ও প্রতিবেশ-চিত্র ।

* * *

ভূমিকা

॥ এক ॥

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিভাগ নিঃসংশয় অগ্রগতির চিহ্ন বহন করে, তাহা হইল ছোট গল্প। এই ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা সমাজ ও জীবনে যে বিচিত্র ও গভীর পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে সার্থকতম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রার যে নিদারুণ বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা-প্রসূত নূতন অনুভূতি জাগিয়াছে, সমাজ-ও-পরিবার-জীবনের নিশ্চিন্ত, নিরাপদ আশ্রয় হইতে উৎখাত হইয়া যে শূন্যতাবোধ ও উদ্‌ভ্রান্তি ব্যক্তিসত্তাকে গ্রাস করিয়াছে, ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে তাহার সবটুকুই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তা ছাড়া গোষ্ঠী-জীবনের প্রভাবমুক্ত, শ্রেণী-পরিচয় হইতে বিবিক্ত ব্যক্তিজীবন আধুনিক ছোট গল্পে এক নূতন কৌতূহলের বিষয় ও অজ্ঞাতপূর্ব মর্যাদার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গল্পে চারিত্রিক অসাধারণত্বের পর্যায়ভুক্ত নর-নারী ছাড়া আর সমস্ত লোকই প্রধানত শ্রেণী-পরিচয়ের মধ্য দিয়াই পরিস্ফুট—তাহাদের ব্যক্তিজীবন শ্রেণী-বেষ্টনীর মধ্যেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। আধুনিক গল্পে মানুষের সমাজ-পরিচয়টা একেবারেই গৌণ ; বংশানুক্রমিকতা ও বৃত্তি-অনুশীলনের প্রভাব এখন তাহার জীবনের রূপ-নির্ণয়ে প্রধান সহায় নহে। ইহাদের পরিবর্তে অচির-প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক পরিবেশ ও সমাজনিয়ন্ত্রণমুক্ত অন্তরের প্রবৃত্তি-সমষ্টিই আজ ব্যক্তিজীবনের নিয়ামক। এখন সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ শান্তি ও সামঞ্জস্যের স্থিরতা-বিধায়ক নহে ; গাঁটছড়ায় বাঁধা এই দুইটি সত্তার মধ্যে অবিরত সংঘর্ষে উহাদের পারস্পরিক ভার-সাম্য সদা-বিচলিত। সমাজের প্রতিকূলতা বা মমতাহীন ঔদাসীন্য আজ ব্যক্তির জীবনসংগ্রামকে তীব্রতর করিয়া উহার সমস্ত অন্তরকে নৈরাশ্যতিক্ত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সাম্প্রতিক

ছোট গল্পে ব্যক্তিজীবনের যে সূক্ষ্ম, অন্তরঙ্গ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, উহার রক্তস্রাবী অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে তুচ্ছতম খেয়াল ও লঘুতম কল্পনা-বিলাস পর্যন্ত অন্তর্জীবনের প্রতিটি অনুভূতির কম্পন যে সুস্পষ্ট রেখাচিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহার পরিকল্পনা ও বিষয়-উপস্থাপনার দিক দিয়া যে অভাবনীয় বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে তাহাতেই উহার অগ্রগতির পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালা এই ব্যক্তিত্ব-উপচিত মানবিক রসে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এক দিক দিয়া বিচার করিলে চল্‌তি জীবনের রূপটি সাহিত্যে ধরিয়া রাখিতে হইলে ছোট গল্পই ইহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাত্র। কাব্যে সমসাময়িক জীবনের প্রতিফলন অপেক্ষাকৃত দুরূহ সাধনা। কবির দৃষ্টিতে নিকট ও সুদূরের পরস্পর-বিরোধী অথচ পরস্পরের পরিপূরক যে সমন্বয়ের, সাময়িক উত্তেজনাকে অতিক্রম করিয়া যে সার্বভৌম তাৎপর্য ও ভাবসুষমার, প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তাহা মোটেই সহজসাধ্য নহে; বস্তুপুঞ্জপরিকীর্ণ ও গতিবেগবিহ্বল কবিমানস ঘটমানতার স্থায়ী রসকেন্দ্রটি খুঁজিয়া পায় না—আবেগ-সম্মোহ উহার স্থির অনুভূতিকে কুয়াশাজালে আবৃত করে। কবির মুখের কথায় উহার গভীরতর অন্তর-সত্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। যে ঘটনা এইমাত্র প্রত্যক্ষ করা গেল বা যে অনুভূতি শিরাস্নায়ুজালকে সদ্য কাঁপাইয়া বহিয়া গেল, তাহারা কালের ব্যবধানে কি শাশ্বত রসরূপ গ্রহণ করিবে, ভবিষ্যতের পাকা কালির লেখায় কিরূপ উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিবে তাহা কবি পূর্ব হইতে অনুমান করিতে পারেন না। সুতরাং সদ্যো-সংঘটনের উপর লেখা কাব্য ঘটনার কোলাহলের পিছনে যে তাৎপর্য-পরিণতির নৈঃশব্দ্য প্রতীক্ষমান তাহার নাগাল পায় না—অপরিণত রূপটাকেই সত্যস্বরূপ বলিয়া ভ্রম করে।

কিন্তু ছোট গল্পের মধ্যে যাহা এইমাত্র ঘটিল তাহার দ্রুত শিল্পরূপান্তরের সম্ভাব্যতা দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত। বস্তুজগতে যাহা ঘটনা শিল্পজগতে তাহা গল্পরূপে সদ্যো ফুটিয়া উঠে। ঘটনা ও গল্প পাশাপাশি জগতের নিকট প্রতিবেশী; উভয়ের মধ্যে মাত্র একস্তরের ব্যবধান। আকের রসের সদ্যো-জাল-দেওয়া গুড়ে পরিণতির মত সংঘটনের প্রত্যক্ষতা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছোট গল্পের শিল্পরূপ ও আপেক্ষিক রসগাঢ়তা লাভ করে। এই পরিবর্তন মানুষের অনেকটা স্বভাবজাত—গল্প বলিতে ও শুনিতে সে এত ভালবাসে যে বাইরের জগত হইতে ইন্দ্রিয় যাহা আহরণ করে তাহা গ্রহণ-মুহূর্তেই গল্পের উপাদানে রূপান্তরিত হয়। কাব্যের সঙ্গে ঘটনার

দুস্তর ব্যবধান গল্পের ক্ষেত্রে অনেকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, গল্পরচনার মধ্যে ঘটনার সহজ-গ্রাহ্য তাৎপর্যটিই বিধৃত হয়—ইহার আশু-প্রতীয়মান মানস প্রতিক্রিয়াই সামান্য একটু রং-ফলানোর সহায়তায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহার আঙ্গিক-বিন্যাস, জীবন-সমালোচনা ও রসপরিণতিতে ঘটনার রূপটিকে বিশেষভাবে পরিবর্তন না করিয়া উহার অন্তর্নিহিত মানবিক আবেদনটুকুই সুস্পষ্ট করিয়া তোলা হয়। এ যেন উড়ন্ত পাখীর স্বচ্ছ সরোবরে ছায়া ফেলার মতই দ্রুত-ধাবমান বহিঃপ্রতিবেশের শিল্প-মুকুরে সূক্ষ্মতর প্রতিরূপ-অবলোকন।

যুগ-চেতনার যে প্রকাশ-আকৃতি কাব্যক্ষেত্রে আংশিক সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহাই ছোট গল্পের উপর কেন এতটা সার্থক ও সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করিল তাহারই কারণ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিলাম। রেলগাড়ীর ইঞ্জিনে কয়লা দিলেই তাহা সঙ্গে সঙ্গে শক্তি উৎপাদন করে না—কয়লা, আগুন ও জল মিলিয়া যখন একটা যৌগিক রূপান্তর ঘটে, তখনই তাহা গাড়ীতে গতিবেগ সঞ্চার করে। কাব্যের সঙ্গে যুগ-সমস্যার সম্বন্ধ অনেকটা এই জাতীয়। কিন্তু ছোট গল্পের অর্থপূর্ণ অঙ্গ-সঞ্চালন ও মননানুভূতির তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ-আঘাত ঘটনা-গজরাজকে সদ্যো-অগ্রগতির পথে চালিত করে। বাঙ্গালী সমাজে সাম্প্রতিক কালে যে তুমুল আলোড়নের কাঁপন ধরিয়াছে, উহার চিত্তসমুদ্রে মন্থনের ফলে যে গরল উঠিয়াছে, গতানুগতিকতার আশ্রয় হইতে সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইবার জন্য অভাবনীয়তার দিক্‌চিহ্নহীন পথে উহার যে লক্ষ্যহীন যাত্রার সুরু হইয়াছে তাহার সমস্ত চঞ্চল জীবনাবেগ, মানস অস্বস্তি ও বিমূঢ়তা ও অতর্কিত জৈব প্রতিক্রিয়া ছোটগল্পের প্রসার ও বৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশের অবসর পাইয়াছে। বাঙ্গালীর দ্রুত-বিবর্তনশীল সমাজ-মনের পরিচয়, তাহার জীবন-নিরীক্ষা ও কৌতূহলের নির্দেশক নব অনুসন্ধিৎসার ছাপ তাহার ছোটগল্পের মধ্যে স্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গালী মনের সাহিত্য-সৃষ্টির অভিযানে, নব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দিবার প্রয়াসে সে এই ছোট গল্পের পথ ধরিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। বাংলা ছোট গল্প, রচয়িতার চিত্তের প্রগতিশীলতায়, মানবমনের নানা অলি-গলিতে উহার যে বিস্ময়কর পরিচয় লুকানো আছে তাহার আবিষ্কারে, বিচিত্র পাত্রে জীবনরস-আস্বাদনের রুচি-ঔদার্যে, ও ইতস্তত ছড়ানো, আকস্মিকভাবে উৎক্ষিপ্ত প্রাণ-কণিকাসমূহের সার্থক-সুন্দর শিল্পছন্দায়নে, বিশ্বসাহিত্যের নৈবেদ্যথালায় নিজ মনের আল্‌পনা-আঁকা অর্ঘ্যপাত্রটি পৌঁছাইয়া দিবার অধিকার অর্জন করিয়াছে।

॥ দুই ॥

বর্তমান গল্পসংকলনের পরিকল্পনা হইতেছে ছোট-গল্পের প্রারম্ভ হইতে আধুনিক পরিণতি পর্যন্ত সমগ্র বিকাশের একটা পরিচয় দান। ইহার পূর্বভাগে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার প্রভৃতি প্রথম যুগের ছোটগল্প-রচয়িতাদের রচনা সঙ্কলিত হইবে। এখন যাহা প্রকাশিত হইল তাহা আধুনিক যুগের প্রথম পর্ব। ইহার কাল-প্রসার মোটামুটি ১৯২৫ হইতে ১৯৫০ খৃঃ অঃ পর্যন্ত। এই উত্তর ভাগের প্রথম পর্বে সামাজিক চেতনার বিভিন্নমুখী প্রকাশকে পর্যায়ক্রমে সাজাইয়া ছোটগল্পের বিষয়নির্বাচনক্ষেত্র ও সৃষ্টিপ্রেরণা-বৈচিত্র্যের অতীন্দ্র-সীমাতিসারী আশ্চর্য প্রসারটি দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সঙ্কলনে সংগৃহীত গল্পগুলি মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত হইয়াছে।—

(১) সমাজ-চিত্র

জগদীশ গুপ্ত—রামের টাকা, মনোজ বসু—ফার্ষ্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা, আশাপূর্ণা দেবী—অভিনেত্রী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র—রস, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—সত্যমেব।

(২) সমাজ-জীবনের ব্যতিক্রম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—অগ্রদানী, সুবোধ ঘোষ—গরল অমিয় ভেল, নবেন্দু ঘোষ—কান্না, রমাপদ চৌধুরী—জ্বালাহর।

(৩) পাতাল-জীবন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—টোপ, ননী ভৌমিক—খুনীর ছেলে, সুশীল জানা—আম্মা, সমরেশ বসু—জোয়ার-ভাটা।

(৪) যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়

প্রবোধকুমার সান্যাল—অঙ্গার, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—নমুনা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—বস্ত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ—কানাকড়ি, প্রভাতদেব সরকার—বিনিয়োগ, বাণী রায়—ময়নামতীর কড়চা।

(৫) ব্যক্তিপরিচয় ও প্রতিবেশ-চিত্র

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—অসমাপ্ত, গজেন মিত্র—আশ্রয়, সৈয়দ মুজতবা আলি—পাদটীকা, বিমল মিত্র—মিলনান্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায়—বাতায়ন, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—উপসংহার।

গ্রন্থের উত্তরভাগের দ্বিতীয় পর্বে পূর্বোক্ত কাল-পরিধির মধ্যেই আরও কয়েকটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রচনা প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে ও উপকরণের প্রাচুর্য-বশত সেই পর্যায়গুলি দ্বিতীয় পর্বের জন্য সংরক্ষিত থাকিল।

এই বিন্যাসরীতির সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। প্রথমত এক একজন লেখকের একটি করিয়া গল্প গৃহীত হওয়ায় কোন লেখকেরই সম্পূর্ণ পরিচয় ইহার মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। নির্বাচিত গল্পটি যে লেখকের শ্রেষ্ঠ বা বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক রচনা এমন দাবীও সব সময় করা চলিবে না। গল্পগুলির নির্বাচনের কারণ এই যে উহাদের মধ্যে লেখকদের বিশিষ্ট সমাজ-চেতনা ও জীবনবোধের এক একটি দিক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক বাংলা গল্পলেখকদের মনে বাঙলা দেশের যে সমাজরূপ ও ব্যক্তিজীবনের নব সম্ভাবনা বীজাকারে নিহিত থাকিয়া তাঁহাদের গল্প-রচনার প্রেরণা যোগাইতেছে এই গল্পসমষ্টি-পাঠের ফলে তাহা পূর্ণরূপে প্রকটিত হইবে। এই চলমান জীবনধারায় মুহূর্তে মুহূর্তে যে ঢেউ ঝলকিয়া উঠিতেছে, যে আবেগ ও অনুভূতি সমতল মসৃণতার ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া একক স্বাতন্ত্র্যে আত্ম-ঘোষণা করিতেছে, যে ক্ষণিক খেয়াল-কল্পনা-ভাব-মদিরতার রঙ্গীন বুদ্‌বুদ উত্থান-পতনের মাঝখানে নিমেষের জন্য স্থিরতার করুণ বিভ্রান্তি জাগাইতেছে তাহারা সকলে মিলিয়া বাঙলার মনোলোকের একটা প্রাণবেগচঞ্চল, বর্ণবৈভবপূর্ণ, সঙ্কেত-ভাস্বর ছবি অঙ্কিত করিতেছে। গল্পসমষ্টির ভিতর দিয়া সাম্প্রতিক বাঙলার প্রাণ-পরিচয়, উহার অন্তরলোকের উদ্‌ঘাটন উহাদিগকে একটি গুরুতর ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়াছে।

॥ তিন ॥

এইবার সংগৃহীত গল্পগুলির মধ্যে জীবনসত্যের যে রূপ-ব্যঞ্জনা ও রচনারীতির যে পরিচয় মিলিতেছে রস-বিশ্লেষণের সাহায্যে তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। প্রথম পর্যায়ে বিন্যস্ত গল্পগুলির মধ্যে ব্যক্তি-পরিচয়ের যে অভাব আছে তাহা নহে; তথাপি ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজের সামগ্রিক চিত্রাঙ্কন।

জগদীশ গুপ্তের 'রামের টাকা' গল্পে চক্‌চকে রূপার টাকার প্রতি ভিক্ষুক রামের বাৎসল্যবোধের আতিশয্য, উহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া, সর্বইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার স্নিগ্ধ সুখস্পর্শতার লেহন, উহাকে লইয়া মনে আশা-আশঙ্কার নেশা-ধরানো প্রবল দোলার উপলব্ধি—এই সমস্তই বঞ্চিত জীবনের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে এক অস্বাভাবিকরূপে তীব্র মানস-আলোড়নের চিত্র।

এই তুমুল আলোড়নের মধ্যে রামের ব্যক্তিত্ব গৌণ ও উপেক্ষণীয়—ইহার ভিতর দিয়া সমাজের স্বভাব-কৃপণতা ও বণ্টন-বৈষম্যের ইঙ্গিতটিই বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ। যে অবস্থায় পড়িলে টাকার অর্থনৈতিক সহজ মূল্যকে বহুদূরে ছাড়াইয়া উহার একটা কৃত্রিম মহার্ঘ্যতা মনের নিকট প্রতিভাত হয়, রসনাকে উপবাসী রাখিয়া কল্পনাকে বিচিত্র আহার্য-সম্ভারে তৃপ্ত করিবার অভিলাষ জাগে, অর্থের ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপর স্বপ্নজালবয়ন প্রাধান্য লাভ করে, গল্পটি সেই সমাজের নিষ্করুণতা, সেই অর্থনীতির বীভৎস বিকৃতির প্রতি এক নীরব অনুযোগ বহন করিতেছে। ইহা লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার রূপকের পিছনে ছেঁড়া কাঁথার শততালি-দেওয়া জীর্ণতার দিকেই আমাদের অনুভূতিকে অনিবার্য অথচ অলক্ষিতভাবে আকর্ষণ করিতেছে।

মনোজ বসুর 'ফার্ষ্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা' গল্পটিতেও একমাত্র চরিত্র পশুপতি মাষ্টার ব্যক্তি নহেন, একটি করুণ পূর্বস্মৃতিরোমন্থনের বাহন মাত্র। তাহার প্রথম যৌবনের দীপ্ত অরুণরাগের সহিত তাহার পরিণত প্রৌঢ় বয়সের ধূসর, প্রয়োজন-পিষ্ট জীবনযাত্রার তুলনা তাহাকে অতীতস্বপ্নবিভোর করিয়া তুলিয়াছে। দুর্যোগের রাত্রে অকস্মাৎ তরুণ দম্পতির আগমন ও তাহাদের মান-অভিমানের প্রণয়লীলা অকালবৃদ্ধ মাষ্টারের মনে তাহার সুপ্ত যৌবনস্মৃতিকে মুহূর্তের জন্য জাগাইয়াছে, কিন্তু কঠোর বাস্তব জীবন এই স্মৃতি-উপভোগের কোন দীর্ঘ সুযোগ দেয় নাই। যে একদিন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে এক অপরিচিত বালিকাকে তাহার যৌবনকল্পনার প্রতীক্ 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য-গ্রন্থটি বিলাইয়া দিয়াছিল সে আজ পেটের দায়ে এক মূর্খ ছেলেকে ফার্ষ্ট বুক পড়াইতে বাধ্য হইতেছে। কল্পনা ও বাস্তবের সামাজিক-কারণ-প্রসূত এই শোচনীয় ব্যবধানের করুণ সুরটি সমস্ত গল্পটিকে প্লাবিত করিয়াছে।

আশাপূর্ণা দেবীর 'অভিনেত্রী' গল্পটিও একটি পারিবারিক সমস্যাকে রূপ দিয়াছে। সংসারের গৃহিণীকে যে সংসারের শান্তি বজায় রাখিতে চিরজীবন অভিনয় করিতে হয়, বিরুদ্ধ আদর্শবাদী বাপ ও ছেলে উভয়েরই মন রাখিয়া পরস্পর-বিরোধী কথা বলিতে হয়, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলেরই মানমর্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা এই গল্পটিতে কৌতুকাবহরূপে চিত্রিত হইয়াছে। অবশ্য এই কৌতুকরসের মধ্যে একটি করুণ রসের ব্যঞ্জনা অলক্ষিতভাবে রহিয়া গিয়াছে—গৃহিণীর সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের মূল্যেই এই অভিনয়-ক্রিয়া নিখুঁত হইতেছে ও সংসার-রথ বিনা সংঘর্ষে চলিয়া যাইতেছে। অনুপমার যদি কোন ব্যক্তিত্ব থাকে,

তবে উহা সম্পূর্ণ আত্মনিরোধের মাধ্যমেই অভিব্যক্ত হইয়াছে—নতুবা সে সংসার-যন্ত্রের একটা আবশ্যকীয় কল মাত্র।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটিও মুসলমান-সমাজের কিছুটা বৈশিষ্ট্যকে উপভোগ্যভাবে চিত্রিত করিয়াছে। গল্পের পটভূমিকা খেজুর গাছে রস নামানো ও সেই রস জ্বাল দিয়া গুড় তৈয়ারি করার প্রয়োজন ও আয়োজনের দ্বারা নির্ধারিত। মোতালেকের মনে খেজুর রসের লাভজনক আকর্ষণ ও নারীদেহলাবণ্যের সব-ভোলানো মোহের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে তাহারই মনোজ্ঞ বর্ণনা গল্পটির উপজীব্য। সে প্রয়োজনের জন্য চাহে মাজুখাতুনকে আর সৌন্দর্যবোধের পরিতৃপ্তির জন্য চাহে ফুলবানুকে। এই প্রেম ও প্রয়োজনের সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনেরই যে জয় হইবে তাহার ইঙ্গিত দিয়া গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। মোতালেকের মত স্থূলরুচিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে প্রেম ক্ষণিক স্বপ্ন, জীবিকার্জনই মুখ্য দাবী। তাহার মধ্যে যেটুকু রসিক পুরুষ সেইটুকুই প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করে; যে মোটা অংশটি কাজের মানুষ তাহা প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দেয়। এই গল্পের মধ্যে মুসলমান সমাজের বিবাহের রীতি-নীতি, প্রতিবেশীদের মধ্যে মেলা-মেশা ও প্রেম-নিবেদনের বিশিষ্ট ভঙ্গীটি একটু নূতন রস, কিঞ্চিৎ আস্বাদন-বৈচিত্র্য আনিয়াছে। মোতালেকের কিঞ্চিৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু মোটের উপর সমাজচিত্রই গল্পটির আকর্ষণের মূল কারণ।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সত্যমেব' গল্পে ঘটক ঘোষালের তীক্ষ্ণ-ঝাঁঝওয়ালা ব্যক্তিত্ব, মনের অনমনীয় দৃঢ়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সমাজ-জীবন তাহার সম্মুখে যে জটিল সমস্যা, কর্তব্য সম্বন্ধে যে দ্বন্দ্ব-দোলায়িত সংশয় উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহাই শেষ পর্যন্ত তাহার ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করিয়াছে। মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা, আশ্রয়চ্যুতা মেয়ের বিবাহে সত্যকথা বলিয়া বিবাহ ভাঙ্গিবার অদম্য সঙ্কল্প হঠাৎ বধূর শান্ত-করুণ মুখশ্রী, মিলন-লগ্নের পরম-নির্ভরতাময় প্রশান্ত মাধুর্যের মায়ায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল—হৃদয় ঘোষালের দুর্জয় ব্যক্তিসত্তা এক বৃহত্তর ন্যায়নিষ্ঠার প্রবলতর প্রতিরোধে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত উদ্যত ফণা সংহরণ করিল।

॥ চার ॥

পরবর্তী পর্যায়ের গল্পগুলিতে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে সমাজের সহজ ছন্দের ব্যতিক্রম উদাহৃত হইয়াছে। কোন প্রবৃত্তির অতিপ্রসারে, বা জটিল সমাজ-ব্যবস্থা-

প্রসূত কোন অসাধারণ মানস প্রতিক্রিয়ার বশে, বা কোন দুর্বোধ্য খেয়ালের প্রেরণায় মানুষ সুস্থ সমাজ-জীবনের স্বাভাবিকতাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া একটা মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহলের উদ্রেক করে।

তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী' গল্পে এক ভোজনলোলুপ ব্রাহ্মণের সুখাদ্যের প্রতি লোভ এতটা মাত্রাতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে ইহা তাহার আত্মসম্ভ্রম বা শালীনতাবোধের সমাজ-রচিত আদর্শকে ত ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিলই, প্রাণতত্ত্বর সহিত জড়িত সন্তানস্নেহের সহজ সংস্কারকেও বিপর্যস্ত করিয়াছিল। সূতিকাগৃহে ছেলে বদল করিয়া সে নিজের ছেলেকে জমিদারের উত্তরাধিকারীরূপে চালাইয়া দিয়াছিল—এবং যাহা আরও অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য—সেই ছেলের শ্রাদ্ধেও অগ্রদানীরূপে দান গ্রহণ করিয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষের এই বীভৎস বিকৃতি সমাজ-সত্তার মধ্যে এক গোপন ক্ষত, এক অস্বাভাবিক প্রশ্রয়দানের ইঙ্গিত দেয়।

সুবোধ ঘোষের 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা-আচারের অন্ধ অনুকরণে রুচিবিকারগ্রস্ত, নানা আজগুবী খেয়ালী কল্পনায় অন্তরের শূন্যতাপূরণে গলদ্‌ঘর্ম সমাজের এক উদ্ভট অসঙ্গতির চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। রূপহীনা তরুণী যে কোন উপায়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভের ব্যাকুল আগ্রহে শেষ পর্যন্ত নিজের নামে কুৎসা রটাইয়া নিজেকে দর্শনীয় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে—মিথ্যা-সম্ভ্রম-লোলুপ, আদর্শহীন সমাজের এক বিকৃত সাধনা মালা বিশ্বাসের অশালীন, অশ্লীল আত্ম-প্রচারের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

নবেন্দু ঘোষের 'কান্না' গল্পে নিদারুণ অভাবের জ্বালায় সাময়িকভাবে অপ্রকৃতিস্থ এক শ্রমিকের স্ত্রী-হত্যা ও তাহার ফাঁসির জন্য প্রতীক্ষার অবসরে তাহার নিদারুণ মানসিক বিপর্যয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গলা-টিপিয়া-খুন-করা স্ত্রীর অস্ফুট কান্নার অবিরাম অনুরণন তাহার কানে সর্বদাই বাজিতেছে; ইহা তাহার স্নায়বিক অনুভূতিকে এমন গভীর-নীরন্ধ্রভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও ইহা তাহার বাস্তব চেতনার উপর একটা বিভ্রম-যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। বিপিনের হিংস্র প্রবৃত্তির উদ্রেক ও খুন করার পর তাহার মনের অসাড়তা ও অবসাদ চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'জ্বালাহর' সমাজ-জীবনের আর একটি উদ্ভট ব্যতিক্রমের কাহিনী। শিউলি ও শ্যামলী দুই বোন, বিবাহের পরও তাহারা এক বাড়ীর উপর ও নীচু তলায় বাস করে। ছোট বোন শ্যামলীর স্বামী ইন্দ্রনাথ গভীর রাতে মাতাল

অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে প্রহার-নির্যাতন করে, ও শ্যামলীর তীব্র, ভয়ার্ত চীৎকার নিয়মিতভাবে সহরতলীর নৈশ নির্জনতাকে চকিত করে। শ্যামলী কিন্তু দিদির নিকট স্বামীর এই মারধোরের কথাটা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে ও দিদির সহানুভূতিপূর্ণ উপদেশকে আমল দেয় না। শিউলি ইহার একটা প্রতিকারের উপায় স্থির করিল—ইন্দ্রনাথ যখন ঘরে ফিরে ঠিক সেই মুহূর্তেই শিউলির ভয়চকিত আর্তনাদ ইন্দ্রনাথের উদ্যত হিংস্রতাকে বিস্ময়াতিশয্যে প্রতিহত করিয়া দেয়। ইন্দ্রনাথের মতি-পরিবর্তনের কথা শিউলির অজ্ঞাত থাকায়, সে নিয়মিতভাবে এই ছলনার আশ্রয় লয়। এখন একেবারে চাকা ঘুরিয়া গেল—এখন সমবেদনা অনুভব করিবার পালা শ্যামলীর। শিউলিও মনে করে যে এই অভিনয়ের দ্বারা সে শ্যামলীর জীবনকে ক্লেশমুক্ত করিতেছে। পারিবারিক সম্বন্ধের এই অস্বাভাবিক বিপর্যয়ে আসল কান্না থামিয়া গেলেও নকল কান্নার প্রতিধ্বনি অনুরণিত হইতে থাকে, রোগ আরোগ্যের পরও তাহার চিকিৎসা চলিতে থাকে। লেখকের কল্পনার মৌলিকতা মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে—পরিবার-জীবনে কোথায় কোন বাঁকা-চোরা ফাটল দেখা দিয়াছে তাহার প্রতি লেখকের দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ ও এই ফাটলের ফাঁক দিয়া যে সুর নির্গত হইতেছে তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুভূতি কি আশ্চর্যরূপ সজাগ।

॥ পাঁচ ॥

ইহার পরবর্তী পর্যায়ের গল্পগুলিকে 'পাতাল-জীবন' এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। সমাজের বাহিরের চাকচিক্য ও সুবিন্যস্ত মসৃণ সুষমার পিছনে যে অন্ধকার, কর্দম-পিচ্ছিল স্তর আছে ও সেখানে যে সমস্ত অন্ধ প্রবৃত্তির দাস, মূঢ় সংস্কারাচ্ছন্ন, মানবজীবনের নীচু তলার লোক বাস করে, ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখকের দৃষ্টি ক্রমশ অধিকতর পরিমাণে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। ইহাদের মধ্যে বিষয়ের অভিনবত্ব ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল মেটাইবারও যথেষ্ট উপাদান আছে। আদিম, অসংস্কৃত জীবনের যে ধারাটি মাটির স্পর্শ ও ঘ্রাণ লইয়া প্রবাহিত হয়, যাহার মধ্যে একই ছাঁচে ঢালা শিক্ষা-সামাজিকতার সমীকরণ-প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ, তাহাতে মানবজীবনের ন্যূনতম মূল্য-মর্যাদা, জীবন-মমতার একটা অবোধ, অমার্জিত উচ্ছ্বাসের কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় মিলে। অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোথাও কোথাও এই বন্য, দুর্বার, শ্বাপদ হিংস্রতার আভাস চকিত হইয়া উঠে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পটি মানুষের গভীর-চেতনাশায়ী শ্বাপদবৃত্তির এক চমকপ্রদ সন্ধান দিয়াছে। গল্পের রাজাবাহাদুর আধুনিক বিলাসের সর্বোপকরণবেষ্টিত, আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির পালিশেও মার্জিতরুচি। কিন্তু শিকার-ব্যসনের সূত্র ধরিয়া তাঁহার গহন-গভীর চিত্তের সঙ্গে কোথাও যেন আরণ্য দুরবগাহতার যোগ ছিল—মোটরের সন্ধানী আলোয় দিগন্ত-গ্রাসী, শ্বাপদের চকিত আভাসে আতঙ্ক-কণ্টকিত, নিবিড় বনের যতটুকু আলোকিত হয়, ভদ্র জীবনের সামাজিকতায় রাজা বাহাদুরের মনের অতল রহস্যগভীরতার ততটুকুর বেশী জানা যায় না। লেখকের সহিত রাজাবাহাদুরের স্বল্পকালীন সাহচর্যে তাঁহার সঙ্গ যেমন আরাম-আতিথেয়তা-সৌজন্যে লোভনীয়, প্রবেশ-নিষেধ নোটিশ-আঁটা ব্যবধানের অন্তর্বর্তিতায়, ঘনিষ্ঠতা-প্রতিবেধক নিগূঢ় অথচ দ্ব্যর্থহীন সঙ্কেতে তেমনি ভয়াবহ সম্ভাবনায় শঙ্কিল। মানুষকে টোপ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া বাঘ-শিকারের নেশা এমনি কল্পনাতীতরূপে নৃশংস, অ-মানবিকতায় এমনি লোমহর্ষণ যে আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা এই অতি-বাস্তব দুঃস্বপ্নের ঘোরে লেখকের ন্যায় মূর্ছিত হইয়া পড়ে। সেই মানুষের টোপ দিয়া ধরা বাঘের চামড়ায় নির্মিত পাদুকার উপহার এক নারকীয় পরিহাসের মতই আমাদের সঙ্গতিবোধকে তীব্রভাবে বিচলিত করে, রক্তমাখা হাতের প্রেমালিঙ্গনের মত আমরা উহার স্পর্শ হইতে সভয়ে পিছাইয়া যাই। গরু মারিয়া জুতা দানের সুপরিচিত প্রবাদ-বাক্যটি এক অকল্পিত অর্থতাৎপর্যে এক অজ্ঞাত বিভীষিকার দ্বার উন্মোচন করে।

ননী ভৌমিকের 'খুনীর ছেলে', রহিম কোচোয়ানের জীবন-যন্ত্রের লুকানো কল-কব্জাগুলিকে পরীক্ষা করার প্রয়াস। ঘোড়া ও ঘোড়াগাড়ীর গাড়োয়ান উভয়েই প্রায় এক জাতীয় জীব—প্রয়োজনের জোয়ালে জোতা, যান্ত্রিক নিয়মের লৌহ-শিকলে বাঁধা। তথাপি এই জাতীয় মানুষের যন্ত্রবদ্ধ একটানা কাজের পিছনে একটা অন্ধ সংস্কারের বিস্ফোরকতা, একটা রক্তবাহিত খুনী মেজাজের উত্তরাধিকার লুকানো আছে। এ যেন শান্ত অপরিবর্তনীয় ছন্দে আবর্তনশীল পৃথিবীর নাড়ীতে অকস্মাৎ লাভার অগ্নিস্রোত বা আগ্নেয় গিরির উষ্ণবাষ্পোচ্ছ্বাস। একটা ঘোড়ার প্রতি অহেতুক ভালবাসার আতিশয্য, অবোধ, নাড়ী-ছেঁড়া আকর্ষণ অন্তরে এই উত্তাপ-সঞ্চয়ের কারণ। ঘোড়া ও মানুষের খাদ্যের দুর্মূল্যতা, গাড়ীর মালিকের মুনাফাখোর মনোভাব ও চারিদিকের প্রতিবেশে দুর্ভিক্ষের আগুনের আঁচ তাহার এই মানসপ্রবণতাকে ফাটিয়া পড়িবার বারুদ যোগাইয়াছে। পাতাল-প্রচ্ছন্ন নাগলোক হইতে এক ঝলক বিষাক্ত বায়ু বাহিরে আসিয়াছে।

সুশীল জানার 'আন্না' আরও গভীর স্তরের জীবন-সংস্কারের পরিচয় বহন করে। যাযাবর বংশের মেয়ে আন্দি সৎচাষীর ছেলে জগার প্রেমে পড়িয়া তাহার পূর্ব সংস্কারকে বিসর্জন দিয়াছে ও মাটির আকর্ষণে গার্হস্থ্য জীবনের স্থিরতায় বাঁধা পড়িয়াছে। তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর সে ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া সংসার চালাইতেছে ও স্বামী-স্ত্রীর যুগ্মশ্রমার্জিত জমিজমার মালিকানা-স্বত্বকে সম্ভ্রান্ত জীবনের বাহ্য নিদর্শনরূপে আশ্রয় করিয়াছে। সে তাহার পূর্বজীবনের আত্মীয়-সঙ্গীদের সংশ্রব হইতে প্রশ্রয়হীন কঠোরতার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কিন্তু তাহার অসহায়ত্বের সুযোগ লইয়া জমিদারের নায়েব তাহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্রজাল পাতিয়াছে। তাহার বিবাহের বৈধতা অস্বীকার করা ও তাহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার জন্য সাক্ষীসাবুদ সমস্ত প্রস্তুত। তাহার ঘরে আগুন লাগাইয়া তাহাকে ভিটা-ছাড়া করিবার দুরভিসন্ধিও বাদ যায় নাই। এই বহুমুখী চক্রান্ত-চক্র-বেষ্টিত হইয়া আন্দি যে অনমনীয় দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়াছে, যে দুর্বার জীবনীশক্তির প্রতিরোধকে চীনা প্রাচীরের ন্যায় অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছে, অত্যাচার-কলঙ্করটনার ভস্মাবলেপ ভেদ করিয়া তাহার মাতৃমূর্তি এরূপ দিব্য বিভায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে যে গল্পটি মানবিক মহিমা ও চরিত্র-সমুন্নতির চিত্রাঙ্কন হিসাবে খুব উন্নত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। অথচ ইহার মধ্যে বাস্তব-পরিচয়-বিলোপী, ভাবাতিশয্যের কুয়াশা-ঢাকা আদর্শায়নের কোন চিহ্ন নাই—আন্দি তাহার সমস্ত স্থূলতা, রূঢ়তা, নিম্নশ্রেণী-সুলভ মনের সমস্ত অশালীনতা ও অপরিচ্ছন্নতা লইয়া গ্রাম্য কারিকরের গড়া, শিল্পের দিক দিয়া নানা ত্রুটিপূর্ণ, অথচ শিল্পীর মানস বিশ্বাসে প্রোজ্জ্বল দেবী-প্রতিমার মতই প্রতিভাত হয়। পাতাল জীবনের অন্ধকার এখনও তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়া এক ঝলক স্বর্গলোকের আলোক তাহার মুখশ্রীর মধ্যে দিব্য ব্যঞ্জনা আনিয়া দিয়াছে।

এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গল্প সমরেশ বসুর 'জোয়ার-ভাটা'। ইহার মধ্যে শ্রমিক নর-নারীর এক নূতন জীবন-ছন্দ, এক অভিনব প্রাণোল্লাস, কাজকে গানে পরিণত করার এক আশ্চর্য রসায়ন ও যৌথজীবনের নিবিড়তা ও বিস্তারের মধ্যে আত্মলীন হইবার একটি প্রবণতা রূপ পাইয়াছে। যে নর-নারীর একদিন-ব্যাপী-জীবনোচ্ছ্বাস এই গল্পটির বিষয়, তাহারা সহুরে শ্রমিক নয়, গ্রাম্য শ্রমজীবি ; ইহারা ঠিক শ্রমিক সংস্থার লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ নয়, গ্রামীন জীবনের খানিকটা স্বচ্ছন্দ প্রসার তাহাদের আর্থিক দুর্গতি ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও

একটা মুক্ত আবহাওয়া প্রবাহিত করিয়াছে। ইহাদের কাজ ইহাদের প্রাণশক্তিকে পিষিয়া মারে নাই, বরং ইহাদের জীবনানুভূতির প্রেরণা যোগাইয়াছে। কাজের সন্ধানে একত্র জোটা মজুর-কামিনের দল গান ও ছড়ার ভিতর দিয়া কবিওয়ালাদের মত উত্তর-প্রত্যুত্তর চালায়, পরস্পরের জীবন-অভিজ্ঞতাকে মিলাইয়া দেখে, হাস্য-পরিহাসপূর্ণ টীকা-টীপ্পনি কাটে, ভালবাসার রং ও অভিভাবকের তর্জন এই দ্বৈতসঙ্গীতের ফাঁকে ফাঁকে মধুর ও ঝাঁঝালো স্বাদ-গন্ধের মত মিশিয়া থাকে। সব শুদ্ধ মিলিয়া অনেকগুলি প্রাণের এক হোলি-খেলা চলে, যদিও এই প্রাকৃত হোলি-খেলায় আবির অপেক্ষা কর্দম-বর্ষণই মুখ্য উপাদান। যে নৌকার মাল খালাস করিবার জন্য তাহারা সকাল হইতে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে তাহার পৌঁছিতে অত্যধিক বিলম্ব তাহাদের ক্ষুধায় তিক্ত মেজাজকে বিগড়াইয়া দেয়, ধৈর্যহারা মন সামান্য উপলক্ষ্যেই কলহের উত্তেজনায় মাতিয়া উঠে, পরস্পরকে হিংস্র নখদন্তের আঘাতে জর্জরিত করে। আবার নৌকা পৌঁছিলে কাজের আনন্দ ও উপার্জনের প্রত্যাশা তাহাদের মেজাজের উষ্ণতাকে প্রশমিত করে, মালবোঝাই নৌকা রূপকথার ময়ূরপংখী তরণীর ন্যায় মায়াময় সৌন্দর্যের হাতছানি দেয়, সমবেদনাস্নিগ্ধ উদারতা বিরোধতিক্ত মনের ঝাঁঝকে নিঃশেষে মুছিয়া দেয় এবং কাজের শেষে গঙ্গার স্নিগ্ধ জলে অবগাহন এই প্রকৃতির দামাল শিশুগুলিকে ধুয়াইয়া মুছাইয়া নির্মল করিয়া ভালবাসার মধুর স্বপ্ন-রোমন্থনের মধ্যে ঘুম-পাড়ানিয়া শয্যার আশ্রয়ে প্রতিপ্রেরণ করে। শ্রমিক জীবনের এই নূতন ছন্দটি শ্রমকর্কশ আধুনিক জগতে যেন রূপকথার গানের মত সমস্ত মনকে এক মধুর আবেশে আচ্ছন্ন করে। লেখক পাতালের অন্ধকারের মধ্যে সূর্যালোক ও ইহার কঠিন পাষাণ-স্তূপের মধ্যে ভোগবতী-ধারার সন্ধান পাইয়াছেন।

॥ ছয় ॥

পরবর্তী পর্যায়ে বিগত মহাযুদ্ধের নিদারুণ অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার সমাজ-জীবনে যে ভয়াবহ বিপর্যয় আনিয়াছে তাহারই কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গালীর যুগযুগান্তরের সংস্কার ও ধর্মবোধ, বদ্ধমূল আদর্শবাদ এই বারুদের বিস্ফোরণে ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গিয়াছে। এই প্রলয়-ঝটিকায় সমস্ত ভদ্রসংস্কার, সমস্ত মানমর্যাদা, জীবনবোধের সমস্ত রুচি-শালীনতা, পরিবার-বন্ধনের সমস্ত মাধুর্য নিঃশেষে উবিয়া গিয়া জীবনের নগ্ন, রিক্ত, প্রবৃত্তিমাত্র-সম্বল, বীভৎস কঙ্কালটি অনাবৃত হইয়া

পড়িয়াছে। গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় এগুলি যেন বাঙ্গলাদেশের পরিচিত সমাজ-চিত্র নয়, বাঙালী নামের অন্তরালে, বাঙলার জানা-শোনা ভৌগোলিক পরিবেশে কোন এক প্রেতপুরীর জীবনযাত্রা অভিনীত হইতেছে। বাঙ্গালী মরিয়া গিয়াছে এবং তাহার শ্মশানে কবন্ধনৃত্যেরই আমরা দর্শক। কিন্তু এই জীবন-চিত্রের মধ্যে খানিকটা অতিরঞ্জন থাকিলেও, লেখকের মানস তিক্ততা ইহাকে বাস্তব অপেক্ষা বীভৎসতর করিয়া তুলিলেও ইহা যে মূলত মর্মান্তিকভাবে সত্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার' গল্পে আশ্রয়চ্যুত মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্ত মানসম্ভ্রম হারাইয়া পেটের দায়ে ইতর, গ্লানিকর জীবনযাত্রায় অবতরণ শোচনীয়ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। শুধু চাল-ডাল যোগাড়ের অনিবার্য প্রয়োজনে মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে ও পুরুষেরা না-জানার-ভান-করা নিরুপায় দর্শকে পরিণত হইয়াছে। অনশনক্লিষ্ট, অভাবমথিত বাঙ্গলা দেশের এই ছিন্নমস্তা রূপের সহিত অপরিচিত আত্মীয় এইরূপ দৃশ্যের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে তাহার মনে যে ধিক্কারজনক অনুভূতি জাগে, তাহার সামনে আবরু রক্ষার বৃথা চেষ্টা ও অসংবরণীয় রোদনোচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া উদ্ধত, বে-পরোয়া স্বীকৃতির যে দুই-অঙ্ক-বিশিষ্ট মর্মান্তিক নাটকের অভিনয় হয়, তাহাই প্রবোধকুমারের গল্পে জ্বালাময় অভিব্যক্তি পাইয়াছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা' আরও গ্লানিকর পরিস্থিতির চিত্র। পেটের দায়ে মেয়ে বেচা ও কামের তাড়নায় উপভোগ্যা নারীর অনুসন্ধান রীতিমত ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এই নারীদেহের আমদানী-রপ্তানির ভিতর দিয়া হৃতসর্বস্ব ছা-পোষা পল্লীগৃহস্থ ও কালোবাজারী মুনাফায় স্ফীতোদর, সহরের হঠাৎ-বড় মানুষের এক দুর্বিষহরূপে অসম মোলাকাৎ হইতেছে, সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক নাড়ীপাকানো যোগসূত্র রচিত হইতেছে। এই হীন বেসাতির মধ্যে মানবিক আবেগ কখন কখন আত্মস্ফুরণের বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত এই পঙ্কপল্বলের কর্দমস্তরে তলাইয়া যাইতেছে। মেয়েকে বিক্রয় করিবার পূর্বে বাপের একটা বিবাহের অভিনয় করিয়া খুঁতখুঁতে ধর্মবোধকে ঘুস দেওয়ার চেষ্টা ও দালালের মেয়েটিকে নিজ স্ত্রীরূপে গ্রহণের আগ্রহ উভয়ই অর্থলোভের নিকট পরাজিত হইয়াছে; এই ব্যর্থ প্রয়াসের করুণ দিক্‌টাই আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। অচিন্ত্যকুমারের 'বস্ত্র' এই উল্টা পরিবেশে লজ্জাবরণত্ব হারাইয়া

উদ্বন্ধনরজ্জুতে পরিণত হইয়াছে—এখানে লেখকের উদ্দেশ্য অতিপ্রকট হইয়া গল্পের রসহানি ঘটাইয়াছে।

সন্তোষ ঘোষের 'কানাকড়ি' আদর্শবাদে দৃঢ়, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামশীল পরিবারের যুগপ্রভাবে ধীরে ধীরে নীতিভ্রষ্ট হওয়ার ইতিহাস বিবৃত করিতেছে। এখানে অতিরঞ্জিত বীভৎসতা নাই, আছে তিলে তিলে নৈতিক দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ-শক্তির ক্ষয়। শেষে স্বামী স্ত্রীকে পরের চোখে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার উপদেশ দেয় ও স্ত্রী এই চেষ্টার ব্যর্থতায় নিজ সৌন্দর্যের অভাবের জন্য আহত অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়। আদর্শনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই পরিণতি—আমাদের নীতিবোধ যে আর্থিক স্বচ্ছলতাসঞ্জাত, উহার নিজের যে কোন প্রাণশক্তি নাই—এই গ্লানিকর সত্যটিই আমাদের মনে মুদ্রিত করে।

প্রভাতদেব সরকারের 'বিনিযোগ' পরিবার-জীবনের মধ্যে বণিকবৃত্তির নির্লজ্জ প্রসার অকথিত, কিন্তু অনুমিত ইঙ্গিতের দ্বারা ভয়াবহরূপে উদ্ঘাটিত করে। ভাইএর চাকরীতে অভূতপূর্ব উন্নতি ভগ্নীকে উপরিতন কর্মচারীর লালসার ইন্ধনরূপে ব্যবহার করার ফল। এই জুগুপ্সিত সত্য সমস্ত গল্পের মধ্যে সংশয়ের মত প্রধূমিত হইয়াছে, কোথাও প্রকাশ্য উদ্ঘাটনের অগ্নিশিখায় জলিয়া উঠে নাই। ভগ্নীর বিবাহে ভাইএর উৎসাহের অভাব ও একরূপ অদ্ভুত নির্লিপ্ততা, ভগ্নীর সংসার-সুখে বিষণ্ণ নিস্পৃহতা ও জীবনে এক রুচিহীন শূন্যতাবোধ, পুরাতন বন্ধু বান্ধবের সাহচর্য ও সঙ্গীতচর্চায় বিরক্তি, সমস্ত সংসারের মুখে একটা লক্ষ্যহীন উদভ্রান্তি ও নিষ্প্রাণতার ছায়া—এ সমস্তই একটা অভাবনীয় কুৎসিত সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে। 'বিনিয়োগ' শব্দের যোগরূঢ় অর্থ হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত মনের মধ্যে খেলিয়া যায়।

এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গল্প বাণী রায়ের 'ময়নামতীর কড়চা'। সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের দুলালী কন্যা ময়নামতী বিবাহের অল্পদিন পূর্বে মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা ও ধর্ষিতা হয়। এই নিদারুণ দুর্ঘটনার পর তাহার চোখের সম্মুখ হইতে সমস্ত আলোক নিবিয়া গেল। পরিবারের সকলের আক্ষেপ ও আক্রোশের মধ্যে, প্রতিবেশীর শ্লেষপূর্ণ ছদ্ম সহানুভূতির দুঃসহ খোঁচায় বিদীর্ণ ও আত্মগত চিন্তার অগ্নিবেষ্টনীতে দগ্ধ হইয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল। দেশত্যাগের পর সে ভাইএর সংসারে গলগ্রহ হইয়া সকলের উপেক্ষিত, অর্ধ-বিকৃত জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইল। পরিবারের হাসি-কান্নার, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্নেহস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া সে যেন পরিবারের মধ্যে বাস করিয়াও তাহাদের কেহ নয়; সে

তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে, তাহার অসুস্থ, বিকৃত কল্পনার বেড়াজালে বন্দী। তাহার এই করুণ জীবনচিত্র যেরূপ মর্মস্পর্শী সহানুভূতি, সংযত শ্লেষ ও ক্ষোভের লক্ষ্যভেদী অব্যর্থ ব্যঞ্জনার সহিত বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তাহার দুঃখের নীরব মহিমা ও নিথর গম্ভীরতাটি আশ্চর্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চির-বঞ্চিত, ভাগ্যলাঞ্ছিত জীবনে অতৃপ্ত যৌবনস্বপ্ন একটি কোমল, অপরের বেদনায় ব্যথিত অনুভবশক্তিকে সম্পূর্ণ বিলোপ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নিজের ভাইঝি যখন প্রেমপত্র লিখিয়া পিতার তর্জনে দিশাহারা, তখন এই চির-উপেক্ষিত পিসি পূর্বজন্মের কোন দুর্বোধ্য প্রেরণায় আগাইয়া আসিয়া সমস্ত দোষ নিজ স্কন্ধে লইয়া ভাইঝিকে দোষমুক্ত করিয়াছে। ইহাই মায়াহীন সংসারের উপর তাহার প্রতিশোধ, অবজ্ঞার পরিবর্তে আত্মবিসর্জন। এই অনপেক্ষিত, অথচ সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বানুমোদিত উপসংহারে গল্পের সর্বদেহবিকীর্ণ করুণ রস এক ঘনীভূত কারুণ্য-নির্যাসে পরিণতিলাভ করিয়াছে। এই পর্যায়ের অন্যান্য গল্পগুলিতে ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা সমগ্র পরিবেশেরই প্রাধান্য—গল্পগুলিকে প্রতিবেশ-বর্ণনা ও সামান্য কিছু ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আনিয়া যবনিকাপাত করা হইয়াছে। একমাত্র 'ময়নামতীর কড়চা'-তে অসহায়, সকলের সহানুভূতিবঞ্চিত নারীর জীবনের অবোধ আকুলি-বিকুলি, তাহার অন্ধকার চিত্তের অবিন্যস্ত কল্পনাজাল, তাহার প্রাণের সঙ্গলিপ্সু শূন্যতাবোধ, ও ছেলেমানুষি, আকাশকুসুমবৎ অভিলাষ-আকূতি তাহার এক সমগ্র, অশ্রুনিষিক্ত পরিচয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। গল্পের নামকরণের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যের সহজ, শাস্ত্রসম্মত নারী-প্রশস্তির সহিত আধুনিক যুগের যে মর্মান্তিক অসঙ্গতি তাহা তীব্র শ্লেষের সহিত ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

॥ সাত ॥

শেষ পর্যায়ে সমসাময়িক প্রভাবমুক্ত, বিশেষ যুগসমস্যার দ্বারা অস্পৃষ্ট, ব্যক্তিজীবন-প্রধান কয়েকটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

শৈলজানন্দের 'অসমাপ্ত' গল্পটিতে এক পাগলাটে, দাম্পত্য কলহে বিড়ম্বিত পোষ্টমাষ্টারের উপভোগ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। গল্পের বিষয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া লেখা বলিয়া ও গল্প লিখিতে লিখিতে পোষ্টমাষ্টারের চরিত্রের নূতন নূতন দিক আত্মপ্রকাশ করিতেছে বলিয়া, গল্পটি 'অসমাপ্ত'। পোষ্টমাষ্টারের ইতিমধ্যে

কখন স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হইয়া গিয়াছে। সুতরাং গল্পের পূর্বতন অংশে তাহার স্ত্রীর যে কালিমালিপ্ত ছবি আঁকা হইয়াছিল তাহা মুছিয়া ফেলিতে সে লেখককে নির্দেশ দিয়াছে। গল্পটির আঙ্গিকও একটু নূতন ধরণের; ইহা পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার অনুসরণ না করিয়া পোষ্টমাষ্টারের খেয়ালের দ্বারা বারবার বাধাপ্রাপ্ত ও খণ্ডিত হইয়াছে।

গজেন মিত্রের 'আশ্রয়' আর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। সংবাদপত্রে আন্দোলন ও প্রকৃত সাহিত্যিক রচনার পার্থক্য এই গল্পে উদাহৃত। আমরা শিক্ষকের আদর্শ চরিত্র, অভাব-অভিযোগ ও দারিদ্র্যের কথা এত বেশী শুনি যে এই পৌনপুনিক দুঃখ-নিবেদন আমাদের মনে বিশেষ কোন সাড়া জাগায় না। কিন্তু লেখক ভূতপূর্ব হেডমাষ্টার ললিত বাবুর যে চিত্র কয়েকটি স্বল্প, সংযত রেখায় আঁকিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞানানুশীলনে উৎসর্গিত জীবনে দারিদ্র্যের সহজ মহিমা ও সুগভীর কারুণ্যের শাশ্বত রূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইনি দুঃখের কথা চাপেন বলিয়াই ইহা অভ্রভেদী; স্বার্থত্যাগের লম্বা বিবরণ দেন না বলিয়াই ইহা দিব্য বিভায় সমুজ্জল। ইনি ভাগ্যের হাতে যে বারবার নিষ্ঠুর আঘাত খাইয়াছেন সে জন্য কোন অনুযোগ করেন না বলিয়াই ইহা নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন অভিযোগের মহিমায় অধিষ্ঠিত। একেবারে শেষ দৃশ্যে কমলার হাত পাতিয়া লেখকের সাহায্য-গ্রহণের আত্মাবমাননা-স্বীকৃতিতে সমস্ত গল্পের আর্দ্রতা যেন একটি বিন্দুতে সংহত হইয়া ট্রাজেডির রসনিবিড়তার রূপ লইয়াছে। কমলা সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিলে উহা অতি-নাটকীয়, ত্যাগের আস্ফালন হইত; ইহার গ্রহণের স্বাভাবিকতাতেই গল্পের শিল্পমূল্য ও সঙ্গতিবোধ চরম উৎকর্ষে পৌঁছিয়াছে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পাদটীকা' আর একটি শিক্ষকের কাহিনী। এই পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ও আধুনিক বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণের সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা না করিয়াই নূতন শব্দ গঠন করা হয় তাহার উপর হাড়ে চটা। পূর্ব গল্পে ললিত বাবু সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের সঙ্গে নিজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটিকেও লোপ করিয়াছিলেন—তিনি ক্রিয়াশীল নন, সহনশীল।(not active but passive)। পণ্ডিত মহাশয় কিন্তু উগ্র ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ছাত্রদের ভর্ৎসনা ও প্রহারে ক্লাসটিকে সর্বদাই সরগরম রাখেন। তিনি স্কুলে বড় কাহাকেও মানেন না, দোর্দণ্ড প্রতাপে আপন রাজত্ব চালান। আসামের ছোটলাট বাহাদুরের স্কুলে শুভাগমন উপলক্ষে পণ্ডিত মহাশয়ের সদা-উন্মুক্ত ঊর্দ্ধদিককে গেঞ্জি

দ্বারা আবৃত করার প্রয়াসে তাঁহার অস্বস্তি ও লাঞ্ছনা লইয়া লেখক নিজেও এক চোট হাসিয়াছেন ও আমাদিগকেও হাসাইয়াছেন। রসিকতার জোয়ারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কেই বা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে এই হাস্যরস করুণ রসের ভূমিকা মাত্র। কিন্তু আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় সে কারুণ্যের নির্ঘোষ নামিয়া আসিয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দিল—পণ্ডিত মহাশয় লাটসাহেবের কুকুরের মূল্যের সহিত তাঁহার পরিবারভুক্ত জনসমষ্টির মূল্য নির্ভুল ত্রৈরাশিক নিয়মে কসিয়া সমস্ত ক্লাসের সামনে নিজ কুকুরাধমত্ব নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিলেন। নিষ্ঠুর আত্মাবমাননার এই রুদ্র পরিহাস সমস্ত গল্পটির মোড় ফিরাইয়া দিল এবং পণ্ডিত মহাশয় ছেলেদের প্রতি যে রূঢ় ও অশ্লীল গালাগালির পিচকারী বর্ষণ করিতেন তাহার মূল উৎসটি যে আত্মধিক্কারের মধ্যে নিহিত তাহা বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় আমাদের নিকট প্রতিভাত হইল।

বিমল মিত্রের 'মিলনান্ত' রেল অফিসের কর্মচারী মল্লিক মহাশয়ের অন্ধ আশাবাদ ও আত্মবঞ্চনার করুণ কাহিনী। তিনি সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া বড় চাকুরে ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ জয়ন্ত যে তাঁহার একমাত্র কন্যা মিনুকে বিবাহ করিবে নিশ্চিন্ত নির্ভরের সহিত সেই আশাকে আঁকড়াইয়া আছেন। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত সাধ, আনন্দ ও সার্থকতার কল্পনাজাল বয়ন করেন। শেষে অবসর গ্রহণের পর তাঁহার অন্তরের দৃষ্টির ন্যায় বাহিরের দৃষ্টিও অন্ধ হইয়া গেল এবং এই অন্ধত্বের অন্ধকারেও তাঁহার চিরপোষিত মিথ্যা আশার প্রদীপ জ্বালিয়া তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি ভুয়া আশা ও আত্মপ্রসাদে কাটাইয়াছেন। অবশেষে মিনুর বিবাহের দিন আসিল, কিন্তু পাত্র যে জয়ন্ত নহে, আর একজন—এই সত্য তাঁহার নিকট গোপন করিতে হইল। তাঁহার একজন সহকর্মী অকস্মাৎ এই অশ্রুসিক্ত, ছলনাভরা বিবাহোৎসবে আসিয়া পড়িয়া এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। এবং যখন বহুদিন পরে তাহার সহকর্মীদের দ্বারা প্রযোজিত নাট্যাভিনয়ে অনভিজ্ঞতার অজুহাতে সে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইল, তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে অতীত জীবনে একদিন সে এক মর্মন্তুদ ছলনানাট্যে অভিনয় করিয়াছিল। মল্লিক মহাশয়ের ব্যক্তিচরিত্রই এই গল্পটির প্রধান অবলম্বন।

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'বাতায়ন' এক শিশুর দারিদ্র্য-সঙ্কুচিত জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যলোলুপ, ঐশ্বর্য-মুগ্ধ কল্পনার কুণ্ঠিত প্রকাশের কারুণ্যভরা বিবরণ। মালতী মাসী তাহার শিশুকল্পনা-রাজত্বের রাণী—অফুরন্ত সম্পদের প্রতীক, শিশু-মনের

সমস্ত কাঙ্ক্ষিত কামনা-পূরণের ইন্দ্রজালের অধিকারিণী। এই মালতী মাসীকে সে চোখে দেখিয়াছে, অল্প কয়েক দিনের জন্য তাহার কুবের-ভাণ্ডার হইতে উপহারও পাইয়াছে, কিন্তু স্বপ্নজালের আবরণমুক্ত তাহার বাস্তব রূপটি তাহার নিকট অনধিগম্যই রহিয়া গিয়াছে। একদিন মালতী মাসীর মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু এত বড় রূঢ় বাস্তব আঘাতেও মালতীর কল্পনা-গড়া ছবিটি মুছিয়া যায় নাই। চিলে কোঠার বন্ধ দেওয়ালে জানালার ছবি আঁকিয়া সে যেমন খোলা আকাশ ও দিগন্তবিস্তৃত বিচিত্র দৃশ্যাবলী কল্পনার চোখে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তেমনি মালতী মাসীও তাহার মনের দেওয়ালে আঁকা একটা 'বাতায়ন', যাহার ভিতর দিয়া দেহভরা রূপ, বুকভরা স্নেহ ও ভাণ্ডার-ভরা ঐশ্বর্য তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। সমস্ত গল্পটির মধ্যেই শিশুসুলভ অর্ধোপলব্ধির একটা অস্পষ্টতা বিস্তৃত হইয়াছে—শিশুর ছোট সংসারটি, তাহার ছোট জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি সবই এই বাষ্পময় পরিবেশে ঝাপসা।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'উপসংহার' গল্পটি দুরাতিক্রান্ত বিভ্রম-বিলাসের যুগের অতৃপ্তি-ভরা, অপূর্ণ লালসায় আবিল, বুনিয়াদি বড় মানুষের মনের ছবি। আধুনিক সমস্যার যুগে ইহাকে যেন অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। ইহাও দারিদ্র্যের কাহিনী, কিন্তু এ দারিদ্র্য ততটা বাহিরের নয়, যতটা অন্তরের। ইহার মধ্যে প্রয়োজনীয়ের অভাব নাই, ন্যূনতমের জন্য কাঙালপণা নাই, আছে স্মৃতিলালিত ভোগকল্পনার অবাধ প্রসারের পথে বাধা, কল্পনার মাপকাঠিতে ঐশ্বর্যের অপ্রতুল। তারাদাস বাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, অর্থেরও টানাটানি, কিন্তু ভোগবাসনা এখনও প্রবল ও অপ্রশমিত। ছেলে শোভনলাল এখন বংশগত কাপ্তেনি-বিদ্যায় প্রথম হাতে খড়ি দিতেছে—ভোগবিলাসের প্রথম পাঠ লইতেছে। তাহার সুন্দর চেহারা, বে-পরোয়া ভাব, জীবন-উপভোগের দুরন্ত স্পৃহা তাহার বাপের মনে সপ্রশংস ঈর্ষ্যা ও অনুচিকীর্ষা জাগায়। একমাত্র মায়ের শাসন পিতা-পুত্রের এই সম্মিলিত বাবুয়ানার বিরুদ্ধে বৃথাই মাথা কুটিয়া মরিতেছে। পুত্রের দৃষ্টান্তে তারাদাস বাবুর জরাজীর্ণ শিরায় ও রোগজীর্ণ দেহে আবার রক্তোচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে ও সে নানারূপ উপায়ে ধারকর্জ করিয়া ও রেস খেলিয়া আবার ভোগবাসনা চরিতার্থতার উপায় অর্থসংগ্রহের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছে। এই গল্পের নূতনত্ব হইল অতীত বিলাস-ব্যসনের বহুযুগব্যাপী সাক্ষী, জীর্ণ অট্টালিকার প্রতি প্রাণ-আরোপে ও তাহাকে এই জীবন-লীলার সহচররূপে কল্পনায়। বাড়ী যেন জীবিত বন্ধুর ন্যায় তারাদাসের সহিত কথা কহে, তাহাকে উৎসাহিত করে, শোভনলালের যৌবনদৃপ্ত

পাদক্ষেপে উৎফুল্ল হয় ও তারাদাসের জীর্ণ বার্দ্ধক্যের স্পর্শে ম্লান হইয়া পড়ে। এক সাধারণ কাহিনীর মধ্যে এই কল্পনার স্পর্শটুকুই ইহার অসাধারণত্বের হেতু হইয়াছে।

॥ আট ॥

আধুনিক গল্পের মধ্যে বিভিন্ন লেখকের যুগচেতনা সমাজ ও ব্যক্তিমানসের কত অপ্রত্যাশিত বিকাশের উপর আলোকপাত করিয়াছে, কত বিচিত্র গতি ও প্রবণতার রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছে তাহা উপরের আলোচনা হইতেই সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের সাম্প্রতিক সমাজে যে পরিবর্তনের ঢেউ খেলিতেছে, যে ভাঙ্গা-গড়ার লীলা চলিতেছে, যে নব নব সমস্যা মানবমনের নিকট আবেদন পাঠাইতেছে, যে সাধারণ ধারা ও অসাধারণ ব্যতিক্রমের সমষ্টি ইহাকে নূতন তাৎপর্যে নব-বিবর্তনাভিমুখী করিয়া তুলিতেছে তাহাই লেখকের কৌতূহলকে জাগ্রত ও তাহার বোধশক্তিকে তীক্ষ্ণ করিতেছে। জীবনের সুপ্রচলিত বিধি-নিয়মগুলি শিথিল হইয়া নানা নূতন খেয়াল ও উৎকেন্দ্রিকতার আবির্ভাবের জন্য পটভূমিকা রচিত হইতেছে। আধুনিক সমাজ-মন কত উড়ু-উড়ু, কত সূক্ষ্ম অতৃপ্তিতে পীড়িত, কত আজগুবি খেয়ালে মস্‌গুল, কত আকস্মিক রুচি-বিকারে নূতন স্বাদপ্রত্যাশী! ইহার পাতালজীবন আর মাটির নীচে আত্মগোপন করিয়া থাকে না, আত্মপ্রকাশের জোর দাবি লইয়া উহার অজ্ঞাতবাস হইতে বাহিরে আসিতেছে ও সমাজের উপরিভাগের মসৃণতা ও উপরিস্তরের লোকের আত্মপ্রসাদকে বিদীর্ণ করিতেছে। ইহার যুদ্ধোত্তর অভিজ্ঞতা এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ন্যায় ইহার নৈতিক ভিত্তিভূমিকে বিপর্যস্ত করিয়া ইহার আদিম পাশবিক স্তরটিকে অনাবৃত করিতেছে। ভদ্রতার খোলস, নীতির আবরণ, পারিবারিক জীবনের মানসম্ভ্রম-মায়া-মমতা, যুগযুগান্তরের সাধনায় গড়িয়া তোলা ধর্মসংস্কার—সবই এই আকস্মিকতার ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতের সমাজ কোন্ নূতন ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে, আগামী যুগের পরিবার-জীবনে প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন্ সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ হইবে, মানব-সম্পর্কের কোন্ কমনীয় প্রকাশ জীবনকে সহনীয় ও মধুর করিয়া তুলিবে, ইহার ধূলিধূসরতার উপর কোন্ স্বর্গের জলধারা সুধা সিঞ্চন করিবে এই সব নূতন চিন্তা ও সম্ভাবনা আজ লেখকচিত্তকে অধিকার করিতেছে। নবগঠিত সমাজে ব্যক্তিক জীবনের বিবর্তন-ছন্দ কি রূপ পরিগ্রহ করিবে, ভবিষ্যতের শিথিল, নিয়ন্ত্রণ-দায়িত্বহীন ও কোন

কেন্দ্রগত নীতি-প্রতিষ্ঠায় উদাসীন সমাজ-সংস্থা ব্যক্তিত্বকে কোন্ নূতন বিকাশের সুযোগ দিবে এই সমস্ত প্রশ্নও ভবিষ্যৎ কথাসাহিত্যের উপাদানরূপে গৃহীত হইবে। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ যদি উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়, তবে একের পরিবর্তনের সহিত অপরের পরিণতিও এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আগামী যুগের গল্প-সাহিত্যে এই যুগ্ম রূপান্তরের পূর্ণতর চিত্র অঙ্কিত হইবে, জীবনের নব সম্ভাবনা ও নূতন মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত হইবে—এই জন্যই গল্পসাহিত্যের ক্রমবিবর্তন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও ভবিষ্যৎ পথের নির্দেশক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩১, সাদার্ণ এভেন্যুউ
কলিকাতা-২৯
১লা আষাঢ়, ১৩৬৩

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা

রামের টাকা

জগদীশ গুপ্ত

॥ ১ ॥

মনে হয়, চারিদিকেই পরিপূর্ণতা—

আকাশ পরিপূর্ণ নীল, তার আর চাই না ; গৃহে গৃহে পরিপূর্ণতা—সেখানে আরও পাইবার ক্ষুধিত ক্রন্দন নাই ; পথের দু'ধারে অগণিত পণ্যশালা, দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ—আরও লইয়া রাখিবার স্থান সেখানে নাই ; গাছে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, আরও ফুটাইবার আকাঙ্ক্ষা তাদের নাই ; গৃহচূড়ায় কপোতের কূজন শুনিযা মনে হয়, ক্ষুধাহীন পরিপূর্ণতায় তাহা বিহ্বল। শিশুর মুখে পরিপূর্ণ নির্লিপ্ততা, বালকের মুখে ক্রীড়াসক্তির পরিপূর্ণ আনন্দ, যুবকের মুখে পরিপূর্ণ সুখ, বৃদ্ধের মুখে পরিপূর্ণ শান্তি। সহস্র সহস্র লোক চলাচল করিতেছে—পরিপূর্ণতার গর্বে তাহারা দৃপ্ত ; পরিপূর্ণতার বার্তা পরস্পরকে জানাইবার ব্যগ্রতায় তাহাদের দাঁড়াইবার ধৈর্য নাই···

কেবল যত ক্ষুধা রামের উদরে !

রামের হাতের ভিক্ষাপাত্র দেখিয়া লোকে আতঙ্কিত হয় ; তাদের মনে হয়, ইহার ভিক্ষাপাত্র এ-জীবনে ভরিবার নয়—এই ত সেদিনও দিয়াছি !

কিন্তু সেদিন দিয়াও আজ আবার দিতে চায় এমন গৃহস্থও আছে। তাহাকে দেখিয়া কি কারণে এই গৃহলক্ষ্মীটির মমতা জন্মে তাহা রাম জানে না—'মা' বলিয়া ডাক দিয়া দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলেই তিনি মেয়েকে ডাকিয়া বলেন : "মাধু, রামকে দে তো, মা, দু'মুঠো চাল।"

মাধুই একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া রামের নামটি জানিয়া লইয়াছিল।

মাধু একখানা সরায় করিয়া চাল আনে ; রামের ঝুলির ভিতর অতি সাবধানে ঢালিয়া দেয়—একটি চাল মাটিতে পড়ে না। রাম ভাবে, যেমন মা তেমনি মেয়ে—দেহ যেমন সুশ্রী, মন তেমন কোমল—ইহারাই স্নেহশীতলা অন্নপূর্ণার সন্তান।

ওদিকে রামভজন আগরওয়ালার আড়তে গিয়া দাঁড়াইলেই তাকিয়ার উপর হইতে ঘাড় তুলিয়া রামভজন বলে : "সরকার ইস্‌কো পয়সা দেও একঠো।"

আরও ওদিকে গাঙ্গুলীর হোটেল ; সেখানে গেলে ভাত থাকিলেই গাঙ্গুলী খাইতে দেয়। কিন্তু যে দেয় তাহারই কাছে নিত্য যাইতে লজ্জা করে ; যে দেয় না, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারগৃহে যে বন্দী, সে যদি দৈবাৎ দেয় এই আশাতেই দানকুণ্ঠের সম্মুখেই নিত্য হাত পাতিতে হয়—তাহাতে রামের ভিক্ষাপাত্র ভরে না। কিন্তু আজ রামের প্রাতরুত্থান সার্থক, ভিক্ষা ভালই মিলিয়াছে ; মনে হইতেছে, আর চাই না—যে পরিপূর্ণতার আনন্দ চতুর্দিকে তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটিতেছে তাহা যেন রামের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ছল ছল করিতে লাগিল।

রাম হৃষ্টচিত্তে সকাল-সকাল ঘরে ফিরিতেছিল—এমন সময় সদর রাস্তার উপর একটা সুবৃহৎ বাড়ীতে উৎসবের কলরব শুনিয়া সে দাঁড়াইল।

॥ ২ ॥

যার ভাগ্য ভাল তার এমনিই হয়। নীলকণ্ঠ মজুমদারের বরাত ভাল—সোনার সঙ্গে মাটি মিশিয়াছে, অর্থাৎ জঙ্গীপুরের মাতুল-সম্পত্তি তাঁহাতেই বর্তিয়াছে। সে সম্পত্তির পরিমাণ ঢের--একটা জমিদারীই। নীলকণ্ঠ নিজে অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী ; স্বাস্থ্যের আনন্দের উপর মাসিক তিন শত টাকা পেনসন তিনি ভোগ করেন ; শহরের বুকের উপর পাঁচটি ভাড়াটিয়া ইষ্টকালয় তাঁহারই ভাগ্যগর্বে শির উঁচু করিয়া আছে ; এক শত টাকার ডাক না দিলে সকলের ছোটটিও মানুষের, অর্থাৎ নীচের, দিকে দৃষ্টিপাত করে না। নীলকণ্ঠের একটি কন্যা ; তার বিবাহ হইয়া গেছে ; সুতরাং যে শত্রুরা বাঙ্গালীর ভিটায় ঘুঘু ডাকিয়া আনে তারা নীলকণ্ঠের আর নাই। জামাই পশ্চিমের একটি কলেজের অধ্যাপক ; বড় আর মেজ ছেলে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়া লাট-দপ্তরের বড় দু'খানি আসনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়া আছে—শূন্য হইলেই যাইয়া বসিয়া পড়িবে। নীলকণ্ঠ বড় ছেলের বিবাহ দিয়াছেন যাঁর কন্যার সঙ্গে সেই বৈবাহিক মহাশয় এত বড় ডাক্তার যে, ভিজিট্ দু' বৎসরে ষোলগুণ বাড়াইয়াও তাঁর বিশ্রামের সময় নাই ; মেজ ছেলের শ্বশুর কোন্ এক স্বাধীন নৃপতির রাজস্ব-সচিব—সেই নৃপতি কলিকাতায় আসিলে কেল্লায় তোপ পড়ে। আরও সুখের বিষয় ইহাই যে নীলকণ্ঠ শোক পান নাই ; আঁতুড় হইতে আজ পর্যন্ত তাঁর সন্তানেরা ভালই আছে। তার উপর তাঁর স্ত্রী এবং বধূ দুটি রূপে গুণে উত্তম।

ভাগ্যলক্ষ্মী মানুষকে আর কি দিতে পারে! সুখের উপর সর্বব্যাপী দ্বিগুণ সুখের কারণ সম্প্রতি ঘটিয়াছে—নীলকণ্ঠের বাড়ীতে আজ প্রাতঃকাল হইতে রসুনচৌকি বাজিতেছে—তাঁর বড় ছেলে শৈলেন্দ্রের প্রথম পুত্রের আজ শুভ অন্নপ্রাশন। কুটুম্ব আর অভ্যাগতে বাড়ী পূর্ণ হইয়া ভারি সমারোহ লাগিয়া গেছে। নীলকণ্ঠের রান্না-বাড়ী হইতে বাহির-বাড়ী অনেকটা পথ—এতটা জায়গায় লোক একেবারে ঠাসা; দেখিয়া মনে হয় না, এ বাড়ীর বাহিরে আর মানুষ আছে। এক কথায়, পৃথিবীর মর্মগত মহানন্দধ্বনি যেন শত মুখে উৎসারিত হইয়া নীলকণ্ঠের গৃহের চতুঃসীমা পর্যন্ত ছড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। উৎসব জমিয়াছে বেশ, এবং খোকা স্বর্ণালঙ্কারে প্রায় আবৃত হইয়া গেছে।

বেলা প্রায় দুটো। নীলকণ্ঠের বাড়ীতে ভোজ আরম্ভ হইয়া গেছে; কোলাহল-ব্যস্ততা আর ডাকহাঁক দৌড়াদৌড়ির অন্ত নাই। প্রকাণ্ড আঙ্গিনা আর বারান্দা জুড়িয়া লোক বসিয়া গেছে—সব বড় বড় লোক; ধনে মানে নীলকণ্ঠের সমকক্ষ তাঁরা; তাঁরা সবাই সগোষ্ঠী আর সবান্ধবে আসিয়াছেন।

নীলকণ্ঠ একখানা চেয়ার পাতিয়া রাখিয়া তাহাতে না বসিয়া সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন; শৈলেন্দ্র তাঁর পাশেই হাজির আছে।

পিতা পুত্র উচ্চকণ্ঠে কেবলি হাঁকিতেছেন: ঐ পাতে, ঐ পাতে ··

তাঁরা আরও বলিতেছেন: দাও, ঠাকুর··

আপত্তি দেখিয়া আপ্যায়নের তেজ আরও বাড়িয়া যাইতেছে; বলিতেছেন,—নষ্ট হবে বল্‌ছেন? তা হয় হোক্। দাও ঠাকুর।

গরম পোলাও ঠাণ্ডা হইয়া অরুচি ধরিয়া গেলে, গরম-গরম আরও চার হাতা লইয়া তার তিন হাতাই ঠাণ্ডা করিয়া ওরা ফেলিয়া রাখিল—পেটে স্থান কম।

নীলকণ্ঠ যদি বলেন: আর দুটো দিক্?—শৈলেন্দ্র বাড়াইয়া বলে: খেয়ে ফেলুন। ঠাকুর আর দুটো দাও।

কিন্তু ঠাকুর দেয় আরও চারটে। লোকে শেষে রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন চিবাইয়া ঢালিতে লাগিল···

দেখিয়া নীলকণ্ঠ আর শৈলেন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না—ইহারই নাম লোক-খাওয়ানো। প্রাচুর্যের উল্লাসে ওঁদের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল।

এইবার বিদায়ের পালা—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কস্তুরীগন্ধযুক্ত পান লইয়া আর শিশুটিকে আশীর্বাদ করিয়া একে একে দলে দলে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

যাইবার আগে সর্বাগ্রগণ্য রায় বাহাদুর নিরঞ্জনপ্রসন্ন সর্বাধিকারী নীলকণ্ঠকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—ভায়া, একবার ভেতরে চল।

বুঝা গেল, খোকাকে তিনি আশীর্বাদ করিবেন। ঘটিলও তাই ; রায় বাহাদুর একটি 'ফুল' গিনি দিয়া খোকাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অধিকন্তু খোকাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া গৃহিণীকে তাহার অঙ্কে সমর্পণ করিবার নির্ঘাৎ প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া খোকা বিচলিত হইল না ; কিন্তু তাঁহার স্বার্থত্যাগের প্রস্তাবে নীলকণ্ঠ প্রমুখ সকলেই প্রচুর হাস্য করিলেন।

পশ্চিম - দেশীয়া ধাই লক্ষ্মীর মা প্রসূতিকে "খালাস" করিয়াছিল ; সেই গৌরবে সে একখানি হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিয়া, আর, কৃষ্ণবর্ণ ত্বকের উপর খানিক অনাবশ্যক তেল ঢালিয়া আসিয়াছে···সে কথাও কহিতেছে ঢের ; রায় বাহাদুরের কথার পর সে বলিল—ই মাগো ; বাবুজীর কি কথা !—বলিয়া সকলের হাসির চতুর্গুণ হাসি সে একা হাসিল।

রায় বাহাদুরের গৃহিণীও সেখানে ছিলেন। খোকার সম্মুখস্থ রৌপ্যপাত্র মামুলি রৌপ্যমুদ্রায় পূর্ণ হইয়া গেছে ; কে একজন একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক দিয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য পাঁচ টাকার বেশী নয় ; কিন্তু গিনি পড়িল মাত্র ঐ একটি। অম্বিকা দেবী সেই কারণে হাফ-ঘোমটার আড়ালে গর্ব অনুভব করিতেছিলেন। খোকার অঙ্কশায়িনী হইতে তিনি মাথা নাড়িয়া রাজী হইলেন।

ইহাতেও সকলে লক্ষ্মীর মায়ের সঙ্গে প্রচুর হাস্য করিলেন।

নীলকণ্ঠের স্ত্রী হৈমবতী একটি ছেলেকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, রায় বাহাদুর খোকার একটি পছন্দসই নাম রাখুন।

লক্ষ্মীর মা সব কথাতেই আছে ; বলিল : হাঁ বাবুজী, একটা পয়মন্ত নাম।

রায় বাহাদুরের মুখে চোখে হর্ষ বিকশিত হইল ; কিন্তু গিনি দেওয়া যত সহজ, নাম রাখা তত সহজ নহে, অনেক হাতড়াইতে হয়—বলিলেন : দেখে শুনে রাখব একটা। চলো হে। বলিয়া তিনি নত হইয়া দুটি আঙ্গুলের দ্বারা খোকার চিবুক স্পর্শ করিলেন এবং নীলকণ্ঠকে হাতের একটা ঠেলা দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।

লক্ষ্মীর মা বলিল : পরে রাখবেন, এখন না। বলিয়া এমন আহ্লাদিত হইয়া উঠিল যেন অবলম্বনের জন্য ঢলিয়া কাহারো গায়ে পড়িতে চায়।

নীলকণ্ঠের বহির্বাটি হইতে রাস্তায় পৌঁছিতে একটা কক্ষ অতিক্রম করিতে হয়। সেটার উপরে নীলকণ্ঠের বৈঠকখানা, নীচেটা ভৃত্যবর্গের বিশ্রামকক্ষ। এই কক্ষ

দিয়াই যাতায়াতের পথ। পাঁচটা সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠান হইতে সেই ঘরে উঠিতে হয়। রায় বাহাদুর নিরঞ্জনপ্রসন্ন সর্বাধিকারী সেই সিঁড়ির দু'ধাপ উঠিতেই অপর যে ব্যক্তি সেই সিঁড়ি দিয়াই উঠানে নামিতে উদ্যত হইয়া একেবারে দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তার চেহারা বীভৎস : হাড়ের উপর চামড়া খালি; মুখে এক মুখ দাড়ি গোঁফ; চুলগুলি আন্দাজে আর অপটু হস্তে নিজেই কাটিয়াছে বলিয়া মাথাটা বড় অপরিপাটি হইয়া উঠিয়াছে; পরিধানে মলিন বস্ত্রখণ্ড; কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি—অশেষ জীর্ণসংস্কারের দরুণ তাহা বিবিধ বর্ণের আর বিবিধ আকারের কাপড়ে কাপড়-হাটার নমুনার মত দেখাইতেছে। হাতে একটি বাঁশের লাঠি আছে।

এই মূর্তি সম্মুখে পড়ায় রায় বাহাদুর বাধা পাইলেন—সিঁড়ির উপরেই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

অস্ত্রে যেমন ধার থাকে রায় বাহাদুরের পাশেই ছিলেন নীলকণ্ঠ; তিনি চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কে রে তুই?

রাম বলিল : আজ্ঞে, আমি রাম, ভিখিরী।—বলিয়া রাম নিজের পরিচয় সসঙ্কোচে নিবেদন করিল, কিন্তু মতিভ্রমবশতঃ রায় বাহাদুরকে পথ দিয়া সে শশব্যস্তে সরিয়া গেল না।

নাম-সম্পর্কে পিছন হইতে একটি ইস্কুলের ছেলে বলিল : তুমি রাম নয়, আরে রাম।

এই কথায় একটি হাস্যধ্বনি উঠিল···

রামের ধৃষ্টতায় আগুন হইয়া নীলকণ্ঠ হাস্যধ্বনিকে আবৃত করিয়া বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলেন : তেওয়ারী?

তেওয়ারী নীলকণ্ঠের দারোয়ান; সে পোলাও পরিবেশনের শ্রমের পর গায়ের ঘাম মুছিয়া পৈতার ঘাম নিংড়াইতেছিল; আহ্বান ধ্বনিত হইতেই 'হুজুর' বলিয়া সাড়া দিয়া সে ভোজপুরী বিক্রমে লাফাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নীলকণ্ঠ তর্জনী নাড়িয়া তাহার কাছে জানিতে চাহিলেন, বেতনভুক্ এত ভৃত্য বিদ্যমান থাকিতে রায় বাহাদুরের সম্মুখে এই লোক পড়ে কেন?

কিন্তু তেওয়ারী কৈফিয়ৎ গড়িয়া তুলিবার পূর্বেই ততক্ষণে কাজ শুরু হইয়া গেছে, অর্থাৎ নীলকণ্ঠের কোচম্যান শিউসেবক আসিয়া প্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত রামের গলদেশ চাপিয়া আর টিপিয়া ধরিয়াছে এবং রাম আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে।

রায় বাহাদুর এতক্ষণে কথা বলিলেন—কোচম্যানকে রামের গলদেশ হইতে হাত তুলিয়া লইতে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল দেখিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া নীলকণ্ঠকে বলিলেন—আহা শুভ দিনে কেন হাঙ্গামা করছ !

ফরিয়াদি মামলা তুলিয়া লইতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া শান্তি স্থাপিত হইল ; নীলকণ্ঠ রুদ্রমূর্তি সংবরণ করিলেন।

রায় বাহাদুর রামকে আরও কাছে ডাকিয়া পকেটে হাত দিলেন ; ব্যাগ বাহির করিলেন ; ব্যাগের ভিতর হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে গেলেন—

রাম তখন থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল ; কম্পিত করতল পাতিয়া সে দান গ্রহণ করিল।

রায় বাহাদুর নীলকণ্ঠকে পুনরায় বলিলেন, কিছু খাবার-টাবার দিয়ে একে বিদায় কর। আহা, আজ শুভ দিনে কি মারধোর করতে আছে !—বলিয়া তিনি এবার নির্বিঘ্নে কক্ষ অতিক্রম করিয়া রাস্তায় মোটরের কাছে পৌছিলেন।

॥ ৩ ॥

রায় বাহাদুরের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থাই নীলকণ্ঠ করিলেন। রায় বাহাদুরের টাকার উপর নীলকণ্ঠের ছ'খানা লুচি রাম পাইল।

ঝুলির ভিতর টাকা আর লুচি লইয়া রাম যখন নীলকণ্ঠের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল তখন তার চিত্ত আনন্দে আকুল ; অশক্ত দেহে অপূর্ব একটি শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। জনস্রোতের দিকে পুলকিত নেত্রে চাহিতে চাহিতে রাম পথ চলিতে লাগিল ·

পৃথিবী কেন আনন্দধাম, এই প্রশ্নের উত্তরটি এবং সানন্দে পথ চলিবার যে গূঢ় কারণটি লুকাইয়া রাখিয়া মানুষ এত দিন তাহাকে ঠকাইতেছিল আজ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ; পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ আহরণ করিতে ছুটিতেছে—অপর অর্ধেক আহরণ করিয়া ফিরিতেছে।

কিন্তু যে যতই আহরণ করুক তাহার মত অমূল্য সঞ্চয়ন কাহারও নহে।··· রামের পা দুখানা দ্রুততর চলিতে লাগিল—ঐ অমূল্য আহরণ, অর্থাৎ টাকাটা, লইয়া ঘরে পৌছিতে পারিলেই তাহা যেন তার সত্যকার আপনার হইবে।···তার

মনে পড়িতে লাগিল সেই দাতাকে—চমৎকার গৌরবর্ণ; বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ হইবে; চুল পাকে নাই, কিংবা প্রচুর চুলের ভিতর সাদা দু-এক থেই তার চোখে পড়ে নাই; গোঁফ দু-একটি পাকিয়াছে; গায়ে মূল্যবান কোট ঝক্‌ঝক্ করিতেছে; গণ্ডদ্বয় স্থূল, যেন গালের ভিতর গোল আর বড়পানা কিছু রহিয়াছে; সুপুষ্ট আঙুলগুলি দেখিতে মোলায়েম; অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক আছে—তাহার উপর উজ্জ্বল একখানি পাথর বসানো; পরিধানে জমাট-বোনা মিহি একখানি কোঁচানো ধুতি—থাকে থাকে ভাঁজ পড়িয়া প্রস্থে ক্রমশঃ বাড়িয়া একটী পরিমাণ-পরিপাট্যে কোঁচাটি সুন্দর দেখাইতেছে—দুর্গাপ্রতিমার কার্তিকের কাপড় ঠিক্ ঐ রকমই কোঁচান থাকে; বুকে কোটের উপর সোনার মোটা চেন্ ঝুলিতেছে—খানিকটা ধনুকের মত বাঁকা, খানিকটা তীরের মত সোজা হইয়া ঝুলিতেছে—সোজা অংশের সঙ্গে আধুলির আকারের একটি চাক্‌তি রহিয়াছে; মানুষটার ঠোঁট দুখানি পাতলা, লাল; চোখ বড়—কিন্তু হাস্যময় নয়, গম্ভীর; ভুরু সরু, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; পায়ের জুতা দর্পণের মতো স্বচ্ছ।

এই সুপুরুষটি জামার পকেটে হাত দিলেন; ব্যাগ বাহির করিয়া টাকা বাহির করিলেন; তাহার মুখের দিকে চাহিয়া টাকাটা তাহার হাতে দিতে চাহিলেন। তার হাত কাঁপিতেছিল; পাঁচটি আঙুল জড়ো করিয়া তিনি টাকাটা ধরিয়াছিলেন—টাকাটা তিনি ছাড়িয়া দিলেন—টাকা তাহার হাতের উপর পড়িল—স্পর্শ ঘটিল; স্পর্শের অপরিমেয় অনুভূতি মস্তিষ্ক হইতে পদতল পর্যন্ত সর্বাঙ্গে এক নিমেষে ছড়াইয়া গেল…

ভাবিতে ভাবিতে রামের প্রাণে আনন্দ-রস উদ্বেল হইয়া উঠিল; কিন্তু বেশীক্ষণ ভোগ করিতে পারিল না—সকল আনন্দ লুপ্ত আর সকল চিন্তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ একটা বড় কঠিন কথা রামের মনে পড়িয়া গেল—যে-দাতা তাহাকে টাকাটা দান করিয়াছে সে-ই আবার টাকাটা কাড়িয়া লইতে পশ্চাতে লোক ছুটাইয়া দেয় নাই ত? এতবড় বস্তু দান করিয়া অকাতর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে এমন ত্যাগী মহানুভব ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই বোধ হয়। শঙ্কায় রামের বুক টিপটিপ করিতে লাগিল; এমন সাহস হইল না যে পিছন দিকে একবার তাকায়।…এমনও ত অনায়াসে ঘটিতে পারে যে, হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চোর বলিয়া পুলিসে দিবে। বিশ্বাস নাই—এমন হয়। ত্রাসে অন্ধ হইয়া পলায়নের উদ্দেশ্যে ছুটিতে যাইয়াই রাম বাধা পাইল; কে যেন কোন্ দিকে গর্জন করিয়া উঠিল: "এইও"…

সে পৌঁছিয়া গেছে—দয়ালু লোকটি দানের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইতে কি ধরাইয়া দিতে যে বলবান্ আর অত্যাচারী ভোজপুরী দারবান্ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন সে দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার নাগাল পাইয়াছে—

কিন্তু তা নয়; "চাপা পড়লে যে"! বলিয়া সদয় কণ্ঠে ভৎর্সনা করিয়া একটি বাবু তাহাকে পাশের দিকে টানিয়া লইলেন। রাম দেখিল, সম্মুখেই গরুর গাড়ী—থামিয়া আছে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান এবং দু-চার জন দর্শক দাঁড়াইয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছে···

গরুর গাড়ী চলিয়া গেল; যাহারা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহারাও চলিয়া গেল; কিন্তু তীব্র ত্রাসের বিদ্যুতে আহত হইয়া ক্ষণিক মূর্ছার যে আঘাত সহ্য করিয়া রাম এইমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার অবসাদ ঠেলিয়া সে তখনই নড়িতে পারিল না। কিন্তু শুনিতে আশ্চর্য, রামের বুকের এই স্তব্ধতা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল—ভয়ের কোন কারণই বিদ্যমান নাই জানিতে পারিয়াই তাহার কষ্ট ঘুচিয়া ক্লান্তি দুর হইয়া প্রাণে পুনরায় স্ফূর্তি দেখা দিল। আবার রাম রওনা হইল।

ভৃত্যশ্রেণীর একটি যুবক বাটিতে করিয়া সেরখানেক ঘি, আর পাতার ঠোঙায় করিয়া সেরদেড়েক ময়দা লইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাম তাহাকে ডাকিয়া দাঁড় করাইল—জানিতে চাহিল; "ঘিয়ের কি দর আজকাল"?

রামের দিকে চাহিয়া হাসিয়া সেই লোকটি দর জানাইবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিল,—মণের দর না সেরের দর?

রাম বলিল; "সেরের দরই শুনি"।

—সাত সিকে।

রাম বলিল; "দাম বেড়েছে"। বলিয়া চলিতে লাগিল।

রামের আজ কিছুই অপ্রাপ্তব্য নাই—কোনো ভোগ্যবস্তু হস্তগত করিবার আশা আর দুরাশা নয়।

ঘরখানাকে রাম এখনো বাসোপযোগী মনে করে কি না বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে সে ভালবাসে।

মাইলদেড়েক পথ অতিক্রম করিয়া শহর হইতে ঘরে পৌঁছিতে আগে তার হাঁটু ভাঙিয়া শরীর দুমড়াইয়া পড়িত, কিন্তু ঝুলির ভিতর দু'খানা লুচি আর টাকাটা লইয়া সে আজ আপন গৃহে চলিয়াছে—দৈবদণ্ডস্পর্শে রোগমুক্তির মত কি একটা শক্তিমন্ত জাদুর খেলায় আজ তাহার পা কাঁপিল না।

রাম গৃহে পৌঁছিল। দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটা নিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিল; তারপর দরজার শিকল নামাইয়া ঘরে ঢুকিল; ঝুলিটা মেঝের মাটিতে নামাইতে যাইয়া তাহার জ্ঞান জন্মিল, মাটির সঙ্গে লুচি আর টাকার স্পর্শ ঘটান সঙ্গত নয়—আর একটু আগাইয়া গিয়া রাম মাটির দেয়ালের পেরেকের সঙ্গে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিল।

তারপর বসিয়া বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে আপন মনেই অনেক হাসিল। ঐ টাকাটা যেন মন্ত্র জানে—সে আসিতেই মাটির হাঁড়িটা, সরাটা এনামেলের ফুটা বাটিটা পর্যন্ত যেন হাসির রজতচ্ছটা ছড়াইতেছে।

কিছুক্ষণ এই হাসিটা উপভোগ করিয়া রাম উঠিল; ঝুলিটা পাড়িয়া আনিল; ঝুলিটা কোলের উপর রাখিয়া তার মুখ খুলিল; অতি সন্তর্পণে তাহার ভিতর হইতে লুচি ক'খানা বাহির করিল; এক-হাতেই গামছাখানা মেঝেয় পাতিয়া তাহার উপর ধীরে ধীরে লুচিগুলি নামাইয়া রাখিল—যেন রৌপ্যনির্মিত একটি পরম উপাদেয় দৃশ্য তার পরিতৃপ্ত আর অপূর্ব একটা আলোকে উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া রহিল।

রাম তখন ক্ষুধিত; কিন্তু লুচির দিকে চাহিয়া চাহিয়া আর টাকার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তার দিনব্যাপী ক্ষুধাবোধ অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঝুলির ভিতর হাত ভরিয়া টাকাটা সে বাহির করিয়া আনিল—করতলে লইয়া নির্নিমেষ চক্ষে সেটির দিকে চাহিয়া রহিল: টাকার গায়ে একটা মুখাবয়ব অঙ্কিত রহিয়াছে—মানুষের মুখ বটে, কিন্তু কোন্ মানুষের মুখ তাহা সে স্বপ্নেও জানে না। উল্‌টাইয়া দেখিল, এদিকেও ছবি রহিয়াছে; অক্ষরগুলিকে অক্ষর বলিয়া সে চিনিতে পারিল না।

একটা লোক, ধর সে-ই, যদি এই রকম একটি টাকা তৈরি করিতে বসে তবে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইবে বিস্তর—যন্ত্রপাতিও অনেক লাগে বোধ হয়—ভাবিয়া রাম বিস্মিত হইল। টাকাটা অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর মাঝে ধরিয়া রাম তাহাকে পরম স্নেহ আর সম্ভ্রমের সহিত একবার কপালে ছোঁয়াইল; তারপর তাহাকে মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ মুষ্টি দৃঢ়তর করিয়া তাহাকে অনুভব করিতে লাগিল; হাত গরম হইয়া উঠিল। মুষ্টি খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, টাকাটা রহিয়াছে; দেখিয়া নূতন করিয়া আর একবার সে অবাক হইল। পুনরায় মুঠা বাঁধিয়া তার মনে হইতে লাগিল: যদি এইবার হাত খুলিয়া দেখা যায়, একটি টাকা দুটি হইয়াছে! রামের গা সিরসির করিয়া উঠিল। তাহা কি

একেবারেই অসম্ভব! ভগবান দয়ালুর হাত দিয়া একটা টাকা দিয়াছেন—তিনিই পুনরায় দয়াপরবশ হইয়া কি একটিকে দুটি করিতে পারেন না! এমন কি ঘটে না? ঘটিতে পারে না, ভগবানের রাজ্যে এমন কিছু নাই। অমনি করিয়া টাকা যদি বাড়িতে থাকে! রামের চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল।

চোখ খুলিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া রাম হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিল, ঘরে এমন স্থান নাই যে অনেক টাকা রাখা যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল: টাকা হইলে সেই টাকাতেই ত ঘর হইতে পারিবে, সিন্দুকও হইতে পারিবে। রামের মনে অতঃপর টাকার স্রোত বহিতে লাগিল।

এক সময়-সে মুষ্টি খুলিয়া দেখিল, টাকা একটাই আছে, দ্বিগুণ হয় নাই, দেখিয়া তার মনে হইল, একটাই যথেষ্ট। তারপর কি মনে করিয়া সে পরম লালসার সঙ্গে জিহ্বা বাহির করিয়া টাকাটার এপিঠ ওপিঠ দুবার চাটিল; তারপর তাহাকে লুচির স্তূপের পাশে অতিশয় যত্নের সহিত নামাইয়া রাখিল।

একটি একটি করিয়া তুলিয়া লুচি ক'খানা গণিয়া দেখিল—ছ'খানা। এক-খানার এক টুকরা ভাঙিয়া মুখে দিতে যাইয়াই রাম হাত নামাইল; একবার অঙ্গহীন লুচির দিকে, একবার টুকরাটির দিকে চাহিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল—যেন নিজের হাতে নিজের পায়ে কুঠার মারিতে গিয়াছিল, প্রলোভনের বস্তুকে পরিহার করিতে এমনি শশব্যস্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রকৃতিস্থ হইতে তার কিছু সময় লাগিল। তারপর সে লুচি ক'খানার কানা ধরিয়া বহন করিয়া চক্ষুর অন্তরালে হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিল—হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দিয়া, আর টাকাটা খুব মজবুত করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া পুনরায় সে ভিক্ষায় বাহির হইল। নূতন হাঁড়ি আর সরা কিনিবার পয়সা তাহার চাই।

॥ ৪ ॥

আজ রামের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—তার দিন আজ সার্থক হইতে কিছু বাকি রহিল না।

বাঘডাঙ্গার শ্রীবাস সরকার পুত্রের বিবাহ দিয়া বধূ, বর এবং বহু অনুচর আর প্রচুর প্রাপ্তিসহ দেশে ফিরিতেছেন। তাঁর হিসাব-রক্ষক হীরালাল ব্যতীত আর সবারই বিশ্বাস, শ্রীবাস পয়সাওয়ালা লোক; সুতরাং সেই বিশ্বাসটা যাহাতে

ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৈবাহিকের টাকায় তিনি বিবাহে ঘটা করিয়াছেন আশাতীত।

যাহা হোক, তিনি ফিরিতেছেন, এবং বৈবাহিকের ব্যবহারে খুশী হইয়াই ফিরিতেছেন। খানিকটা পথ গো-যানে আসিয়াছেন, খানিকটা পথ রেলগাড়ীতে যাইতে হইবে। তিনি হাতে "কিছু সময়" রাখিয়া গাড়ীর সময়ের বহু পূর্বেই ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সম্প্রতি ষ্টীল ট্রাঙ্কের উপর আসন গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

শ্রীবাসের মন সন্তুষ্ট হইয়া আছে। বধূটি সুন্দরী এবং বৈবাহিক সৎলোক, ইহা তিনি পুনঃপুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। আবার ইহাও সত্য যে, লোকে কস্মিন্‌কালেও বলিতে পারিবে না, শ্রীবাস সরকার গরীবের ঘরের 'হাভেতে' মেয়ে আনিয়াছে, কিংবা ধনীর ঘর হইতে কুৎসিত বউ আনিয়াছে।

শ্রীবাসের এ কথায় পুরোহিত দশরথ তর্কবাগীশ, পরামাণিক যুধিষ্ঠির এবং প্রতিবেশী সৃষ্টিধর সমস্বরে এবং প্রবল কণ্ঠে সায় দিয়াছেন—কদাচ না বলিতে পারে নাই।

সুতরাং শ্রীবাস আরও খুশী হইয়া গেছেন এবং আল্‌পাকার কোটের উপর ফরাসডাঙ্গার চাদর ফেলিয়া সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে আলাপ করিতেছেন, আর অতি সামান্য কথাতেই হাস্যবেগে তাঁর বোতাম-আঁটা ভুঁড়ি নাচিতেছে।

রাম ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহারই অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। ভুঁড়ি-নাচানো হাসির শেষে একবার হঠাৎ মুখ ফিরাতেই রাম শ্রীবাসের চোখে পড়িল।

শ্রীবাসের মন প্রফুল্ল ছিল—বলিলেন, হুঁ, বুঝেছি। বলিয়া তিনি পকেটের ভিতর হইতে একটি চতুষ্কোণ দু'আনি বাহির করিয়া রামের দিকে ছুড়িয়া দিলেন। কিন্তু শূন্যের জিনিস লুফিয়া লওয়ার তৎপরতা রামের নাই, দু'আনিটা তার হাত এড়াইয়া মাটিতে পড়িল। রাম শ্রীবাসের পদতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল; তারপর দু'আনিটা কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

টাকাটা ট্যাঁকে আছে, আর তার অস্তিত্বের অনুভূতি রামের রক্তে জীবন্ত হইয়া আছে। তার উপর এই দু'আনি। মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতায় রামের চোখ সজল হইয়া উঠিল।

শ্রীবাসের দেওয়া দু'আনি ভাঙাইয়া রাম হাঁড়ি আর সরা কিনিল। মনে মনে অনেক তর্কবিতর্ক তোলাপাড়া আর লোভ—সংবরণের বৃথা চেষ্টার পর আধলার তামাক, ঐ মূল্যের টিকে এবং ঐ মূল্যের দিয়াশলাই এবং ঐ মূল্যেরই

একটি কলিকা কিনিয়া রাম যখন বাড়ীর দিকে পা চালাইল তার বহু পূর্বেই তার মন যাইয়া পড়িয়াছে হাঁড়ির লুচিতে—যাইয়া দেখিতে পাইব কিনা ঠিক কি !

যথাসাধ্য দ্রুতপদে ঘরে ফিরিয়া রাম সর্বাগ্রে লক্ষ্য করিল দরজার মাথাটা—শিকল চড়ানোই আছে, শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, হাঁড়ির আবরণ ঠিক আছে, এবং ঢাকনা তুলিয়া দেখিল, লুচিও আছে।

শান্তির, তৃপ্তির এবং স্বস্তির একটি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাম বিশ্রাম করিতে বসিল।

॥ ৫ ॥

রামের দিন যাইতেছে।

চাল সিদ্ধ করিবার নূতন হাঁড়ি আনা হইয়াছে ; কাজেই লুচিগুলিকে স্থানভ্রষ্ট করিতে হয় নাই। তিন রাত্রি না যাইতেই পরিষ্কার সুখাদ্য লুচিগুলি পরস্পরের বুকে পিঠে সংলগ্ন হইয়া একটা নিরেট পিণ্ডে পরিণত হইল ; আগে পচিয়া দুর্গন্ধময়, পরে শুকাইয়া নির্গন্ধ হইল, এবং তারপর আরও শুকাইয়া ঝরিয়া ঝরিয়া গুঁড়া হইয়া গেল ; কিন্তু রাম সরা তুলিয়া আর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল না—আছে, তার নিজস্ব স্বেচ্ছাভোগ্য হইয়া তাহা মজুত আছে, ইহাই মনে করিয়া রাম ক্ষুধার সময়ও সুখ পায়।

. কিন্তু ধাতুনির্মিত মুদ্রাটির দেহ কঠিন—তাহার দেহ পচিয়া উঠিল না।

রাম প্রত্যহই নিয়মিতভাবে ভিক্ষায় বাহির হয় ; বাহির হইবার পূর্বে টাকাটা হাতে লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করে—জিব দিয়া আর ঠোঁট দিয়া তার দুই পিঠ বারংবার চাটে ; তারপর তাহাকে আবার ঝুলিতে ফেলে—আনন্দে তার পা অনায়াসে চলে।

টাকা পচিয়া উঠিল না ; কিন্তু লেহনের ফলে তার দু-পিঠের ছবি আর লেখা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

এমনি মন্থর ক্ষয়ের রাহুগ্রাসে পড়িয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাওয়া টাকার অদৃষ্টের কথা নয়, কাজেই এক দিন বড় দুর্দৈব ঘটিয়া গেল। যে পেরেকটার সঙ্গে ঝুলি টাঙ্গানো থাকিত সেই পেরেকটা ঝুলি ঝুলাইবার আর পাড়িবার টানাটানিতে নোনা-লাগা মাটির ভিতর কবে ঢিলা হইয়া গিয়াছিল রাম তাহা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই।

ঝুলি সেদিন ভারী ছিল।

পেরেকে ঝুলি ঝুলাইয়া রাখিয়া রাত্রে রাম ঘুমাইয়াছিল ; ঝুলির ভারে পেরেক খুলিয়া পেরেক সমেত ঝুলি কখন ভূপতিত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। সকালে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিতেই যে দৃশ্য রামের নজরে পড়িল ঝুলির ভূতলে পতন তার সবটা নয় ; ঝুলির কেবল ধরাপৃষ্ঠে পতনের ফলও তেমন সাংঘাতিক নয় ; কিন্তু সাংঘাতিক ব্যাপার এই যে, দেখা গেল, ঝুলির গা ঘেঁষিয়া ইঁদুরের মাটি রাতারাতি পর্বতাকার হইয়া উঠিয়াছে।

রামের শরীর সেদিন ভাল ছিল না। ঝুলির ভিতর টাকা আছে ; সেই ঝুলি ইঁদুরের গর্তের মুখে পড়িয়া আছে দেখিয়া আতঙ্কে উদ্বেগে রামের প্রাণ যত দ্রুতবেগে ধড়ফড় করিতে লাগিল তত দ্রুতগতিতে সে গা তুলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া সে ঝুলির কাছে আগাইয়া গেল, ঝুলিটাকে টানিয়া তুলিল—ঝরঝর করিয়া অনেকগুলি চাল ইঁদুরের মাটির উপরেই স্তূপীকৃত হইয়া পড়িল—রাম তাহা অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া তুলিয়া পাশের দিকে রাখিয়া দিল।

টাকাটা ছিল চালের নীচে। রাম তাড়াতাড়ি ঝুলির ভিতর হাত ভরিয়া দেখিল, টাকা নাই, ইঁদুরের দাঁতের করা ছিদ্র রহিয়াছে—ঝুলি হাতড়াইতে যাইয়া ছিদ্রের ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়া আট্‌কাইয়া গেল। ঝুলির ভিতরটা বাহিরে উল্‌টাইয়া আনিয়া রাম দু'হাতে করিয়া সেটাকে বাতাসের উপর আছড়াইতে লাগিল ; চালের গুঁড়া তার চতুর্দিকে উড়িতে লাগিল—তার চোখে মুখে প্রবেশ করিল, কিন্তু টাকা পড়িল না।

রাম ঝুলি ফেলিয়া পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইল ; তার ভোঁতা দা-খানা কোথায় পড়িয়া ছিল, সেই দা আনিয়া দুই হাতে ইঁদুরের মাটি সরাইয়া মেঝের মাটি খুঁড়িতে বসিয়া গেল।

অল্পক্ষণেই সুড়ঙ্গের মুখ দেখা গেল ; কিন্তু সুড়ঙ্গ কোন্ অতলে প্রবেশ করিয়াছে, দুই হাত গর্ত খুঁড়িয়াও তাহা আবিষ্কৃত হইল না।

ক্লান্তিতে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল ; দা রাখিয়া রাম অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে গহ্বরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল···বিসর্পিত রেখায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য স্থানে নিজেকে ভেদ করিয়া সেই সুড়ঙ্গের যেখানে শেষ হইয়াছে সেই অতি দুর্গম দূরে আয়ত্তাতীত একটা অন্ধকার স্থানে মূষিকবাহিত টাকাটা পড়িয়া ঝকঝক্ করিতেছে, রাম পুনঃপুনঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবাধ ঋজু দৃষ্টিতে তাহা যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল।

(প্রবাসী, ১৩৫৪, ফাল্গুন সংখ্যা)

রামোত্তম রায় মহাশয়ের সেজছেলে ননী তিন বছরে তের খানা ফার্স্ট বুক ছিঁড়িল, কিন্তু ঘোড়ার গল্প ছাড়াইতে পারিল না।

ব্যাপারটা আর কোনক্রমে অবহেলা করা চলে না। অতএব পশু মাস্টারের ডাক পড়িল।

পশুপতির নামডাক যেমন বেশি, দরও তেমনি কিছু বেশি। তা হউক। ছেলে আকাটমূর্খ হইয়া থাকে, সে জায়গায় দু'একটা টাকার কম-বেশি এমন কিছু বড় কথা নয়।

সাব্যস্ত হইল, আট টাকা মাহিনা, তা ছাড়া রায় মহাশয়ের বাড়িতেই পশুপতি খাইবে, থাকিবে। পড়াইতে হইবে ফার্স্ট বুক, শিশুশিক্ষা, সরল পাটীগণিত—সকালে একঘণ্টা, সন্ধ্যার পর দু-ঘণ্টা মাত্র।

বাহিরবাড়ির কাছারিঘরের পাশে ছোট্ট সংকীর্ণ ঘরখানিতে চুন ও সুরকি বোঝাই থাকিত, উহা পরিষ্কৃত হইয়া একপাশে পড়িল তক্তাপোশ আর একপাশে একটি টেবিল ও ছোট বেঞ্চি একখানি।

পড়াশুনা বিপুল বেগে আরম্ভ হইল।

লোকে যে বলে, পশু মাস্টার গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে পারে—তাহা মোটেই মিথ্যা নয। ছয় মাস না যাইতেই ননী শিশুশিক্ষা ছাড়াইয়া বোধোদয় ধরিল, পাটীগণিতের ত্রৈরাশিক শুরু হইয়া গিয়াছে, ফার্স্ট বুকও শেষ হইবাব বড় বেশি দেরি নাই।

আশ্বিন মাস, দেবীপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি।

অন্যান্য বার মহালয়ার সঙ্গেই ইস্কুল বন্ধ হইয়া যায়। এবার বছর বড় খারাপ, ছেলেরা মাহিনাপত্র মোটে দিতেছে না, তাই দেরি পড়িয়া যাইতেছে।

সকাল হইতে আকাশ মেঘলা। স্নান সম্বন্ধে বারমাসই পশুপতি একটু বেশি সাবধান হইয়া চলে; এমন বাদলার দিনে ত আরোই। খাওয়াদাওয়া সারিয়া ইস্কুলের পথে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে পিওন একখানা চিঠি দিয়া গেল।

খামের চিঠি হইলে কি হয়, ইস্কুলমাস্টারের নামে আসিয়াছে—অতএব ভিতরে এমন-কিছু থাকিতে পারে না যাহা না পড়া পর্যন্ত প্রাণ আছাড়ি-

পিছাড়ি থাইতে থাকে। এমনই আঁকাবাঁকা অক্ষরে ঠিকানা-লেখা খাম পশুপতির নামে বহুকাল ধরিয়া আসিতেছে। বিবাহের পর প্রথম বছর তিন-চারের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী সকল চিঠির সুর একটি মাত্র। খাম না ছিঁড়িয়া পত্রের মর্ম স্বচ্ছন্দে আগে হইতে বলিয়া দেওয়া যায়, প্রভাসিনী সংসার-খরচের টাকা চাহিয়াছে।

ইস্কুলে গিয়া স্থির হইয়া বসিতে না বসিতে ঘণ্টা বাজিল।

প্রথমে অঙ্কের ক্লাস। ক্লাসে ঢুকিয়াই প্রকাণ্ড একটা জটিল ভগ্নাংশ বোর্ডে লিখিয়া পশুপতি হুঙ্কার দিল—খাতা বের কর্—টুকে নে। বলাটা অধিকন্তু, সকল ছেলে ইহা জানে এবং প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তারপর বোর্ডের উপর নক্ষত্রগতিতে অঙ্কের ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। পশুপতি কষিয়া যাইতেছে, মুছিতেছে, আবার কষিতেছে। জোর কদমে-চলা ঘোড়ার খুরের মতো খটাখট ক্রমাগত খড়ির আওয়াজ, তা ছাড়া সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। ক্লাসের মধ্যে যেন কোন ছেলে নাই, কিম্বা থাকিলেও হয়তো একেবারে মরিয়া আছে। প্রকাণ্ড খড়ির তাল দেখিতে দেখিতে জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হইয়া গেল। ছেলেরা একটা অঙ্কের মাঝামাঝি লিখিতে লিখিতে তাকাইয়া দেখে কোন্ ফাঁকে সেটা শেষ হইয়া আর একটি শুরু হইয়াছে ; দ্বিতীয়টি না লিখিতে সেটা মুছিয়া তৃতীয় একটা আরম্ভ হয় এবং সেটা ধরিবার উপক্রম করিতে করিতে পরেরটি শেষ হইয়া যায়। গায়ে তাহার নীল খদ্দরের জামা। ইহার মধ্যে যখন একটু ফাঁক পায়, পকেট হইতে নস্তের শামুক বাহির করিয়া এক টিপ নাকে গুঁজিয়া দেয়, তারপর নাকের বাহিরের নস্ত ঝাড়িয়া হাতখানা জামার উপর ঘসিয়া সাফ করিয়া আরম্ভ করে—শেষ হল ? ফের দিচ্ছি আর গোটাআষ্টেক—

এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোকের মুখে পশু মাস্টারের এত নামডাক শুধু শুধু হয় নাই, সে তিলার্ধ ফাঁকি দেয় না।

চারিটা ক্লাস পড়াইবার পর টিফিনের ঘণ্টা বাজিলে পশুপতি বাহির হইয়া আসিল। তখন নস্ত ও খড়ির গুঁড়ায় জামার নীল রঙ ধূসর হইয়া গিয়াছে।

সিঁড়ির নিচে জানালাহীন ঘরখানিতে ক্লাস বসান যায় না। ইন্স্পেক্টর মানা করিয়া গিয়াছে, সেখানে বসিলে ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাইবে।

সেইটি মাস্টারদের বসিবার ঘর। ইতিমধ্যেই সকলে আসিয়া জুটিয়াছেন। হুঁকা গোটা পাঁচ-সাত—কোনটার গলায় কড়ি-বাঁধা, কোনটায় কেবলমাত্র রাঙা সুতা, একটির নলচের উপর আবার ছুরি দিয়া গর্ত করিয়া লেখা হইয়াছে —'মা' অর্থাৎ মাহিষ্যের হুঁকা। নিজ নিজ জাতি বিবেচনা করিয়া মাস্টারেরা উহার এক একটি তুলিয়া লইলেন। যাঁহাদের ভাগ্যে হুঁকা জোটে নাই, তাঁহারা অনুকল্পে বিড়ি ধরাইলেন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছোট ঘরখানি অন্ধকার। রসালাপ ও প্রচণ্ড হাসি ক্রমশঃ জমিয়া আসিল। ক্ষণে ক্ষণে আশঙ্কা হয়, বুঝি-বা অত আনন্দের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া বহুকালের পুরানো ছাদ ভাঙিয়া-চুরিয়া সকলের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।

কিন্তু ইস্কুলের জন্মকাল হইতে এমনি আটত্রিশ বছর চলিয়া আসিতেছে, ছাদ ভাঙিয়া পড়ে নাই।

উহারই মধ্যে একটা কোণে বসিয়া পশুপতি খামখানা খুলিল। খুলিতেই আসল চিঠিখানা ছাড়া আর এক টুকরা কাগজ উড়িয়া মেঝেয় গিয়া পড়িল। তুলিয়া দেখে—অবাক কাণ্ড! ইহা হইল কি করিয়া?

এই সেদিন মাত্র সে খোকাকে ধরিয়া ধরিয়া অ-আ লেখাইয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে, এরই মধ্যে ছেলে নিজের হাতে পত্র লিখিয়াছে। কাহাকে দিয়া কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ কাটিয়া লইয়াছে, সেই ফাঁকের মধ্যে বড় বড় করিয়া লিখিয়াছে—

বাবা, আমি পাড়তে ও লিখিতে শিখিয়াছি। ছবির বই আনিবে। ইতি।—কমল।

একবার, দুইবার, তিনবার সে পড়িল। লেখা যেমনই হউক, অক্ষরের ছাঁদ কিন্তু বেশ। বড় হইলে খোকার হাতের লেখা ভারি সুন্দর হইবে! পশুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। এই ছেলে আবার বড় হইবে, তাহার দুঃখ ঘুচাইবে, বিশ্বাস তো হয় না! পর পর আরও তিনটি এমনি বয়সে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।·· ভাবিতে ভাবিতে সে কেমন একটু উন্মনা হইয়া পড়িল।

পরক্ষণে খোকার চিঠি খামে পুরিয়া বাহির করিল প্রভাসিনী যেখানি লিখিয়াছে।

ছোট ছোট অক্ষরের সারি চলিয়াছে যেন সারবন্দী পিপীলিকা। বিস্তর

দরকারি কথা—সাংসারিক অনটন, ধানচালের বাজার-দর, গোয়ালের ফুটা চাল দিয়া জল পড়িতেছে, তারিণী মুখুয্যে বাস্তভিটার খাজনার জন্য রোজ একবার তাগাদা করিয়া যায়—ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া শেষ কালে আসিয়া ঠেকিয়াছে কয়েকটি অত্যাবশ্যক জিনিষের ফর্দ—ছুটিতে বাড়ি যাইবার মুখে খুলনা হইতে অতি অবশ্য অবশ্য সেগুলি কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে, ভুল না হয়।

পশুপতি ফর্দখানির উপর আর একবার চোখ বুলাইল, তারপর পকেট হইতে পেন্সিল লইয়া পাশে পাশে দাম ধরিতে লাগিল।

কি ভাগ্য যে এতক্ষণ এদিকে কাহারও নজর পড়ে নাই। এইবার রসিক পণ্ডিত দেখিতে পাইল এবং ইসারা করিয়া সকলকে কাণ্ডটা দেখাইল। তারপর হঠাৎ ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল—পশুভায়া, করেছ কি? হাটের মধ্যে প্রেমপত্তোর বের করতে হয়? ঢাকো—শিগগির ঢাকো, সব দেখে নিল—

পশুপতি আপনার মনে ছিল, তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়া মুখ তুলিল।

হাসি চাপিয়া অত্যন্ত ভালমানুষের মতো রসিক কহিল—ঐ নকুড়চন্দোর বাবুর কাণ্ড, আড়চোখে দেখছিলেন।

নকুড়চন্দ্র বসিয়াছিলেন ঘরের বিপরীত কোণে। বুড়ামানুষ, কাহারও স্ত্রীর চিঠি চুরি করিয়া দেখিবার বয়স তাঁহার নাই। পশুপতি বুঝিল, ইহাদের সুদৃষ্টি যখন পড়িয়াছে, এখানে বসিয়া আর কিছু হইবে না। উঠিয়া পড়িল।

মন্মথ গরাই অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল—মিছে কথা পশুপতিবাবু, কেউ দেখছে না। আপনি বসুন, বসুন। পণ্ডিত মশায়ের অন্যায়, ভদ্রলোকের পাঠে বাধা দিলেন। আপনি এই আমার পাশে এসে বসুন।—গিন্নী কি পাঠ দিয়েছেন, সেইটে একবার পড়ে শোনাতে হবে কিন্তু—

পশুপতি কোনদিন এই সব রসিকতায় যোগ দেয় না। আজ তাহার কি হইয়াছে, বলিল—এই কথা? তা শুনুন না—বলিয়া চিঠির উপর দৃষ্টি দিয়া মিছামিছি বলিতে লাগিল—প্রাণবল্লভ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়রঞ্জন। আর সব ও-পাতায় আছে, হল তো। পথ ছাড়ুন মন্মথবাবু—বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

রসিক কহিতে লাগিল—দেখলে? তোমরা তর্ক করতে, পশুপতি হাসতে জানে না—দেখলে তো? অন্যদিন বাড়ির চিঠি পেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে, আজ যেন নবযৌবন পেয়েছে। ওহে মন্মথ, আজকের চিঠিতে কি আছে, একবার দেখতে পার চুরি-চামারি করে?

ঘরের বাহির হইয়াই কিন্তু পশুপতির হাসি নিবিয়া গিয়া ভাবনা ধরিল—পাঁচ টাকা দু-আনার মধ্যে প্রভাসিনীর শাড়ি, খোকার জামা, জিরামরিচ, পান খাইবার চুন দু-সের, এক কৌটা বার্লি, বালতি এবং ছবির বই—এতগুলি কি করিয়া কুলাইয়া উঠে ?

তখন ছেলের দল হাসিয়া খেলিয়া চেঁচাইয়া লাফাইয়া ইস্কুলের উঠানটি মাত করিয়া ফেলিয়াছে। পশু মাস্টারকে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। কিন্তু পশুপতির কোন দিকে নজর নাই, সে ভাবিতেছে—

ইস্কুলে পঁচিশ টাকা বলিয়া তাহাকে সহি করিতে হয়, কিন্তু আসল মাহিনা পনের টাকা। চিঠিতে ঐ যে তারিণী মুখুয্যের তাগাদার কথা লিখিয়াছে, এবার বাড়ি গেলে মুখুয্যের খাজনা অন্তত টাকা তিন-চার না দিলে রক্ষা নাই। আবার অগ্রহায়ণে নূতন ধান-চাল উঠিবে, চাষীদের সহিত ঠিকঠাক করিয়া এখনই অগ্রিম কিছু দিয়া আসিতে হইবে, না হইলে পরে দেখিয়া শুনিয়া কে কিনিয়া দিবে ? অতএব ইস্কুলের মাহিনার এক পয়সা খরচ করিলে হইবে না। ভরসা কেবল রামোত্তমের বাড়ির আটটি টাকা। তাহা হইতে বাড়ি যাইবার রেল-স্টিমারের ভাড়া দুই টাকা চৌদ্দ আনা বাদ দিলে দাঁড়ায় পাঁচ টাকা দু-আনা। সমস্ত পূজার বাজার ঐ পাঁচ টাকা দু-আনার মধ্যে।

হেডমাস্টার কোন দিক দিয়া হঠাৎ কাছে আসিয়া ফিশ-ফিশ করিয়া কহিলেন—সেক্রেটারির অর্ডার এসেছে, বন্ধ শনিবারে। ছেলেদের এখন কিছু বলবেন না, খালি ভয় দেখাবেন—কালকের মধ্যে যদি মাইনে সব শোধ না করে তবে একদম ছুটি হবে না। মাইনে-পত্তোর আদায় যদি না হয়, বুঝতে পারছেন ত ?

ছুটির পর পশুপতি ও বুড়া নকুড়চন্দ্র পাকা-রাস্তার পথ ধরিল। নকুড় কহিলেন—বন্ধ তা হলে শনিবারে ঠিক ? শনিবারেই রওনা হচ্ছ পশুবাবু ?

সে কথার জবাব না দিয়া পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা নকুড়বাবু, ছবির বই একখানার দাম কত ?

—কি বই তা বল আগে। ছবির বই কি এক রকম ? দু-টাকার তিন টাকার আছে, আবার বিনি পয়সাতেও হয়।

পশুপতি কাছে আসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—বিনি পয়সায় কি রকম? বিনি পয়সায় ছবির বই দেয় নাকি? কি বই?

নকুড় কহিলেন—ক্যাটালগ। ছেলে-ভুলানো ব্যাপার তো? একখানা কবিরাজি ক্যাটালগ নিয়ে যেও। এই ধর, হাঁপানী-সংহারক তৈল—পাশে দিব্যি ছবি, একটা লোক ধুঁকছে—কোলের উপর বালিশ—বউ তেল মালিশ করছে। ছেলেকে দেখিয়ে দিও।

যুক্তি পশুপতির পছন্দ হইল না, হাসি পাইল। কমলকে দেখেন নাই তো! সে যে বানান করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, তাহার কাছে চালাকি চলিবে না। কহিল—না, তাতে কাজ নেই—একখানা ছবির বই, সত্যি-সত্যি ছবির বইয়ের দাম কত পড়বে? দু-টাকা তিন টাকা ও-সব বড়মানুষি কথা ছেড়ে দিন, খুব কমের মধ্যে—যার কমে আর হয় না, কত লাগবে?

নকুড় কহিলেন—বোধ হয় গণ্ডা চারেক পয়সা নেবে, কিনি নি কখনও। মাস্টারির পয়সা—মুখে রক্ত ওঠানো পয়সা। ও রকম বাজে খরচ করলে চলে?

পশুপতি তখন ফর্দ বাহির করিয়া আর একবার পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল—আর, পাথুরে চুন দু-সের?

নকুড় কহিলেন—তিন আনা।

এবার নকুড়ের হাতে কমলের চিঠিটুকু দিল। কহিল—মজাটা দেখুন মশাই, ছেলে আবার চিঠি লিখেছে—ফরমায়েসটা দেখুন পড়ে একবার। বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বড় ফর্দখানি দেখাইয়া বলিল—বড় সমস্যায় পড়েছি, একটা সৎযুক্তি দিন তো নকুড় বাবু। পুঁজি মোটে পাঁচ টাকা দু-আনা —ফর্দের কোন কোনটা বাদ দি?

দেখি—বলিয়া নকুড় চশমা বাহির করিয়া নাকের উপর পরিলেন। তারপর বিশেষ প্রণিধান করিয়া বলিলেন—ছেলেপিলের ঘর, দুধ মেলে না বোধ হয়—তাই বার্লির কথা লিখেছে; ওটা নিয়ে যেও। তা জিরেমরিচ চুন-টুন সব বাদ দাও। ছবির বই পয়সা দিয়ে কিনে কি হবে? যা বললাম, পার তো একখানা ক্যাটালগ নিয়ে যেও। তোমরা বোঝ না—ছেলেপিলে যখন আব্দার করে মোটে আস্কারা দিতে নাই। তাদের শিখিয়ে দিতে হয়, এক আধলাও যাতে বাজে খরচ না করে। গোড়া থেকে মিতব্যয়িতা শিখুক, তবে তো মানুষ হবে—

মনে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু মোটের উপর নকুড়ের কথাটা ঠিক। পশুপতির স্মরণ হইল, সে-ও ক্লাশের একখানি বাংলা বহিতে সেদিন পড়াইতেছিল—'অপব্যয় না করিলে অভাব হয় না। হে শিশুগণ, তোমরা মিতব্যয়ী হইতে অভ্যাস করিবে। তাহা হইলে জীবনে কদাপি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না…' এমনি অনেক ভাল ভাল কথা। ছবির বই, জিরামরিচ ও চুল কিনিয়া কাজ নাই তবে, বালতি, বালি ও কাপড়-জামা কিনিয়া লইলেই চলিবে।

নকুড় কহিতে লাগিলেন—তিল কুড়িয়ে তাল! হিসেব করে দেখ ত ভায়া, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কত পয়সা অপব্যয় করেছি। সেইগুলো যদি জমানো থাকত, তবে আজ দুঃখ কিসের? বাঙালি জাত দুঃখ পায় কি সাধে?

পশুপতি আর কথা না কহিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

গ্রামের মধ্যে কয়েক বাড়ি দেবীর ঘটস্থাপনা হইয়াছে। বড় মধুর সানাই বাজিতেছে। পশুপতির কানে নূতন লাগিল, এমন বাজনা সে অনেক দিন শোনে নাই। হঠাৎ সে হাসিয়া উঠিল, বলিল—কথা যা বললেন নকুড়বাবু, ঠিক কথা! আমরা কি হিসেব করে চলি? আমাকে আজ দেখছেন এই রকম—শখ করে আমিই একবার একখানা বই কিনি—সে-ও একরকম ছবির বই, ইস্কুল-কলেজে পড়ায় না। দাম পাঁচ টাকা পুরো।

নকুড় শিহরিয়া উঠিলেন—পাঁচ টাকার বাজে বই, বল কি?

—হুঁ, পাঁচ টাকা। তখন কি আমার এই দশা? বাবা বেঁচে। পায়ে পম্প-শু, মাথায় টেড়ি। কলকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম। মাসে মাসে টাকা আসে। ফূর্তি কত! বইখানার নাম চিত্রাঙ্গদা—সেই যে অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা—পড়েন নি?

নকুড় কহিলেন—পড়ি নি আবার, কতবার পড়েছি। বল যে মহাভারত। আজকাল সেই মহাভারত বিকুচ্ছে এগার সিকেয়।

পশুপতি কহিল—মহাভারত নয়, তাহলেও বুঝতাম বই পড়ে পরকালের কিছু কাজ হবে। এমনি একখানা পদ্যের বই, পাতায় পাতায় ছবি। রাতদিনই তাই পড়ে পড়ে মুখস্থ করতাম। এখন একটা লাইনও মনে নাই।

পশুপতির নির্বুদ্ধিতার গল্প শুনিয়া নকুড় আর কথা বলিতে পারিলেন না। মহাভারত রামায়ণ নয়, মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুরের অনুমোদিত ইস্কুল বা কলেজ-পাঠ্য বই নয়, এমন বই লোকে পাঁচ টাকা দিয়া কিনিয়া পড়ে!

সেই-সব দিনের অবিবেচনার কথা ভাবিয়া পশুপতিরও অনুতাপ হইতেছিল। বলিল তা-ও কি বইটা আছে ? জানা নেই, শোনা নেই—পরন্তু পর একটা মেয়ে—নির্বিচারে দামি বইটা তার হাতে তুলে দিলাম। কি বোকাই যে ছিলাম তখন ! ও—আপনি তো এসে পড়েছেন একেবারে—আচ্ছা—

নকুড় বামদিকের বাঁশতলার সরুপথে নামিয়া পড়িলেন। সামনেই তাঁহার বাড়ি। কহিলেন—কাল আবার দেখা হবে। শিগগির শিগগির চলে যাও পশুবাবু, চারদিকে থমথমা খেয়ে আছে, বিষ্টি নামবে এক্ষুণি।

তখন সত্যসত্যই চারিদিক নিষ্কম্প, বাতাস আদৌ নাই, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। মাথার উপরে অতি-ব্যস্ত আকাশ মেঘের উপর মেঘ সাজাইয়া নিঃশব্দে আয়োজন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

আজ পাঁচ টাকার মধ্যে সমস্ত পূজার বাজার সারিতে হইতেছে, আর বহু বৎসর পূর্বে একদিন ঐ দামের একখানি নূতন বই নিতান্ত শখ করিয়া বিসর্জন দিয়াছিল, একবিন্দু ক্ষোভ হয় নাই—চলিতে চলিতে কতকাল পরে পশুপতির সেই কথা মনে হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সে বাড়ি ফিরিতেছিল, অন্তরভরা আশা ও উল্লাস, হাতে চিত্রাঙ্গদা।

বনগাঁর পর দু-তিনটা স্টেশন ছাড়াইয়া—সে স্টেশনে ট্রেন থামিবার কথা নয়—তবু থামিল। ইঞ্জিনের কোথায় কি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা অনেকে নামিয়া পড়িল।

প্লাটফরমের উপরে দক্ষিণ দিক্‌টায় জোড়া পাকুড়গাছ ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার গোড়ায় স্টেশনের মরিচা-ধরা ওজনের কলটি। পাকুড়গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দিব্য পা ছড়াইয়া কলটির উপর বসিয়া পশুপতি চিত্রাঙ্গদা খুলিয়া পড়িতে বসিল। লাইনের ওপারে অনেক দূরে সূর্য অস্ত যায়-যায়। কুয়ায় কলসি ভরিয়া আল-পথে গ্রামে ফিরিতে ফিরিতে বৌ-ঝিরা তাকাইয়া তাকাইয়া রেলগাড়ি দেখিতেছিল।

পশুপতি একমনে পড়িয়া চলিয়াছে। ঠিক মনে নাই, বোধ করি অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার প্রথম পরিচয়ের মুখটা—খাসা জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে

সে অনুভব করিল, জোড়াগাছের পিছনে কেহ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে চিত্রাঙ্গদার আসিবার তো সম্ভাবনা নাই। পশুপতি ভাবিল, হয় পানিপাঁড়ে কি পয়েন্টস্‌ম্যান, নয়তো ছাগলে গাছের পাতা খাইতে আসিয়াছে। অতএব না ফিরিয়া পাতা উল্টাইতে যাইতেছে, এমন সময়ে কাঁচের চুড়ি বাজিয়া উঠিল।

তাকাইয়া দেখে, বছর আষ্টেকের একটি মেয়ে। মুখখানার চারিপাশে কালো কালো চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মেয়েটির বড় বড় চোখ দুটির উপর লেখা রহিয়াছে, সে ঐ পাতার ছবিগুলি ভাল করিয়া দেখিবে। আপিস-ঘরে টেলিগ্রাফের কল টক-টক করিয়া বাজিয়া যাইতেছিল এবং লাইনের উপরে ইঞ্জিন একটানা শব্দ করিতেছিল—ইস্‌-স্‌-স্‌। আজ পশুপতি ভাবিতেছে, সে-সব নিছক পাগলামি—সেদিন কিন্তু সত্যসত্যই তাহার মনের মধ্যে এরূপ একটা ভাবাবেশ জমিয়া আসিয়াছিল, যেন সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার গতিবেগ থামাইয়া ম্লান অপরাহ্ণ-আলোয় মেয়েটির লুব্ধ ভীরু চোখ দুটিকে সমীহ করিয়া প্লাটফরমের ধারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল—খুকী, ছবি দেখবে? দেখ না কেমন খাসা খাসা সব ছবি।

অনুরোধের অপেক্ষা মাত্র। তৎক্ষণাৎ মেয়েটি সেই মরিচা-ধরা ওজন-যন্ত্রের উপর বিনাদ্বিধায় পশুপতির পাশে বসিয়া পড়িল।

পশুপতি ছবির মানে বলিয়া দিতেছিল; সে নিজেও পশুপতির পাণ্ডিত্যের মর্যাদা না রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বানান করিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় ঘণ্টা দিল। ইঞ্জিন ঠিক হইয়াছে—এইবার ছাড়িবে। পশুপতির মনে হইল, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিয়া ইঞ্জিন ঠিক হইয়া গেল। মেয়েটির মুখখানিও হঠাৎ কেমন হইয়া গেল—তাহার ছবি দেখা তখনও শেষ হয় নাই, সে কথা মোটে না ভাবিয়া রেলগাড়ি তার সুদীর্ঘ জঠরে ছবির বই সমেত মানুষটিকে লইয়া এখনি গুড়গুড় করিয়া বিলের মধ্য দিয়া দৌড়াইবে—বোধকরি এইরূপ ভাবনায়। বইখানি মুড়িয়া নিজেই সে পশুপতির হাতে দিল, কোন কথা বলিল না।

পশুপতি সেই সময়ে করিয়া বসিল প্রকাণ্ড বে-হিসাবি কাজ। সেই চিত্রাঙ্গদা তাহার ডুরে শাড়ির উপর রাখিয়া বলিল—এ বই তুমি ‘রেখে

দাও—ছবি দেখো, আর বড় হলে পড়ে দেখো—নূতন বই—প্রায় আনকোরা, পাঁচ পাঁচটা টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। কেবল নিজের নামটি ছাড়া কালির আঁচড় পড়ে নাই। কাহাকে দিল তাহার পরিচয়ও জানে না—হয়তো কোন রেলবাবুর মেয়ে কিংবা যাত্রীদের কেহ অথবা নিকটবর্তী গ্রামবাসিনীও হইতে পারে।

* * *

রামোত্তম রায়ের বাড়ি বড় রাস্তার ঠিক পাশেই। রোয়াকে উঠিয়া পশুপতি ডাকিল—ও ননী, এক গ্লাস জল দিয়ে যা তো বাবা।

ননী জল দিয়া গেল। তাকের উপর কাগজের ঠোঙায় এক পয়সার করিয়া বাতাসা কেনা থাকে। তাহার দুইখানি গালের মধ্যে ফেলিয়া ঢকঢক করিয়া সমস্ত জল খাইয়া পরম পরিতৃপ্তিতে কহিল—আঃ—

ইহাই নিত্যকার বৈকালিক জলযোগ।

তারপর এক ছিলিম তামাক খাইয়া চোখ বুজিয়া সে অনেকক্ষণ বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল; সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। রোয়াকের গোড়া হইতে একেবারে বড় রাস্তা অবধি উঠানের উপর দুই সারি সুপারিগাছ। গাছগুলি যেন মাথা ভাঙাভাঙি করিয়া মরিতেছে। জল গড়াইয়া উঠান ভাসাইয়া কলকল শব্দে রাস্তার নর্দমায় গিয়া পড়িতে লাগিল। কি মনে করিয়া পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জামার পকেট হইতে কমলের পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমে চারিদিক আরও আঁধার করিয়া আসিল, আর নজর চলে না।

রাস্তার ঠিক ওপার হইতে ধানভরা সবুজ সুবিস্তীর্ণ বিলের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরপারে অতি অস্পষ্ট খেজুর ও নারিকেল-বন। সেইদিকে চাহিয়া পশুপতির মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। ঐ নারিকেলগাছের ছায়ায় গ্রামের মধ্যে চাষীদের ঘরবাড়ি। বৃষ্টি ও অন্ধকারে বাড়ি দেখা যাইতেছে না, অতি ক্ষীণ এক একটা আলো কেবল নজরে পড়ে। গ্রামটি ছাড়াইলে তারপর হয়তো আবার বিল। এমনি কত গ্রাম, কত খালবিল, কত বারোবেঁকি, কাচিপাতা ও নাম-না-জানা বড় বড় গাঙ পার হইয়া শেষকালে আসিবে তাহার গ্রামের পাশের পশর নদী। ভাঁটা সরিয়া গেলে আজকাল চরের উশর বাঁধের ধারে ধারে শরতের মেঘভাঙা-রৌদ্রে সেখানে বড় বড় কুমীর শুইয়া থাকে। বাবলাগাছে হলদে-পাখী

ডাকে। কমল মিহি সুরে অবিকল পাখীর ডাকের নকল করিতে পারে—বউ সরষে কোট্, বউ—। এমন দুষ্ট হইয়াছে কমলটা!

তাহাদের গ্রামের ঘাটে স্টিমার আসিয়া লাগে সন্ধ্যার পর। ঘাটের কাছেই বাড়ি, অন্ধকার সাবেককালের আম-বাগান এবং নাটা ও বেতের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরু পথ। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি পোকার মতো একটি অতিশয় ছোট্ট আলো দূরে—বহুদূরে—পশুপতির স্তিমিত দৃষ্টির অগ্রে ঐ যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আলো ছোট হইলে কি হয়, পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আচ্ছা, তাহাদের গ্রামেও কি এই রকম ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে? এই রকম অন্ধকার আকাশ, মেঘের ডাক···? হয়তো এসব কিছুই নয়। হয়তো সে-দেশে এখন আকাশ-ভরা তারা এবং প্রভাসিনী এতক্ষণ রান্নার জোগাড় করিতে আলো লইয়া এঘর-ওঘর করিতেছে। আর চারদিন পরে পশুপতি সেই অপূর্ব শীতল ছায়াচ্ছন্ন উঠানে গিয়া দাঁড়াইবে। খোকা?—সোনামাণিক খোকন তখন কি করিতেছে? পড়িতেছে বোধ হয়—

পশুপতি ভাবিতে লাগিল, সে যেন পশর নদীর পারে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উঠিয়াছে; কমল শোবার ঘরে প্রদীপের আলোয় পড়া মুখস্থ করিতেছিল, বাপের সাড়া পাইয়া উঠানের উপর দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিল। এমন ছুটিতেছে, বুঝি-বা পড়িয়া যায়। আস্তে আয়, ওরে পাগলা একটু দেখে শুনে—অন্ধকারে হোঁচট্ খাবি, অত দৌড়ুস নি—

ঘনান্ধকার দুর্যোগের মধ্যে বহুদূর হইতে কমল আসিয়া যেন দুই হাত উঁচু করিয়া ক্লান্তদেহ, অকালবৃদ্ধ ইস্কুল-মাস্টারের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল···

রামোত্তম এতক্ষণ কাছারি-ঘরে কি কাজকর্ম করিতেছিলেন। এইবার বাড়ির মধ্যে চলিলেন। পশুপতিকে বলিলেন—মাস্টার মশায়, আপনিও চলুন—বাদলা-রাত্তিরে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ুন আর কি। এই বৃষ্টিতে আপনার ছাত্তোর আর আসবে না।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পশুপতি সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। আলো নিবাইয়া দিল।

শুইয়া শুইয়া শুনিতে লাগিল, ঝড় দালানের দেওয়ালে যেন উন্মত্ত ঐরাবতের

হাওয়ার ছুটিয়া আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে, রুদ্ধ দরজা-জানালা খড়খড় করিয়া ঝাঁকাইতেছে, আকাশ চিরিয়া মেঘের ডাক, ছাদের নল হইতে ছড়-ছড় করিয়া জল পড়ার শব্দ···সমস্ত মিলিয়া ঝটিকাক্ষুব্ধ নিশীথিনীর একটানা অস্পষ্ট চাপা আর্তনাদের মত শোনাইতেছে।

পশুপতি আরাম করিয়া কাঁথা টানিয়া গায়ে দিল।

সেই অবিরল বাতাস ও বৃষ্টিধ্বনির মধ্যে পশুপতি শুনিতে লাগিল, গুনগুন গুনগুন করিয়া কমল পড়া মুখস্থ করিতেছে। কণ্ঠ কখনও উচ্চে উঠিতেছে, কখনও ক্ষীণ—ক্ষীণতর—অস্ফুটতম হইয়া সুরের রেশটুকু মাত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেছে। তন্দ্রা-ঘোরে আঁধার আমবাগানের মধ্য দিয়া বাড়িমুখো যাইতে যাইতে সে শুনিতে লাগিল। মনে হইল, ঘরের দাওয়ায় কাঁথের পুঁটুলি নামাইয়া সে যেন ডাকিতেছে —কই গো কোথায় সব ?

খোকা আসিয়া সর্বাগ্রে পুঁটুলি লইয়া খুলিয়া ফেলিল। জিনিষপত্র একটা একটা করিয়া সরাইয়া রাখিতেছে, কি খুঁজিতেছে পশুপতি তাহা জানে। ম্লানমুখে কমল প্রশ্ন করিল—বাবা, আমার ছবির বই ?

পশুপতি উত্তর দিল—সোনামাণিক আমার, বই তো আনতে পারি নি। অপব্যয় করতে নেই—বুঝলি খোকা, পয়সাকড়ি খুব বুঝেসুজে খরচ করতে হয়। তাহলে পরে আর দুঃখ পাবি নে।

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া সরিয়া বসিল। অবোধ বালকের অভিমানাহত মুখখানির স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ পরে পশুমাস্টার ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। প্রাণপণ বলে বারংবার কে যেন দ্বারে ধাক্কা দিতেছে। ঝড়ের বেগ আরও বাড়িয়াছে বুঝি ! এ কী প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড, দরজা সত্য-সত্যই চুরমার করিয়া ফেলিবে না কি ?

অন্ধকার ঘর। পশুপতির বোধ হইল, বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইতেছে—দুয়োর খুলুন—দুয়োর খুলুন—

তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নাই। তাহার সর্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। ঝটিকা-মথিত দুর্যোগ—আঁধার বর্ষা-নিশীথ। নির্জন সুখসুপ্ত গ্রামের একপাশে, দিগন্ত-

বিসারী বিলের প্রান্তে রামোত্তম রায়ের বাহির-বাড়ির রোয়াকে দাঁড়াইয়া কে অমন আর্তকণ্ঠে বারংবার দরজা খুলিয়া দিতে বলে!

শিকলের ঝনঝনানি অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। নিশ্চয় মানুষ। পশুপতি উঠিয়া খিল খুলিয়া দিতেই কবাট দুইখানি দড়াম করিয়া দেওয়ালে লাগিল এবং ঝড়ের বেগেই যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল একটি পুরুষ, পিছনে এক নারী।

মেয়েটির হাতের চুড়ি ঝিন-ঝিন করিয়া ঈষৎ বাজিয়া উঠিল এবং কাপড়-চোপড় হইতে অতি কোমল মৃদু সুগন্ধ আসিয়া পশুপতি মাস্টারের ঘর ভরিয়া গেল।

পুরুষ লোকটি আগাইয়া আসিতে গিয়া তক্তপোষে ঘা খাইল। পশুপতি কহিল—দাঁড়ান, আলো জ্বালি।

হেরিকেন জ্বালিয়া দেখে, স্বাস্থ্য ও যৌবন-লাবণ্যে দু'জনেই ঝলমল করিতেছে। মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসে নাই, চৌকাঠের ওধারে ছাদের নলের নিচে দাঁড়াইয়া পরম শান্ত ভাবে ভিজিতেছিল, মুখভরা হাসি। দেখিয়া যুবক ব্যস্ত হইয়া কহিল—অ্যাঁ, ও কি হচ্ছে লীলা, এ কি পাগলামি তোমার? ইচ্ছে করে ভিজছ দুপুর রাত্রে?

সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া বধূ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

যুবক আরও চটিয়া কহিল—বড্ড স্ফূর্তি—না? এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, আমি যত মানা করি তুমি মজা পেয়ে যাও যেন।

আঙুল তুলিয়া লীলা চুপি-চুপি তর্জন করিয়া কহিল—চুপ! তারপর ভিতরে ঢুকিল। ফিশ-ফিশ করিয়া কহিল—বাবারে বাবা, তোমার শাসনের জ্বালায় যাই কোথায়? সেই তো কাপড় ছাড়তে হবে, তা একটুখানি নেয়ে নিলাম—বলিয়া আঁচল তুলিয়া মুখে দিল, বোধকরি তাহার হাসি পশুপতি দেখিতে না পায় সেইজন্য।

যাক গে—আর একটা কথাও বলব না, মরে গেলেও না—বলিয়া যুবক গুম হইয়া রহিল। পরক্ষণে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল—তুই কতক্ষণ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে ভিজবি, এখানে এনে রাখ্।

উহাদের চাকর এতক্ষণ বাক্স মাথায় করিয়া রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরের মধ্যে আসিয়া বাক্স নামাইয়া দিল।

যুবক কহিল—যদি ইচ্ছে হয় তবে দয়া করে বাক্সটা খুলে শিগগির ভিজে কাপড়চোপড়গুলো বদলান হোক, আর ইচ্ছে যদি না হয় তবে এক্ষুণি ফিরে মোটরে যাওয়া যাক। আমি আর কাউকে কিছু বলছি নে।

মেয়েটির হাসিমুখ আঁধার হইল, হেঁট হইয়া বাক্স খুলিতে লাগিল।

কাণ্ড দেখিয়া পশুপতি একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এতরাত্রে এই তরুণ-দম্পতি কোথা হইতে আসিল এবং আসিয়া নিঃসঙ্কোচে পশুপতির ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই অমনি রাগারাগি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এতক্ষণ ইহাদের মধ্যে কথা বলিবার ফাঁকই পাইতেছিল না, এইবার বলিল—আপনারা তবে কাপড় ছাড়ুন, আমি লোকটাকে নিয়ে কাছারি-ঘরে বসিগে।

যুবক যেন এইমাত্র পশুপতিকে দেখিতে পাইল। কহিল—কাপড়টা ছেড়ে আমিও যাচ্ছি। বড্ড কষ্ট দিলাম আপনাকে। আমি এ বাড়িতে আরও অনেকবার এসেছি, রামোত্তম বাবু আমার পিশেমশাই হন। আপনাকে এর আগে দেখি নি। একটু আলাপ-টালাপ করব—তা মশায়, কাণ্ডটা দেখলেন তো? সেদিন অসুখ থেকে উঠেছে, কচি খুকী নয়—একটু যদি বুদ্ধিজ্ঞান থাকে! একেবারে আস্ত পাগল!

লীলা মুখ রাঙা করিয়া একবার স্বামীর দিকে তাকাইল। তারপর রাগ করিয়া খুব জোরে জোরে ট্রাঙ্ক হইতে কাপড়-চোপড় নামাইয়া ছড়াইয়া মেজের রাখিতে লাগিল; কাপড়ের সঙ্গে আতরের শিশি ঠক করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

পশুপতি ও চাকরটি ততক্ষণ কাছারিঘরে গিয়া বসিয়াছে।

যুবক কহিল—গেছে তো? তক্ষুণি জানি। আস্ত শিশিটা—এক ফোঁটাও খরচ হয় নি।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে লীলা কহিল—আর বোকো না; তোমার আতর আমি কিনে দেব—কালই। তারপর কথা যেন কান্নায় ভিজিয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল—অজানা জায়গায় এসে লোকজনের সামনে কেবলি বকাবকি—কেন? কিসের এত? আমি বিষ্টি লাগাব, খুব করব, অসুখ করে খাই মরে যাব—তোমার কি?

পাশাপাশি দু'টি ঘর। কলহের প্রতি কথাটি পশুপতির কানে যাইতেছিল।

স্বামী উত্তর করিল—আমার আর কি—আমি তো কারও কেউ নই। ঘাট হয়েছে—আর কোনদিন কিছু বলব না।

কিছুক্ষণ আর কথাবার্তা নাই। খুটখাট আওয়াজ, বাক্সের ভিতরের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া হইতেছে।

লীলা বলিতে লাগিল—মোটরের হুড উড়িয়ে যে ভিজিয়ে দিয়ে গেল তাতে কিছু দোষ হয় না, আর আমি একটুখানি বাইরে দাঁড়িয়েছি অমনি কত কথা—আস্ত পাগল—হেনোতেনো—কেন, কি জন্যে বলবে?

অন্য পক্ষের সাড়া নাই।

পুনরায় বধূর কণ্ঠস্বর—ভিজতে আমার বড্ড ভাল লাগে। ছেলেবেলা এই নিয়ে মা'র কাছে কত বকুনি খেয়েছি। তা বকবে যদি তুমি আমায় আড়ালে বকলে না কেন? অজানা অচেনা কোথাকার কে-একজন তার সামনে···ওগো, তুমি কথা বলবে না আমার সঙ্গে?

স্বামী বলিল—না, বলব না তো। কেউ মরলে আমার কিছু আসে যায় না যখন—বেশ তো—আমি যখন পর—

বধূ কহিল—কতদিন তো সাবধান হয়ে আছি, ছড়ছড় করে জল পড়ছে দেখে আজকে হঠাৎ কেমন ইচ্ছে হল। আমি আর করব না—কোনদিনও না। ওগো, তুমি আমায় মাপ কর—সত্যি করব না।

স্বামীর কণ্ঠ অভিমানে কাঁপিতে লাগিল, বলিল—কথায় কথায় তুমি মরতে চাও—কেন? কি জন্য? আমি কি করেছি তোমার?

বধূ কহিল—না, মরব না।

—দিব্যি কর গা ছুঁয়ে যে কক্ষণো না—কোন দিনও না—

স্বামীকে খুশি করিতে বধূ দিব্য করিল, সে কোনদিন মরিবে না।

আরও খানিকক্ষণ পরে যুবক কাছারি-ঘরে ঢুকিল। পশুপতি কহিল—হয়ে গেছে? এবার চলুন বাড়ির মধ্যে, আমি আলো দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

যুবক কহিল—আজ্ঞে না। এক্ষুণি চলে যাব। সকালে পিসেমশাইকে বলবেন, জাঙ্গুলগাছির সুরেশ এসেছিল। থাকলাম না বলে চটে যাবেন—

পশুপতি কহিল—তবে আর কি! আত্মীয়ের বাড়ি এসে পড়েছেন যখন দয়া করে—

সুরেশ বলিল—দয়া করে নয় মশায়, দায়ে পড়ে। ফাল্গুন মাসে ওর টাইফয়েড হয়, একত্রিশ দিন যমে-মানুষে টানাটানি করে, কোন গতিকে প্রাণটুকু নিয়ে চেঞ্জে পালিয়েছিলাম। সেই গেছলাম আর আজ এই ফিরছি। স্টেশনে নেমে বিষ্টি-বাদলা দেখে বললাম—কাজ নেই লীলা, রাতটুকু ওয়েটিং-রুমে কাটান যাক। তা একেবারে নাছোড়বান্দা—বলে, মোটরে হুড দেওয়া রয়েছে—

এক ফোঁটা জল গায়ে লাগবে না, ঝড়-বাতাসের মধ্যে ছুটতে খুব আমোদ লাগে। শুনেছেন কখনও মশায়, ভূ-ভারতে এমন ধারা? এদেশের ট্যাক্সি—ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে বাতাসে হুড গেল উল্টে। ভিজে একেবারে জবজবে। এখানে উঠতে কি চায়? ভিজে কাপড় বদলাতে একরকম জেদ করে নিয়ে এলাম।

পশুপতি কহিল—বেশ তো, ওঁদের সঙ্গে দেখা-টেখা করে অন্তত রাতটুকু কাটিয়ে কাল সকালেই চলে যাবেন।

সুরেশ বলিল—বলছেন কাকে? ওদিকে একেবারে তৈরি। এরই মধ্যে দু দু-বার দরজার উপর ঠকঠক হয়ে গেছে—শোনেন নি? বিষ্টি বোধ হয় ধরে গেল এইবার। আচ্ছা, নমস্কার! খুব বিব্রত করে গেলাম—

তরুণ-তরুণী পাশাপাশি গুঞ্জন করিতে করিতে এবং তাহাদের পিছনে চাকরটি ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া রাস্তার উপরের মোটরে গিয়া উঠিল।

তারপরে সেই রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি পশুপতি মাস্টার আর ঘুমাইতে পারিল না। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তারা উঠিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার রমণীয়। শিশি ভাঙিয়া ঘরময় আতর ছড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার উগ্র মধুর মাদক সুবাসে পশুপতির মাথার মধ্যে রিমঝিম করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। এই ঘর তৈয়ারি হইবার পর বরাবর চুনসুরকিই পড়িয়া ছিল, এই প্রথম আতর পড়িয়াছে এবং বোধকরি দুর্যোগের রাত্রে বিপন্ন তরুণ-দম্পতি কয়েক মুহূর্তের জন্য আসিয়া আতরের সহিত তাহাদের কলহের গুঞ্জন রাখিয়া গিয়াছে।

হেরিকেনটা তুলিয়া পশুপতি প্রভাসিনীর চিঠিখানি গভীর মনোযোগের সহিত আর একবার পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সমস্ত অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল। একটা সোহাগের কথা নাই, অথচ সমস্ত চিঠি ভরিয়া সংসারের প্রতি ও তাহাদের সন্তানের প্রতি কতখানি মমতা ছড়ান রহিয়াছে! কোনদিন সে এসব ভাবিয়া দেখে নাই।

জানালা খুলিয়া দিয়া অনেকক্ষণ একাগ্রে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে পশুপতির মন চলিয়া গেল আবার সেই বহুদূরবর্তী পশর নদীর পারে তাহার নিজের বাড়িতে···এবং সেখান হইতে চলিয়া গেল আরও দূরে, প্রায় বিশ বছরের ওপারে বিস্মৃতির দেশে—যেদিন প্রভাসিনীকে বিবাহ করিয়া

গ্রামে ঢুকিয়া সর্বপ্রথমে ঠাকরুনতলায় জোড়ে প্রণাম করিয়াছিল·· তারপর কত নির্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের মধুর স্মৃতি—ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালে চুরি করিয়া চোখোচোখি —সুপ্তিমগ্ন জ্যোৎস্নারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া কাটানো—ভোর হইলে বউকে তুলিয়া দিয়া নিজে আবার পাশ ফিরিয়া শোওয়া···

এখন আর সে-সব কথা কিছু মনে পড়ে না, পৃথিবীতে কিন্তু তেমনি দুপুর সন্ধ্যা ও রাত্রি আসিয়া থাকে ; পৃথিবীর লোকে গান গায়, কবিতা পড়ে, প্রেয়সীর কানে ভালবাসার কথা গুঞ্জন করে, আকাশে নক্ষত্র অচঞ্চল দীপ্তিতে ফুটিয়া থাকে, তারার আলোকে নারিকেলপাতা ঝিলমিল করিয়া দোলে। পশুপতি সে-সময় সংসারের অনটনের কথা ভাবে, জ্যামিতির আঁক কষে, নয় তো ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে জানালা আঁটিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

অকস্মাৎ তাহার বোধ হইল, চিত্রাঙ্গদার ভুলিয়া-যাওয়া লাইনগুলি তাহার যেন মনে পড়িতেছে। ছেলেমানুষের মতো মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া সে গুন-গুন করিতে লাগিল। এখনও ঠিক মনে পড়ে নাই · মনে হইল, এমনি করিয়া রাত্রি জাগিয়া আরো বহুক্ষণ অবধি যদি সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারে সমস্ত কবিতাগুলি তাহার মনে পড়িয়া যাইবে।

তারপর হঠাৎ একটি অদ্ভুত রকমের বিশ্বাস তাহার মনে চাপিয়া বসিল। বহুকাল আগে একদিন স্টেশনে যে-মেয়েটির হাতে সচিত্র চিত্রাঙ্গদা তুলিয়া দিয়াছিল, সে-ই আজ আসিয়াছিল—এই বধূটি···লীলা, এই যেন সেই মুখ। ইহা যে কত অসম্ভব, সে-ই মেয়ে বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে নিশ্চিত তার যৌবন পার হইয়া গিয়াছে, এসব কথা পশুপতি একবারও ভাবিতে পারিল না। বারম্বার তাহার মনে হইতে লাগিল, ট্রাঙ্কে এই বধূটির কাপড়-চোপড় ছিল, সকলের নিচে ছিল সেই চিত্রাঙ্গদা—পাঁচ টাকা দামের। লীলা আতরের শিশি ভাঙিয়াছে, কে জানে হয় তো চিত্রাঙ্গদাও এই ঘরের মেজেয় ফেলিয়া গিয়াছে। খুঁজিয়া দেখিলে এখনই পাওয়া যাইবে—কিংবা থাকগে এখন খোঁজাখুঁজি, কাল সকালে···

পরদিন পশুপতির ঘুম ভাঙিতে বেলা হইয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখে ইতিমধ্যে ননী আসিয়াছে। বেঞ্চের উপর বসিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া সে ফার্স্ট বুকের পড়া তৈয়ার করিতেছে—

One night when the wind was high a small bird flew into my room.......

ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা

একদিন রাত্রিবেলা যখন বাতাস প্রবল হইয়াছিল, একটি ছোট পাখী আমার ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসিয়াছিল.... .

শুনিতে শুনিতে পশুপতি আবার চোখ বুজিল; ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসা ছোট্ট একটি পাখীর কল্পনা করিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, রোদ উঠিয়া গিয়াছে, পাখীর ভাবনা ভাবিবার সময় আর নাই। এখনই হয়ত রামোত্তম ছেলেরা পড়ার তদারক করিতে আসিবেন। উঠিয়া বসিয়া হুঙ্কার দিল—বানান করে করে পড়—

(বনমর্মর)

দালানের মাঝখানে গালচের আসন পেতে গোটা আষ্টেক দশ বাটি আর অভব্য রকমের বড়ো একখানা থালা সাজিয়ে আহারের আয়োজন করা হয়েছে। জামাইয়ের নয়, বেহাইয়ের।

নতুন বৌমার বাপ এসেছেন বিদেশ থেকে।

বাড়ীর গৃহিণী নাকি নিতান্তই লজ্জাশীলা, তাই অতিথির অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং বধূমাতারই। তা' অযোগ্য অধিকারীর হাতে ভার ন্যস্ত হয় নি। নতুনবৌ ছেলেমানুষ হলে কি হয়, তিনজনের আহার্যবস্তু একজনের জঠর-গুহায় চালান করিয়ে দেবার চেষ্টার জন্যে যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সেটা তার আছে।

শ্বশুরবাড়ীতে—বাপ ভাই কুটুম, কাজেই বাপকে অতিভোজনের জন্যে পীড়াপীড়ি না করবে কেন অনুপমা?

বাপ হেসে বলেন—খুব যে গিন্নী হয়ে উঠেছিস দেখছি? আমার সঙ্গেও কুটুম্বিতা? এতো কখনো খাই আমি?

খান না সে কি আর অনুপমাই জানে না? কিন্তু উপরোধটাই রীতি যে! তা ছাড়া—শাশুড়ী সামনা-সামনি না এলেও আনাচে-কানাচে আছেন কোথাও, পরে বৌয়ের ত্রুটি ধরবেন। তাই অনুপমা সোৎসাহে বলে—আচ্ছা মাছটাছ না খেতে পারো থাক, পায়েস মিষ্টি এগুলো তো খাবে? এ সন্দেশ এদের দেশ থেকে আনানো—ফেললে চলবে না বাবা!

—না চলে তো তুই খা বসে বসে—বলে বাপ হেসে উঠে পড়েন। 'অপচয়' সম্বন্ধে কোনো বক্তৃতা না দিয়েই ওঠেন।

সাল তারিখের হিসেবে ঘটনাটা দু' যুগ আগের; অপচয়ের ভয়ে অপ্রচুর আয়োজনটা ছিলো তখনকার দিনে বিশেষ নিন্দনীয়। একজনকে খেতে বসিয়ে কেবলমাত্র একজনের উপযুক্ত দেওয়া—সে কেমন? ফেলাছড়া না হলে আবার আদর জানানো কি? আহার্য-বস্তুর ওপর মমত্ববোধটা তো মানসিক দৈন্য।

অতিবড়ো কল্পনাবিলাসীও তখন 'রেশনের বাজারের' দুঃস্বপ্ন দেখেনি। অতএব —কাক বা বেড়াল সম্বন্ধে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়েই অনুপমাও বাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায় এবং পাশাপাশি চলতে চলতে প্রায় অস্ফুট স্বরে বলে—আমাকে নিয়ে যাবার কথা বলবে তো বাবা?

এতোক্ষণ বলতে পারেনি, জানতো খাবার সময়টা অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে এদিকে।

বাপও মেয়ের সঙ্গে স্বরের মিল রেখে বলেন—বলবো বলেই তো এসেছি। এবারে একলা ফিরে গেলে তোমাদের মাঠাকুরুণটী কি আর আস্ত রাখবেন আমাকে ? ··ভাবছি কাল সকলের গাড়ীতেই নিয়ে যাবো।

আশায় আশঙ্কায় উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত কিশোরী-হৃদয়, এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে রাজী হয় না। 'কাল সকাল'—সে যেন—সুদূর ভবিষ্যৎ !

কিন্তু 'বৌ' বলে কথা ! দু' যুগ আগের বৌ। বাপের বাড়ী যাবার ইচ্ছা প্রকাশটাও অমার্জনীয় অপরাধ। তাই পাকাগিন্নীর মতো ফিসফিস করে বাপকে উপদেশ দেয় অনুপমা—বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে বোলো বাবা, জানোই তো আমার শ্বশুর একটু রাগী মানুষ ?

—একটু ? বাপ প্রায় স্পষ্ট হেসে ওঠেন—বল্ যে বিলক্ষণ ! চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। যাক গে—এবারে যেমন করে হোক বলে করে—

কথঞ্চিত আশ্বস্ত অনুপমা বাপকে চোখ টিপে ইসারা করে চুপ করতে। কোথায় যেন পায়ের শব্দ হলো, বাপের কাছে নিয়ে যাবার আবেদন করছে—এ অপরাধ ধরা পড়লে রক্ষে আছে ?

শাশুড়ী লজ্জাশীলা হ'তে পারেন, তা' বলে—এতোদূর সহ্যশীলা তো হ'তে পারেন না সত্যি !

ঘণ্টাখানেক পরে সেই দালানেই শতরঞ্চের আসন বিছিয়ে, আর—গোটা চার পাঁচ বাটি ঘিরে থালা সাজিয়ে আহারে বসেছেন বাড়ীর কর্তা ! সামনে পাখা হাতে অনুপমা।

ইনি কুটুম্ব না হলেও—অনুরোধ উপরোধের মাত্রাটা ওঠে প্রায় কুটুম্বের পর্যায়ে। সেটাও রীতি। ছেলের বৌ যত্নআত্তি করবে এই তো সাধ মানুষের। ··

তা সে সাধ মেটাতে জানে অনুপমা।

কর্তা বেশ খানিকক্ষণ খাওয়ার পর এক সময় মুখ তুলে যেন হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গীতে বলেন—হ্যাঁ ভালো কথা·· তোমার বাবা যে নিয়ে যেতে চাইছেন তোমাকে।

—বাবার কথা বাদ দিন—বলে পাখাটা জোরে জোরে চালাতে থাকে অনুপমা। হৃৎস্পন্দনের দ্রুত ছন্দটা পাছে ধরা পড়ে তাই আরো ব্যস্ততা।

—বাদ দিলে চলছে কই গো ? শ্বশুরঠাকুর শ্লেষের ভঙ্গীতে কথা শেষ করেন —তিনি একেবারে নাছোড়বান্দা ! মেয়ে নিয়ে না গেলে—তোমার মা নাকি তাঁকে বাড়ী ঢুকতে দেবেন না শুনলাম !

—ওই তো হয়েছে জ্বালা—দইয়ের ওপর চিনি দিতে দিতে অনুপমা যেন অগ্রাহ্যভরে বলে—মার যে কি বাতিক ! মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হলেই কান্না জুড়ে দেবেন। আচ্ছা এ কী ? বাবার কি কম মুস্কিল ?···সেবারে অমনি পূজোর সময় দিদির আসবার কথা ছিলো—আসা হলো না বুঝি, বাস্ মার সাতদিন খাওয়া বন্ধ। পূজোর সময়—কোথায় নতুন কাপড়চোপড় পরবেন—তা' নয়। আচ্ছা সব সময় কি আসা বললেই আসা হয় ? সংসারের সুবিধে অসুবিধে দেখতে হবে না ?

শ্বশুরের মুখের মেঘ কেটে ঈষৎ কৌতুকের বিদ্যুৎছটা দেখা দেয়—আমি তা তো তোমার বাবাকে কথা দিলাম—বলে পায়েসের বাটাটি কাছের গোড়ায় টেনে নেন।

অনুপমার মুখেও বিদ্যুৎরেখা, কিন্তু সুকৌশলে তার উপর একখানি নকল মেঘ চাকা দিয়ে হাতের পাখা নামিয়ে গালে হাত রেখে বলে—সে কি বাবা ? কথা দিলেন কি ? মার এই শরীর খারাপ, দু'দিন বাদে ঠাকুরঝি আসবেন ! বামুন-ঠাকুর 'দেশে যাবো' বলছে—দুশ্চিন্তায় যেন মুসড়ে পড়ে অনুপমা।

—তা' বললে কি হবে—কথার পিছনে ড্যাস টেনে—কর্তা জলের গ্লাসে দুখানা পাতিলেবু নিংড়ে তারিয়ে তারিয়ে জলটি খেতে থাকেন।

অনুপমার মা অবুঝ হতে পারেন তাই বলে অনুপমা তো হ'তে পারে না ? সে শুনের পাত্র চিনির কৌটো গুছিয়ে তুলতে তুলতে বিচক্ষণভাবে বলে—এ সময় আমি হঠাৎ বাপের বাড়ী গিয়ে বসে থাকলে ঠাকুরঝি কি মনে করবেন বাবা ? বাবাকে আপনি ওই কথাই গুছিয়ে বলে দিন।

—তা হয় না বৌমা—কর্তা মাটিতে বাঁ হাতের ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বলেন —মরদকা বাত হাতীকা দাঁত ! একবার যখন 'হ্যাঁ' বলেছি, তখন ত্রিভুবন উল্টে গেলেও তার নড়চড় হবে না।

তবে আর কি করতে পারে অনুপমা ?

মাত্রাতিরিক্ত উজ্জ্বল মুখের ভাবটা ম্লান করে আনতে একটু বেশী সময় লাগে বলেই তৎপর হয়ে শ্বশুরের খড়ম, খড়কে, গামছা ইত্যাদি এগিয়ে দিয়ে তবে বলে

—মুস্কিল হলো ! মাঝামাঝি হঠাৎ এখন নিয়ে যাবার জন্তে যে কি দরকার পড়লো বাবার বুঝিও না।…মার শরীরটা খারাপ—

এ 'মা' অবশ্য শাশুড়ী।

তাঁর নিটোল দেহখানিতে কোন রোগ বালাই আছে—এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না, কিন্তু অনুপমা দেয়। কর্তাগিন্নী উভয়ের মনোরঞ্জনের এই এক উৎকৃষ্ট দাওয়াই।

পরবর্তী সিন্ দালানে নয় ঘরে, দিনে নয় রাত্রে।

তারানাথকে ছেড়ে যেতে যে 'কী ভয়ঙ্কর মন কেমন' করছে সেই কথাই ছল ছল চোখে বিশদভাবে বোঝাতে হচ্ছে অনুপমাকে।

ছুই কর্তা মিলে কথা পাকাপাকি করে ফেললেন, অনুপমা বেচারী করে কি ? ওর তো আর এখন সুধু সুধু যাবার ইচ্ছে ছিলো না ? হ্যাঁ একটা উপলক্ষ্য থাকতো—আলাদা কথা। বড্ডো অবুঝ অনুপমার মা ! অথচ বেহায়ার মতো বলতে পারে না অনুপমা সে কথা ?…কাজেই বিরহবেদনার যত রকম লক্ষণ আছে সেগুলো সব প্রকাশ করতে হয়—তারানাথের অভিমান ভাঙ্গাতে।

চতুর্থ দৃশ্যও একটা আছে, সে অনুপমার পিতৃগৃহের পটভূমিকায়।…কিন্তু সে কথা থাক। ছু' যুগ পরের কথাই বলি। "ছু' যুগ" কেন—বরং তার বেশীই।

কালের পরিবর্তন হয়েছে বটে—স্থানটা ঠিক আছে। 'পাত্রটাও' বলা চলে। সেই দালানে—ঠিক সেই জায়গাটাতেই সেই ভঙ্গীতে বসে আছেন গৃহিণী অনুপমা, পাখা একখানা হাতে।‥মুখের গড়নটা কিছু বদলেছে, গায়ের রঙের জেল্লাটা গেছে কমে, তবে—চুলে যে পাক ধরেছে সেটা—এক নজরে চোখে পড়ে না।

সামনে আহারে বসেছেন—বর্তমান কর্তা তারানাথ।

পঁচিশের ওপর আর পঁচিশ যোগ করলে—যে পরিবর্তনটুকু অবশ্যম্ভাবী তার বেশী কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না তারানাথের আকৃতিতে।

আসনটা আর বাসনগুলো বাপের আমলের, তবে আহার-আয়োজনটা নয়। তা'তে এ যুগের শীর্ণ ছাপ ! অনুরোধ-উপরোধের কাজটা ফুরিয়েছে গৃহিণীদের। …সচরাচর এ সময় ওই প্রসঙ্গেরই অবতারণা হয়। সে যুগের "জলের দরের"

সঙ্গে এ যুগের "অগ্নিমূল্যের" তুলনা করে করে প্রতিদিনই নতুন করে বিস্ময় প্রকাশ করেন অনুপমা। আবার এ উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করতে ছাড়েন না—সংসারের এই নবাবী-চাল চেলে আর কতোদিন চালাতে পারবেন তারানাথ!

ছেলেটা তো—একেবারে লাট সাহেবের পুষ্যি-পুত্তুর। মেয়েটা বাদশার বেগম।—এতোটুকু ত্রুটি হলেই রসাতল। ছেলে-মেয়েদের কান বাঁচিয়েই অবশ্য বলেন অনুপমা, এখনকার ছেলে-মেয়েদের তো বিশ্বাস নেই!

আজ আর বাজার দরের আলোচনা নয়—কর্তা রেগে আছেন। অনুপমা নীরব।

খানিকক্ষণ খাওয়ার পর হঠাৎ মুখ তুলে তারানাথ বলেন—কি নিয়ে এতোক্ষণ বচসা হচ্ছিল বাবুর?

বলা বাহুল্য উদ্দিষ্ট "বাবুটী" তারানাথের বয়স্ক বেকার পুত্র। এহেন অম্লরসাত্মক উক্তভাষা আর কার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে—উপযুক্ত বয়সের পুত্র ছাড়া?

একটা বিক্ষোভসূচক শব্দের সঙ্গে অনুপমা উত্তর দেন—আর বলো কেন? সেই দিল্লী যাওয়া! বন্ধুরা যাচ্ছে—অতএব ওঁরও যাওয়াই চাই। দিল্লী দিল্লী করে ক্ষেপে উঠেছে একেবারে।

তারানাথ বিরক্ত ভাবে বলেন—এখনো সেই 'খোট্' ধরে বসে আছে? এক-কথায় বলে দিচ্ছি—যাওয়া হবে না, ব্যস।

—বলে তো আমিও দিয়েছিলাম গো—অনুপমা পাখা নামিয়ে হাত উল্টে বলেন—শুনলে তো! সেই তক্কই তো হচ্ছিলো 'কেন যাবো না'—'গেলে দোষ কি'—'লোকে কি যায় না'—'যারা যাবে তারা সব মরে যাবে না কি—' 'নিষেধের একটা কারণ থাকা দরকার…'এই সব পাকা পাকা কথা!

নিষেধের কারণ থাকা দরকার!

শোনো আস্পর্ধার কথা! তারানাথের অনিচ্ছাটাই তো যথেষ্ট কারণ। তা ছাড়াও আবার কারণ দেখাতে হবে ছেলেকে? ক্রুদ্ধ তারানাথ বলেন—আমি ওর তাঁবেদার নই যে কারণ দেখাবো! একপাল চ্যাঙড়া ছোড়ার সঙ্গে হৈ চৈ করতে যেতে আমি দেবো না। টাকা জোগাবার বেলায় তো আমি ব্যাটা! তবু যদি—এক পয়সা আনবার মুরোদ থাকতো! চুল-ছাঁটার পয়সাটা পর্যন্ত তো হাত পেতে নিতে হয়—এই বাবাতে বুড়োর কাছে, তবু কী তেজ! কথাই কওয়া হয় না ভালো করে। আমি যেন একটা কীটস্য কীট!

অনুপমার কণ্ঠেও অনুরূপ সুর—শুধু তুমি কেন, কা-কে নয়? জগৎকেই যেন খোরাই কেয়ার করে ওরা।···দরকারের সময় হাত পাতার কথা বলছো? তা' হলেও তো বাঁচতাম, মুখফুটে চাইলে—মানের কানা খসে যাবে না?······সেই সেধে সেধে দিতে হবে—নিয়ে যেন মাথা কিনবেন।

—হুঁঃ। তারানাথ গম্ভীর ভাবে বলেন—বললে—এখুনি আবার তোমারই মানের কানা খসে যাবে, তবে স্থায্য কথা বলবো—তোমার আস্কারাতেই এ রকম হয়েছে—।

—আস্কারা আবার কি—অনুপমা অসন্তোষ প্রকাশ করেন—মেজাজটা তো জানো না ছেলের? একটা স্থায়-অন্থায় কথা বলবার জো আছে?

—আছে কি না আমি দেখতাম···তারানাথ হুমকি দিয়ে ওঠেন—বলতে আমি খুবই পারতাম; শুধু পারি না তোমার ভয়ে।

হঠাৎ চল্লিশোত্তীর্ণা অনুপমার মুখে এমন একটা রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে,—বেটা চব্বিশ বছরে মানানসই।···তবে উত্তরটা বয়সের অনুপাতেই দেন ভদ্রমহিলা—আহা মরে যাই! আমার ভয়ে তো অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছো তুমি।···ভয় করতে হয়—আজ-কালকার ছেলেদের। খোকাই তো সেদিন বলছিলো—ওর কোন বন্ধুর ভাই না কি বাপের কাছে বকুনি খেয়ে···কে? কে ওখানে?

তারানাথ অগ্রাহ্যভরে বলেন—কে আবার? মেথো হয় তো!

—কি জানি বাবু—অনুপমা সন্দিগ্ধভাবে বলেন—মনে হলো যেন খোকা উঠে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।···

—খোকা আবার কি? এই তো সাহেব সেজে বেরিয়ে যাওয়া হলো বাবুর! পোর্টফোলিও হাতে না ঝোলালে বেরোনো হয় না, যেন মস্ত এক অফিসার।

—হ্যাঁ ওই এক ফ্যাসান ছেলের! কিন্তু— ঘুরে আবার আসেনি তো?

—কেন ঘুরে আসবে কি জন্যে?

—কি জানি, কিছু ভুলে ফেলে গিয়েছে হয়তো। পরশু অমনি—কতোদূর গিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো—ঘড়ি ভুলে গেছে বলে।

—তা আসবেন বৈকি! কব্জিতে ঘড়ি না বেঁধে বেরোলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! কই বলো দিকিন ছুটে গিয়ে সংসারের একটা জিনিষ কিনে আন? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে লাট সাহেবের!

বিরক্তি-তিক্তস্বরে কথাগুলি উচ্চারণ করে ছোট এক টুকরো পাতিলেবু

গেলাসের জলে গুলতে থাকেন তারানাথ। তিন আনা জোড়া লেবু বড়ো বড়ো দুখানা খাওয়া যায় না।

অনুগামিনী সতী অনুপমা পতি-দেবতার এই ধারালো মন্তব্যটির পিঠো-পিঠি বেশ ঘোরালো কিছু বলবার আগে একবার উঠে গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে নিঃসন্দেহ হয়ে এসে বসেন এবং এখনকার ছেলেরা লেখা-পড়া শিখেও যে কতো মুখ্যু আর বাঁদর হয় তারই উদাহরণ দিতে তৎপর হয়ে উঠেন।···ভাগ্নে-ভাইপো, ভাসুরপো, বোনপো দেখছেন তো সবাইকে! অন্ধ স্নেহের বশে নিজের ছেলের বিষয়ে ছেড়ে কথা কইবেন এমন মুখ্যু মা অনুপমা নন।···তিন তিনটে পাশ করে যে ছেলে নির্বিকার-চিত্তে দু' বছর ধরে শুধু আড্ডা দিয়ে আর সিনেমা দেখে বেড়ায়, তার আবার পদার্থ আছে কিছু? কেন উঠে পড়ে লেগে চেষ্টা করলে কিছু একটা জুটতো না এতোদিন? তবু তো বাপের একটু আসান হতো!

দামী দামী আর ভালো ভালো আরো অনেক কথাই বলেন অনুপমা। ছুটির দিন খেয়ে তাড়াতাড়ি ওঠবার তাড়া নেই তারানাথের।

ধীরে-সুস্থে খেয়ে উঠে পানের ডিবে হাতে বাইরের ঘরে চলে যান, ছুটির দুপুরে দাবার আড্ডা বসে পাড়ার হিমাংশুবাবুর সঙ্গে। আসার সময় হয়ে এলো তাঁর।

অনুপমা ঠাকুর-চাকর সকলের খাওয়ার দেখাশোনা করে সবে খেতে বসেছেন, মেয়ে শীলা নেমে এসে ব্যস্তভাবে বলে—ঠাকুর, উনুনে আগুন আছে তো? থাকে তো একটু চায়ের জল চড়িয়ে দাও চট করে।

চায়ের জল! বেলা দেড়টার সময়!

অনুপমা অবাক হয়ে বলেন—এখন চা খাবি?

শীলা বিরক্তস্বরে বলে—আমি কেন? দাদার ভীষণ মাথা ধরেছে—তাই।

—দাদা? খোকা বাড়ী আছে নাকি?···বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে অনুপমার।

—আছেই তো। বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এসে শুয়ে পড়েছে মাথা ধরেছে বলে। ···কই ঠাকুর দিয়েছো?

শীলার চিত্ত-জগতে একমাত্র সম্মানিত ব্যক্তি দাদা।

গোগ্রাসে ভাত ক'টা গিলে নিয়ে ছুটে ওপরে গিয়ে ছেলের ঘরে ঢুকে একবারে বিছানায় বসে পড়েন অনুপমা। শঙ্কিতস্বরে বলেন—কি হয়েছে রে খোকা? বেরিয়ে আবার ফিরে এসে শুয়েছিস? শরীর খারাপ হয়েছে?

বলা বাহুল্য স্নেহাতুর মাতৃকণ্ঠের এই শঙ্কিত প্রশ্নের কিছু উত্তর তিনি পান না।

অবস্থা-নির্ণয়ের প্রথম পর্যায় হিসাবে গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করতে যেতেই—তৎক্ষণাৎ হাতখানা সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শোয় খোকা।

অনুপমা এ অপমান গায়ে না মেখে পুনঃ প্রশ্ন করেন—কখন এলি তুই?

খোকা নিরুত্তর।

অতএব নিঃসন্দেহ, তার সম্বন্ধে মা-বাপের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলছিলো—সে আলোচনা তার কর্ণগোচর হয়েছে। তা হোক, অনুপমা তো হেরে ফিরে যাবেন না, তাই সক্ষোভ বেদনায় বলেন—আজই হঠাৎ শরীর খারাপ করলি? পশু তোদের বেরোবার কথা না?

—বেরোনো? · খোকা যেভাবে ভুরু কুঁচকে তাকায়, তাতে আর যাই হোক খোকাত্ব প্রকাশ পায় না।—বেরোনো মানে? যাচ্ছি কোথায়?

অনুপমা যেন অবোধ, অনুপমা যেন আত্মবিস্মৃত, অনুপমার যেন এখনো শৈশব-কাল কাটেনি, তাই প্রায় শিশুসুলভ সরলতাতেই বলে—কেন তুই যে বলেছিলি মঙ্গলবারেই স্টার্ট করবে ওরা?

ওরা করবে তার আমার কি? ওদের নিজের পয়সা আছে, ওরা যা খুসি করতে পারে।

হঠাৎ আচমকা প্রায় লীলার মতো ভঙ্গীতেই খিলখিল করে হেসে ওঠেন—অনুপমা। বিশ বছর আগে দুধ খেতে নারাজ ছেলেকে যে সুরে কথা বলে কায়দায় আনতেন, প্রায় তেমনি ছেলে-ভোলানো সুরে বলেন—ওঃ, তাই বলো—বাবুর রাগ হয়েছে! 'কে বকেছে—কে মেরেছে—কে দিয়েছে গাল?' ··তখন বুঝি ও'র বাক্যবাণগুলি কাণে গেছে? (ও'র কথাই শুধু উল্লেখ করেন অনুপমা, স্বচ্ছন্দেই করেন। নিজের অপরাধ-বোধের লেশমাত্র ধরা পড়ে না মুখের চেহারায়) তাই ভাবছি—কি হলো খোকার! নে নে মন খারাপ করিস নি, টাকা তো আমি দেবো বলেছি।

—তুমি আর কোন্ আকাশ থেকে টাকা পেড়ে আনবে শুনি? তারানাথ রায়ের টাকাই তো?···সখ করে বেড়াতে যাবার রুচি আমার আর নেই মা, একটু ঘুমোতে দাও। বেকারের আবার সখ-সাধ!

অনুপমা যেন তুড়ি দিয়ে ওড়ান ছেলের কথা—হ্যাঁঃ বড্ডো তুই বুড়ো হয়েছিস, রোজগারের বয়েস পার হয়ে গেছে একেবারে? তাই 'বেকার' বলে একেবারে

মেগে দে নিজেকে। ওঁর কথায় আবার মানুষ রাগ করে? কথার কোনো মাথা আছে?…ওঁর কথা ধর্তব্য করতে হলে তো ভালো খেতে নেই, ভালো পরতে নেই, আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী যেতে নেই, সাধ-আহ্লাদ সব শিকেয় তুলে রেখে খালি টাকা আনা পাইয়ের হিসেব কষতে হয়।

—উচিত তাই—খোকা শ্লেষের সুরে বলে—অন্ততঃ যতদিন ওঁর অন্ন ধ্বংসাচ্ছি।

—তাই বৈকি—আমি তো আজীবন ওঁর অন্ন ধ্বংসাচ্ছি—করছি যে তাই? ওই সামনা-সামনি দুটো মনরাখা কথা কয়ে যা তা বুঝিয়ে একটু ঠাণ্ডা রাখা বুঝলি? গোঁয়ার্তুমী করে কাজ পণ্ড করে লাভ? তোর ঠাকুদ্দা ছিলেন কী দুর্দান্ত রাগী, কিছুতে যদি একবার 'না' বলেছেন তো 'হ্যাঁ' করায় কার সাধ্যি। আমিই শুধু ভুলিয়ে-ভালিয়ে—খোসামোদ করে—

খোকা এইবার উঠে বসে, উদ্ধতভাবে বলে—কেন করেছো? অন্যায় করেছো। খোসামোদ করবে কিসের জন্যে? বাবাকেও চিরকাল ভয় করে করে আর খোসামোদ করে করে এই অবস্থা! কিন্তু কেন? তোমার নিজের একটা সত্তা নেই? ভালোমন্দ বিচার-বিবেচনা নেই? যুক্তিতর্ক নেই?

সূক্ষ্ম একটী হাস্যরেখা ফুটে ওঠে—অনুপমার বাঁকা ঠোটের কোণে।

যুক্তিতর্ক? অনুপমার ভিতরে যুক্তিতর্ক নেই? এতো অজস্র আছে যে, তার প্রবল স্রোত সমুদ্রস্রোতের মতো ভাসিয়ে দিতে পারে বাপ-ছেলে দু'জনকেই। কিন্তু ভাসিয়ে দিলে—চলে কই অনুপমার?…বিচার বিবেচনা? সেটা যে আছে, তার প্রমাণ দিতে গেলেই তো সংসার করা কবে ঘুচে যেতো অনুপমার।

আর সত্তা?

সে বস্তুটাও তো আমসত্ত্বের মতো জলে গুলে রোদে শুকিয়ে ভাঁড়ারজাত করা হয়েছে। খোসামোদের বিরুদ্ধে তো এতো তড়পানি ছেলের, তাকেই বা এতোক্ষণ কি করলেন তিনি মা হয়ে?

কিন্তু এ সবের কিছুটী উচ্চারণ করেন না অনুপমা, সূক্ষ্ম হাসির রেখাটা সূক্ষ্মতর হয়ে মিলিয়ে যায়। শুধু ম্লান কণ্ঠে বলেন—কেন নেই, সে আর তুই কি বুঝবি খোকা? লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হলেই কি সব বোঝা যায়? আমার মনে আর দুঃখু দিসনে বাবা, তোর সব বন্ধুরা দিব্যি বেড়াতে যাবে, আর তুই পড়ে

থাকবি—এ আমি সইতে পারবো না।···উনি না হয় একটু রাগই করবেন।··· নিজে কখনো কোথাও যেতে পাইনি, জগতের কিছু কখনো দেখিনি, চিরদিন বন্দী হয়ে থেকেছি, তোরা মন খুলে সব করলেও শান্তি আমার।

খোকা অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। মনে হয় যেন মায়ের দুই চোখের তারায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সেই চিরদিনের ক্ষোভ।···বঞ্চিত জীবনের, বন্দী জীবনের, নিরুপায় জীবনের!

অতঃপর কথার মোড় ঘোরে। চা হাতে করে এসে শীলাও যোগ দেয়। খোকার টাকা হলে মাকে কোন্ কোন্ দেশে বেড়াতে নিয়ে যাবে তারই আলোচনা চলে।···খোকার যেটা পছন্দ অনুপমার হয়তো নয়, তাঁর মতে—কতো দুঃখে বেরোনো, তা মুসৌরি কেন? বরং পুরী, ভুবনেশ্বর।···শীলার আদর্শ দাদা, অতএব সে মার পছন্দকে উপহাস করে।···খোকা আবার তখুনি মত পাল্টায়, কেন পুরী, ভুবনেশ্বরই কি যা তা জায়গা? ভারতের স্থাপত্য শিল্পের পৌরাণিক নমুনা।···মার পছন্দকে বরং তারিফই করতে হয়।

অতএব তাই। তৎক্ষণাৎ শীলার 'কটকী শাড়ী' কেনা হয়, 'কেওরে'র কাঁসার বাসন। আবার—পরবর্তী ট্রিপটা সম্বন্ধে গবেষণা চলে।···

দেড়টা বেলা গড়িয়ে সাড়ে চারটায় ঠেকে।

হঠাৎ যেন দরজার কাছে বোমা ফাটে।

—বলি আজ কি আর চা-টা হবে না?

শিহরিত অনুপমা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন—চারটে চল্লিশ!···সর্বনাশ! ঠিক চারটে বেলা হচ্ছে—তারানাথের 'টী টাইম'। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই যে তারানাথের হার্টের ট্রাবল বাড়ে।

আচমকা এই প্রশ্ন-বোমাঘাতে নিজের হার্টের অবস্থা যাই হোক, মুখের চেহারাটা ঠিকই রাখেন অনুপমা। সহজ আফশোসের সুরে বলেন—ওমা! এতো বেলা হয়ে গেছে! দেখো কাণ্ড! শীলা তুইও তো আচ্ছা মেয়ে?···মেধোরই বা কী আক্কেল? বেহুঁস হয়ে ঘুমোচ্ছে হয়তো।

—সত্যি—স্বরমাধুর্যে যতোটা তিক্ততা ঢালা সম্ভব তা ঢেলে—তারানাথ মন্তব্য করেন—মাইনে করা চাকর-বাকরের আক্কেলটাই বেশী হওয়া উচিত বটে!

স্বামীর কথার উত্তরে—জিভের আগায় কোন কথাটা আসছিলো না অনুপমার? 'বিনি মাইনের চাকরাণী'র উচিত-বোধের প্রশ্ন?

কি জানি। আসে না তো, কাজেই বোঝা যায় না। শুধু স্বাভাবিক খেদের সুরই ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে—এই দেখো না, ছেলেটা আবার 'শরীর খারাপ' বলে এসে শুয়েছে, কে জানে জরজ্বারি হবে কি না! যে-দিন-কাল!

পরবর্তী সিন্ দিনে নয় রাত্রে।

এ ঘরে নয়, ও ঘরে।···ঘরের দরজায় খিল লাগানোর পর টাইকো সোডা ট্যাবলেট ছটো আর জলের গ্লাসটা কর্তার হাতে তুলে দিয়ে পানের ডিবেটি নিয়ে বিছানার ওপর গুছিয়ে বসেন অনুপমা।·· 'পান মজাবার' বহুবিধ উপকরণপূর্ণ কৌটোটি খুলে একটিপ্ মুখে ফেলে বলেন—বুকের কষ্টটা বেশী হচ্ছে না তো? তোমার তো আবার সময়ের একটু এদিক-ওদিক হলেই—কি? তাকানো নেই কেন? রাগ হয়েছে বুঝি? না, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলোনা। ছেলে মানুষের মতো রাগ অভিমানটা ঠিক আছে এখনো।· ছেলেটাও হয়েছেন তেমনি! বাপের আর কোনো গুণ না পান, রাগ গুণটা পেয়েছেন ষোলো আনা। তখন তোমায় বললাম—খোকার শরীর খারাপ হয়েছে?·· শরীর নয় মোটেই, মেজাজ।···ওই যে, বন্ধুদের সব গোছগাছ হয়ে যাচ্ছে তাই মেজাজ খাপ্পা। রেগেটেগে হুকুম দিয়ে দিয়েছি আমি যেতে।—শেষটায় মনগুঁজরে থেকে সত্যি রোগ করবে? সুধীর শ্যামল সবাই যাচ্ছে যখন, যাকগে একবার। দিল্লী গিয়ে কি চারখানা হাত বেরোয় দেখি।···হ্যাঁ একটা চাকরী জোগাড় করে আসতে পারে—তবে বলি বুদ্ধি। শ্যামলের মামা না যেন খুব বড়ো চাকরে ওখানকার! আচ্ছা হ্যাঁ গো—তোমাদের সুবোধবাবুও না দিল্লীতে বদলী হয়েছেন আজকাল?

—হয়েছে তার কি—তারানাথ বিদ্রূপ-হাস্যে বলেন—তোমার ছেলে গিয়ে দাঁড়ালেই একটা চেয়ার এগিয়ে দেবে?

—যাও—হেসে ফেলেন অনুপমা। হাসিটা—দশ-বিশ বছর আগের টাইপের। হেসে বালিশের ওপর এলিয়ে পড়ে বলেন—তোমার সবতাতেই ঠাট্টা! সরোদিকিন, একটু শুই ভালো করে।···ওই যাঃ মশারিটা টাঙাবো ভাবলাম যে—রোঁসো—টাঙিয়ে দিই।···

—আর থাক—অনুপমার সদ্য বালিশে ফেলা মাথাটার ওপর হাতের একটু চাপ দিয়ে তারানাথ বলে ওঠেন—হয়েছে, খুব হয়েছে, উঠতে হবে না। আজ হঠাৎ এতো কর্তব্যজ্ঞানের উদয় কেন?

—না না, তোমার শরীরটা আজ ভালো নেই—বলে ব্যস্তভাবে উঠে বসেন অনুপমা। ততক্ষণে অবশ্য তারানাথ উঠে দাঁড়িয়েছেন। গোঁফের ফাঁকে মুচকে একটু হেসে বলেন—আচ্ছা খুব পতিভক্তি হয়েছে! এই—সাতাশ বছরের মধ্যে ক'দিন মশারী টাঙিয়েছ?

অম্বলের রোগী তারানাথের সহজে ঘুম আসে না, সুদীর্ঘ দিনের কর্মক্লান্ত আর অভিনয়শ্রান্ত অনুপমা ঘুমিয়ে পড়েন মুহূর্তেই···হয়তো—অভিনয়টা নিখুঁৎ উৎরেছে বলেই এতো স্বস্তি।···

অভিনয়?

তা ছাড়া আর কি? সুন্দর নিখুঁত অভিনয়। এতো নিখুঁত যে অভিনয় বলে বোঝা অসম্ভব। বোঝা অসম্ভব কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা কৃত্রিম।

কিন্তু একা অনুপমাই বা কেন? নারী মাত্রেই কি অভিনেত্রী নয়? অভিনয়-ক্ষমতাই তো তার জীবনের মূলধন। জন্মগত সেই মূলধনটুকু সম্বল করেই তো তার যতো কিছু কাজকারবার!

সে মূলধন যার যতো বেশী, তার-ই তো সংসারে ততো বেশী প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, সুনাম, সুখ্যাতি।

নদীর মতো আপন বেগে প্রবাহিত হতে চাইলে চলবে কেন তার?···একদিক ভরাট করে তুলতে—অপরদিকে ভাঙন ধরাবার মতো বোকামী তার নেই। দুই কূল সযত্নে রক্ষা করে চলতে হয় তাকে। ·রক্ষা করতে হয় সংসার, রক্ষা করতে হয় দাঁড়াবার ঠাঁই।

অনাদরকে তার বড়ো ভয়, বড়ো ভয় অবহেলাকে!

নাকি এ-তথ্যের সবটাই ভুল?

কোনোটাই তার অভিনয় নয়? চিরন্তনী নারীপ্রকৃতির মধ্যে পাশাপাশি বাস করছে সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি সত্তা, জননী আর প্রিয়া। নিজের ক্ষেত্রে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

মমতাময়ী নারী তার এই বিভিন্ন দু'টি সত্তার বিশাল পক্ষপুটের আড়ালে সযত্নে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে চিরশিশু অবোধ পুরুষ জাতিকে।

ছলনাটা তার ছলনা নয়, করুণা।·· এই করুণার আওতা ছাড়িয়ে ছলনা-লেশহীন উন্মুক্ত পৃথিবীতে বে-পরোয়া শিশু ভোলানাথের দলকে যদি মুখোমুখি দাঁড়াতে হতো—ক'দিন লাগতো পৃথিবীটা ধ্বংস হতে?

—শারদীয় যুগান্তর

কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ীর রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শী সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বউ বছর খানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজুখাতুন ত্রিশে না পৌঁছলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালির শেখেদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজুখাতুনের আছেই বা কি? বাক্স সিন্দুক ভরে যেন কত সোনাদানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত খামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে মাজুখাতুন। ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর আছে একখানি পড়ো পড়ো শণের কুঁড়ে। এই তো বিষয়-সম্পত্তি, তারপর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানাকাটা হুরির মত চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আঁট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজু-খাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।

সিকদার-বাড়ির, কাজী-বাড়ির বউঝিরা হাসাহাসি করল, 'তুক করছে মাগী, ধুলা-পড়া দিছে চোখে।'

মুন্সীদের ছোটবউ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো করছে। দেবে না? অমন মানুষের চোখে ধুলাপড়া দেওয়নেরই কাম। খোদা তো পাতা দেয় নাই চোখে। দেখছো তো কেমন ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া চায়। ধুলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা তেরছা মোতালেফের। বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ ক'রে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সী খাপসুরৎ চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠার উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ

করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে পরতে কষ্ট দেয়, মার ধোর করে এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশী আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জন্যই ইচ্ছা ক'রে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয় যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দায় নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। এক নজরেই বুঝেছিল যে, সেও নজরে পড়েছে। চেহারাখানা তো বেমানান নয় মোতালেফের। নীল লুঙ্গি পরলে ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় চমৎকার খোলতাই হয় তার, তাছাড়া এমন ঢেউ-খেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে ক'জনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম সেখের বাড়ীতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে গত বার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার আর না দেখে শুনে যার তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি বা খরচ করতে হয়েছে মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদে আসলে তা পুরিয়ে নিতে চায়। গুনাগার চায় সেই লোকসানের। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুণাগার দু'এক কুড়ি নয়, পাঁচকুড়ি একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজী হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোত্থেকে।

মুখ ভার ক'রে চলে আসছিল মোতালেফ। আশ্‌শেওড়া আর চোখউদানের আগাছার জঙলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হল ফুলবানুর সঙ্গে। কলসী কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিক ক'রে একটু হাসল ফুলবানু, 'কি মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি ?'

'চলব না ? শোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বা-জানের !'

ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাইছে তো দোষ হইছে কি ? পছন্দসই জিনিষ নেবা, বা-জানের গুনা, তার দাম দেবা না ?'

মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বা-জানের নয়, বা-জানের মাইয়ার। হাটে বাজারে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'

মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান্, পালায় উইঠা বসব। মুঠ ভইরা ভইরা সোনা জহরৎ ওজন কইরা দেবা পালায়। বোঝব কেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হন হন ক'রে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব'?

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষেরে। মাইনয়ের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝছ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মত জমি ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ, বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বে-সবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে মোতালেফ। গেল মল্লিকবাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি, সিকদারবাড়ি, মুন্সীবাড়ী—কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ করে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশি হোল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনৎ কম নয়, এক একটি ক'রে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে

বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে তুলে জুৎসই ক'রে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই ক'রে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপ টুপ করে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক খেজমৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এতো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হোল।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইযে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়াশুদ্ধ কেটে নিলেই হোল। এর নাম খেজুরগাছ কাটা। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রক্ষা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজে হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এ-সব তত্ত্বকথা আর বিধি-নিষেধও তার মুখের। রাজেকের মত অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে-কাছে ছিল না। যে গাছের প্রায় বারো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজেকের হাতের ছোঁওয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়তো আধ-হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠতো। তার হাতে খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থরা। গাছের কোন ক্ষতি হোত না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। সাকরেদ দু'চারজন আরো ছিল রাজেকের—সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মত হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মত।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মত মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে,—কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড় করে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালিগুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পয়সায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমৎ মেহনৎ। কিন্তু বছর দুই ধরে বাড়ীতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু'বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজুখাতুনের ঝাঁপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজুবিবি?'

ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা?' 'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাপটা একবার খুইলা দিতা, কয়ডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজুখাতুন উঠে ঝাপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কি কবা তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজুখাতুনরে। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মেঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই এ বছর।'

মোতালেফ মিষ্টি করে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজুখাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে?'

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজুখাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ তামাসা থুইয়া দাও মেঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'

মোতালেফ বলল, 'শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্তেই। কিন্তু

শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজুবিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটান যায় ?'

ইসারা ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট ক'রে খুলে বলল মনের কথা। কোনরকম অন্যায় সুবিধা সুযোগ নিতে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা ক'রে নিয়ে যেতে চায় মাজুখাতুনকে। ঘর গেরস্থালির ষোল আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজুখাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ তামাসার আর মানুষ পাইলা না তুমি! ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে।'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজুবিবি। কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওন যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজুখাতুন, বলল 'সাঁচাই নাকি! আর আমি ?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা ?'

তখনকার মত মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলি মাজুখাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পরিচয় অল্পদিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়ীতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দুজনের। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হাল্‌কা ঠাট্টা তামাসা চলত, কিন্তু তার বেশী এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজুখাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাটখোট্টা ধরণেরই ছিল রাজেকের। ভারি কড়া-কড়া চাঁছা-ছোলা ছিল তার কথাবার্তা। শীতের সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মাজুখাতুনের উঠানে আর মাজুখাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালি-গুড়। হাতের গুণ ছিল মাজুখাতুনের। তার তৈরী গুড়ের সের দু'পয়সা বেশি দরে বিক্রী হত বাজারে। রাজেক মরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশির ভাগ খেজুর

গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু'এক হাঁড়ি রস কোন বার ভদ্রতা ক'রে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকার মত হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। গতবার মাস খানেক তাকে রস জাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দু'আনা ক'রে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের মাজুখাতুন গুড় চুরি ক'রে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রী করাচ্ছে সেই গুড়, ষোল আনা জিনিষ পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজুখাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধ-বুড়োদের দলের আরো করেছে দু'একজন কিন্তু মাজুখাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের ইয়ার্কি দিতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজুখাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ান যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খাপসুরৎ মুখও কারোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরও আসতে হোল দু'এক সন্ধ্যা, তারপর নীল রঙের জোলাকী শাড়ি প'রে, রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজুখাতুন।

ঘরদোরের কোন শ্রীছাঁদ নেই, ভারি অপরিষ্কার আর অগোছালো হয়ে রয়েছে সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাজুখাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠানের, লেপেপুঁছে ঝক্‌ঝকে তকৃতকে করে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরনীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের, সে আছে গাছেগাছে। পাড়ায় আরো অনেকের—বোসেদের, বাড়ুয্যেদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ ক'রে দিচ্ছে রস। পাকাটির একখানা চালা উঠানের পশ্চিমদিকে মাজুবানুকে তুলে দিয়েছে মোতালেফ। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় মাটির জালা বসিয়ে সেই চালাঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জাল দেয় মাজুবানু।

জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয়। মাজুবানু এর ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেক দিন পরে মনের মত কাজ পেয়েছে মাজুবানু, মনের মত মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি করে আসে চড়া দামে! বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লা বাঁশের একেকটি করে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারা দিনের ময়লা রস চোঙাগুলির মধ্যে জমে থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ' আনা সের। দু'বেলা দু'বার ক'রে এতগুলি গাছে উঠতে নামতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকাল বেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে। পায়ের নিচে দুর্বার মধ্যে চিক চিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়া-পড়শীরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ। কিন্তু এত বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিনরাত এমন কলের মত পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায় নি কোনদিন। ব্যাপারটা কি? গাছ কাটা অবশ্য মনের মত কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু' হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালি গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হোল চরকান্দায় এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলে রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা করকরে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোণায়, কিনারে

চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায় নি কোথাও, কোন জায়গায় ছাপ লাগে নি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব মেঞা? তুমি তো শোনলাম নিকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান্ আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে 'দিন রাইত।'

মোতালেফ মুচকে হাসল। বলল, 'তার জৈন্যে ভাবেন ক্যান্ মেঞাসাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিযে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ ক'রে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিষ আছে মেঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকি ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে।'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কি!'

মানের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজ্‌তে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কি ক'রে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জাল দিয়ে গুড় তৈরী করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি ক'রে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি ক'রে।

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা কিন্তু গায়ে যে আর একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়াবা কেমনে।'

মনে এলেও মুখ ফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে, মানুষ চ'লে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আর একজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তা'হলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতরগুনা ঘইসা ঘইসা বদ্ গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি?' মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না ত কি মিছা? গুইজা দেইখো তখন নতুন মাইন্ষের নতুন গন্ধে ভুর ভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুর ভুর করবে, কেবল সবুর কইরা থাক আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু'মাসের বেশি সবুর করতে হোল না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভারি আপত্তিকর।

মাজুখাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ, ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যেই ফুরাইল অমনি দূর্ দূর্!'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের; ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। পাড়াপড়শী বলল, 'এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধরে ফুলবানুর, 'থুইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন, ঘর-গেরস্থালি। কাছে বস আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর সবুর! এ কয়মাস কাটাইলা কি কইরা মেঞা?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া।'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু 'গাছি'র কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।'

মাজুখাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো পড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। পাড়াপড়শীরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফুলবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের সুরে বলে, 'নাঃ, বউ বউ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সী ছুঁড়ী-টুড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না কিছু। তাই মাজুখাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার ?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, এক-পঞ্চাশ।'

মাজুখাতুন খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ ওই রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তারপর মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে ? খাজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে ?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান্! ওসব কাম কোন কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান্ বউ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে ?'

মাজুখাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহ'লে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে ? সে বেশি দেরি করতে চায় না।,

মাজু খাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কি।'

দেরি বেশি হোলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজু খাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মত ফাঁৎ ফাঁৎ নিঃশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্ডি করত দিন রাইত, তার হাত থিকা তো বাচলাম, কি কও ফুলজান ?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা ?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'

'ক্যান্, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার ?'

'ডর নাই ? পাখা মেইলা কখন্ উরাল দেয় তার ঠিক কি !'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উরাল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই ঘর পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইন্ষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'চোখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারি আদরে তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালোবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার ক'রে কেনে সেই মাছ। ডিমটা, আনাজটা, তরকারিটা যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মসলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান্, তুমি তো বেশি ভক্ত না পানের। দিন রাইত খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্তে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে,

পান খাইয়া রাঙাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙা হয় না, আর-একজনের পানখাওয়া-ঠোঁটের রস লাগে।'

নিজের ভুঁই ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভালো কৃষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মত নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, কাটে, জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারি ·খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিবেচারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে! কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা।'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ-দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়; সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়ি-গুলি পাওয়া যাবে তাহ'লে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে। অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউস ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ— এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারি কাতর মোতালেফ। একেক দিন পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে।

ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পার না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে ?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়ীতে।'

যেখানে যেখানে জোঁকে মুখ দিয়েছিল সে সব জায়গায় সযত্নে চুণ লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কৃষাণের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের একভাগ। ধামায় ক'রে পৈঁকায় ক'রে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় ক'রে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেক-বার বলে 'ভারি কষ্ট হয় বউ, না ?'

ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না! কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্থ ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি!'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ে। এ কাজে নাম—ডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই সেরা। এবারেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ বেড়ে গেল।

গাছ কাটবার ধুম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধার দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মত দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমে ভেঙ্গে আসে চোখ। দু'হাতে ঠেলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবানু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোন অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে ?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো ডালপাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ। ফুলবানুকে

বলে, 'রস জ্বাল দেও,—যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিব হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবানুর, বুক কাঁপে। দু'এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়ীতে, কিন্তু এত রস এক সঙ্গে সে কোনদিন দেখেনি, কোনকালে জ্বাল দেয়নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কি, আমি তো আছিই কাছে কাছে—আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জ্বালার মধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন ক'রে টগবগ করে না জ্বালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখ-মুখ শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমত। কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইয়া কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝ না। এই গুড় হইছে, এই নি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে 'কেনবে না ক্যান্। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুসি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা। খাপসুরৎ মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু'চারদিনের মধ্যেই কোনরকমে চলনসই গুড় তৈরী করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না। কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মত, খদ্দেররা তেমন খুসি হয় না দেখে।

পুরোন খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মেঞা? গত হাটে নিয়া দেখলাম গেল বছরের মত সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জেহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবার তো

তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন শিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মত এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুশি হচ্ছে না, খেয়ে হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে ?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বার কয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা কইরা ফোঁটা দেইখো নামাবার সময় হইল কিনা ঢালবার সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে 'হ হ, চিনছি। আর বক বক কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইন্‌ষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজুখাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজুখাতুন এমন করে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায় ক'রে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাকাটির চালার দোরের কাছে ; 'কি রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান ?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোন জবাব এল না ফুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কি রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড় ? সারে সারে গোটা পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণ-কোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কি ক'রে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে

ভিতর থেকে। বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া করে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চীৎকার বেরুল,—'কই, কোথায় গেলি হারামজাদী ?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশী হয়ে যাওয়ায় দু'দিন ধ'রে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড় চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। এক মুহূর্ত জলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুঠি ক'রে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী। এই জৈন্যই গুড় খারাপ হয় আমার অপবাদ হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে !'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তোমার ?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিট-কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো আর মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারি বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম করল না।

ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বা'জান তোমার সাথে—এমন গোঁয়ার মাইন্ষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদল-বদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের।

দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলও। খানিক বাদেই আবার যেচে আপোষ করল মোতালেফ। সেধে-ভজে মান ভাঙাল ফুলবানুর। পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোন রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।'

ফুলবানু বলল 'কষ্ট আবার কি।'

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরণ আলাদা, ধ্বনি আলাদা; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। সে কথা ওরা বলেও জানে, শুনেও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ী এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ ক'রে ব'সে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মত যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাদির শেখের সঙ্গে।

'সেলাম মেঞাসাব।'

'আলেকম আসলাম্।'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো, সব ছাওয়ালপান ভালো তো—?'

মাজুখাতুনের কথাটা মুখে এনেও আনতে পারলে না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোন রকম সকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'ছাওয়ালপানের জৈন্তে সের দুই তিন গুড় লইয়া যান না মেঞা। ভালো গুড়।'

নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনকালে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস ক'রে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমন-তরো ব্যাপারী! গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জৈন্তে কি? দুই সের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানরে খাইতে। কয়ন জানি, চাচায় দিছে।'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যায়ন আইজ। খাইয়া ছাখেন। দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটাবার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুণপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলি কত মিথ্যা, পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারতপক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা-কওয়ায় একসের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজী হয় নাদির, আর বাকি দু' সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর ক'রে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজুখাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, আমি ও গুড় ছোব না হাত দিয়া। তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজুখাতুন নিষেধ ক'রে দিয়েছে নাদিরকে, 'খবরদার, ওই মাইনষের সাথে যদি ফের খাতির নাতির কর, আমি চইলা যাব ঘরগুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজুখাতুনকে ভারি ভয় করে নাদির। কাজে-কর্মে সরেশ, কথায়-বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দু'টি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু' হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়া নৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপ্‌টানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে; 'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা ?'

হুকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে; 'কেডা ? ও, আপনে ? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান্ মেঞাসাব ?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির কিন্তু মনে মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজুখাতুনের জন্য। যে মানুষের নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজুখাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই নাইমা যাইতে কও। একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে ? কোন মুখে ওঠল আইসা এখানে ?'

নাদির ফিস ফিস ক'রে বলে, 'আস্তে, আস্তে,—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শোনতে পাবে। মাইন্‌ষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইন্‌ষে।'

মাজুখাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ কর, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে, একটুও ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি নাজসরম নাই ?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজুখাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে; মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহতা বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়ি দু'টি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাব, শোনবেন নি একটু ?'

নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসেন মেঞা, বসেন। ধরেন, তামাক খান।'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই ক'ন না, দোষ কি তাতে।'

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নাই। 'ক'ন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জৈন্যে আনে নাই রস, সেইটুক্ বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজু খাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জৈন্যে আনছে ?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া দুই সের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মেঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর এক ছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার।'

গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর দুটি চোখ ছল ছল করে উঠেছে। চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হল না।

হঠাৎ যেন হুঁস হোল নাদির শেখের ডাকে, 'ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না ? আগুন যে নিবা গেল কইলকার।'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞা ভাই, নেবে নাই।'

'চড়াই উৎরাই'

নাম হৃদয় ঘোষাল। হৃদয়ের বালাই নেই। সাজানো হাড়ের ওপর চামড়ার আস্তরণ। তোবড়ানো গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঠেলে ওঠা চোয়ালের পাশে কুতকুতে চোখ। দাঁতের বাহার আরো সরেস। চেহারা দেখলেই মেজাজ খারাপ। তার ওপর কথা বললে সারা শরীর রি রি করে ওঠে। দেহে যেমন রস নেই, মনেও তাই। কথার না আছে ছিরি, না আছে ছাঁদ। ইস্কাবনকে ইস্কাবনই বলবে, তা বলুক, কিন্তু অমন চাঁছা ছোলা ভাষায় না বলে একটু মিঠে গলায় তো বললেই পারে। বাড়তি খরচ যখন হ'চ্ছে না, তখন বাড়তি একটু দরদ ঢালতে আর অসুবিধাটা কোথায়। কিন্তু সে কথা বলতে যাওয়াও বিপদ। আটাশ ইঞ্চি বুক চিতিয়ে ছ ফিট মানুষটা লম্বায় ছ ফিট পাঁচ ইঞ্চি হয়ে দাঁড়াবে। মুখের সামনে হাড়জিরজির হাত দুটো হেলে সাপের মতন কিলবিলিয়ে উঠবে, 'কি করবো বলো, অতো মধু আমার আসে না। সাদা মাটা লোক সিধে কথাই ভালবাসি। চিনির পেরলেপ দেওয়া বড়ি এখানে পাবে না।'

এমন মানুষকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কি বলতে কি বলবে, লঘুগুরু যখন জ্ঞান নেই, তখন যার সম্মান তার আছে। এড়িয়েই অবশ্য যায়। একজন দু জন নয়, অফিসসুদ্ধ।

একেবারে দেয়াল ঘেঁষে চেয়ার। পার্টিশনের কাছ বরাবর। নাথুমল কোম্পানীর কেরানী। আজ বিশ বছরের ওপর। ঠিক দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে হাতল ভাঙা চেয়ারের ওপর চাদরটি পাট করে রেখে কাজে বসে, ওঠে পাঁচটায়। একটু এদিক ওদিক হয়নি। এক আধদিন নয়। টানা বিশটি বছর। ফাইল গোছানোর কাজে চাকরির শুরু, পা ফেলে ফেলে উঠেছে শিপিং ডিপার্টমেন্টের মেজো কেরানীর পদে। চেহারাটা খাপসুরত নয়, তার ওপর ওই হাড় জ্বালানো বুকনী, তা নাহলে হৃদয় ঘোষাল এতদিনে পার্টিশনের ওপারেই জায়গা পেয়ে যেতো। বড়োবাবুদের স্বগোত্র। লুডো খেলার পাকা ঘুঁটি।

তার জন্য অবশ্য একটু আফসোস নেই। সখেদ নিঃশ্বাসও নয়। মনে করিয়ে দিলে আরো জ্বলে উঠেছে, 'কি করবো বলো। কেষ্ট বোসের মতন দত্ত সায়েবের বাজার করা তো আমার দ্বারা হবে না। মথুর মাইতির মতন গাঁটের পয়সা খরচ করে শেয়ালদার বাজার থেকে রুই মাছ কিনে, আমার মামার পুকুরের গুর, বলে

সাষ্টাঙ্গে উপুড় হওয়াও ধাতে সইবে না। ওসব যারা পারে পারুক, জন্ম জন্ম উন্নতি হোক তাদের। হৃদয় শর্মাকে দিয়ে ওসব হবে না।' কথা শেষ ক'রেই মুঠোভরা নস্যি নাকের গোড়ায় ছুঁইয়ে হৃদয় ঘোষাল টান হ'য়ে বসেছে।

কিন্তু বিপদ যারা বলতে যায় তাদের। পার্টিশনের প্রস্থ আড়াই ইঞ্চির বেশী নয়। এ পাশের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ, ওপাশে আসে, ওপারের ফিসফিসিয়ে কথা বলা, একটু কান খাড়া ক'রে রাখলে বেশ শোনা যায় এপারে। হৃদয় ঘোষালের দরাজ গলায় এমন সর্বনেশে কথাগুলো ওদিকের মানুষের কানে কেন মরম অবধি পৌঁছে যাবার কথা। তারপরের ব্যাপার ভাবতেও গা হিম হিম, তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। কেষ্ট বোস আর মথুর মাইতি দুজনেই চাকরি খাবার যম। শুধু একটু ছুতোর অপেক্ষা।

মুখে না মানলেও মনে মনে সবাই ভয় করে লোকটাকে। ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যা কথা বলবে না কোনদিন, লাগসই মিষ্ট কথা তো নয়ই। একেবারে খাঁটি কথার মানুষ।

অবশ্য এর বিপদও আছে।

এক্সপোর্ট ডিপার্টমেণ্টের ছোকরা কেরানী কুমুদ মজুমদার। কাঁচা বয়স, তার ওপর বিয়ে হ'য়েছে এখনও বছর পুরোয় নি। সর্বদাই একটু উড়ো উড়ো ভাব। খুশীর চেকনাই চোখ মুখের ভাঁজে। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে ড্রয়ার থেকে আয়না বের করে হাত দিয়েই চুলগুলো পাট করে নেয়। গুনগুনিয়ে গানের দু এক কলি, কিংবা পাশে বসা যতীনদার সঙ্গে চুটকি রসিকতা। মাঝখানে গোটা দুয়েক টেবিল। ফাইলের ফাঁক দিয়ে ব্যাপারটা হৃদয় ঘোষালের নজর এড়ায় না। অন্য ডিপার্টমেণ্টের লোক। করুক যা খুশী। ঘোষাল মাথা গলায় নি এতদিন। কিন্তু ব্যাপারটা সেদিন অন্য রকম দাঁড়ালো।

মথুর মাইতির সামনে কাজ বুঝে নিচ্ছিলো হৃদয় ঘোষাল। টমসন কোম্পানীর গোলমেলে ফাইল। অন্য একটা ব্যাপারে কুমুদের ডাক পড়লো। সিল্কের শার্টের হাতা কনুই অবধি তুলে কাটা দরজা দিয়ে কুমুদ ঢুকলো। ব্যস্তবাগীশ ভাব। খুব দরকারী কাজ একটা করতে করতে উঠে এসেছে এমনি ধরণ।

'আমায় ডাকছেন স্যর ?'

মাইতি চশমাটা হাত দিয়ে কপালের ওপর তুলে দিলেন। ভুরু ওঠাতেই বলিরেখার আঁচড়। মুখ শিঁটকে বল্লেন, 'আশ্চর্য, আজ মাসের সতেরোই, অথচ স্টেটমেণ্ট পাঠানো চুলোয় থাক, এখনও শুরুই করেননি আপনি ?'

কুমুদ সঙ্গে সঙ্গে ঢোঁক গিললো, 'একেবারে মরবার সময় পাচ্ছি না স্যর। পনেরো দিন ধরে সলোমন সন্সের হিসেবটা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।'

'সলোমন সন্সের হিসেব ?' মাইতি ঘোরানো চেয়ারে কাত হলেন 'সে হিসেব তো কবে হয়ে গিয়েছে। তার চেকও পেয়ে গিয়েছি আমরা ?'

কুমুদ আবার ঢোঁক গিললো। আচমকা কুইনিন ঠোঁটে ঠেকেছে, মুখ চোখের এমনি ভাব।

'সলোমন সন্স নয় স্যর, কাজের চাপে মাথার ঠিক নেই, হ্যারিসন কোম্পানীর।'

এবারে মাইতি কপালের চশমা টেবিলে আছড়ে ফেললেন। আর কাত নয়, চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন, 'হ্যারিসন কোম্পানী ? তারা আবার কারা ? নেশা-ভাং করে এসেছেন নাকি ?'

কুমুদ মজুমদারের কপালে ঘামের ফোঁটা। কোঁচার খুঁট দিয়ে মোছার চেষ্টা করতে গিয়েই থেমে গেলো। মাইতি চেয়ার ঘুরিয়েছেন হৃদয় ঘোষালের দিকে, 'একেবারে অপদার্থ লোক। সারা দিন এঁরা কি করেন বলতে পারো ?'

হৃদয় ঘোষাল ফাইলটা বগলদাবা করলো। আড় চোখে আপাদমস্তক দেখলো কুমুদ মজুমদারকে, তারপর বললো, 'চুল ঠিক করতে আর গলা সাধতেই দিন যায়, অফিসের কাজ কখন হবে বলুন ?'

কেউটের ছোবলেও বোধ হয় কুমুদ মজুমদার এত বিচলিত হতো না।

চোখের তারা কপালের কাছ বরাবর। চার বছরের চাকরিটা এবার খতম। মথুর মাইতির সামনে এমন কথা। একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ !

বরাত কুমুদের। মাইতির মেজাজ বোধ হয় একটু নরম ছিলো। কুমুদের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'যা বলেছো। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, ফ্যাসানের হিজ ম্যাজেষ্টি দি কিং। এই আপনাকে সাফ কথা বলে দিলাম, সাতদিনের মধ্যে আমার স্টেটমেণ্ট তৈরী চাই। না পারেন, অন্য কোথাও বরাত ঠুকবেন, এখানে আপনার অন্ন উঠলো।' মাইতি পাইপে কড়া তামাক ভরতে শুরু করলেন।

চেম্বারের দরজা পর্যন্ত কুমুদ দুর্গানাম জপতে জপতে এলো, তারপর চৌকাঠ পার হয়েই হৃদয় ঘোষালের বাপান্ত, অবশ্য ফিস-ফিস করে। চোদ্দ পুরুষের পিণ্ড দেওয়ার বন্দোবস্ত, সাত পুরুষের নরকস্থ হবার প্রার্থনা।

হৃদয় ঘোষালের ভ্রূক্ষেপ নেই। অতই যদি চাকরির মায়া তো সাবধানে

কাজকর্ম করলেই হয়। ফষ্টি-নষ্টি একটু কমিয়ে ফাইলে মন দেওয়াই তো ভালো।

শুধু কি এই। নবজীবনবাবু একটু দেরীতে আসেন। একে বয়স হয়েছে, তার ওপর ভীড়ের ঠেলায় সুবিধা করে উঠতে পারেন না। ফলে দশটা দশ চুলোয় যাক, মাঝে মাঝে গজেন্দ্রগমনে যখন অফিসে ঢোকেন, তখন ঘড়িতে পৌনে এগারোটার কাছাকাছি। রামকমলবাবুর আমলে কোন গোলমাল ছিলো না। তিনিই অফিসে আসতেন এগারোটা নাগাদ। তার ওপর এসব দিকে তার নজরও ছিল না। পান চিবিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে চেয়ারে এসে বসতেন। আধ বোজা চোখে অপার করুণা। হাজিরার বালাই নেই। ছুটির আগে সবাই এসে পৌঁছোলেই তিনি খুশী।

কিন্তু মুশকিল রামকমলবাবু রিটায়ার করার পর। ছোকরা কেষ্ট বোস বসলো সেই চেয়ারে। বয়স কম হ'লে হবে কি, দুঁদে লোক। সাত ঘাটের জল খাওয়া। এক এক ধমকে টেবিল চেয়ার পর্যন্ত থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। কেরানী কোন্ ছার। দশটা দশ নয়, দশটা। শুধু আসা নয়, কাজ শুরু করতে হবে। একটু এদিক ওদিক হ'লে নামের পাশে লাল ঢ্যাঁরা। মাথা ঠুকে মরে গেলেও সে লাল দাগ একটু ফিকে হবে না। পর পর তিনটে লাল ঢ্যাঁরা এক মাসে পড়লে একদিনের রোজগার কমলো, তার ওপর ফাউ হিসেবে চোস্ত গালাগাল। ইংরেজি, বাঙলা মাঝে মাঝে উর্দুর মিশেল।

পর পর দুদিন নবজীবনবাবু দেরীতে পৌঁছোলেন। সাড়ে দশটা নাগাদ। দিন সাতেক সামলে নিলেন আবার যে কে সেই। আসলেন দশটা চল্লিশে কিন্তু বরাত, কোঁচা ছাতি সামলাতে সামলাতে একেবারে খোদ কেষ্ট বোসের সামনে। বোস সায়েব প্যান্টের দু পকেটে হাত ডুবিয়ে ঘাঁটি আগলে দাঁড়ালেন। নবজীবনবাবুর একটা হাত ততক্ষণে কোঁচা ছেড়ে পৈতেয়। দ্রুত স্পীডে গায়ত্রী জপ। সূর্যস্তবের কিছুটা। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়।

'এটা অফিস, না আড্ডা দেওয়ার জায়গা?' বোস সাহেব চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন।

নবজীবনবাবু উত্তর দিলেন না। সূর্যস্তব ছেড়ে ততক্ষণে আবার গায়ত্রী ধরেছেন।

'কি চুপ ক'রে রয়েছেন যে? উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেন না।' বোস সায়েব দু পা এগিয়ে আসলেন, একেবারে নবজীবনবাবুর মুখোমুখি।

অন্ধকারে আলোর আঁচড়। পাশ কাটিয়ে হৃদয় ঘোষাল ঢুকলো। হাতে ফাইলের গোছা। দ্রুতগতি। নবজীবনবাবুর মনে হ'লো হৃদয় ঘোষাল নয়, গায়ত্রী শুনে তেত্রিশ কোটির একজন নেমে এসেছেন। তাঁর বিপদের মেঘ কাটিয়ে দিতে।

চট করে নিজেকে সামলে নিলেন। পৈতে ছেড়ে দু হাতে ছাতার বাঁট চেপে ধরলেন, 'কি করবো বলুন স্যর। ট্রামের তার ছিঁড়ে ধর্মতলায় সব গাড়ী আটকে রয়েছে। এতটা পথ হেঁটে আসতেই দেরী হ'য়ে গেলো। দেখুন না। হৃদয়বাবুরও এক অবস্থা!' কথার সঙ্গে সঙ্গে কেষ্ট বোসের চোখ বাঁচিয়ে নবজীবনবাবু নিজের বাঁ চোখ টিপলেন। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এক পথের পথিক যখন, ছোট খাটো ধাপ্পায় সায় দিয়ে যেও ভাই। এ যাত্রা বাঁচাও।

কিন্তু ঠিকে ভুল। হৃদয় ঘোষাল অফিসে পৌঁছেচে দশটা বাজতে পাঁচে। তারপর অফিসেরই কাজে ফাইল বগলে বেরিয়েছিলো। এই ফিরছে। একথা কেষ্ট বোসের অজানা নয়। 'কি ঘোষাল' বোস সায়েব হৃদয় ঘোষালকেই সাক্ষী মানলেন, 'তুমি তো ওরিয়েণ্টাল কোম্পানী থেকে আসছো, ধর্মতলায় তার-টার ছেঁড়া কিছু দেখলে?'

হৃদয় ঘোষাল প্রথমে চোখ ফেরালো বোস সায়েবের দিকে। কেষ্ট বোসের দু চোখে আগুনের হল্কা। তারপর নবজীবনবাবুর দিকে চেয়েই বিব্রত হ'য়ে পড়লো। ক্রমান্বয়ে দুটো চোখ বিদ্যুৎগতিতে নবজীবনবাবু টিপে চলেছেন। ভয়াবহ বিপদের সঙ্কেত।

হৃদয় ঘোষালের মুখের ভাব নির্বিকার। কেবল ফাইল হাতবদল করলো। একটু থেমে বললো, 'কই সে রকম কিছু তো দেখলাম না।'

'আশ্চর্য' বোসসায়েব নবজীবনবাবুর ওপর প্রায় ফেটে পড়লেন, 'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবু মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস ছাড়তে পারলেন না। ছি ছি।'

কিন্তু শুধু ছি, ছি-তেই শেষ হলো না। একদিনের মাইনে খেসারৎ। অপমানের শেষ নেই। কাঁপতে কাঁপতে নবজীবনবাবু চেয়ারে গিয়ে বসলেন। কাঁপুনি কমতে দু' হাতে পৈতে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড। দু'দিনের মধ্যে সর্বনাশ হবে হৃদয় ঘোষালের। চন্দ্র সূর্য যদি ওঠে, ধর্ম বলে কিছু যদি থাকে দুনিয়ায়, ত্রিসন্ধ্যে জপ বৃথা যাবে না। ঝাড়ে বংশে নির্বংশ। বাতি দেবার মানুষ লোপাট। অফিস

শুদ্ধ লোক চঞ্চল। কেবল হৃদয় ঘোষাল নস্তের ডিবে খুললো। এক চিমটি নয়, এক খাবলা। রুমালে নাক ঝেড়ে টেবিলে ঝুঁকে পড়লো।

ঘোর কলি। ঠাকুর দেবতা সব বাজে। ঠিক সময়ে চন্দ্র সূর্য ওঠার মতন হৃদয় ঘোষাল বহাল তবিয়তে অফিসে হাজিরা দিয়ে যেতে লাগলো। দিনের পর দিন। শরীর-পাত চুলোয় যাক, সামান্য জ্বরজারিও নয়, সর্দিকাশিও না।

অফিস সুদ্ধ লোক ভয় করতো মানুষটাকে। কেষ্ট বোস আর মথুর মাইতি যদি যম হয়, তো হৃদয় ঘোষাল যমদূত।

ঘোষালের টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ, কিন্তু দুটো ড্রয়ারে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। দশটা পাঁচটায় হৃদয় ঘোষাল ড্রয়ার ছোঁয় না, কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টির দাপটে অফিসে আটকা পড়লে ফাইল সরিয়ে ড্রয়ারের কাগজ টেবিলের ওপর রাখে। নানা আকারের কাগজের টুকরো। নানা রংয়ের। রাশিচক্র, জন্মকুণ্ডলী, কোষ্ঠি, ঠিকুজি, ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের রকমারী পোজের ফটো।

চাকরির বয়স বছর বিশেক, ঘটকালির বয়স অতটা না হলেও, বছর পনেরো হবে বৈ কি। এই অফিসেরই ছোকরা কেরানী দু' চারজনের বিয়ে তো ওরই দেওয়া। এ ব্যাপারে বেশ সুনাম আছে, হাতযশও নিন্দের নয়। তবে ওই এক অসুবিধা। কাটা কাটা বুলি। মেয়ের বাপের গায়ে ফোস্কা-পড়ানো কথাবার্তা। কালো মেয়েকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিষ্টি করে শ্যামবর্ণা বলা কিংবা ট্যারাকে কথার পলিমাটি চাপা দিয়ে লক্ষ্মীট্যারা বলে ছেলের বাপের কাছে বর্ণনা দেওয়া হৃদয় ঘোষালের ধাতে নেই। যেমনটি দেখবে, ঠিক তেমনটি বলবে। পরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়। নিজে দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তা পাত্রই হোক আর পাত্রীই হোক।

শুধু মেয়ের বেলাতেই নয়, ছেলের ব্যাপারেও ব্যবস্থার একটু নড়চড় নেই। ছেলের কাকা অশ্বিনীকুমারকে হার মানানো রূপের ফিরিস্তি দিলেন ভাইপোর। একেবারে রাজপুত্র। দুধে আলতায় গোলা রং। তার ওপর সরকারী চাকরি। আড়াই শো টাকায় শুরু, শেষ দেড় হাজারের আগে নয়। সেই আন্দাজে মেয়ে চাই। ডানাকাটা না হোক, ছেলের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য যেন হয়।

হৃদয় ঘোষাল ঘাড় হেঁট ক'রে শুনলো। লাল মোটা খাতায় সব টুকে রাখলো। ছেলের কাকা থামতে, আস্তে বললো, 'অফিসের ঠিকানাটা একবার দিন।'

দেরী নয়, ঠিকানা পেয়েই টিফিনের সময় হানা দিলো পাত্রের অফিসে। খুঁজে খুঁজে ঠিক বের করলো। কিন্তু পাত্রকে দেখেই হৃদয় ঘোষালের মেজাজ তিরিক্ষে। আড়াইমণী কয়লার চাঙড়। নাক চোখ মাংসের তলায় উধাও। দেড়শো টাকার ডেসপ্যাচার, তাও মাগ্‌গীভাতা নিয়ে। এরপর ছেলের খুড়োর সঙ্গে কেবল হাতাহাতি বাকি।

'যান যান মশাই, হীরের আংটি আবার বাঁকা' চোখ পাকিয়ে খুড়ো মারমুখী।

হৃদয় ঘোষালও ছাড়বার বান্দা নয়, 'ও হীরের আংটি বাজারে বের করবেন না মশাই, সিন্দুকে তুলে রাখবেন।'

হন হন ক'রে চলে এলো সেখান থেকে। সে গলিই আর মাড়ালো না।

অনেক ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া হ'য়েছে এমনিভাবে। মোটা পাওনার আশা খতম। কিন্তু হৃদয় ঘোষালের মেজাজ বদলায়নি। টাকা তো খোলামকুচি। আজ আছে, কাল নেই। তা বলে উল্টোপাল্টা কথা বলতে হবে? তেঁতুল বীচি চোখকে হরিণনয়ন? এক কাপ চা করতে উনানের ওপর ডিগবাজি খায় যে মেয়ে, তাকে বলতে হবে দ্রৌপদীর সামিল! হৃদয় ঘোষাল পারবে না। কারুর না পোষালে, সে পথ দেখুক। জাতব্যবসা তো আর নয়, এই করে খেতেও হয় না।- আধা শখ, পেশা আর নেশার মাঝামাঝি।

কিন্তু এতেই হৃদয় ঘোষালের নামডাক। যারা হাঁকিয়ে দেয়, তারাই আবার ডাকে হাত নেড়ে; সদর রাস্তা বাতলানোর লোকই ঘরে ডেকে বসায়। আর যাই হোক, সিধে কথার মানুষ। টাকা দিয়ে মুখবন্ধ করা যাবে না। যেমনটি দেখবে, ঠিক তেমনটি এসে বলবে। একটু এদিক ওদিক নয়।

অবশ্য টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টাও যে হয়নি এমন নয়।

ধানডাঙ্গার বাড়ুয্যে। এক সময়ে দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো, এখন অবস্থা পড়তির মুখে। তা ছাড়া শহরে ঘাটই বা কোথায় আর গরু থাকলেও, বাঘের আমদানী নেই। কিন্তু না থাক চৌরাস্তার মোড়ে সাড়ে-তিনতলা বাড়ী তো রয়েছে, দশ কাঠা তিন ছটাক জমির ওপর। লোহার গেটে তকমা আঁকা দারোয়ান, পুরনো মডেলের হাম্বার।

মালিক অনাদি বাড়ুয্যে বাতে পঙ্গু। ইজি চেয়ারে কাত হয়েই খাওয়াদাওয়া সারেন। ব্যথা একটু কমলে লাঠি হাতে ছাদে পায়চারী। বাড়িতে বিধবা বোন আর কচি মেয়ে। অবশ্য কচি মানে বছর আঠারো। দুধ ঘি'র প্রলেপে বয়স

আরও কম দেখায়। দুটি ছেলে নিজের পথ বেছে নিয়েছে, এখন মেয়েটার একটা গতি হলেই অনাদি বাড়ুয্যে নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন, শেষ না হোক, স্বস্তির।

হৃদয় ঘোষালের ডাক পড়লো। সকালে যাবার কথা কিন্তু সকালে সময় নেই। বাজার স্নান সেরে নাকে মুখে কিছু গুঁজতেই সাড়ে ন'টা। তারপর বাসে সাড়ে চার মাইল রাস্তা। আধ ঘণ্টা লাগে বৈকি। ঘোষাল অফিস ফেরৎ বিকেলে গিয়ে হাজির হলো।

ইজি চেয়ারের সামনে জল চৌকি চেপে বসলো। মেয়ের পিসি ভেজানো দরজার পিছনে। সাদা থানের খানিকটা দেখা গেলো, রুক্ষ চুলের কিছুটা।

বাড়ুয্যে মশাই একেবারে কথা পাড়লেন, 'ভালো ছেলে একটি দেখে দিতে হবে আপনাকে। আমার উমার যোগ্য ছেলে। নিজে বাতে অথর্ব হ'য়ে পড়ে আছি। ঘোরাফেরা করারও শক্তি নেই। বয়সও হয়েছে। আপনাদের ওপরেই নির্ভর।'

ঘোষাল ততক্ষণে খেরোবাঁধা খাতা খুলে তৈরী।

'মেয়ের বয়স ?'

অনাদি বাড়ুয্যে উঠে বসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওই চেষ্টাই। চেয়ারের আর্তনাদের সঙ্গে নিজের কাতরানি। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'উমির বয়স, তা বছর উনিশেক হলো বৈ কি।'

অনাদিবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কড়ার জোর শব্দ। পিসির তরফ থেকে। ঘোষাল মুখ ঘোরাতেই পিসি অস্ফুট গলায় বললেন, 'উনিশ নয়, সতেরো। গেলো ফাল্গুনে ষোলো পার হ'য়েছে।'

ঘোষাল নোট বইয়ে সতেরো লিখলো।

'খরচপত্তর কেমন করবেন, পাত্রপক্ষ সেটাই আগে জানতে চাইবে কি না' হৃদয় ঘোষাল পিসি আর অনাদিবাবুর মাঝ'বরাবর চাইলো। মতলব, উত্তরটা দু'জনে মিলে যুক্তি ক'রেই দিক। আসল কথা এইটেই। দেখেছে তো, চোখের কাজলের রংয়ের সঙ্গে গায়ের রংয়ের তফাৎ করা যায় না এমন মেয়েও পার হয়ে গেছে স্রেফ টাকার জোরে। শুধু পার হওয়া। ছেলে কি, যেন ময়ূর ছাড়া কার্তিক। মনের লেনদেন পরের কথা, পয়সার লেনদেনটাই আসল।

অনাদি বাড়ুয্যে ভুরু কোঁচকালেন। একটা হাত দিয়ে টিপে ধরলেন কপাল। ওই একটি মাত্র মেয়ে। নেই নেই করেও ধানডাঙার বাড়ুয্যেরা পথের ভিখিরী

হয় নি এখনও। জমিজমা লাটে, দেশের বসতবাটি হাত বদলেছে। খুঁদ-কুড়ো যা ছিলো সতেরো শরিকের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা। তবু অনাদি বাড়ুয্যে কোঁচা ঝাড়া দিলে দশ বিশহাজার টাকা পড়ে বৈ কি। শহরের বাড়ীটার দামই লাখ দেড়েক। গিন্নীর গয়নাগাঁটিও কিছু আছে।

'পাত্র যদি মনের মত হয়' ঝেড়ে ঝুড়ে অনাদি বাড়ুয্যে উঠে বসলেন, 'তাহলে হাজার পনেরো আমি খরচ করবো।'

হাজার পনেরো খরচ, তার ওপর মেয়ে যদি দেখতে শুনতে ভালো হয়, তবে লাগসই ছেলেও একটি হৃদয় ঘোষালের হাতে রয়েছে। ছেলের মতন ছেলে। বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার। কয়লার খনিতে চাকরি। তা হোক, হীরের জন্মই তো কয়লার খাদে। পাল্টা ঘর, কোন অসুবিধা নেই। তবে এক ওই রাশি-চক্রের বাগড়া আছে, ঠিকুজী-কোষ্ঠির ঝামেলা।

'মাকে একবার দেখতে পাই না?' হৃদয় ঘোষালের গলায় নিবেদনের ভঙ্গী।

'বিলক্ষণ, দেখবেন বই কি, হাজার বার দেখবেন। ও সুখদা' অনাদিবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। শুয়ে শুয়েই হাত পা ছোঁড়া। ব্যতিব্যস্ত।

এবার পিসির গলা আরো স্পষ্ট, 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না দাদা। ঘটক মশাইকে একটু অপেক্ষা করতে বলো, উমাকে আমি নিয়ে আসছি।'

আধ ঘণ্টার ওপর। হৃদয় ঘোষাল পা দুটো একটু ছাড়িয়ে নেবে। দাঁড়াবে দাঁড়াবে ভাবছে, এমন সময় পায়ের শব্দ। পিসির পিছন পিছন উমা ঢুকলো।

খুঁত খুঁতে হৃদয় ঘোষালকেও স্বীকার করতে হলো, হ্যাঁ মেয়ে বটে। এমন জিনিস রাজারাজড়ার ঘরেই মানায়। টানা চোখ, লাল টুকটুকে ঠোঁট, মোমের মতন গড়ন। লক্ষ্মণ যুক্ত মেয়ে। এমন মেয়ে লুফে নেবে মানুষ। তার ওপর খরচাও যখন নিন্দের নয়।

'আমি দিন পাঁচেক পরে দেখা করবো' হৃদয় ঘোষাল উঠে দাঁড়ালো, 'মেয়ে আপনার খুবই সুন্দরী। তবে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এ তিনটে তো আমাদের এলাকার বাইরে কিনা, কোথায় কার চাল মেপেছেন, তিনিই জানেন।' ঘোষাল ওপর দিকে আঙুল দেখালো। খাতা বগলে করে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।

৯৯

ধানবাদে ছেলের বাপকে চিঠি লেখা শেষ। কলকাতায় পাত্রের জ্যাঠার সঙ্গেই কথাবার্তা এগিয়েছে কিছুটা। ছেলের মত পেলেই, বাপ-জ্যাঠায় মিলে

মেয়েটিকে একবার দেখে যাবেন, এমন সময়ে হৃদয় ঘোষালের পাঁজরা বের-করা পাঁচিলের গায়ে বাইশহাজারী বুইক এসে লাগলো। ফিনে ফিনে গিলে-করা ক্যাম্বি্রকের পাঞ্জাবী, মাটি ছুঁই ছুঁই ফরাসডাঙ্গার কোঁচানো ধুতি, দশটা আঙুলের মধ্যে কেবল দুটো ন্যাড়া. বাকি আটটায় হীরে আর পোকরাজ ঝক ঝক করছে। মোষের শিংয়ের ছড়িটা দিয়ে দরজায় আলতো টোকা।

'এ বাড়িতে হৃদয়বাবু থাকেন' খানদানি গলার আওয়াজ।

হৃদয় ঘোষাল আটহাতি গামছা জড়িয়ে তেল থাবড়াচ্ছিলো, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থাতেই দরজার গোড়ায় দাঁড়ালো, 'আজ্ঞে, আমিই হৃদয় ঘোষাল। মশাইকে তো চিনতে পারলাম না।'

'পারবার কথাও নয়' ভদ্রলোক চুরুটে মোলায়েম টান দিলেন। দামী জিনিষ। ধোঁয়াতেও কি খোসবো।

চুরুট সরিয়ে বললেন, 'কোন দিন দেখেন নি কিনা। আমি সম্পর্কে অনাদি বাড়ুয্যের ভাইপো। ধানডাঙ্গার বাড়ুয্যে বাড়ির সেজো শরিক।'

হৃদয় ঘোষাল তেল চিটচিটে হাত দুটো জোড় করে কপালে ঠেকালো। এমন ঢিমেতেতালায় কথাবার্তা বললে দুপুরের আগে অফিসে গিয়ে পৌছোতে পারবে এমন ভরসা কম।

কথাটা ঘোষাল মুখ ফুটে বলেই ফেললো। ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে উঠলেন। চুরুটটা রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলে মিঠে গলায় বললেন, 'একটু এদিকে আসুন। জরুরী কথা আছে।'

এদিকে মানে, মল্লিকদের রোয়াকের পাশে। সিঁড়ির চাতালে পা দিয়ে ধানডাঙ্গার সেজো শরিক দাঁড়ালেন। গামছা সামলে রোয়াকের ওপর হৃদয় ঘোষাল উবু হলো।

মিনিট দশেক। কিন্তু তাতেই ঘোষালের মুখ চোখের চেহারা পালটে গেলো। দুটো চোখে রক্তের ছিটে। হাত দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে। ধুলো উড়িয়ে বুইক যখন রাস্তার মোড়ে, তখনও হৃদয় ঘোষালের ঘোর কাটে নি। কপালের শিরাগুলো দপ দপ করছে।

অফিস ফেরৎ সোজা অনাদি বাঁড়ুয্যের বাড়ি। বাঁড়ুয্যের বাতের বেদনা একটু কম। খোলা ছাদে লাঠিতে ভর দিয়ে মেপে মেপে পায়চারি। হৃদয় ঘোষালকে দেখেই এগিয়ে গেলেন। এক মুখ হাসি।

'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে' ঘোষালের গলার আওয়াজে ঝাঁজের মিশেল।

'আমার সঙ্গে ?' অনাদি বাড়ুয্যে লাঠি ঠুকে ঠুকে ঘরের মধ্যে এলেন। ইজিচেয়ারে জুতসই হয়ে নেপথ্যে হাঁক দিলেন, 'জগা, ওরে এক কাপ চা ওপরে পাঠিয়ে দে।'

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘোষাল হাত নেড়ে বারণ করলো। চা থাক, কাজের কথাটা হয়ে যাক আগে। উড়ো সন্দেহের নিষ্পত্তি হোক, তারপর চা কেন, পাত পেতে খেয়ে যেতেও ঘোষালের আপত্তি নেই।

'আপনার মেয়ের ঠোঁটে শ্বেতি তাতো বলেন নি আমাকে ?" হৃদয় ঘোষাল ছুঁড়ে দিলো কথাগুলো। কথা তো নয়, যেন হুল এক মুঠো। অনাদি বাড়ুয্যে চমকে উঠতেই হাত লেগে লাঠিটা পড়ে গেলো মেঝেয় বিশ্রী আওয়াজ করে। কিন্তু দুজনের কেউ তোলার চেষ্টা করলো না।

'সে কি, কে বললে ? কি বলছেন আপনি যা তা ?' বাঁড়ুয্যের কথা এলো মেলো। মুখ থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে কে যেন সব রক্ত আচমকা টেনে নিলো। এই কটা কথাতেই হাঁফ লেগে গেলো। দু হাত কপালে রেখে দম নিলেন। তারপর মুখ তুলে চাইলেন হৃদয় ঘোষালের দিকে।

'খুব ভালো জায়গা থেকেই খবর পেয়েছি। কথাটা সত্যি কিনা তাই জানতে এলাম আপনার কাছে।'

'একেবারে বাজে কথা। শত্রুপক্ষ রটিয়াছে। মেয়ে আমার নিখুঁত।' অনাদি বাঁড়ুয্যে চীৎকার করে উঠলেন। অথচ হৃদয় ঘোষাল ফিট দুয়েক তফাতে। এত চেঁচানোর কোন মানে হয় না।

'বেশ তো আপনার মেয়েকে আর একবার দেখবো। চোখে কানে বিবাদ-ভঞ্জন।' ঘোষালের গলায় উত্তেজনার ছিটে ফোঁটাও নেই।

'ভালো' বহু চেষ্টায় অনাদি বাঁড়ুয্যে উঠে বসলেন। ঘোষালের মনে হলো ঝোঁকের মাথায় নিজেই হয়তো চলে যাবেন মেয়েকে আনতে। কিন্তু তা নয়। অনাদিবাবু সামনে ঝুঁকে ঘোষালের দুটো হাত চেপে ধরলেন, 'বিশ্বাস করুন, শ্বেতি নয়। ঠোঁটে সাদা সাদা কতকগুলো দাগ আছে বটে, কিন্তু ওসব রোগটোগ নয়।'

ঘোষাল আস্তে হাত সরিয়ে নিলো। শ্বেতি আর সাদা দাগে তফাৎ আছে বৈকি। এটুকু জানবার মতন বয়স অনাদিবাবুরও হয়েছে, হৃদয় ঘোষালেরও।

এবারে ঘোষাল মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লো। পাশুপত।

'অধর ডাক্তারও কি চিনতে পারেনি দাগগুলো ?

সাপের মুখে শেকড়। প্রসারিত ফণা কুঁচকে নিস্তেজ। কুণ্ডলী পাকিয়ে গর্ত খোঁজার চেষ্টা। অবিকল অনাদি বাঁড়ুয্যের সেই অবস্থা। সমস্ত শরীরটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠলো। ঘোলাটে চোখের চাউনি। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে কাঠ। ঘরের শত্রু বিভীষণ জুটেছে। গোপন কথা সব ফাঁক। নাড়ালে জল আরও ঘোলা হয়ে উঠবে, কাদামাখা। তার চেয়ে অন্য শড়কই ভালো। পিচঢালা রাস্তায় অসুবিধা, তো খিড়কির পথ আছে। অনাদি বাঁড়ুয্যে সেই পথ ধরলেন। চুপচাপ বিয়েটা হয়ে যাক। ধরবার ছোঁবার উপায় নেই। লিপষ্টিক মেখে থাকলে বাড়ির লোকই বুঝতে পারে না, বাইরের লোকের কথা ছার। হৃদয় ঘোষাল চেপে যাক ব্যাপারটা। হাজার টাকা নগদ হাতের মুঠোয় ভরে দেবেন। এমন পাত্র যেন হাতছাড়া না হয়।

হৃদয় ঘোষাল এত কথার উত্তরে জুতোয় পা গলালো। উঠতে যাবার মুখেই বাধা। অনাদি বাঁড়ুয্যে আবার হাত চেপে ধরেছেন। এক হাজার কম হয়ে থাকে তো আরো পাঁচশো বাড়িয়ে নিক।

হৃদয় ঘোষাল অটল। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই দেড় হাজার আড়াই হাজারে চড়ে গেলো। অনাদি বাঁড়ুয্যে ঘোষালকে ভর করেই দাঁড়িয়ে উঠলেন।

ছাতি বগলে করে হৃদয় ঘোষাল সাবধানে বাঁড়ুয্যেকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো। হেসে বললো, 'টাকার কথা আর কি বলছেন ? যদি এই বাড়ি আর আপনার পুরোনো গাড়িটা লিখে দেন আমার নামে, তবু হৃদয় ঘোষালকে দিয়ে এ কাজ হবে না। আপনি অন্য লোক দেখুন। নমস্কার।'

সিঁড়ি বেয়ে সোজা নেমে ফটক খুলে একেবারে চৌরাস্তার মোড়ে। পিছন ফিরে দেখলোও না একবার !

বন্ধুবান্ধব জানাশোনা যারাই শুনেছে তারাই নিন্দা করেছে। একেই বলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা। বিয়েটা একবার হয়ে গেলেই তো ব্যস। আর দেখছে কে তোমায় ?

হৃদয় ঘোষাল আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়েছিলো। আসল দেখবার লোকটি ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু হিসেব ঠিক রেখে চলেছেন। তাঁর কাছে পার নেই।

এ কথার ওপর অবশ্য আর কথা চলে না! তবে হৃদয় ঘোষালের পরিবার ছাড়ে নি। স্পষ্ট করে বলেছে, এমন মানুষের সংসারধর্ম করার দরকার কি। লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হয়।

মাস তিনেক পর।

সন্ধ্যের ঝেঁাকে হ্যারিকেনের আলোয় ঘোষাল খাতা হাতড়াচ্ছিলো। আজকেই একটি মেয়ের ছক হাতে এসেছে। অফিসের শরৎবাবুর ভাগ্নী। খরচ-পত্র মন্দ করবে না, তার ওপর মেয়েও সরেস। সামনের রবিবার নিজের চোখে একবার দেখে আসবে। পাত্রী গুহ। কায়স্থ। কাজেই হৃদয় ঘোষাল ঘোষ, বোস, মিত্তির খুঁজতে লাগলেন।

লাগসই বোস একটা চোখে পড়ে গেল। বয়স একটু বেশি। ওতেই হবে। মেয়ে এমন কিছু খুকি নয়। নিচু হয়ে ছক মেলাতে যাবার মুখেই বাধা পড়লো। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ।

সুতো বাঁধা চশমাটা সাবধানে মুড়ে হৃদয় ঘোষাল খাতাপত্র গোছাতে শুরু করলো। এমন অসময়ে আবার কে এলো জ্বালাতে। হ্যারিকেনটা একটু উস্কে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই ঘোষাল পিছিয়ে এলো। বেশ কয়েক পা। ঘোমটা ঢাকা একটি স্ত্রীলোক। রাস্তার গ্যাসের আলোয় আবছা কিছু নয়।

হৃদয় ঘোষাল কথা বলবার আগেই স্ত্রীলোকটি ঘোমটা একটু সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'এটা কি হৃদয়বাবুর বাড়ি, হৃদয় ঘোষাল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই হৃদয় ঘোষাল। বলুন আপনার কি দরকার?'

'ভিতরে আসিতে পারি', চৌকাঠে একটা পা রেখে খুব কাঁপানো গলার আওয়াজ।

দু-এক সেকেণ্ড। হৃদয় ঘোষাল চটপট হিসাব করে নিলো! পরিবার গঙ্গায় —অবশ্য স্নান করতে। ফিরতে কম করে ঘণ্টাখানেক। সারাদিনের গ্লানি না ধুয়ে বাড়িমুখো হবে না। কিন্তু এমন করে একজন মহিলাকে চৌকাঠে দাঁড় করিয়েও তো রাখা যায় না।

'আপনি ভিতরে এসে বসুন।' হ্যারিকেন তুলে ঘোষাল পথ দেখালো। সিমেণ্ট-ওঠা ভাঙা সিঁড়ির ধাপ। চেনা মানুষই হাজার আছাড় খায়। তাও দিনদুপুরে।

স্ত্রীলোকটি এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালো, 'বেশিক্ষণ বসবো না বাবা। আপনার কাছে দরকারটা সেরেই চলে যাবো।'

'আমার কাছে? আমার কাছে কি দরকার বলুন তো?' আড়চোখে ঘোষাল স্ত্রীলোকটির আপাদমস্তক দেখে নিলো।

'আমার মেয়ের একটি ভালো সম্বন্ধের জন্য এসেছি। পাড়ায় আপনার খুব নামডাক, দয়া করে গরীব বিধবার যদি একটু উপকার করেন।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। ঘটকালি। বেশ তো, ঘোষাল রাজি। কিন্তু মুখের একটা কথাতেই কি সম্বন্ধ আসে। মেয়ে দেখতে হবে, খরচপাতি কত করবে তার খোঁজ, কোমরের জোর বুঝে জাল ফেলতে হবে। নমোঃ নমোঃ করে সারবে তো চুণোপুটি আছে তার জন্য, অঢেল খয়রা-চাঁদা, আর যদি টাকা ঢালার সুবিধা থাকে তো রুই, কালবোস থেকে রাঘব বোয়াল পর্যন্ত ঘোষালের মুঠোয়।

'আপনি কি এ-পাড়াতেই থাকেন?' ঘোষাল হাত দিয়ে মাদুরটা বিছিয়ে দিতে দিতে বললো।

'হ্যাঁ, শশিকান্ত বাবুর বাড়ি।' মহিলা বসলো পা মুড়ে।

শশিকান্ত! মানে শশিকান্ত বসাক। মোড়ের ছাইরঙা তেতলা। কিন্তু ওখানে তো সবাই ঘোষালের চেনা। বসাকের আত্মীয় পরিজন সবই নখদর্পণে। কাজে-কর্মে দু-একবার গেছেও সে বাড়িতে। কিন্তু!

কিন্তুটা শুধু মনে নয়, ঘোষালের মুখেচোখে ফুটে উঠলো। মহিলাটিরও নজর এড়ালো না।

'আমরা শশিবাবুর ভাড়াটে। নতুন এসেছি এ পাড়ায়। মাস দেড়েক।'

'আগে ছিলেন কোথায়?' ঘোষাল ততক্ষণে খাতা খুলে ফেলেছে।

'পাকিস্থান, মানে নরসিংদীতে।' খুব চাপা গলা মহিলাটির। করুণ একটা ইতিহাস সেখানের মাটি চাপা, এমনই ইঙ্গিত।

'মেয়ে দেখতে কেমন?' পেন্সিল বাগিয়ে ঘোষাল তৈরি।

'মেয়ে! তা মন্দ নয়। এই বাঙালীর ঘরে যেমন হয়ে থাকে। রঙ আমার চেয়ে ফরসা।'

মহিলাটির কাঁপা গলার আওয়াজে মুখ তুলেই ঘোষাল অবাক হয়ে গেলো।

মাথার ঘোমটা সামান্য সরে গেছে। হয়তো মুখটা তোলার জন্য, না কি ইচ্ছা করেই। কিন্তু ঘোষাল চোখ ফেরাতে পারলো না। ঢলঢলে চোখ, নিটোল ছুটি

গাল, টিকোলো নাক, ছুটি ঠোঁট গোলাপের পাতলা পাপড়ির সামিল। আর রঙ, রঙের উপমা ভাবতে ঘোষাল থেই হারিয়ে ফেললো। মায়ের পাশাপাশি মেয়ের রূপের হিসাবটাও করলো। এঁর চেয়েও ফরসা, বয়স আরো কম।

'মেয়েকে দেখাবেন একবার', ঘোষাল বাঁধাবুলি আওড়ালো, কিন্তু গলার জোর অনেকটা মৃদু।

'হ্যাঁ নিশ্চয়। কবে আপনার সুবিধে হবে বলুন?'

'ধরুন, কাল—'

'বেশ কালই। সন্ধ্যা নাগাদ। মহিলাটি ওঠার তোড়জোড় করার মুখেই ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলো, 'দেনা-পাওনার সম্বন্ধে কথা কার সঙ্গে বলতে হবে?'

হ্যারিকেনের কম জোর আলো, কিন্তু সেই অনুপাতে ঘোষালের চোখ কম ধারালো নয়। দেখতে ভুল হলো না। চোখের পাতাগুলো ভিজে ভিজে। বিষাদের মেঘ নামলো মুখে।

মাদুরের কাঠি খুঁটতে খুঁটতে খুব অস্পষ্ট গলায় বললো, 'সবই আমাকে করতে হবে। আর তো বিশেষ কেউ নেই কোথাও। আমার সম্পর্কের এক মামা আছেন। ঠিকঠাক হলে তাঁকে একবার খবর দেবো।'

'ব্যাপারটা হচ্ছে কি জানেন', হৃদয় ঘোষালের সঙ্কোচের বালাই নেই। লজ্জা-সরমের ধার দিয়েও যায় না, 'যত চিনি ঢালবেন, ততই মিষ্টি। আপনাদের খরচের বহরটা জানতে পারলে সেই দরের পাত্রের খবর আনতে পারতাম।'

'তাতো ঠিক কথা' মহিলা উঠে দাঁড়ালো। আলতো হাতে মাথার ঘোমটা সিঁথি থেকে কপাল পর্যন্ত, 'অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। সর্বস্ব পাকিস্থানে রেখে আসতে হয়েছে। সাহায্য করার মতন আত্মীয়ও এখানে কেউ নেই। সবশুদ্ধ হাজার তিনেক টাকা খরচ করতে পারবো। এর বেশি আমার সঙ্গতি নেই।'

মন্দের ভালো। ঘোষাল ভেবেছিলো শুধু শাঁখা-সিঁদুরে মেয়ে পার করার চেষ্টা। হরিতকি দিয়ে সম্প্রদান। যাক অতোটা নয়। পেটকাপড়ে বেঁধে কিছুটা তাহলে আনতে পেরেছিলো এপারে। তাই ভাঙিয়েই সংসার চলছে।

হৃদয় ঘোষাল যখন শশিকান্ত বসাকের ফটকে পা ঠেকালো, তখনও বেশ বেলা। খটখটে না হোক, রোদ রয়েছে। একটু ইতস্তত করে ঢুকেই পড়লো। বেলাবেলি দেখাই ভালো। সিঁড়ির এ-কোণে দরজা বসনো হয়েছে। আগে

গুদাম-ঘর ছিলো। শশিকান্তর রোজগারের আমলে। লোক-লস্কর, যন্ত্রপাতির স্তূপ। এখন শশিকান্তর ছেলেরা গুদাম সরিয়ে নিয়েছে সায়েব পাড়ায়। জানালা ফুটিয়ে, কলি ফিরিয়ে ভোল বদলে ফেলেছে। এতগুলো ঘর পড়ে থাকবে এমনি। ন দেবায়ঃ, ন ধর্মায়ঃ। এর চেয়ে সাফসুফ করে ভাড়া বসানোই ভালো।

দরজার কাছ বরাবর আসতেই আধবুড়ো একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলো। দোহারা চেহারা, ফুটফুটে রং। হাত পাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন, ঘোষালকে দেখে পাখা বন্ধ করে মুখ খুললেন, 'কাকে চাই ?'

সেইটাই বলা মুশকিল। ধামের খোঁজটাই শুধু নিয়েছিলো নামের নয়। আর সেটা সমীচীনও হতো না।

ঘোষাল, আমতা আমতা করতেই ভদ্রলোক বুঝে ফেললেন। উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে আধ-ভেজানো দরজার পাল্লাটা খুলে দিয়ে বললেন, 'মশায়ের নাম কি হৃদয় ঘোষাল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বিলক্ষণ' ভদ্রলোক হাতপাখা রেখে হাত জোড় করলেন, 'আসুন, আসুন, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। সতী ঠাকুরঘরে গেছে, এই এলো বলে। আমি তার মামা।'

হৃদয় ঘোষাল ঘরে ঢুকলো। ভালোই হয়েছে। পুরুষমানুষ মাঝখানে একটা না থাকলে বড়ো বাধো বাধো ঠেকে। দরকারী কথা গুছিয়ে বলাও যায় না।

ভদ্রলোকের নাম রাখাল চাটুজ্যে। দক্ষিণেশ্বরে বাসা। বাসাই বটে। দেড়খানি ঘর। একটিতে রান্নাবাড়া, আর একটিতে শোওয়া। বাড়তি লোক এলে আঙুল বাড়িয়ে গঙ্গার ধার দেখিয়ে দিতে হয়। এমন অবস্থা না হলে কি আর সতীকে আলাদা ডেরা বাঁধতে হয়। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পুরানো কথারও জের চললো। নিজে কাজ করতেন রেলে। বছর পাঁচেক পেন্সন নিয়েছেন। ভাগ্নীজামাই নরসিংদীর হেডমাস্টার। যেমনি বিদ্বান, তেমনি সজ্জন। সতীর কপাল। নইলে আর অমন জোয়ান-মন্দ লোকটা তিন দিনের জ্বরে মাটি নেয়।

কথার ফাঁকেই সতী এসে দাঁড়ালো। হাতে চায়ের কাপ। চৌকাঠে পা দিয়েই থতমত। হাত দিয়ে ঘোমটা টেনে দেবার চেষ্টা। মুখে বললো, 'ওমা, আপনি এসে গেছেন। আর এক কাপ চা নিয়ে আসি।'

আর এক কাপ চা আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষাল কাজের কথা পাড়লো। মেয়েকে একবার দেখে নিলে হতো।

'নিশ্চয়' সতী ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলো, 'বাসু, একটু এদিকে এসো তো মা।'

ভিতর থেকে হাতাবেড়ির ঝনঝন। দরজায় শিকল তোলার শব্দ। ঠুক করে আওয়াজ হতেই ঘোষাল চেয়ে দেখলো।

বোধ হয় তরকারির কড়া নামিয়েই চলে এসেছে। খয়েরি শাড়ি পরনে, নিটোল দুটি হাতে দুগাছা সরু চুড়ি, কপালে ঘামের ফোঁটা। আঙুলে হলুদের ছোপ নজর এড়ালো না।

মেয়ে নয় ছবি। বাঁধিয়ে রাখলে কে বলবে, নলচিতির ছোট তরফের মেয়ে নয়। ডাকসাইটে সুন্দরী। মিটিংয়ে, মেলায়, মোটরে নামতে .উঠতে ঘোষালের চোখে পড়েছে। তার চেয়ে কোন অংশে খাটো নয় এ মেয়ে। তেমন আদর যত্নে থাকলে রূপ খুলতো আরো।

মিনিট পাঁচেক! মেয়েটি দুহাত জোর করে দাঁড়াল। ঘোষালই প্রথম কথা বললো, 'হয়েছে মা, আমার দেখবার কিছু নেই।'

আসবার সময় নজরে পড়েছিলো মেয়েটির অপূর্ব মমতামাখা দুটি চোখ; যাবার সময় ঘোষাল দেখলো ঢেউ-খেলানো কালো চুলের রাশ। বিনুনির বালাই নেই। সারা পিঠ ছেয়ে পড়েছে।

এদিক ওদিক খবর নিয়ে ঘোষাল উঠলো। মেয়েটির কোষ্ঠি নেই, জন্মতারিখ আছে। তাতেই হবে। ছক-তৈরী ঘোষালের পাঁচ মিনিটের মামলা।

ঘোষাল একটু জোর দিয়েই লাগলো। রোজ অফিসের পরে হাঁটাহাঁটি। কোনরকমে পাত্রপক্ষকে একবার দেখাতে পারলেই মাত। দেনাপাওনার কথা নিয়ে হৈ চৈ হবে না। কোন খিটিমিটি নয়। এমন মেয়ে হাজারে কি, লাখেও মেলে না। এ বয়সে ঘোষাল বড়ো কম মেয়ে দেখিনি। কিন্তু ঠিক এমনটি খুব কম। নেই বললেই চলে।

মাসখানেকের মধ্যে জুটে গেলো। সরকারী চাকুরে। বাপের এক সন্তান। কলকাতায় বাড়ীই খানতিনেক। ছেলে কন্দর্প। পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে

দরকার। মেয়ে পছন্দ হ'লে কোন খাঁই নেই, একটি পয়সা চাইবে না। একেই ব'লে যোগাযোগ। হৃদয় ঘোষাল ডবল ডোজ নস্যি নাকে গুঁজে দিলো। এক-গাল হেসে বললো, 'মেয়ে কবে দেখতে যাচ্ছেন বলুন। এমন মেয়ে আপনাদের ঘরেই মানায়।'

সামনের বুধবার। কি একটা পরবে অফিস-আদালত বন্ধ। বিকেল ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা সময় শুভ। ছেলের বাপ আর পিসে দেখতে যাবেন, ঘোষাল যেন হাজির থাকে।

লালপাড় তাঁতের শাড়ী, জরদ-রাঙা ব্লাউজ। আজ মুখে হাল্কা পাউডার বুলিয়েছে। বাড়তি চুড়িও ক'গাছা দু হাতে। চুল এলো।

মিনিট দুয়েক কথা বন্ধ। নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত নয়। প্রথমে কথা বললেন ছেলের পিসে, 'নামটি কি মা ?'

'বাসন্তী দেবী।' কথা নয় তো, যেন চাক ভাঙা মধু ঝরে পড়ছে।

সেলাই-ফোঁড়াইয়ের প্রশ্ন, রান্নাবাড়ার কথা, কিছুটা লেখাপড়া সম্বন্ধে। সব কথা চালালেন পিসে। ছেলের বাবা ওখানে একটি কথাও নয়, মুখ খুললেন সদর রাস্তায় এসে।

দু'হাতে ঘোষালের একটা হাত জড়িয়ে ধরলেন 'ব্যস, আপনি পাকা কথা দিয়ে দিন ঘটকমশাই। ছেলের বিয়ে আমি এখানেই দেবো।'

পিসে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, 'এক শ' বার। আহা মেয়ে তো নয় লক্ষ্মী প্রতিমা। এ মেয়ে তোমার ঘরেই মানায় বাঁড়ুয্যে।'

হাত ছাড়িয়ে হৃদয় ঘোষাল সরে দাঁড়ালো, 'তা'হলে আমাকে এখানেই ছুটি দিন। আহা বিধবা মা অনেক আশা ক'রে রয়েছেন, তাঁকে খবরটা একবার দিয়ে আসি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ দিয়ে আসুন', ছেলের বাপ লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন, 'আর কাল বিকেলে একবার অফিস ফেরৎ যাবেন আমার ওখানে, পাকা দেখার দিনটাও অমনি ঠিক ক'রে ফেলবো।'

খবরটা দিতে মেয়ের মা আর রাখাল চাটুয্যে দুজনেই উৎফুল্ল। কি ব'লে যে ধন্যবাদ জানাবে ঘোষালকে। বাসন্তী ঘরের মধ্যে ছিলো, মার ইশারায় আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে হেঁট হ'য়ে প্রণাম করলো ঘোষালকে।

'থাক্ মা, থাক্', আশ্চর্য ঘোষালের গলাও ধরে যায়, চোখ দুটোর মধ্যে কেমন জ্বালা জ্বালা ভাব।

হৃদয় ঘোষাল চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে বাইরে চলে এলো।

বরাত জোর। সামনের স্কুলবাড়ীটা নাম-মাত্র ভাড়ায় পাওয়া গেলো, অবশ্য শশীকান্তর ছেলেদের দৌলতে। বৃষ্টি বাদলার সময় নয়, সামনের মাঠে বরযাত্রীরা অনায়াসে এসে বসতে পারে। খাওয়ার ব্যবস্থা ভিতরের দিকে। লগ্ন সাড়ে নটা। একটু দূরের যারা, তারা আগেই খেয়ে নিতে চায়। ভরপেটে বিয়ে দেখাই ভালো।

হৃদয় ঘোষালের অবস্থা কাহিল। বরের ঘরের পিসি আর কনের ঘরের মাসী। চারখানা হাড়ে যেন ভেল্কি দেখাচ্ছে। শুধু এবারে বলে নয়, সব বিয়েতেই এক অবস্থা! টোপর দেখলে ঘোষাল দুনিয়া ভুলে যায়।

ব্যাপারটা ঘটলো পৌণে ন'টা নাগাত। জামায় টান পড়তেই ঘোষাল ফিরে দাঁড়ালো। বাগানো টেরি, চোখে চশমা, মাঝবয়সী ভদ্রলোক। আস্তে বললেন, 'একটু কথা ছিলো।'

কথা যে কি তা আর ঘোষালের অজানা নয়। বাড়ীর মেয়েদের বসিয়ে দেবার অনুরোধ, কিংবা নিজে আসছেন কামারকুণ্ডু থেকে, নটা পয়তাল্লিশে শেষ ট্রেন, এক কোণে পাতের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে!

ঘোষাল হাত জোড় করলো, 'আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই বিয়ে শুরু হয়ে যাবে। একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে। তারপর সব এক বারে বসিয়ে দেওয়া হবে।'

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়লেন, 'আরে না মশাই, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার কিছু নয়। জরুরী কথা, সনাতন মুখুজ্জের মেয়ের বিয়ে না? নরসিংদী ভবতারিণী স্কুলের হেডমাষ্টার।'

ঘোষাল ঘাড় নাড়লো ;

'যা ভেবেছি তাই। শহরে এসে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে বৈ কি। এখানে কে কাকে চেনে। কিন্তু, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ভগবান আছেন।'

এবার ঘোষাল কাঁধের গামছা কোমরে বাঁধলো, 'কি ব্যাপার বলুন তো।' ঝুঁকে পড়লো লোকটির দিকে।

মাঠের মধ্যে ভীড়ের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দুজনে বসলো। মিনিট দশেক ধরে ফুসফাস। লোকটি পকেট থেকে খবরের কাগজের খানিকটা বের করলো। লাল পেন্সিলের বর্ডার টানা।

কথা শেষ হ'তেই ঘোষাল দাঁড়িয়ে উঠলো। কোমরের গামছা আবার কাঁধে। ফ্যাকাসে মুখের চেহারা। সারা শরীর টলমল করছে। ভীড় ঠেলে মেয়েমহলের দরজায় এসে দাঁড়ালো। না, না, করেও এপাশের ওপাশের কম মেয়েছেলে জোটেনি। শাড়ী গয়নায় ছয়লাপ। গলা খাঁকাড়ি দিতেই মেয়ের দল সরে পড়লো। মেয়েদের মাঝখানে উটকো পুরুষ কেন আবার! ঘোষালের ভ্রুক্ষেপ নেই।

'মেয়ের মাকে একটু দরকার। দয়া করে কেউ যদি ডেকে দেন। বলুন ঘটক একবার ডাকছে।'

মেয়েদের মুখে মুখে সতীর কানে পৌঁছোলো কথা। মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে ভেজানো দরজার আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। মেয়ে-জামাই দেখবে কি ছাই। পোড়া চোখে জল এসে সামনের সব কিছু ঝাপসা। ঘটক ডাকছে শুনে হন্তদন্ত হয়ে বাইরে এলো।

হৃদয় ঘোষাল পাচিল ঘেঁষে খাড়া ছিলো। সতী এদিক ওদিক ঠাওর করে সামনে যেতেই একেবারে বারুদ।

'মেয়েকে মোছলমানে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, ঘুণাক্ষরেও তো জানান নি কথাটা। মেয়ে বিয়ে দিয়ে জাতে উঠছেন। চমৎকার।'

চোখের সামনে অজস্র আলোর ফুলঝুরি। সামনের পাঁচিল ফেটে চৌচির। সব ঘুরছে আস্তে আস্তে। সতী পাঁচিল ধরেই টাল সামলালো। 'আপনার কাছে কিছু লুকোবো না', সতী গ্যাস দেওয়া রোগীর গলায় বললো, 'মেয়েকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে গিয়ে পড়েছিলো। সর্বনাশ কিছু করতে পারে নি।

ঘোষাল হুঙ্কার ছাড়লো 'ছুঁয়েছে যখন তখন আর সর্বনাশের বাকীটা কি। জেনে শুনে এমন মেয়ে কারুর ঘরে ঢোকালে আমি ধর্মে পতিত হবে, চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে আমার। এখনও সময় আছে।' ঘোষাল ভীড় ঠেলে ছাদনাতলার দিকে ছুটলো।

'ঘোষাল মশাই' কাতর একটা আর্তনাদ, তারপরেই সতী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

শাঁখ আর উলুর আওয়াজ হতেই ঘোষাল জোরে পা চালালো। যেমন করেই হোক এ বিয়ে আটকাতে হবে। এমন একটা কথা কানে শোনার পর আর যে পারে পারুক, হৃদয় ঘোষাল চুপচাপ থাকতে পারে না।

'রাখালবাবু, রাখালবাবু' হৃদয় ঘোষাল চীৎকার করে উঠলো।

পুরোহিতের জোর মন্ত্রের আওয়াজ। শাঁখের শব্দ। মেয়েদের উলু।

বরকনের সামনে গিয়ে ঘোষাল আবার চীৎকার করলো 'রাখালবাবু, রাখালবাবু।' তারপরে একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়ালো।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বাসন্তী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলো। কনে চন্দনের ছাপ সারা মুখে, কাজল কালো চোখ আজকের রাতে যেন আরো আয়ত। ভয়, লজ্জা, কৌতূহল মিলিয়ে অপূর্ব মুখশ্রী। হয়তো বিপদের আভাষ পেয়েই পাতলা ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপছে। ফুলে আর চন্দনের গন্ধে, পেট্রোমাক্সের উজ্জ্বল আলোয় সব কিছু মধুর। বর আর কনের হাত দুটি এক সঙ্গে ধরা। পরম নির্ভরতার প্রতীক। ঘোষালের হাজার চীৎকারেও বুঝি এদের আলাদা করা যাবে না।

শুধু কনে নয়, বরও ঘাড় ফেরালো ঘোষালের দিকে। দুটি চোখে ভ্রূকুটি। তপোবনের পবিত্র মাটিতে ও যেন দৈত্যের মতন হানা দিয়েছে। পায়ে পায়ে ঘোষাল পিছিয়ে আসার মুখেই রাখাল চাটুজ্যে সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কি ব্যাপার, আমায় খুঁজছিলেন। সম্প্রদান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম '

'ওঃ, তাই বুঝি' হৃদয় ঘোষাল আমতা আমতা করলো। জিভ দিয়ে নিচে ওপর দুটো ঠোঁটই ভিজিয়ে নিলো, তারপর কাঁচুমাঁচু গলায় বললো, 'না মানে ডাকছিলাম, আপনার নাতনি আর নাতজামাইকে কেমন মানিয়েছে তাই দেখবার জন্য।'

খুব জোরে ঘোষাল হেসে উঠলো শাঁখ আর উলুর আওয়াজকে ছাপানো গলায়। তারপর রাখালবাবুর দিকে না চেয়েই আস্তে আস্তে ভীড়ে মিলিয়ে গেলো, অনেক পিছনে। আশ্চর্য, এমনদিনে মুখ লুকোবার মতন একটু অন্ধকারও কোথাও নেই।

॥ শারদীয়া দেশ, ১৩৫৯ ॥

একটি ছয় ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা কাঠিকে মাঝামাঝি মচকাইয়া নোয়াইয়া দিলে যেমন হয়, দীর্ঘ শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্তীর অবস্থাও এখন তেমনই। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে সে এমন ছিল না, তখন সে বত্রিশ বৎসরের জোয়ান, খাড়া সোজা। লোকে বলিত, মই আসছে—মই আসছে। কিন্তু ছোট ছেলেদের সে ছিল মহা প্রিয়পাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিদের হাসি দেখিয়া সে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিত, হুঁ। কি রকম হাসছ যে ?

এই দাদা, একটা রসের কথা হচ্ছিল।

হুঁ তা বটে, তা তোমার রসের কথা—ও তোমার রস খাওয়ারই সমান।

একজন হয় তো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া দিত, না দাদা, তোমাকে দেখেই সব হাসছিল, বলছিল—মই আসছে।

চক্রবর্তী আকর্ণ দাঁত মেলিয়া হাসিয়া উত্তর দিত, হুঁ তা বটে। তা কাঁধে চড়লে স্বর্গে যাওয়া যায়। বেশ পেট ভ'রে খাইয়ে দিলেই, বাস্, স্বর্গে পাঠিয়ে দোব।

আর পতনে রসাতল, কি বল দাদা।

চক্রবর্তী মনে মনে উত্তর খুঁজিত। কিন্তু তাহার পূর্বেই চক্রবর্তীর নজরে পড়ত, অল্প দূরে একটা গলির মুখে ছেলের দল তাহাকে ইশারা করিয়া ডাকিতেছে। আর চক্রবর্তীর উত্তর দেওয়া হইত না। সে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িত।

কোন দিন রায়েদের বাগানে, কোন দিন মিত্রদের বাগানে ছেলেদের দলের সঙ্গে গিয়া হাজির হইয়া আম জাম বা পেয়ারা আহরণে মত্ত থাকিত। সরল পরিপক্ক ফলগুলির মিষ্ট গন্ধে সমবেত মৌমাছি-বোলতার দল ঝাঁক বাঁধিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণের ভয় দেখাইলেও সে নিরস্ত হইত না; টুপটাপ করিয়া মুখে ফেলিয়া চোখ বুজিয়া রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকিত।

ছেলেরা কলরব করিত, ওই, অ্যাঁ—তুমি যে সব খেয়ে দিলে, অ্যাঁ! সে তাড়াতাড়ি ডালটা নাড়া দিয়া কতকগুলা ঝরাইয়া দিয়া আবার গোটা দুই মুখে পুরিয়া বলিত, আঃ!

কেহ হয়তো বলিত, বাঃ পূর্ণকাকা, তুমি যে খেতে লেগেছ? ঠাকুর পুজো করবে না?

পূর্ণ উত্তর দিত, ফল, ফল, ভাত মুড়ি তো নয়, ফল, ফল।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে দিন এ কাহিনী আরম্ভ, সেদিন স্থানীয় ধনী শ্যামাদাস বাবুর বাড়িতে এক বিরাট শান্তি-স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষে ছিল ব্রাহ্মণ-ভোজন। শ্যামাদাস বাবু সন্তানহীন, একে একে পাঁচ পাঁচটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা গিয়াছে। ইহার পূর্বে বহু অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার শ্যামাদাসবাবু বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রী শিবরাণী সজল চক্ষে অনুরোধ করিল, আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখ; তারপর আমি বারণ করব না; নিজে আমি তোমার বিয়ে দেব।

শিবরাণী তখন আবার সন্তানসম্ভবা। শ্যামাদাসবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শুধু তাই নয়, এবার তিনি এমন ধারা ব্যবস্থা করিলেন যে, সে ব্যবস্থা যদি নিষ্ফল হয় তবে যেন শিবরাণীর পুনরায় অনুরোধের উপায় আর না থাকে। কাশী, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর এবং স্বগৃহে একসঙ্গে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। স্বস্ত্যয়ন বলিলে ঠিক বলা হয় না, পুত্রেষ্টি যজ্ঞই বোধ হয় বলা উচিত।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনও বিপুল। শ্যামাদাসবাবু গলবস্ত্র হইয়া প্রতি পংক্তির প্রত্যেক ব্রাহ্মণটির নিকট গিয়া দেখিতেছেন—কি নাই, কি চাই। এক পাশে পূর্ণ চক্রবর্তীও বসিয়া গিয়াছে; সঙ্গে তাহার তিনটি ছেলে। কিন্তু পাতা অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি। বাড়তি পাতটিতে অন্ন ব্যঞ্জন মাছ স্তূপীকৃত হইয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাতাটি তাহার ছাঁদা; তাহার নাকি এটিতে দাবি আছে। সে-ই শ্যামাদাসবাবুর প্রতিনিধি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে, আবার আহারের সময় আহ্বান জানাইয়াও আসিয়াছে। তাহারই পারিশ্রমিক এটি। শুধু শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এবং এই ক্ষেত্র-বিশেষটিতেই নয়, এই কাজটি তাহার যেন নির্দিষ্ট কাজ, এখানে পঞ্চগ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়িতেই হউক এবং যত সামান্য আয়োজনের ব্রাহ্মণ-ভোজন হউক না কেন, পূর্ণ চক্রবর্তী আপনিই সেখানে গিয়া হাজির হয়; হাঁটু পর্যন্ত কোনরূপে ঢাকে এমনই বহরের তাহার পোষাকী কাপড়খানি পরিয়া এবং বাপ-পিতামহের আমলের রেশমের একখানি কালী-নামাবলী গায়ে দিয়া হাজির হইয়া বলে, হুঁ, তা কর্তা কই গো, নেমন্তন্ন কি রকম হবে একবার বলে দেন?

ওরে, মাছগুলো বেশ তেলুক তেলুক ঠেকছে! হুই হুই—। নিয়েছিল একুনি চিলে।

চিলটা উড়িতেছিল আকাশের গায়ে, পূর্ণ চক্রবর্তী সেটাকেই তাড়াইয়া গৃহস্থের হিতাকাঙ্খার পরিচয় দেয়। দুর্দান্ত শীতের গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া সে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরে; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরেও আহারের আহ্বান জানাইতে চক্রবর্তী ছেঁড়া চটি পায়ে, মাথায় ভিজা গামছাখানি চাপাইয়া কর্তব্য সারিয়া আসে; সেই কর্মের বিনিময়ে এটি তাহার পারিশ্রমিক। যাক।

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া পূর্ণকে বলিলেন, আর কয়েকখানা মাছ দিক চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর তখন খান-বিশেক মাছ শেষ হইয়া গিয়াছে; সে একটা মাছের কাটা চুষিতেছিল, বলিল, আজ্ঞে না, মিষ্টি-টিষ্টি আবার আছে তো! হরে ময়রার রসের কড়াইয়ে ইয়া ইয়া ছানাবড়া ভাসছে, আমি দেখে এসেছি।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, সে তো হবেই; একটা মাছের মুড়ো? পূর্ণ পাতাখানা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল ছোট দেখে। মাছের মুড়োটা শেষ করিতে করিতে ও-পাশে তখন মিষ্টি আসিয়া পড়িল!

চক্রবর্তী ছেলেদের বলিল, হুঁ, বেশ করে পাতা পরিষ্কার কর্ হুঁ। নইলে নোস্তা ঝোল লেগে খারাপ লাগবে খেতে। এঃ, তুই যে কিছুই খেতে পারলি না, মাছশুদ্ধ প'ড়ে আছে!—বলিয়া ছোট ছেলেটার পাতের আধখানা মাছও সে নিজের পাতে উঠাইয়া লইল। মাছখানা শেষ করিয়া সে গলাটা ঈষৎ উঁচু করিয়া মিষ্টি-পরিবেশনের দিকে চাহিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে হাঁকিতেছিল, এই দিকে।

ওপাশে সকলে তাহাকে দেখিয়া টেপাটেপি করিয়া হাসিতেছিল। একজন বলিল, চোখ দুটো দেখ, চোখ দুটো দেখ—

উঃ, যেন চোখ দিয়ে গিলছে! আমি তো ভাই, কখনও ওর পাশে খেতে বসি না। উঃ কি দৃষ্টি!

ততক্ষণে মিষ্টান্ন চক্রবর্তীর পাতার সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়াছে।

চক্রবর্তী মিষ্টান্ন-পরিবেশকের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল, ছাঁদার পাতে আমি আটটা মিষ্টি পাব।

বাঃ, সে তো চারটে ক'রে মিষ্টি পান মশায়!

সে দুটো ক'রে যদি পাতে পড়ে, তবে চারটে। আর চারটে যখন পাতে পড়ছে, তখন আটটা পাব না, বাঃ।

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া বলিলেন ষোলটা দাও ওর ছাঁদার পাতে। ভদ্রলোক বিনা মাইনেতে নেমন্তন্ন ক'রে আসেন ; দাও দাও ষোলটা দাও।

পূর্ণ চক্রবর্তী আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল, আঁচলে দাও, আমার আঁচলে দাও।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, চক্রবর্তী কাল সকালে একবার আসবে তো! কেমন, এখানে এসেই জল খাবে!

যে আজ্ঞা, তা আসব।

ওপাশ হইতে কে বলিল, চক্রবর্তী, বাবুকে ধরে প'ড়ে তুমি বিদূষক হ'য়ে যাও—আগেকার রাজাদের যেমন বিদূষক থাকত।

চক্রবর্তী গামছায় ছাঁদার পাতাটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, হুঁ। তা তোমার, হলে তো ভালই হয় ; আর তোমার, ব্রাহ্মণের লজ্জাই বা কি ? রাজা-জমিদারের বিদূষক হয়ে যদি ভাল-মন্দটা—

বলতে বলতে সে হাসিয়া উঠিল।

বাড়িতে আসিয়া ছাঁদা-বাঁধা গামছাটা বড় ছেলের হাতে দিয়া চক্রবর্তী বলিল, যা, বাড়িতে দিগে যা।

ছেলেটা গামছা হাতে লইতেই মেজো মেয়েটা বলিল, মিষ্টিগুলো ?

সে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যা।

অ্যাঁ, তুমি লুকিয়ে রাখবে। ষোলটা মিষ্টি কিন্তু গুনে নেবে, হ্যাঁ।

আরে আরে এ বলছে কি! ষোলটা কোথা রে বাপু! দিলে তো আটটা,—তাও কত ঝগড়া করে।

মা, মা, দেখ, বাবা মিষ্টিগুলো লুকিয়ে রেখেছে, অ্যাঁ।

চক্রবর্তী-গৃহিণী যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্র্যের শতমুখী আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই। দেহ শীর্ণ, চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র ; তবুও হৈমবতী যেন সত্যই হৈমবতী। কাঞ্চননিভ দেহবর্ণ দেখিয়া সোনার প্রতিমা বলিতেই ইচ্ছা করে। চোখ দুইটা আয়ত সুন্দর, কিন্তু দৃষ্টি তাহার নিষ্ঠুর মায়াহীন। মায়াহীন অন্তর ও রূপময়ী কায়া লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি, প্রভাতের পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতই প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠে।

হৈমবতী আসিয়া দাঁড়াইতেই চক্রবর্তী সভয়ে মেয়েকে বলিল, বলছি, তুই নিয়ে যেতে পারবি না ; না, মেয়ে চেঁচাতে—

হৈমবতী কঠোর স্বরে বলিল, দাও।

চক্রবর্তী আঁচলের খুঁটটি খুলিয়া হৈমর সম্মুখে ধরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছেলেটা বলিল, বাবাকে আর দিও না মা। আজ যা খেয়েছে বাবা, উঃ! আবার কাল সকালে বাবু নেমন্তন্ন করেছে, বাবাকে মিষ্টি খাওয়াবে।

হৈম কঠিন স্বরে বলিল, বেরো, বেরো বেরো বলছি আমার সম্মুখ থেকে হতভাগা ছেলে! বাপের প্রতি ভক্তি দেখ! তোরা সব মরিস না কেন, আমি যে বাঁচি!

পূর্ণ এবার সাহস করিয়া বলিল, দেখ না, ছেলের তরিবৎ যেন চাষার তরিবৎ।

হৈম বলিল, বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে, সেটুকুও ভাগ্যি—মেনো। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই, রোগে ওষুধ নাই, গায়ে জামা নেই, তবু—মরে না ওরা। রাক্ষসের ঝাড়, অখণ্ড পেরমাই!

চক্রবর্তী চুপ করিয়া রহিল। হৈম যেন আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া গেল। চক্রবর্তী ছেলেটাকে বলিল, দেখ দেখি রে, এক টুকরো হত্তুকি; কি সুপুরি এক কুচি যদি পাস্! তোর মার কাছে যেন চাস নি বাবা।

সন্ধ্যার পর চক্রবর্তী হৈমর কাছে বসিয়া ক্রমাগত তাহার তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। হৈম কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। চক্রবর্তী এবং ছেলেরা আজ নিমন্ত্রণ খাইয়াছে। রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা নাই, যে ছাঁদাটা আসিয়াছে, তাহাতে হৈম এবং কোলের ছেলেটারও চলিয়া গিয়াছে।

বহু তোষামোদেও হৈম যেন তেমন প্রসন্ন হইল না, অন্তত চক্রবর্তীর তাই মনে হইল; সে মনের কথা বলিতে সাহস পাইল না। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায়। তাহার তৃপ্তি হয় নাই, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্ধমান বহ্নি-শিখার মত জ্বলিতেছে।

ধীরে ধীরে হৈমবতী ঘুমাইয়া পড়িল। শীর্ণ দুর্বল দেহ, তাহার উপর আবার সে সন্তানসম্ভবা, সন্ধ্যার পরই শরীর যেন তার ভাঙিয়া পড়ে। চক্রবর্তী হৈমর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হাঁ, হৈম ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হৈমর আঁচল হইতে দড়িতে বাঁধা কয়টা চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই ছেলেরা নাচিতে নাচিতে চীৎকার করিতে আরম্ভ

করিল, ছানাবড়া খাব। বড় ছেলেটা ঘুর ঘুর করিয়া বারবার মায়ের কাছে আসিয়া বলিতেছিল, আমাকে কিন্তু একটা গোটা দিতে হবে মা।

হৈম বিরক্ত হইয়া বলিল, সব-সব – সবগুলো বের ক'রে দিচ্ছি, একটা কেন ?

সে চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একটা রূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে শিকাটাতে মিষ্টিগুলি ঝুলানো ছিল, সেটা কিসে কাটিয়া ফেলিয়াছে, মিষ্টান্নগুলি অধিকাংশই কিসে খাইয়া গিয়াছে, মাত্র গোটা তিন-চার মেঝের উপর পড়িয়া আছে, তাও সেগুলি রসহীন শুষ্ক, নিঃশেষে রস শোষণ করিয়া লইয়া ছাড়িয়াছে। ছেঁড়া শিকাটাকে সে একবার তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, কাটা নয়, টানিয়া কিসে ছিঁড়িয়াছে। অতি নিষ্ঠুর কঠিন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, গিন্নীর একান্ত ইচ্ছে যে, তুমি এবার তাঁর আঁতুড়-দোরে থাকবে।

এখানকার প্রচলিত প্রথায় সূতিকা-গৃহের দুয়ারের সম্মুখে রাত্রে ব্রাহ্মণ রাখিতে হয়। চক্রবর্তীর সন্তানদের মধ্যে সবকটিই জীবিত ;চক্রবর্তী-গৃহিণী নিখুঁত প্রসূতি; তাহার সূতিকা-গৃহের দুয়ারে চক্রবর্তী শুইয়া থাকে। তাই শিবরাণী এবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, কল্যাণের এমনই সহস্র খুঁটিনাটি লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত। শ্যামাদাসবাবু তাহার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন না।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ তা আজ্ঞে—

একজন মোসাহেব বলিয়া উঠিল, তা না না—কিছু নেই চক্রবর্তী। দিব্যি এখানে এসে রোজ ভোগ খাবে রাত্রে, ইয়া পুরু বিছানা, তোফা ভরা পেটে, বুঝেছ ?—বলিয়া সে ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকাইয়া ফেলিল।

আহার ও আরামের বর্ণনায় পুলকিত চক্রবর্তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হুঁ, তা হুজুর যখন বলছেন, তখন না পারলে হবে কেন ?

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, ব'স তুমি, আমি জল খেয়ে আসছি। তোমারও জলখাবার আসছে।—বলিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একজন চাকর একখানা আসন পাতিয়া দিয়া মিষ্টান্ন-পরিপূর্ণ একখানা থালা নামাইয়া দিল।

একজন বলিল, খাও চক্রবর্তী।

হুঁ। তা একটু জল, হাতটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

আর একজন পারিষদ বলিল গঙ্গা গঙ্গা বলে বসে পড় চক্রবর্তী। অপবিত্রো পবিত্রো বা, ওঁ বিষ্ণু স্মরণ করলেই—বাস্ শুদ্ধ, ব'সে পড়।

গ্লাসের জলেই একটা কুলকুচা করিয়া খানিকটা হাতে বুলাইয়া লইয়া চক্রবর্তী লোলুপভাবে থালার সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

পাশের ঘরে জলযোগ শেষ করিয়া আসিয়া শ্যামাদাসবাবু বললেন, পেট ভরল চক্রবর্তী ?

চক্রবর্তীর মুখে তখন গোটা একটা ছানাবড়া। একজন বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, কথা বলবার অবসর নেই চক্রবর্তীর এখন।

সেটা শেষ করিয়া চক্রবর্তী বলিল, আজ্ঞে, পরিপুন্ন, তিল ধরবার জায়গা নেই আর পেটে।

সে উঠিয়া পড়িল!

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, তোমার কল্যাণে যদি মনস্কামনা আমার সিদ্ধ হয় চক্রবর্তী, তবে দশ বিঘে জমি আমি তোমাকে দেব! আর আজীবন তুমি সিংহ-বাহিনীর একটা প্রসাদ পাবে। তাহ'লে তোমার কথা তো পাকা, কেমন ?

সিংহবাহিনীর প্রসাদ কল্পনা করিয়া চক্রবর্তী পুলকিত হইয়া উঠিল। সিংহ-বাহিনীর ভোগের প্রসাদ—সে যে রাজ-ভোগ!

হুঁ তা পাকা বই কি। হুজুরের—

কথা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, দেখি, দেখি, ওহে দেখি।

চোখ তাহার যেন জলজল করিয়া উঠিল।

খানসামাটা শ্যামাদাসবাবুর উচ্ছিষ্ট জলখাবারের থালাটা লইয়া সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। একটা অভুক্ত ক্ষীরের সন্দেশ ও মালপোয়া থালাটার উপর পড়িয়াছিল। চক্রবর্তীর লোলুপতা অকস্মাৎ যেন সাপের মত বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উদ্গার করিল। চক্রবর্তী স্থান কাল সমস্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিল, দেখি দেখি, ওহে দেখি দেখি।

শ্যামাদাসবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, কর কি, এঁটো, ওটা এঁটো। নতুন এনে দিক।

চক্রবর্তী তখন থালাটা টানিয়া লইয়াছে। ক্ষীরের সন্দেশটা মুখে পুরিয়া বলিল, আজ্ঞে রাজার প্রসাদ। আর সে বলিতে পারিল না, আপনার অন্তারটা

পরমুহূর্তে তাহার বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আর উপায় ছিল না, বাকিটাও আর ফেলিয়া রাখা চলে না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেটাও কোনরূপে গলাধঃ-করণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের ছুতা করিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়িতে তখন মরুতে যেন ঝড় বহিতেছে। হৈম মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ছেলেগুলো কাঁদিতেছে। বড়টা কোথায় পলাইয়াছে।

মেজো মেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিষ্টিগুলো কিসে খেয়ে দিয়েছে, তাই দাদা ঝগড়া ক'রে মাকে মেরে পালাল। মা পড়ে গিয়ে—

কথার শেষাংশ তাহার কান্নায় ঢাকিয়া গেল। চক্রবর্তীর চোখে জল আসিল। জলের ঘটি ও পাখা লইয়া সে হৈমর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে করিতে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চেতনা হইতেই হৈম স্বামীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি ছি। তোমাকে কি বলব আমি—ছিঃ।

চক্রবর্তী হৈমর পা জড়াইয়া ধরিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল, মাথা ঠুকে মরব আমি, ছাড়, পা ছাড়।

সমস্ত দিন হৈম নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার দিকে সে সুস্থ হইয়া উঠিলে চক্রবর্তী সমস্ত কথা বলিয়া কহিল, তোমার বলছ আবার ওই সময়েই! তা হ'লে না হয় কাল ব'লে দেব যে, পারব না আমি।

হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল, না না না। মরুক, মরুক হয়ে মরুক আমার, আমি খালাস পাব। জমি পেলে অন্যগুলো তো বাঁচবে।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই। সেদিন সন্ধ্যায় শ্যামাদাসবাবুর লোক আসিয়া চক্রবর্তীকে ডাকিল, চলুন আপনি, গিন্নীমায়ের প্রসব-বেদনা উঠেছে।

চক্রবর্তী বিব্রত হইয়া উঠিল; হৈমরও শরীর আজ কেমন করিতেছে।

হৈম বলিল, যাও তুমি।

কিন্তু—

আমাকে আর জ্বালিও না বাপু, যাও। বাড়িতে বড় খোকা রয়েছে, যাও, তুমি।

চক্রবর্তী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। জমিদার বাড়ি তখন লোক-জনে ভরিয়া গিয়াছে। শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, এস চক্রবর্তী এস। আমি বড় ব্যস্ত এখন। তুমি রান্নাবাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিও।

চক্রবর্তী সটান গিয়া তখনই রান্নাশালে উঠিল।

হুঁ, ঠাকুর, কি রান্না হয়েছে আজ, বাঃ খোসবুই তো খুব উঠছে! কি হে ওটা, মাছের কালিয়া, না মাংস?

মাংস। আজ মায়ের পুজো দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে কি না।

হুঁ, তা তোমার রান্নাও খুব ভাল। তার ওপর তোমার বাদলার দিন। কতদুর, বলি দেরি কত? দাও না. দেখি একটু চেখে।

সে একখানা শালপাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙা করিয়া একেবারে কড়াই ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা লোভ তোমার কিন্তু চক্রবর্তী।

হুঁ তা বলেছ ঠিক। তা একটু বেশি। তা বটে।

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল, সিদ্ধ হতে দেরি আছে নাকি?

হাতাতে করিয়া খানিকটা অর্ধসিদ্ধ মাংস তাহার ঠোঙাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, এই দেখ, বললে তো বিশ্বাস করবে না। নাও, হুঁ।

সেই গরম ঝোলই খানিকটা সড়াৎ করিয়া টানিয়া লইয়া চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, বাঃ, ঝোলটা বেড়ে হয়েছে। হু তা তোমার রান্না যাকে বলে, উৎকৃষ্ট।

ঠাকুর আপন মনেই কাজ করিতেছিল, সে কোন উত্তর দিল না।

চক্রবর্তী আবার বলিল, হুঁ। তা তোমার, এ চাকলার তো কাউকে জুড়ি দেখলাম না। মাংসটা সিদ্ধ এখনও হয় নি। তবে তোমার গিয়ে খাওয়া চলছে।

ঠাকুর বলিল, চক্রবর্তী, তুমি এখন যাও এখান থেকে। খাবার হ'লে খবর দেবে চাকরেরা। আমাকে কাজ করতে দাও। যাও, ওঠ।

চক্রবর্তী উঠিত কি না সন্দেহ। কিন্তু এই সময়ই তাহার বড় ছেলেটা আসিয়া ডাকিল, বাবা!

চক্রবর্তী উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি রে?

একবার বাড়ি এস। ছেলে হয়েছে।

তোর মা—তোর মা কেমন আছে? ভালই আছে গো। তবে দাই-টাই কেউ নেই, দাই এসেছে বাবুদের বাড়ি; নাড়ি কাটতে লোক চাই।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি ছেলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

হৈম!

ভয় নেই, ভালই আছি। তুমি শুদ্দুরদের দাইকে ডাক দেখি, নাড়ী কেটে দিয়ে যাক। আমাদের দাইকে তো পাওয়া যাবে না।

তাহাই হইল। দাইটা নাড়ী কাটিয়া বলিল, সোন্দর খোকা হয়েছে বাপু, তা-বাপ সোন্দর না হইলে কি ছেলে সোন্দর হয়! মা কেমন—তা দেখতে হবে!

হৈম বলিল, যা যা বকিস নি বাপু; কাজ হ'ল তোর, তুই যা।

চক্রবর্তী বলিল, হু, তা হ'লে, তাই তো! খোকা যাক, ব'লে আসুক বাবুকে, অন্য লোক দেখুন ওঁরা।

হৈম বলিল, দেখ জ্বালিও না আমাকে; যাও বলছি যাও।

চক্রবর্তী আবার অন্ধকারের মধ্যে বাবুদের বাড়ির দিকে চলিল।

মধ্যরাত্রে জমিদার বাড়ি শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শিবরাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

পূর্ব হইতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত ছিল, সে-ই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নাড়ী কাটিল। গরম জলে শিশুর শরীরের ক্লেদাদি ধুইয়া মুছিয়া দাইয়ের কোলে শিশুটিকে সমর্পণ করিয়া সে যখন বিদায় লইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রভাতে চক্রবর্তী বাড়ি আসিতেই হৈম বলিল, ওগো, ছেলেটার ভোর-রাত্রে যেন জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে।

চক্রবর্তী চমকিয়া উঠিল, বলিল, হুঁ, তা—

অবশেষে অনুযোগ করিয়া বলিল, বললাম তখন, যাব না আমি। তা তুমি একেবারে আগুন হয়ে উঠ্‌লে! কিসে যে কি হয়—হুঁ।

হৈম বলিল, ও কিছু না, আপনি সেরে যাবে। এখন পয়সা-টাকের সাবু কি দুধ যদি পাও তো দেখ দেখি। আমাকে কাটলেও তো এক ফোটা দুধ বেরুবে না।

পয়সা ছিল না, চক্রবর্তী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবুদের বাড়ির দিকেই চলিল, দুধের জন্য। কাছারি-বাড়িতে ঘটিটি হাতে দাঁড়াইয়া সে বাবুকে খুঁজিতেছিল। বাবু ছিলেন না। লোকজনও সব ব্যস্তসমস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে। কেহ চক্রবর্তীকে লক্ষ্যই করিল না।

খানসামাটা বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিল, সে চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আজ আর পেসাদ-টেসাদ মিলবে না ঠাকুর, যাও, বাড়ি যাও।

চক্রবর্তী ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। একজন

নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য একটা আড়াল দেখিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল, চক্রবর্তী তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ, বাবা, ছেলের জন্য গাই দোয়া হয় নি ?

সে উত্তর দিল, কেন ঠাকুর, ধারস্ত খাবে না কি। আচ্ছা পেটুক ঠাকুর যা হোক। না, গাই দোয়া হয় নি ; বাড়িতে ছেলের অসুখ, ওসব হবে না এখন, যাও।

শিশুর অসুখ বোধ হয় শেষ রাত্রেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোঝা যায় নাই। সারারাত্রিব্যাপী যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শিবরাণীও এলাইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রি-জাগরণক্লিষ্টা দাইটাও ঘুমাইয়াছিল।

প্রভাতে, বেশ একটু বেলা হইলে, শিবরাণী উঠিয়া বসিয়া ছেলে কোলে লইয়াই আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিল। এ কি, ছেলে যে কেমন করিতেছে। তাহার পূর্বের সন্তানগুলি তো এমনিভাবেই—! চোখের জলে শিবরাণীর বুক ভাসিয়া গেল। শিশুর শুভ্রপুষ্পতুল্য দেহবর্ণ যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শিবরাণী আর্তস্বরে ডাকিল, যমুনা, একবার ডেকে দে তো।

শ্যামাদাসবাবু আসিতেই সে বলিল, ডাক্তার ডাকাও, ছেলে কেমন হয়ে গেছে ! সেই অসুখ।

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দুর্গা দুর্গা !

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। স্থানীয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল এবং তাহার পরামর্শমত সহরেও লোক পাঠানো হইল বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শিবরাণীর আশঙ্কা সত্য ; সত্যই শিশু অসুস্থ। ধীরে ধীরে শিশুর দেহবর্ণ হইতে আকৃতি পর্যন্ত যেন কেমন অস্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। এই সর্বনাশা রোগেই শিবরাণীর শিশুগুলি এমনি করিয়াই সূতিকা-গৃহে একে একে বিনষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্ণে সদর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া শিশুকে কিছুক্ষণ দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চলুন, আমার দেখা হয়েছে।

দাইটা বলিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু ছেলে—

তাহার প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই ডাক্তার বলিল, ওষুধ দিচ্ছি।
শ্যামাদাস বাবুর সঙ্গে ডাক্তার বাহির হইয়া গেল।

শ্যামাদাসবাবুর মাসীমা সূতিকা-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাইকে বলিলেন, কই ছেলে নিয়ে আয় তো দেখি।

ছেলের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আ আমার কপাল রে!—বলিয়া ললাটে করাঘাত করিলেন। ঘরের মধ্যে শিবরাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

মাসীমা আপন মনেই বলিলেন, আরও বার করে দিতে হয়েছে কি করেই বা বলি! আর পোয়াতীর কোলেই বা—

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুকে বলিল, কিছু মনে করবেন না শ্যামাদাসবাবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বলুন।

ডাক্তার, শ্যামাদাসবাবুর যৌবনের ইতিহাস প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া বলিল. আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওই হল আপনার সন্তানদের অকাল-মৃত্যুর কারণ।

তা হ'লে ছেলেটা কি—

না, আশা আমি দেখি না।—বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইল।

শ্যামাদাসবাবু বাড়ির মধ্যে—আসিতেই মাসীমা আপনার মনের কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, নইলে কি পোয়াতীর কোলে ছেলে মরবে? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা। আচার-আচরণগুলোও মানতে হবে তো।

আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোন প্রয়োজন হয় না; এবং হিন্দুর সংসারে আচারের উপরেই নাকি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরাণীর কোল শূন্য করিয়া দিয়া শিশুকে সূতিকা-গৃহের বাহিরে বারান্দায় মৃত্যু-প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার কাছে রহিল দাই এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নির্মাল্যের রাশি। ঘরের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা শিবরাণীর সেবা ও সান্ত্বনার জন্য রহিল যমুনা ঝি।

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি। চক্রবর্তী বসিয়া ঘন ঘন তামাক খাইতেছিল। তাহার ঘরেও শিশুটি অসুস্থ। কিন্তু সে সারিয়া উঠিবে। চক্রবর্তী মধ্যে মধ্যে আপন মনেই বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, বিধিলিপি! তাহার শিশুটা মরিয়া যদি এটি বাঁচিত, তবে চক্রবর্তী অন্তত বাঁচিত। দশ বিঘা জমি আর সিংহবাহিনীর প্রসাদ নিত্য এক থালা। ভাগ্যের চিকিৎসা কি আর ডাক্তারে করিতে পারে!

শিশুটি মধ্যে মধ্যে ক্ষীণকণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। চক্রবর্তী দাইটাকে বলিল, "একটু জল-টল মুখে দেরে বাপু"

নিদ্রাকাতর দাইটা বলিল, "জল কে খাবে গো ঠাকুর? তা বলছ, দিই।" সে উঠিয়া ফোঁটা দুই জল দিয়া শিশুর অধর ভিজাইয়া দিল। তারপর শুইতে শুইতে বলিল, "ঘুমোও ঠাকুর, তোমার কি আর ঘুম-টুম নাই?"

চক্রবর্তীর চক্ষে সত্যই ঘুম নাই। সে বসিয়া আকাশজোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশও এমনি অন্ধকার। আঃ, ছেলেটা যদি মহামন্ত্রে বাঁচিয়া ওঠে! চক্রবর্তী পৈতা ধরিয়া শিশুর ললাট-খানি স্পর্শ করিল।

অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপে।

না, না, সে হয় না। জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। সে আবার তামাক খাইতে বসিল।

দাইটা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। ঘরের মধ্যেও শিবরাণীর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি আর শোনা যায় না। কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন তাহার আগুন জ্বলিতেছে।

উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মূর্তি, তাহার শিশুও কুৎসিৎ নয়, দরিদ্রের সন্তান হইলেও জননীর কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার সন্তানের হইবে। উঃ!

পাপ যেন সম্মুখে অদৃশ্য কায়া লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চক্রবর্তীর চোখের সম্মুখে ঝলমল করিতেছে। চক্রবর্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুর নিকট আসিয়া কিন্তু তাহার ভয় হইল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। পরমুহূর্তে সে মৃতপ্রায় শিশুকে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল।

অদ্ভুত সে যেন চলিয়াছে অদৃশ্য বায়ুপ্রবাহের মত। নিঃশব্দ, দ্রুত গতিতে। অন্ধকার পথেও আজ সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ, কেহ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করে না। তাহারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভাঙ্গা ঘর। চারিদিকে প্রাচীরও সর্বত্র নাই। হৈমর সূতিকা গৃহের দরজাও নাই, একটা আগড় দিয়া কোনরূপে আগলানো আছে। হৈমও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

চক্রবর্তী আবার বাতাসের মত লঘু ক্ষিপ্রগতিতে ফিরিল।

দাইটা তখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

*　　　　*　　　　*

রোগগ্রস্ত শিশু, মৃত্যুরোগগ্রস্ত নয়। সে থাকিতে থাকিতে অপেক্ষাকৃত সবল ক্রন্দনে আপনার অভিযোগ জানাইল। দাইটার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না। চক্রবর্তী ঘুমের ভান করিয়া কাঠ মারিয়া পড়িয়া রহিল।

শিশু আবার কাঁদিল।

ঘরের মধ্যে শিবরাণীর অস্ফুট ক্রন্দন এবার যেন শোনা গেল।

শিশু আবার কাঁদিল।

এবার যমুনা ঈষৎ দরজা খুলিয়া বলিল—দাই, ও দাই! ওমা, নাক ডাকৃছে যে! ঠাকুরও দেখছি মড়ার মত ঘুমিয়েছে। ও দাই!

দাইটা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

যমুনা বলিল, "এই বুঝি তোর ছেলে আগলানো? ছেলে যে কাতরাচ্ছে, মুখে একটু করে' জল দে।"

দাইটা তাড়াতাড়ি শিশুর মুখে জল দিল, শুষ্ককণ্ঠ শিশু ঠোঁট চাটিয়া জলটুকু পান করিয়া আবার যেন চাহিল। দাই আবার দিল। এবার সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "ওগো, জল খাচ্ছে গো, ঠোঁট চেটে, চেটে!"

শিবরাণী দুর্বল দেহে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে আয়, ঘরে নিয়ে আয় আমার ছেলে। কারুর কথা আমি শুনব না।"

প্রভাতে আবার লোক ছুটিল সদরে। এবার অন্য ডাক্তার আসিবে। মৃত্যু-দ্বার হইতে শিশু ফিরিয়াছে। দেবতার দান, ব্রাহ্মণের প্রসাদ! চক্রবর্তী নাকি আপন শিশুর পরমায়ু রাজার শিশুকে দিয়াছে! হতভাগ্যের সন্তানটী মারা গিয়াছে। প্রায়ান্ধকার সূতিকা-গৃহে শিবরাণী জ্বর-কাতর শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাগ্যদেবতা তাহার হারান মাণিক।

*　　　　*　　　　*

দশ বিঘা জমি চক্রবর্তী পাইল। সিংহ-বাহিনীর প্রসাদও এক থালা করিয়া নিত্য সে পায়। হৈম অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্তী সেই তেমনই করিয়া বেড়ায়।

লোকে বলে স্বভাব যায় না ম'লে। চক্রবর্তী বলে "হুঁ, তা বটে। কিন্তু ছেলের দল দেখেছ, এক একটা ছেলে যে একটা হাতীর সমান।"

হৈম ছেলেগুলিকে স্কুলে দিয়াছে। বড় ছেলেটা এখন ইতরের মত কথা বলে না, কিন্তু বড় বড় কথা বলে, "বাবার ব্যবহারে স্কুলে আমার মুখ দেখান ভার মা। ছেলেরা যা তা বলে। কেউ বলে ভাঁড়ের বেটা খুরি। কেউ কেউ আবার দেখলেই সড়াৎ ক'রে মুখে ঝোল টানে। তুমি বাপু বারণ করে দিও বাবাকে।"

হৈম সে কথা বলিতেই চক্রবর্তী সহসা যেন আগুনের মত জলিয়া উঠিল। তাহার অস্বাভাবিক রূপ দেখিয়া হৈমও চমকিয়া উঠিল।

চক্রবর্তী বলিল, "চলে যাব আমি সন্নেসী হয়ে।"

ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু বাহির হইতে কে ডাকিল "চক্রবর্তী।"

"কে ?"

"বাঁড়ুজ্জেরা পাঠালে হে। ওদের মেয়ের বাড়ী তত্ব যাবে। তোমাকে যেতে হবে ; ওরা কেউ যেতে পারবে না। লাভ আছে হে, ভাল মন্দ খাবে, বিদেয়টাও পাবে।"

"আচ্ছা চল যাই।"

চক্রবর্তী বাহির হইয়া পরিল। বাঁড়ুজ্জের বাড়ী গিয়া যেখানে মিষ্টি তৈয়ারী হইতেছিল, সেখানে চাপিয়া বসিয়া বলিল, "ব্রাহ্মনস্য ব্রাহ্মনং গতি। হুঁ তা যেতে হবে বৈকি। উনুনের আঁচটা একটু ঠেলে দিই, কি বল মোদক মশাই ?"

সে সতৃষ্ণ নয়নে কড়াইয়ের পাকের দিকে চাহিয়া রহিল।

* * *

বৎসর দশেক পর শিবরাণী হঠাৎ মারা গেল। লোকে বলিল—ভাগ্যবতী, স্বামী-পুত্তুর রেখে ডঙ্কা মেরে চলে গেল।

শ্যামাদাসবাবু—শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিপুল আয়োজন করিলেন। চক্রবর্তীর এখন ওইখানেই বাসা হইয়াছে। সকাল বেলাতেই টুক টুক করিয়া গিয়া হাজির হয়, বসিয়া বসিয়া আয়োজনের বিলিবন্দোবস্ত দেখে, মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে।

সেদিন বলিল—"হুঁ, ছাদা একটা করে তো দেওয়া হবে। তা তোমার লুচিই বা ক'খানা, আর তোমার মিষ্টিই বা কি রকম হবে ?"

একজন উত্তর দিল—"হবে, হবে, একখানা করে লুচি এই চালুনের মত। আর মিষ্টি একটা করে, তোমার লেডিকেনী, এই পাশ বালিশের মত, বুঝলে ?"

সকলে মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল। শ্যামাদাসবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "একটু থামতো, সব। হ্যাঁ, কি হল, পাওয়া গেল না ?"

একজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি কথা কহিতেছিলেন। কর্মচারিটী বলিল, "আজ্ঞে, তাদের বংশই নির্বংশ হয়ে গিয়েছে।"

"তাহলে অন্য জায়গায় লোক পাঠাও। অগ্রদানী না হলে তো শ্রাদ্ধ হয় ন আচ্ছা তাই দেখি। অগ্রদানী তো বড় বেশি নেই, দশ বিশ ক্রোশ অন্তর এক ঘর আধ ঘর।"

কে একজন বলিয়া উঠিল "তা আমাদের চক্রবর্তী রয়েছে। চক্রবর্তী নাও না কেন দান, ক্ষতি কি ? পতিত করে আর কে কি করবে—তোমার ?"

শ্যামাদাসবাবুও ঈষৎ উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মন্দ কি চক্রবর্তী ! শুধু দান সামগ্রী নয়, ভূসম্পত্তিও কিছু পাবে, পঁচিশ বিঘে জমি দেব আমি, আর তুমি যদি রাজি হও, তবে বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা দেব আমি, দেখ।" বলিয়াই তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া চাকরকে ডাকিলেন, "ওরে, চক্রবর্তীকে জলখাবার এনে দে। কলকাতার কি মিষ্টি আছে নিয়ে আয়।"

শ্রাদ্ধের দিন সকলে দেখিল, শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিবরাণীর শ্রাদ্ধ করিতেছে, আর তাহার সম্মুখে অগ্রদান গ্রহণ করিবার জন্য দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে পূর্ণ চক্রবর্তী।

তারপর গোশালায় বসিয়া তাহারই হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চক্রবর্তী গোগ্রাসে পিণ্ড ভোজন করিল।

গল্পের এইখানেই শেষ। কিন্তু চক্রবর্তীর কাহিনী এখানে শেষ নয়। সেইটুকু না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

লোভী, আহার—লোলুপ চক্রবর্তী আপন সন্তানের হাতে পিণ্ড ভোজন করিযাও তৃপ্ত হয় নাই। লুব্ধ দৃষ্টি, লোলুপ রসনা লইয়া সে তেমনই করিয়াই ফিরিতেছিল। এই শ্রাদ্ধের চৌদ্দ বৎসর পর সে একদিন শ্যামাদাসবাবুর পায়ে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল। শ্যামাদাসবাবু তাঁহার দুই বৎসরের পৌত্রকে কোলে করিয়া শুষ্ক অশ্বত্থ তরুর মত দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চক্রবর্তী তাঁহার দুইটী পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "পারব না বাবু, আমি পারব না।"

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন 'না পারলে উপায় কি, চক্রবর্তী ? আমি বাপ হয়ে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে,—তার বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে পারবে আর তুমি পারবে না বললে চলবে কেন, বল, দশ বিশ বিঘে জমি তুমি এতেও পাবে।'' শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিশুপুত্র ও পত্নী রাখিয়া মারা গিয়াছে। তাহারই শ্রাদ্ধ হইবে।

চক্রবর্তী নিরুপায় হইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল।

পুরোহিত বলিল, "খাও হে চক্রবর্তী।''

॥ —শ্রেষ্ঠ-গল্প ॥

মেহেদি গাছের বেড়ার ওপারে চন্দ্রবাবুর বাড়ির একটি জানালা। প্রায় সব সময় একটি মেয়েকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটীর নাম মালা বিশ্বাস। চন্দ্রবাবুর মেয়ে। শহরের সকলেই একে চেনে।

জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা, মেয়ে হয়ে দুর্নাম কেনার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। মালা বিশ্বাসের চাল চলনে যেন মাত্রা নেই। দুর্নামও তাই এককালে মাত্রা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন লোকনিন্দার সেই অশান্ত গুঞ্জন কিছুটা থিতিয়ে গেছে। চন্দ্রবাবুর বাড়ির মেহেদি গাছের বেড়া, ফটকের ল্যাম্প পোষ্ট, আর পথের কাছে মাকাল গাছটা—এসবের মতই জানালার কাছে মালার দাঁড়িয়ে থাকাটাও এখন একটা নিছক নিসর্গ—শোভা মাত্র।

মালা তাকিয়ে দেখে সবাইকে। ফেরীওয়ালারা যায়, পুলিশ লাইনের সেপাইরা যায়। কেউ তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয় না। বেলা সাড়ে দশটায় পথ ভর্তি করে স্কুলের ছাত্র আর কাছারীর বাবুরা যায়। হাটের দিনে পথে ভীড় হয় আরও বেশী। দুপুরের রোদে পথের ধুলো ক্ষেপে আঁধি ওঠে, কখনও বৃষ্টি নামে। মালা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে জানালার ধারে। কখনও বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছেলের দল জটলা করে। মালা তবু সরে যায় না। এ এক সমস্যার কথা—একি শুধু দেখার নেশা? অথবা দেখা দেওয়ার নেশা?

ঘরের বাইরেও মালা বিশ্বাসকে দেখা যায়। কখনও বেড়াতে বার হয়, কখনও বা অকারণেই ঘুরে আসে। তাই সে প্রায় সকলেরই চেনা। সকলেই চেনে মালা বিশ্বাসের মুখের বসন্তের দাগগুলি, কালো মোটা চেহারা, চোখে অদ্ভুত রকমের চশমা, হাতে ছাতা, সঙ্গে চাকর রামজীবন। তার শাড়ি, রঙের বৈচিত্র্যে আর পরবার কায়দায় হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মত। পথে যেতে হঠাৎ মালা একবার থামে গ্রামোফোনের দোকানের সামনে। রামজীবন গিয়ে কয়েকটা রেকর্ডের দাম জিজ্ঞেস করে আসে। কখনও থামে গুরুদাসের ঘড়ির দোকানের কাছে—রামজীবন অনুসন্ধান করে, ভাল হাতঘড়ি আছে কিনা।

আড়ালে থাকতে মালা বোধ হয় হাঁপিয়ে ওঠে। শুধু ভীড় খোঁজে, যদিও ভীড়ের মধ্যে ঠিক মিশতে পারে না। বারোয়ারী তলায় যাত্রাগানের আসরে বর্ষীয়সী মহিলারা বসেন চিকের আড়ালে। ছোট মেয়েরা বসে চিকের বাইরে

দু'সারি বেঞ্চে। মালা বসে চিকের বাইরেই, ভিন্ন একটা চেয়ারে, একটু এগিয়ে —সবা হতে দূরে।

মেয়ে স্কুলের বার্ষিক উৎসবে মালা বিশ্বাসও এসেছিল। সকলে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে দেখেছিল, তার গলার প্রকাণ্ড সাঁওতালী হাঁসুলীটা। আশ পাশ থেকে নানারকম ঠাট্টাভরা টিপ্পনি টিক্ টিক্ করে উঠলো। কিন্তু ওসব মন্তব্য মালার কানেই আসে না।

ভাদ্রের ঠিক মাঝামাঝি এসে আকাশ ভরা বর্ষার ঘটা একেবারে থেমে গেল। রাণীঝিলের মাঠের ঘাসে, কালো পাথরের টিলাতে, টেলিগ্রাফের তারে, দূরের নিম-বনের চূড়ায় প্রথম শরতের আলো চিক্ চিক্ করে উঠলো ছোট ছেলের হাসির মত।

ঝাপ্সা হয়েছিল সারা শহরের প্রাণ, আড়াই মাস ধরে। আজ আবার আলোয় চম্‌কে উঠেছে রঙীন আয়নার মত। শিকল দেওয়া প্রাণগুলি ছাড়া পেল ঘরে ঘরে। নিঝুম শহরটা সাড়া দিল আবার।

রাণীঝিলের মাঠে বেড়িয়ে ফেরার মরসুম এল। একটা দেওদারের নীচে দেখা যায় হরিজন স্কুলের ছেলেরা ড্রিল করছে। আয়ার দল ঘুরছে পেরাম্বুলেটার টেনে। শরৎবাবু ও কান্তিবাবু, বিহার জুডিসিয়ারির দু'টী রিটায়ার্ড মানুষ, লাঠি হাতে একসঙ্গে পা ফেলে চলেছেন বাঁধের লাল কাঁকরের সড়ক ধরে।

রাণীঝিলের নতুন বাতাস আজ ডাক দিয়েছে সবাইকে। হাসপাতাল রোড ধরে সপরিবারে লালবাগের ভদ্রলোকেরা বেড়াতে আসছেন। গল্‌ফের লাঠি হাতে মুখে পাইপ কামড়ে আসছে সামুয়েল সাহেব। মালা বিশ্বাসও বেড়াতে এসেছে, খোঁপায় জড়ানো প্রকাণ্ড একটা রঙীন রুমাল উড়ছে বাতাসে।

সকলে একবার থমকে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে, ছোট একটা কালো পাথরের টিলা, তার গা ঘেঁসে একটা করবী গাছ। এই পাথরটা ক্রস রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে। কোন দিন এর দিকে তাকিয়ে দেখার মত কিছু ছিল না। গরু চরাতে এসে রাখালেরা কোন দুপুরে মাঝে মাঝে এখানে ভাত খেতে বসে।

সকলেই একবার দাঁড়াচ্ছিল সেখানে। জায়গাটা পার হতে অন্তত দু'তিন মিনিট সময় লাগছিল সবারই। পাথরটার ওপর বড় বড় হরপে সাদা খড়ি দিয়ে গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে নানা ছন্দে কিসব লেখা। পথচারী সকলেই, কেউ একা

কেউ সন্দেহে চোখভরা দুরন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ছিল লেখাগুলি। প্রথম শরতের সকাল বেলা এই পথে-পড়ে-থাকা পাথরটার গায়ে কে ছড়িয়ে গেল এমন এক মুঠো রোমান্স!

বেশীক্ষণ কেউ দাঁড়াচ্ছিল না সেখানে। তা সম্ভবও ছিল না। পড়ে নাও আর সরে পড়। লেখাগুলি ভয়ানক রকমের অশ্লীল।

শুধু তাই নয় দেখা যাচ্ছে, কথাগুলি সবই একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে লেখা। শুধু নাম থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কাদের বাড়ির মেয়ে। এই নিদারুণ পরিচয়-লিপির অনেক কিছু বাদ দিলে সংক্ষেপে তাকে এইটুকু শুধু চেনা যায়:

—পূর্ণিমা বসু। রূপে আর নামে এমন মিল আর দেখা যায় না। তুমি নাকি গয়না ভালবাস না। লজ্জাই তোমার ভূষণ, খুব সত্যি কথা। ছ'মাস চেষ্টা করে একটি বার শুধু তোমায় চোখে দেখতে পেয়েছি। জানি তোমার চিঠি আসে ভিয়েনা থেকে। তিনি ভাল আছেন তো? আর এক যক্ষ যে সিমলা পাহাড়ে হাঁ করে বসে আছেন। ক'দিক্ সামলাবে? যাচ্ছ কবে? যখন তখন ওভাবে হাই তুলতে নেই, বড় বিশ্রী দেখায়।

কে লিখেছে কে জানে! এই অজানা অশ্লীল কুৎসাবিশারদের লেখাগুলি মৌচাকে ঢিলের মত শহরের বুকে এসে লাগলো। তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেক ঘরে ও বৈঠকে, নিভৃতে ও নেপথ্যে গুন্ গুন্ করে উঠলো শুধু এই প্রসঙ্গ—কালো পাথরের লেখা।

শুধু এই প্রশ্ন, কে লিখলো? কে পূর্ণিমা বসু? কথাগুলি কি সত্যি? মনে মনে, মুখে মুখে, আলাপে আলোচনায়, সন্দেহে ও সন্ধানে এক প্রচণ্ড কৌতূহল যেন পরোয়ানা হয়ে ছুটলো চারদিকে। এই প্রশ্নের উত্তর চাই।

প্রথম কৌতূহলের বিকার একটু শান্ত হয়ে এল। পূর্ণিমা বসুর পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ দুবছর হলো পুরণো গির্জার দক্ষিণে যে নতুন বাড়িটা তৈরী হয়েছে, সেই বাড়ির মালিকের নাম মহীতোষবাবু। মহীতোষবাবুর মেয়ে পূর্ণিমা। ক'জনই বা এদের চেনে! লতা-মোড়া উঁচু প্রাচীর দিয়েই ঘেরা থাকে এঁদের বড়মানুষী বনিয়াদ। এঁরা অগোচর। তার মধ্যে পূর্ণিমা বসুকে একরকম অলীক বললেই হয়। কিন্তু সেও আজ সব জানা—অজানার ব্যবধান ঘুচিয়ে নতুন আবিষ্কারের মত সবার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

নিশ্চয় নতুন কেউ একজন এসেছে এ'শহরে। যেই হোক, পূর্ণিমা বসুর ওপর

তার এত আক্রোশ কেন? এ কি কোন বিগত অপমানের প্রতিশোধ? তবুও এটা বড় কাপুরুষের মত কাজ হয়েছে। অত্যন্ত গর্হিত।

অনেকে এই ভেবে লজ্জিত হচ্ছে, পূর্ণিমার বাড়ির লোকেরা কি মনে করলো। কেন তাদের ওপর এই অহেতুক কুৎসার আঘাত? সত্য হোক মিথ্যা হোক, এই আঘাত কারও গায়ে না বেজে পারে না।

মহীতোষবাবুর বাড়ির সবাই বিকেলের দিকে একবার বেড়াতে বার হতেন। সমস্ত দিনের মধ্যে প্রাচীরের বাইরের পৃথিবীতে একটিবার ঘোরাফেরার এই শ্রদ্ধাটুকুও তাঁদের হারাতে হলো। তাঁদের কাউকে আজ কোথাও দেখা গেল না।

কিন্তু পূর্ণিমা কি ভাবলো? এতক্ষণে সেও নিশ্চয় সব খবর শুনেছে। হয়তো ঘরের দরজায় খিল দিয়ে কাঁদছে, হয়তো আজ সারাদিন খায় নি। ভাবতে গেলে কত কি মনে হয়, কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না, এই উপদ্রবে পূর্ণিমার মনের শান্তি কতটা নষ্ট হলো। এও হতে পারে, সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না, তার রীতিমত মনের জোর আছে।

ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়।

যেখানে দুর্নীতি, সেখানে তিনি ক্রুর ও কঠোর। বহু বহুবার তিনি ছেলেদের সখের থিয়েটারের আয়োজন পণ্ড করেছেন। তিনি একবার মিউনি-সিপ্যালিটির কমিশনার হয়েই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর প্রস্তাব ছিল বিড়ির দোকানগুলিকে উচ্ছেদ করা, যাতে ধূমপানের পাপ যথেচ্ছা ধুঁইয়ে না ওঠে। সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নি।

অন্য দিকে যতই নিরীহ ও নমনীয় মানুষ হোন্ না কেন, নীতিগত কোন অন্যায়ের ব্যাপারে তিনি নিজের কর্তব্য ভুলতে পারেন না। সেখানে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখার মত প্রতাপ কারও নেই। লোকে মানুক আর না মানুক, চৌধুরী মশায় জানেন, তিনিই স্বয়ং এ শহরের ভদ্র সমাজের নীতি রুচি ও শালীনতার অভিভাবক—স্বরূপ। একবার হোলির দিনে মেথরদের মদ খাওয়া বন্ধ করে সকলকে গেলাস ভর্তি দুধ খাইয়েছিলেন চৌধুরী মশায়। এ'শহরের ইতিহাসে এরকম অঘটনও ঘটে গেছে।

তাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়, তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন পাপের এই দুঃসাহসিক রূপ দেখে। রাগে ও ঘৃণায় চৌধুরী মশায় স্থৈর্য হারালেন। স্বয়ং

থানায় এসে ডায়েরী করিয়ে গেলেন, যে বা যারা শহরের বুকের ওপর বসে এই অপকীর্তি করলো, অবিলম্বে তাদের যেন ধরে ফেলা হয়। এমন কঠোর শাস্তি তাকে দেওয়া হোক্, যাতে এক যুগ ধরে যত দুষ্ট ও দুর্বৃত্তের বুক কাঁপতে থাক্‌বে। নইলে বুঝতে হবে দেশে সুশাসনের শেষ হয়েছে, গভর্ণমেণ্ট নেই।

পুলিশের ইনস্পেক্টর প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি এই ঘড়িয়াল বদমায়েসকে সাত দিনের মধ্যে ধরে ফেলবেন, সে যতই গভীর জলে থাক্ না কেন।

মালা বিশ্বাস অবশ্যই দেখেছে পাথরের লেখাগুলি। বোধ হয় একমাত্র সেই লেখাগুলি ভাল করে পড়েছে, পরম নির্ভয়েও নিঃসঙ্কোচে। মালা চিনেছে পুর্ণিমাকে, লোকমুখে শুনে নয়, সে আগেই তাকে জানতো। গির্জার সড়কে বেড়াতে গিয়ে কতদিন সকালবেলা মালা তাকে দেখেছে, দোতলা ঘরের জানালার কাছে বই হাতে বসে আছে পুর্ণিমা। চোখোচোখি হতেই পুর্ণিমা সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিত। বোঝা যেত, এই জানালা বন্ধ করা একটা সশব্দ প্রতিবাদ মাত্র। কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে বা কার বিরুদ্ধে তা ঠিক আন্দাজ করা যায় না। হতে পারে—সেটা মালার গায়ে জড়ানো ঐ সবুজ রঙের রেশমী নেট, বড় বেশী ঝক্‌ঝক্ করে।

আজ সারাক্ষণ হেসেছে মালা। রূপসী পুর্ণিমা বসুর সকল অহঙ্কার কালো পাথরের নোংরামির আঘাতে কী ভয়ানক জব্দ হয়ে গেছে।

সমস্ত শহরের শাসন ও সতর্কতাকে বিদ্রূপ করে ক্রসরোডের পাথরটা পনের দিনের মধ্যে আর একবার খেউড় গেয়ে উঠলো।—"সুমিতা নন্দী, প্রতিজ্ঞা করেছ মনের মত মানুষ না পেলে গলায় মালা দেবে না। তবে তোমার এলবাম ভরা ওসব কাদের ছবি? কিছু বেছে উঠতে পারলে? এ অভ্যেস ভাল নয়, এটা দ্বাপর যুগ নয়। বয়স তো সাত বছর ধরে সেই তেইশে ঠেকে রয়েছে। তবে তোমার মেক-আপের পায়ে গড় করি। এত শিথিলতাকে কি কৌশলে এত উদ্ধত করে রেখেছো। নাঃ, তুমি সত্যিই অসাধারণী। ও ছাই মানুষের ছবির এলবামে কি হবে? তোমার বিয়ে না করাই ভাল।"

ব্যাপারটা আগাগোড়া বিস্ময়কর বলেই মনে হচ্ছে। যেই লিখুক না কেন, সে দুঃসাহসী সন্দেহ নেই। সুচতুর তো নিশ্চয়ই। প্রতি দুশ্চিন্ত মনের মেঘে মেঘে, সন্দেহের পরতে পরতে, এক একবার তার রূপ আবছায়ার মত গোচরে আসে যেন। কল্পনার নেপথ্যে এই অদ্ভুতকর্মা কাজ করে চলেছে। নেহাৎ বাজে ফক্কড়

গোছের কেউ নয়। লেখাপড়া নিশ্চয় খুব ভালই জানে। বয়স বিশ পঁচিশের বেশী বোধ হয় হবে না। বোধ হয় কোন হতাশ-প্রেমিক।

সেবক সমিতির অফিসে সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে সেক্রেটারী ননীবাবু চিন্তিতভাবে বসেছিলেন। আজ জেনারেল মিটিং আহ্বান করা হয়েছে। সভ্যেরা সব আসে একে একে। এরা সবাই ছাত্র—সতু, প্রিয়তোষ, লোকনাথ······।

ননীবাবু জানালেন—এটা আমাদের সবারই অপমান। কোন্ এক বদমাস দিনের পর দিন এইসব কুকর্ম করে চলেছে, আজও ধরা পড়লো না। সে যে শীগ্‌গির বন্ধ করবে, তারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কখন কার নামে লেখা উঠবে এই ভয়েই সবাই শঙ্কিত। বাস্তবিক····।

ননীবাবু দুঃখের হাসি হাসলেন।

—যেই হোক্, এটা বুঝতে পারছি, বাইরের লোক কেউ নয়। নিশ্চয় আমরা সবাই তাকে চিনি, তবে ভোল দেখে হয়তো বুঝতে পারছি না।

ননীবাবুর কথায় সংশয়ের কুয়াসা ঠেলে তার মূর্তিটা যেন ছায়ার মত দেখা যায়।

—এ ধরণের লোককে সহজে চেনা মুস্কিল। যাকে কোন মতেই সন্দেহ হচ্ছে না, এ কাজ হয়তো তারই।

স্বয়ং ননীবাবুই শেষ পর্যন্ত আশ্বাস দিয়ে বলেন,—তাকে না ধরতে পারলে কোন সুরাহা হবে না। হাতে হাতে ধরে ফেলা চাই।

চৌধুরী মশাই রণে হার মানেন নি। অনেকদিন পরে সংগ্রাম করার মত এক পাপের চ্যালেঞ্জকে পাওয়া গেছে। আবার একদিন থানায় এসে পুলিশ কর্মচারী-দের সঙ্গে ঝগড়া করে গেলেন। চৌধুরী মশাই বিশ্বাস করেন না, পুলিশ আন্তরিকভাবে তার কর্তব্য করছে, নইলে অপরাধী নিশ্চয় এতদিনে ধরা পড়তো। তিনি প্রস্তাব করলেন,—পাথরটার কাছে দিবারাত্র পাহারা দেবার জন্য এক বন্দুকধারী সান্ত্রী মোতায়েন করা হোক্।

ইনস্পেক্টর হেসে হেসে বললেন।—কি যে বলেন চৌধুরী মশায়, পুলিশের আর কাজ নেই? একটা মামুলী ব্যাপারে কামান বন্দুক নিয়ে টানাটানি করতে হবে?

চৌধুরী মশাই উত্তেজিত হলেন—মামুলী ব্যাপার! কথাটা প্রত্যাহার করুন।

ইনস্পেক্টার।—আপনি বৃথা রাগ করছেন। চুরি রাহাজানি খুন ডাকাতির খবর দিন, এক সপ্তাহে আসামীকে বেঁধে আনছি। কিন্তু এসব ভুতুড়ে গোছের ব্যাপার, এটা কি একটা তদন্ত করার মত কেস চৌধুরী মশায় ?

চৌধুরী মশাই।—তাহলে প্রাইভেট ডিটেক্টিভ নিয়োগ করুন।

ইনস্পেক্টর।—মাপ করবেন, আপনি আমার শ্রদ্ধেয়। তবু আপনার প্রস্তাব গ্রাহ্য করতে আমরা অসমর্থ, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা অবশ্য করবো।

চৌধুরী মশাই।—তাহ'লে আমাকেও বাধ্য হয়েই গভর্ণরকে টেলিগ্রাম করে কম্‌প্লেন জানাতে হয়।

চৌধুরী মশাই উঠে চলে গেলেন।

ইনস্পেক্টর ভয় পেল কি না বোঝা গেল না। চৌধুরী মশাইয়ের মত প্রবীণ শ্রদ্ধাভাজন লোককে রাগানো উচিত নয়। যে কারণেই হোক সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একজন কনস্টেবল লাঠি হাতে পাথরটাকে পাহারা দিল।

সকালবেলা ছিল সামান্য একটু পুরনো লেখার অবশেষ। সুমিতা নন্দীর কলঙ্কগুলি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু এই সজাগ সতর্ক পাহারার এক ফাঁকেই বিকেলের মধ্যে ঝলসে উঠলো একটা নতুন লেখা। সারা গোধূলিবেলা পাথরটা যেন ঠাট্টার সুরে হাসতে লাগলো।—"সুধা দত্ত, অনেক মেয়ের গলার সুর শুনেছি, তবে তোমার মত এত মিষ্টি কারও নয়। সত্যিই গলাটি তোমার সুধায় ভরা, ছোট্ট গলগণ্ডটাই তার প্রমাণ। হাই কলার ব্লাউজে আর ঢাকা পড়ছে না। কেন যে এত ইংরেজী বুলি বলছো বুঝি না। প্রফেসর ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে যে, ও পথ ছেড়ে দাও।"

কনস্টেবলের চাকরী যাবার উপক্রম হলো! সে কসম খেয়ে জানালো, এক মুহূর্তের জন্য সে ডিউটিতে ফাঁকি দেয় নি। একটা পিঁপড়ের দিকেও ভুল করে তাকায়নি।

আশ্চর্য এই কালোপাথরের অশরীরী শিল্পী।

সন্দেহের ঝড় উঠছে। অলক্ষ্যে যদি গরুর হাড় বা মড়ার মাথা কেউ ফেলে দিয়ে যেত, তবে না হয় বলা যেত ভূতের কাণ্ড। কিন্তু এটা নিছক প্রাকৃতিক আর চারিত্রিক ব্যাপার। একজন কেউ আছে পেছনে। সাবাস্ তার বাহাদুরী। তিন মাস ধরে শহর সুদ্ধ লোককে আঙুলের ডগায় নাচাচ্ছে। এক এক সময়

বেশ ভেবে চিন্তে সন্দেহ করতে হয়। যার তার ওপর এই কৃতিত্ব আরোপ করা যায় না। যেই হোক সে, সে বড় দুঃসাহসী ও চতুর। এতগুলি তরুণী হিয়ার গোপন কথা যে জানতে পেরেছে, সে গুণী ও যাদুকর। সব সময় তাকে অশ্লীল বলতে বাধে, সে বড় রসিয়ে লেখে।

কিন্তু একবার যদি এই অধরা যাদুকর ধরা পড়ে! চৌধুরী মশায়, পুলিশ, সেবক সমিতি আর নিন্দিতাদের বাপভাইয়েরা ওর হাড়মাস কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দেবে রাণীঝিলের মাঠে। সন্দেহ হয় অনেককে। কার্নিভালের বাঙালী ম্যানেজারটা তিন মাস ধরে শহরে বসে আছে কেন? ঘড়ির দোকানে নতুন ম্যাট্রিক-পাশ ছেলেগুলি বড় বেশী গুলতানি করে আজকাল। কেন? নন্দ মিস্তিরি উপন্যাস পড়ছে। হাতুড়ি ছেড়ে হঠাৎ এ সখের ব্যামো আবার কেন? প্রশান্ত পানের দোকান করে, এমন কি লাভ হয়? তবু সপ্তাহে তিনখানা রেকর্ড কেনে। হঠাৎ এত সুরেলা হয়ে উঠলো কেন সে? তবু ভরসা, প্রশান্ত নাকি লেখাপড়া জানে না। কিন্তু এ ভব মাঝারে কিছুই অসম্ভব নয়। সেবক সমিতি সন্দেহ করে পুলিশকে, পুলিশ সন্দেহ করে সেবক সমিতির সেক্রেটারী ননীবাবুকে। ননীবাবু ভাবছেন, সন্দেহটা কার নামে রটিয়ে দেওয়া যায়। এই সন্দেহের মাৎস্যন্যায়ে কারও অস্তিত্ব বুঝি আর ঠিক থাকে না।

কিন্তু ক্রসরোডের পাথর কি হঠাৎ বোবা হয়ে গেল? এক মাস পার হয়ে গেছে, কোন নতুন রহস্যের দাগ পড়ছে না আর। তা'হলে চলে কি করে? শহরের প্রাণের তার যে বাঁধা পড়েছে কালো পাথরের সুরে। দিবস রজনী ঐ কালো পাথরে ফুটে উঠবে নব নব শ্বেতলিপিকার ফুল। জ্যোৎস্না রোদ কুয়াসা শিশিরেরই মত প্রতি প্রভাতে প্রেম-বিচিত্র কত রহস্যের অর্ঘ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রসরোডের পাষাণবেদিকা। ক'মাসের মধ্যে কত অজানা কথা বলে দিল পাথরটা। এই লেখাগুলির মধ্যেই শহরের ঘুমন্ত মহিমা সাড়া দিয়ে উঠেছে।

সিনেমায় দর্শকের ভীড় কমে গেছে। সকাল বিকেল রাণীঝিলের মাঠে লোকের সমারোহ। গত বছরেও শরৎ এসেছিল এমনি আকাশভরা নীল নিয়ে। কিন্তু রাণী-ঝিলের মাঠ আর ক্রসরোডের ধুলো এত চঞ্চল হয়ে ওঠেনি জনপদধ্বনির উচ্ছ্বাসে। ঘরে ঘরে চিত্তে চিত্তে দোলা লাগে। ক্রসরোডের পাথর তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এবার কার পালা কে জানে! মনে হয়, এই ক্ষমাহীন পাথরের অমোঘ অনুশাসন একে একে সকল গোপনচারিণীর কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দেবে।

শত শত মূক মুখের প্রার্থনা পাথরের কাছে পৌঁছল যেন। ক্রসরোডের পাথরে অনুগ্রহের স্বাক্ষর আবার জল্ জল্ করে ফুটে উঠলো।

—"প্রীতি মুখার্জি, তুমি অপরূপ না হলেও অদ্ভুত। পরের কোলের ছেলে নিয়ে এত টানাটানি কেন? সবই বুঝি সখি। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে, এবার থেকে সামলে থেক। গিরিডিকে ভুলে যাও।"

যেই যাক্ ক্রসরোড দিয়ে, সকলকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হবেই লেখাগুলিকে, যতদিন না কেউ সাহস করে মিটিয়ে দেয়। ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ বিরুদ্ধ, মুখে যে যাই বলুক, এই কুৎসাদৃপ্ত পাথরের কাছে যেন ঝুঁকে পড়ে সকলেই, অভিবাদনের আবেশে।

শরৎবাবু যান, কান্তিবাবু আসেন। ক্রসরোডে মুখোমুখি দুজনের সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই এই কুপথে চলার গ্লানিটুকু বার্তালাপের মধ্যে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেন।

কান্তিবাবু—এ যে অসহ হয়ে উঠলো মশাই। কুৎসিত লেখাগুলি কি বন্ধ হবে না?

শরৎবাবু—আর বলেন কেন, বড়ই ঘৃণ্য ব্যাপার!

দুই সজ্জনের আলাপ হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো, আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতো; কিন্তু তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন চৌধুরী মশায়—সাদা ভুরু ও দাড়ির মাঝখানে শাণিত নাক আর কঠোর দৃষ্টি। কান্তিবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

কান্তিবাবু—চৌধুরী মশাই ওভাবে তাকালেন কেন বলুন তো?

শরৎবাবু সশব্দে হেসে বলেন—কে জানে, উনি হয়তো মনে করছেন আমরা দুজনেই লেখাগুলি লিখেছি।

কান্তিবাবু—বলা যায় না, এ সন্দেহ তাঁর হতে পারে, যে রকম নীতিবাতিক লোক।

এতক্ষণে তারা কি ভাবছে? কালো পাথরের লেখাগুলি যাদের সুনামকে কালো করেছে? অপমানের আঘাত সহ্য ক'রে তাদের মন কি এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে? কিন্তু যতই কৌতূহল হোক্ না কেন, এ সংবাদ জানবার উপায় নেই। প্রথমে ভয় হয়েছিল, নিন্দিতাদের মধ্যে দু'একজন অতি-অভিমানিনী আত্মহত্যা করে না বসে। খুব বেশী ভয় হয়েছিল সুধা দত্তের কথা ভেবে।

বড় লাজুক আর মুখচোরা মেয়ে সুধা, বেচারি এই বছরেই গুড কনডাক্ট প্রাইজ পেয়েছে।

সত্য মিথ্যা যাচাই হয় না, তবু রীতিমত মনোবেদনা পায় অনেকে। মানুষ আজ খারাপ থাকে, কাল ভাল হয়ে যায়। কিন্তু লোকসমাজে কারও দোষ-ত্রুটিকে ঢোল পিটিয়ে রটিয়ে দিলে কোন লাভ হয় না, বরং তাতে অনেকে উল্টো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যদি সত্যও হয়, তবুও এতগুলো ভদ্রবাড়ির মেয়ের চরিত্র নিয়ে মাঝময়দানে লেখালেখি করা খুবই অন্যায়।

শুধু সন্দেহ নয়, বিচিত্র রকমের গুজব উড়ছে চারদিকে। পূর্ণিমারা নাকি চিরকালের মত চলে যাচ্ছে এ শহর ছেড়ে। সুমিতা নন্দী বিষ খাবার চেষ্টা করেছিল বোধ হয়। প্রীতি মুখার্জীর দাদা খুব সম্ভবতঃ গুণ্ডা লাগিয়েছে—যে এসব লেখা লিখেছে, তাকে খুন করা হবে। কে যেন বলছিল জোর করে সুমিতার বিয়ে দেওয়া হবে এই মাসেই। গুজব উড়ছে—বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করার উপায় নেই। এতগুলি বাড়ির হাঁড়ির খবর কে আর স্বচক্ষে দেখে এসে সঠিক বলতে পারে? হ্যাঁ সে কাজ একমাত্র পারে এবং যদি দয়া ক'রে বলে, সে হলো কালো পাথরের কবি।

হঠাৎ মালা বিশ্বাস তাদের দেখলো একদিন, টাউন সিনেমার ওপরের গ্যালারিতে। প্রথম সারিতে বসে আছে—পূর্ণিমা, সুমিতা, সুধা ও প্রীতি। কি আশ্চর্য, গুনে গুনে তারা ঠিক চারজন।

পাশে ও পেছনের সারিতে আরও অনেক মেয়ে বসে আছে। মালা একটা চেয়ার টেনে নিযে বসে আছে একেবারে শেষ প্রান্তে—ঝক্‌ঝকে একটা আলোর ঝাড়ের নীচে।

মালা ভাল করে আর একবার দেখলো। হ্যাঁ ঠিক ওরাই চারজন। কিন্তু কবে ওরা এত ঘনিষ্ঠ হলো? আগে তো ওরা কেউ কাউকে ভাল করে চিনতো না। আশ্চর্য, আজ ওরা এক হয়ে গেছে।

পেছনের সারিতে সেনপাড়ার মেয়েদের মধ্যে বসে আছে মুক্তি রায়, মালারই স্কুলজীবনের বন্ধু। ওরা সকলেই ব্যস্ত, সবাই উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখছে সামনের সারির চারজনকে। মুক্তি রায় এক এক করে চিনিয়ে দিচ্ছে সকলকে—কে পূর্ণিমা, কে সুমিতা, কে সুধা…।

পূর্ণিমারাও চুপ করে ছিল না। ওদের আলাপ—গল্পের উদ্বেল কলরব সমস্ত

গ্যালারিকে চুপ করিয়ে রেখেছিল। সকলেই আস্তে কথা বলে, শুধু পূর্ণিমারা ছাড়া। ওদের হাসি থামতে চায় না। একজনে বাদাম কেনে, চারজনে ভাগ করে খায়। ওরা তাকায় না কারও দিকে। সমস্ত গ্যালারির জনতা যেন প্রকাণ্ড একটা ছায়া মাত্র, প্রাণ আছে শুধু ঐ চারজনের।

মালা একা পড়ে গেছে, তাকে কেউ দেখছে না। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম আড়ালে পড়ে গেল মালা। এত প্রখর বিদ্যুতের বাতিটার নীচে বসে আছে মালা, অষ্ট্রিচের পালকের বর্ডার দেওয়া মেরিনো পশমের জামা গায়ে, দু'ইঞ্চি লম্বা সোনার চেনে গাঁথা একজোড়া উদ্ভট প্যাটার্ণের দুল দু'কান থেকে ঝুলে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে আছে। তবু কোন বিস্মিত বিরক্ত বা ধিক্কারভরা দৃষ্টি কোন দিক থেকে তার দিকে তেড়ে আসছে না। মালা আজ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

ছবির অভিনয় আরম্ভ হলো। ক্ষান্ত হ'ল গ্যালারির কলরব। আলোগুলি নিভলো। পূর্ণিমাদের সারি থেকে এক এক টুকরো হাসিভরা কলরব মাঝে মাঝে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত উছলে পড়ছে। কে জানে, কোন্ সার্থকতায় ভরে উঠেছে ওদের জীবনে এই খুশিয়ালী রাত।

সিনেমার ছবি চোখের সামনে বৃথা ঝলসে পুড়ছিল! মালা ডুবেছিল তার মনের অন্ধকারে। কালো পাথরের সেই ভয়ঙ্কর কুৎসা, মনে পড়লেই আতঙ্ক হয়। মালা জানতো, এই গরবিণীরাই তো মান হারিয়েছে। কিন্তু এ আবার কোন্ ছবি! এ যে নতুন করে মান পাওয়া। ওদের চোখে মুখে সেই তৃপ্তির উল্লাস।

পেছনের মেয়েদের দৃষ্টি আর এক তৃষ্ণায় ছলছল। ওরা তাকিয়ে আছে পূর্ণিমাদের দিকে—এক দুরধিগম্য মহিমলোকের দিকে। ওখানে আসন পেতে হলে ছাড়পত্র চাই, সে বড় কঠিন ঠাঁই। সে সৌভাগ্য কি হবে?

কালো পাথরের কবি মরে যায় নি।

সেদিন মেয়েদের বাৎসরিক আনন্দমেলার অনুষ্ঠান। রাণীঝিলের মাঠে বাঁশের জাফরি আর খেজুর-পাতার ঘেরান দিয়ে সারি সারি স্টল সাজানো হয়েছে। পথে যেতে সবাই দেখলো, বহুদিনের স্তব্ধ পাথরটা আবার মুখর হয়ে উঠছে—"মুক্তি রায়, অমন মেঘে ঢাকা চাঁদের মত ফুলবাগানে গাছের আড়ালে আর কতদিন থাকবে? আজকাল সব সময় হাতে ওটা কি থাকে? কাব্য-গ্রন্থ? তোমার আসল কাব্য ভাল আছেন মজঃফরপুরে। আমার আর কি লাভ? শুধু যখন হেঁটে চলে যাও,

তখন পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। বড় সুন্দর ছলতে পায়ে তোমার চলার ছন্দ। মুখের দিকে তাকাতে ভাল লাগে না। স্নো-পাউডার দিয়ে কি চোখের কালি ঢাকা পড়ে? অসুখটা সারাবার ব্যবস্থা কর।"

দলে দলে মেয়েরা এসেছে আনন্দমেলায়। মালা বিশ্বাসও এসেছে। আজ তার বেশভূষার কেমন একটা উদ্ভ্রান্ত দীনতা। একটা সাধারণ মিলের সাড়ী, আঁচলটা আধ হাত ছেঁড়া। দেশী ছিটের একটা আধময়লা ব্লাউজ। পায়ে জুতো নেই, চোখে নেই চশমা।

চন্দ্রার দিদিরা একটা স্টল নিয়েছে। হরেক রকম ফুলের তোড়া আর বুকে বিক্রী হচ্ছে সেখানে, এক আনায় একটি। স্কটিশ মিশনের মেয়েরা খুব ভীড় করেছে সেখানে, তোড়া কেনার জন্য। মালা সেখানে সামান্য একটু দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে চললো।

মালতীরা একটা স্টল নিয়েছে—ঘরে তৈরী নানারকম জ্যাম জেলী আর চাটনী শিশি ভরে সাজিয়ে রেখেছে। সেখানে কোন ভীড় নেই, তবু মালতীর অনুরোধে মালা দাঁড়ালো একবার। এক শিশির দাম ছ'আনা পয়সা রেখে দিয়ে মালা বলে গেল, ফেরবার সময় নিয়ে যাবে।

মালার চোখে পড়েছে—একটু দূরেই রাণুদের ম্যাজিকের স্টল। ভীড় সেখানেই সবচেয়ে বেশী। নবীনা প্রবীণা সকলেই সেখানে দলে দলে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। কী এমন আকর্ষণ আছে রাণুদের স্টলে?

আর একটু এগিয়ে যেতেই নজরে এল, হ্যাঁ কারণ আছে। সেখানে বসে আছে পূর্ণিমাদের দল। আজ তাদের মধ্যে একটা নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে, মুক্তি রায়। পূর্ণিমারা সবাই খুশি হয়ে ম্যাজিক দেখছিল, আর সবাই দেখছিল পূর্ণিমাদের।

মালার চলার উৎসাহ শান্ত হয়ে এল। ওদিকে এগিয়ে যেতে বুকটা যেন দুরু দুরু করছে আজ। কিন্তু যেতেই হবে তাকে। তার ছেঁড়া কাপড়, খালি পা, নোংরা ব্লাউজ। নিশ্চয় তাকিয়ে দেখবে সবাই, পূর্ণিমারাও দেখবে।

হঠাৎ পাশে অনেকগুলি বাচ্চা মেয়ে চীৎকার করে ডাকলো—মালাদি! মালাদি!

মালা মুখ ঘুরিয়ে দেখলো, অনুপমা ডাকছে তাদের চায়ের স্টলে। সবাই মিলে চীৎকার করে মালাকে চা খেতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

কি ভেবে নিয়ে মালা স্টলের ভেতরে গিয়ে বসলো। পর পর তিন কাপ চা খেল। অনুপমারা খুব খুশি। বয়স্কদের মধ্যে কেউ তাদের এক কাপ চা খেয়েও অনুগৃহীত করেনি। কত চেনা অচেনা মহিলাদের হাত ধরে ওরা টানাটানি করেছে, কিন্তু কারও হৃদয় গলেনি।

অনুপমা মানুষ জাতির ওপর তাই চটে গেছে। ম্যাজিকের ষ্টলের দিকে তাকিয়ে চড়া মেজাজে বলে—বুঝলে মালাদি, আমাদের দোকানের সব বিক্রী মাটি করে দিয়েছে রাণুদি। কাঁচা আম জলে ডুবিয়ে দেখাচ্ছে আম নেই। ছাই ম্যাজিক, ওটা তো চিনির তৈরী আম।

মালা বলে—রাণুদি তোমাদের বিক্রী মাটি করে নি।

অনুপমা—তবে কে ?

মালা—করেছে...।

উত্তর দিতে গিয়ে মালা হঠাৎ সামলে গেল। অনুপমার মত এতটুকু মেয়েকে অবাক করে দিয়ে আর লাভ কি ?

চায়ের স্টলের সামনে দিয়ে কতজন আসছে যাচ্ছে। মালা আজ জোর করে সকলের চোখের ওপর ভেসে রয়েছে। তবু যেন তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না। একটু দূরেই বসে রয়েছে পূর্ণিমারা। খুবই ইচ্ছে করছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে। আজও ভীড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো সবাই তাকিয়ে দেখবে তার এই ছেঁড়া-ময়লা সাজ—তার নিরাভরণ জীবনের চরম বিনতি। এই তো দেখবার মত একটা নতুন জিনিস। কিন্তু যদি কেউ না তাকায়, এই আবেদনও যদি ব্যর্থ হয়! এগিয়ে যেতে মালার সাহস হলো না।

মালা যেন আভাসে দেখতে পাচ্ছে—এই মেলার ভীড় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তিন ভাগে। এখানে একদল আছে, যারা পূর্ণিমাদের মত অসাধারণ। একদল রয়েছে, রাণু অনুপমা ও এই পাঁচশত নবীনা প্রবীণার মত সাধারণ। আর আছে মাত্র একজন—মালা বিশ্বাস—সাধারণের নীচে। তার এতদিনের, এত সাহসের, এত কষ্টের, এত লজ্জা-সহ্য-করা আত্মবিজ্ঞাপনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সেবক সমিতির বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে আবার। সেক্রেটারী ননীবাবু বললেন—একটা দুঃখের কথা বলবো আজ।

ননীবাবুর গলার স্বরে বোঝা গেল, অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে। সভ্যেরা

কৌতূহলী হয়ে ননীবাবুর মুখের দিকে তাকালো। ননীবাবু টেবিলের আলোটার গায়ে একটা ঝই মেলে দিয়ে তাঁর চিন্তিত মুখের ওপর যেন আরো খানিকটা অন্ধকার মেখে নিলেন।

—তোমাদের গ্যারেণ্টি দিতে হবে, একথা আমাদের ক'জন ছাড়া বাইরের কোন জীবের কানে পৌঁছবে না! সে ধরা পড়ে গেছে—কালো পাথরের লেখা-গুলি যার কুকীর্তি। এ কাজ করেছে চৌধুরী মশাই।

কথাগুলি যেন সবার মাথার ওপর হাতুড়ি মেরে ভয়ানক একটা ঠাট্টা করে বসলো। প্রিয়তোষের রাগ হলো—আপনি কি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

ননীবাবু—ইয়েস্। যারা দেখেছে স্বচক্ষে, তারাই বলেছে।

প্রিয়তোষ—কে স্বচক্ষে দেখেছে?

ননীবাবু—তাদের নাম বলতে আমি বাধ্য নই।

ননীবাবুর চোখদুটো মিটমিট ক'রে এক দুর্বোধ্য প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে।

সেবক সমিতির দায়িত্ব সমাপ্ত হলো এইখানে। কিন্তু এই উদ্ভট অকল্পেয় তথ্যটা প্রতিজ্ঞা দিয়ে বেঁধে গোপন রাখা সম্ভব হলো না। দুদিনের মধ্যেই সকলে জানলো, বার লাইব্রেরী থেকে আরম্ভ করে গুরুদাসের ঘড়ির দোকান পর্যন্ত। যে শোনে সেই লজ্জা পায়, আশ্চর্য হয়—এও কি সম্ভব?

তবু এই বিচিত্র সন্দেহের সম্পদ হারাতে কেউ রাজী নয়। হোক না শোনা-কথা। শোনা যাচ্ছে কেউ একজন স্বচক্ষে দেখেছে। তাহলেই হলো। তা ছাড়া, চৌধুরী মশায়ের মত খাঁটি মানুষকে এই রকম একটা যা-তা ভাবতে বেশ একটু ভালই লাগে।

বিশ্বাসবাড়ির জানালায় সেই অচঞ্চল মূর্তিও আর দেখা যায় না। ক্রসরোডের কালো পাথরে আর লেখা পড়ছে না। শহরের উৎসাহে মন্দা পড়েছে। জমাট গানের মাঝখানে হঠাৎ যেন সুর ছিঁড়ে গেল।

আজকাল ঘরের ভেতরেই থাকতে ভালবাসে মালা। বাইরের পৃথিবী, সেখানে মানায় পূর্ণিমাদের। ওরা অগ্রাণের তারা, সন্ধ্যা সকাল ওদেরই শুধু দেখতে হয়।

সার্থক জীবন পূর্ণিমাদের। ওরাই প্রার্থিতা। আড়াল থেকে মুক্ত করে

এনে সংসার ওদেরই মুখ দেখতে চায়। বুৎসাকল্লও ধন্ত হতে চায় ওদেরই আঁচল ছুঁয়ে। ওরাই মানুষের সব গল্পের কামনা। আর, সকল কামনার সীমানার ওপারে, এক বেদনাহীন বিরাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে আছে মালা। সে একা, সে নিঃস্ব।

মালা নিজেকে বন্দী করে ফেলেছে। সব দেখা আর দেখা দেওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে। ওর মধ্যে কোন সত্য নেই। পৃথিবীর চোখের ওপর নিজেকে যে এতদিন অকুণ্ঠভাবে সঁপে দিয়ে এসেছে, সে-ই মুছে গেল আজ। এই বুঝি হুনিয়ার রীতি।

জানালার খড়খড়ি দিয়ে পড়ন্ত রোদের এক ফালি ঘরে এসে পড়েছিল। আনমনে জানালাটা খুলে দিয়েই মালা বন্ধ করে দিল আবার।

আয়নার সামনে অনেকক্ষণ বসে থাকে মালা। নিজের চেহারা চোখে পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিল। আর বুঝতে বাকী নেই, এ চেহারা যদি গ্রহের মত আকাশে ভেসে বেড়ায়, তবুও চোখ তুলে কেউ তাকাবে না।

এক এক সময় মালা চেষ্টা ক'রেও তার অস্থিরতাকে চেপে রাখতে পারে না। মনে হয় বাইরের বাতাসে নিশ্বাস না নিলে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। তবু জোর করে কপাটে খিল এঁটে দেয়—এক পলাতকার পায়ে যেন বেড়ি পরিয়ে তাকে সবলে ধরে রাখে।

সন্ধ্যে হয়ে আসে, অনেকদিন পরে চাঁদ উঠেছে আবার। মালা জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা ঝড়ো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। দৃশ্যটা ভালোই লাগলো মালার। মালা ডাকলো—রামজীবন, আমি বেড়াতে যাব এখনি।

সাজ-সজ্জার পর মালা কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইল আয়নার সামনে। চোখের জলে হু'হুবার মুখের পাউডার ভিজে গেল। রামজীবন বার বার হাঁক দিচ্ছে। নিজেকে একরকম জোর করে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল মালা।

রাণীঝিলের চারিদিকে হু'বার ঘোরা হলো, মাঠটাকে আড়াআড়ি হুবার হেঁটে পার হলো মালা। দিক ছাপিয়ে অন্ধকার আসছে। পূবে পশ্চিমে দেওদারের মাথা শিউরে উঠছে। বনজোয়ানের গন্ধমাখা ধুলো ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে। ঝড় আসছে। রামজীবনের হাঁক-ডাকে অগত্যা মালা ফিরলো ঘরের দিকে।

রামজীবন এগিয়ে গেছে কিছু দূর। মালা খুবই আস্তে আস্তে যেন টেনে টেনে

চলেছিল। কি যেন একটা ইচ্ছা লুকিয়ে রয়েছে মালার সতর্ক চোখের দৃষ্টিতে। যেন কিসের জন্য একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। হ্যাঁ, এই যে ক্রসরোডের মোড়। এই তো সেই পাথর, অন্ধকারে যেন কারও প্রতীক্ষায় বসে আছে!

মালা থমকে দাঁড়ালো। এই সেই পাথর, এই কলঙ্ককীর্তনিয়ার প্রসাদে কত নগণ্যা গরীয়সী হয়ে উঠেছে। অপবাদ হয়েছে প্রশস্তি। কিন্তু এ পাথরের মনে সুবিচার নেই। এর সব চক্রান্তকে আজ একটি আঘাতে চূর্ণ করে দেওয়া যায়। কালো পাথরের কবিকে কেউ ধরতে পারেনি, মালা তাকে আজ জব্দ করে দিতে পারে। মালা বিশ্বাসকে তুচ্ছ করার প্রতিশোধ নিতে পারা যায় এইক্ষণে।

মালা যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়লো পাথরটার ওপর। ব্লাউজের আড়াল থেকে টেনে বার করলো এক টুকরো খড়ি।

বিদ্যুৎ চমকাবার আগে, রামজীবনের হাঁক শোনার আগে মালা নিজের হাতেই খড়ির লেখায় এক স্তবক ঘনঘোর মিথ্যা সাদা ফুলদলের মত ছিটিয়ে দিল কালো পাথরের গায়ে।

—মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার···থাক্, বেচারাদের নাম আর করবো না। তোমার আলো ছুঁতে গিয়ে কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রাণীঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।

[—পরশুরামের কুঠার]

ঢং ঢং করে দুটোর ঘণ্টা বাজল।

কান পেতে শুনল বিপিন। রাত দুটোর ঘণ্টা বাজল।

করিডোরে সান্ত্রীর পাদচারণা চলছে। নাল বাঁধানো বুটের কঠিন শব্দ উঠছে—খট্ খট্ খট্ খট্। একটানা শব্দ।

শেষ রাতের স্তব্ধতা। সারা শহর ঘুমোচ্ছে, স্বপ্ন দেখছে। এই জেলখানার ভেতরেও সেই ঘুমের ঢেউ এসেছে, স্বপ্নের জোয়ার এখানকার উঁচু দেওয়ালকেও অতিক্রম করেছে। শুধু ঘুমোয়নি বিপিন, ঘুমোয়নি ঐ সান্ত্রী এবং আরো দু'তিনজন।

সান্ত্রীর বুটের শব্দটা কাছে এল। করিডোরের দেওয়ালে একটা বাতি জ্বলছিল, তার আলোর একটা ধারা এসে পড়েছিল বিপিনের কামরার সামনে, কিন্তু তাতে ভেতরটা সম্পূর্ণ আলোকিত হয়নি, আবছা অন্ধকার ঘুপ্‌টি মেরে ছিল কোণের দিকটায়—যেখানে একটা কম্বলের ওপর চুপচাপ বসে ছিল বিপিন। নিঃসাড় হয়ে বসে ছিল আর প্রহর গুণছিল।

"ক-টা বাজল চৌবেজী? ক-টা?" মৃদুকণ্ঠে হঠাৎ সে প্রশ্ন করল।

চৌবেজী তাকাল ভেতরের দিকটাতে, বিপিনের মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সে বেশ অনুভব করল যে তার গলাটা ধরা ধরা। বেচারা—

"কটা আবার—দুটো বাজল ভাই"—

চৌবেজীর বুট জুতো আবার শব্দ তুলতে লাগল।

দুটো! তাহলে আরো তিন ঘণ্টা সময় আছে। আরো তিন ঘণ্টা আছে তার জীবনের মেয়াদ। বিপিন হাসল, একটু নড়ে বসল সে, জোরে জোরে বারকয়েক নিঃশ্বাস টানল। আঃ! আরো তিন ঘণ্টা। কতক্ষণ আর? কাল-সমুদ্রে কত যুগযুগান্ত ভেসে গেছে—খড়কুটোর মত এই তিন ঘণ্টাও তার দুরন্ত স্রোতোবেগে ভেসে যাবে—তারপর যখন পাঁচটা বাজবে তখন ঐ লোহার দরজাটা খুলে যাবে, ফাঁসির দড়ির ডাক শোনা যাবে। হ্যাঁ, আজই শেষরাতে তার ফাঁসি হবে।

শেষরাতের ভৌতিক মুহূর্তগুলো। পাথর আর কংক্রীটের তৈরী এই কামরার বাইরে, জেলখানারও বাইরে, নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মত পৃথিবীটা এখন তন্দ্রাচ্ছন্ন ও

শান্ত হয়ে আছে। সেখানে গিয়ে একবার দাঁড়াতে ইচ্ছে হয় বিপিনের। হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, আলো আঁধারের দ্বন্দ্বে ভরা পৃথিবীকে শেষবারের মত আর একবার দেখতে ইচ্ছে করে। অথচ উপায় কোথায়? রাত্রিশেষে তার ফাঁসি হবে। খুনী আসামী সে, কলঙ্কযুক্ত অপরাধীর বহুমূল্য জীবন তার, পাথর আর কংক্রীটের গাঁথা কামরায় তাকে রাখা হয়েছে, সদাসতর্ক সান্ত্রীর বুটে আজ পৃথিবীর অস্বীকৃতি ঘোষিত হচ্ছে। সে আর এখন পৃথিবীর জীব নয়—এই সেলের অন্ধকারে, নিঃশব্দে বসে বসে, আসন্ন মৃত্যুরাজ্যের ছাড়পত্রের জন্যই তাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে। উপায় নেই।

খুনী আসামী বিপিন। বহাল তবিয়তে সে তার স্ত্রী মালাকে গলা টিপে মেরেছে। প্রমাণ অজস্র, সাক্ষী অসংখ্য। বস্তির নরনারীরা এসে যখন তাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে একপাশে নিয়ে এল তখন দেখা গেল যে মালার জিভ বেরিয়ে এসেছে, নাক দিয়ে, দু-কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। আতঙ্ক-বিস্ফারিত দুটো চোখের তারা স্থির হয়ে গেছে—সে মারা গেছে। বিচার বেশী দিন চলেনি। প্রমাণ সুস্পষ্ট। দায়রা জজ রায় দিলেন যে একেবারে না মরা পর্যন্ত আসামী বিপিনকে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হবে। আজ, ৩রা মার্চ, সোমবার, শেষরাতে দায়রা জজের সেই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালিত হবে। বিপিন তা গতকাল জানতে পেরেছে।

সত্যি সে খুন করেছিল। প্রমাণ এবং সাক্ষীর দরকার ছিল না—সে নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করেছিল। শুধু স্বীকার করেনি যে কেন সে খুন করেছিল। আসামী পক্ষের উকীল প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে বিপিন উন্মাদ। প্রমাণ টেঁকেনি, ডাক্তারের রিপোর্টে তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হল। সাক্ষীরা প্রমাণিত করল যে আসামী নিজে দুশ্চরিত্র ছিল এবং এই নিয়ে তার স্ত্রী তাকে গঞ্জনা দিত বলেই সে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে মালাকে খুন করেছে। বিপিন কোন প্রতিবাদ করল না। আসামী পক্ষের উকীল ক্ষীণকণ্ঠে একটু প্রতিবাদ করল। বিচারক সাক্ষীদের কথাই বিশ্বাস করলেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা সহজেই ঘোষিত হয়ে গেল।

বিপিন প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ করলে খুন করার কারণ সম্পর্কে যদি সে সত্যি কথাই বলত তাকে কি কেউ বিশ্বাস করত? বিপিন হাসল। আর মাত্র তিন ঘণ্টা। আর একবার আগাগোড়া এই জীবনটার কথা ভাবা যাক্

না। আজ, এই মুহূর্তে, নিজের জীবনের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ব্যতীত তার আর কি-ই বা অবশিষ্ট আছে?

বিপিনের জীবন! জন্ম আর আসন্ন মৃত্যুর মধ্যবর্তী একটা অবিচ্ছিন্ন দুঃখের জীবন। সে জীবনে ঘটনা-বৈচিত্র্য নেই, চাকচিক্য নেই, মহাকাব্য কিংবা নাটক তৈরীর উপাদান নেই তাতে। দূর বরিশালের কোন গ্রামে সে জন্মেছিল, কেমন করে অশিক্ষায়, অভাবে বড় হয়ে সে একদিন আয়রণ ফ্যাক্টরীতে ষোল বছর বয়সে ঢুকেছিল—সে কথা আর ভেবে লাভ কি। তার চেয়ে আজ ঠিক সেইখান থেকেই ভাবা যাক—যেখান থেকে ফাঁসির দড়িটা বিপিনকে অদৃশ্যভাবে আকর্ষণ করতে লেগেছিল।

জেলখানার ভেতরেও এখন স্তব্ধতা। শুধু সান্ত্রীর বুট শব্দ তুলছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত—আকাশে হয়ত অসংখ্য তারা ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু বিপিন তা দেখতে পাচ্ছে না। চোখ বুজে সে ভাবছে। হঠাৎ সে উঠল, চোখ মেলল। কে যেন কাঁদছে! বিনিয়ে বিনিয়ে কে যেন কাঁদছে! দূরে, অতি—দূরে—বহু—দূরে—। ঐ কান্নাই তো রাত্রিশেষে আসন্ন ফাঁসির দড়ির পেছনে। কে কাঁদে!

"চৌবেজী, কে যেন কাঁদছে"—

চৌবেজী থমকে কান পাতল, মাথা নেড়ে বলল "দূর"—

বিপিন চুপ করল! সে ছাড়া কেউ শুনতে পাবে না এ কান্না। এ কান্নার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে তার বস্তির ঘরে ফিরে যেতে হবে। কাঠ মাটি আর টিনের একখানা ঘর, পেছনে ছোট একটা উঠোন পেরিয়ে খড়ের ছাউনি-দেওয়া রান্নাঘর। তাতেই থাকত সে, মালা, পাঁচ বছরের ছেলেটা আর জরাজীর্ণ শাশুড়ীকে নিয়ে।

লোহালক্কড় পিটিয়ে সে মাইনে পেত মোট আটত্রিশটি টাকা। লম্বা চওড়া জোয়ান মানুষ সে, লোহার মত শক্ত তার পেশী, স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী মালা, বাচ্চাটাও জীর্ণ-শীর্ণ নয় আর শাশুড়ী বুড়ী হলেও কম খেত না। আটত্রিশ টাকায় কুলোবে কেন, তাই তাতেও কুলোত না। অথচ বয়লারের আগুন, গলানো লোহার উত্তাপ আর ভারী হাতুড়ী মানুষকে রাক্ষসের মত ক্ষুধার্ত করে তোলে। প্রতিদিন বাড়ী ফিরত বিপিন আর খাবার সময় হাড়ির ভেতরটা দেখে হাত গুটিয়ে নিত। আক্রোশে জ্বলতে জ্বলতে শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে সে হিংস্র হয়ে উঠত। কোত্থেকে যে এই আপদটা এসে জুটল—উঃ—

খুড়ির দোষ নেই। জামাই ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই, সে যাবে কোথায়? সে জানে যে তার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে, তাই পরিপূর্ণ ভাবে জীবনের স্বাদটা পেতে চায় বুড়ী। লোভীর মত। খেতে বসে ঝেঁকে বসত, ভাত দেখে গভীর তৃপ্তির আবেশে তার চোখ দুটো বুজে আসত। মুখে চার-পাঁচটা মাত্র নড়বড়ে দাঁত আছে, তাই দিয়ে ধীরে ধীরে, রসিয়ে রসিয়ে ভাত চিবোত সে, আর অনেকক্ষণ ধরে খেত।

বিপিনের খাওয়া হয়ে যেত, বাচ্চাটারও শেষ হত, বুড়ী তবু বসে থাকত। বসে বসে ভাত কটা শেষ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বলত, "তোর ডাঁটা চচ্চড়িটা বড় ভাল হয়েছে মালা; দে তো আর চাট্টি ভাত মা—"

মালা মৃদু হেসে হাঁড়ি থেকে ভাত দিত আর প্রায় শূন্য হাঁড়ির চেহারাটা দেখে বিপিন বারুদের মত জ্বলত। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে ক্রোধের উচ্ছ্বাসটাকে দমন করতে গিয়ে সে বিড় বিড় করে বলত, "হারামজাদি—রাক্ষুসী—মরেও না, বজ্জাত মাগী কোথাকার—"

মালা একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করত, "কি হল! তুমি কিছু বলছ নাকি?"

বাচ্চা ছেলেটা ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ আব্দার করে উঠত "আমুও খাব দিদিমা—হ্যাঁ—"

ছেলেটার পিঠে লোহার বলের মত শক্ত মুষ্টির এক ঘা বসিয়ে বিপিন সজোরে বলত, "কিচ্ছু বলছি না—তুমি খাও—"

ছেলেটা আচমকা কিল খেয়ে কান্নায় ফেটে পড়ত, সে শব্দে সমস্ত ঘরটা ভেঙে পড়তে চাইত আর বিপিনের হিংস্রতা বেড়ে উঠত ক্রমশঃ। ছেলেটার দিকে তর্জনী নাচিয়ে সে আদেশ করত, "চোপ—চোপ বলছি।"

ছেলেটা থামত না। কেঁদেই চলত।

মালা তখন চেঁচিয়ে উঠত, "কথা নেই বাত্তা নেই, ওকে মারলে যে! তার চেয়ে একেবারে মেরেই ফেল না ওকে—"

"চোপ—"

"কেন চুপ করব কেন? কি দোষডা করলাম?" মালা কেঁদে উঠত।

ধাঁ করে মালাকে একটা লাথি মেরে বিপিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত। বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলে আর বৌয়ের কান্নার বিশ্রী শব্দটা দু-চার সেকেণ্ড চুপ করে শুনে বিপিন ভাটিখানার দিকে পা চালিয়ে দিত। সে কান্না সইতে পারে না। চলন্তে

চলতে আফসোস্ হত তার। কাকে মারতে কাকে মারলাম বাবা, ওদের না মেরে বুড়ীকে এক ঘা মারলেই তো হত।

এমনিভাবে দিন কাটছিল। ছেলে বৌয়ের কান্না শুনে আর পেট ভরে খেতে না পাওয়ায় শুধু বিপিনের মনের মধ্যেই যে হিংস্রতার ঝড় উঠেছিল তা নয়, বিপিনের সহকর্মীদের মনেও তেমনি ঝড় উঠেছিল। ধীরে ধীরে দলবদ্ধ হচ্ছিল তারা, সংগঠিত হচ্ছিল। ফাঁকা বুলির দমকে তারা এক হচ্ছিল না, পেটের দায় তাদের পাশাপাশি দাঁড়াতে শেখাচ্ছিল। যুদ্ধের বাজারে কোটি টাকা আয় হয়েছে ফ্যাক্টরীর কিন্তু তাদের আয়ের অঙ্ক বদলায়নি। যুদ্ধের দেবতারা বাজারে আগুন ছড়িয়েছে, চাল ডাল আর নুন তেল হয়েছে দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য—অথচ তাদের শ্রমের দাম বাড়েনি। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর পেটে যে রাক্ষসের ক্ষুধা জন্মায় তার সামনে অল্প আহার্য দেওয়ায় এবার বিপর্যয় ঘটল। ফ্যাক্টরীর শ্রমিকেরা বিদ্রোহের পতাকা তুলে হাওয়ায় ধরল। বেতনবৃদ্ধির দাবী নিয়ে তারা কর্তৃপক্ষের সামনে দাঁড়াল, দাবীর খস্‌ড়াটা সিগারেটের ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিয়ে রক্তচক্ষু করল মালিকেরা। শ্রমিকেরা পালটা ঘা মারল।—ষ্ট্রাইক্। বিপিনও সোৎসাহে এতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একদিন—দু-দিন—দশ দিন—। তবু মীমাংসা হল না। এ লড়াইয়ের নিয়মই যে এমনি। মালিকেরা ভাবে যে ক্ষুধার তাড়নায় হয়ত ধর্মঘট ভেঙে যাবে। যাই ভাবুক—এখানে তা হল না। ধর্মঘট চলল।

ওদিকে শ্রমিকের কোষাগার শূন্য হয়ে গেল। মাসের মাঝামাঝি তারা বিদ্রোহ করেছে, ভেবেছিল কয়েক দিনেই তা শেষ হবে। অথচ তা হল না, অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল।

বিপিন চিন্তায় পড়ল। চারটে পেটের জোগান, এখন সে দেবে কোত্থেকে? কি করে চালাবে সে? না চালালে চলবেই বা কি করে? বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠতে পারে না, চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে আসে সব কিছু। অথচ হার মানলেও চলবে না। কি করা যায় তবে? ধার? কার কাছে, কোন মুখে সে তা চাইবে?

এমনি অভাবের সময় বুড়ি শাশুড়ী যেন আরো ক্ষেপিয়ে তুলল বিপিনকে। পকেটে পয়সা নেই, শিগ্‌গীর টাকা পাবার কোন আশাই নেই, অতি কষ্টে নুন ভাত জুটছে এক মুঠো করে—তবু বুড়ীর নির্লজ্জ ক্ষুধা এক তিলও কমেনি। সন্ধ্যার

পর সেদিন বিপিন চুপ করে বসে ছিল। ক্ষুধার জ্বালায় ঝিমোতে ঝিমোতে সে ফ্যাক্টরীর কর্তৃপক্ষের অনমনীয় দৃঢ় মনোভাবের কথা ভাবছিল। আর কতদিন, আর কতদিন চলবে এমনি ধারা ?

মালা এসে ডাকল, "ভাত খেতে এস—"

ভাত ! লাফিয়ে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে বসল বিপিন। গিয়ে দেখল যে ছেলেটা আর বুড়ী এসে আগেভাগেই বসে আছে সেখানে। ভাত খেতে আরম্ভ করল সবাই। শুধু ভাত আর আলুসেদ্ধ, আর কিছু নয়। খাওয়া শেষ করেও বিপিন উঠল না, বসে বসে বুড়ীর খাওয়া দেখতে লাগল। কেমন যেন নীচ হয়ে গেছে সে কিন্তু টের পেয়েও নিজেকে সংশোধন করতে পারে না বিপিন।

বুড়ী পাতের ভাত শেষ করে মেয়ের দিকে তাকাল—"মালা অ-মা"

"কি ?"

"আর চারডি ভাত দে তো মা—এই এত কটি দে—"

মালা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শীর্ণ হাসি হাসল, তারপর এক হাতা ভাত দিল তার পাতে।

বুড়ী খুশি হয়ে বলল, "থাক্ থাক্, ওতেই হবে মা, ওতেই হবে—"

দিদিমাকে ভাত খেতে দেখে ছেলেটাও হঠাৎ দাবি জানাল, "আমাকেও ভাত দে—এই মা—"

মালা ধমক দিল "আগে ঐ কটি খা দেখি রাক্কস—তারপরে চাস—"

ছেলেটা অসহিষ্ণু হয়ে মাথা নাড়িল, "না, আমার আরো ভাত দে, দে বলছি।"

"না"

ফস্ করে প্রশ্ন করল বিপিন, "কেন, দেবে না কেন ?"

"বা—রে, আমি খাব না ?"

বিপিনের মুখ কুৎসিত হয়ে উঠল, "মা চাইলে দিতে পার আর ছেলে চাইলে দিতে পার না কেন ?"

"কি বললে !" মালা চেঁচিয়ে উঠল।

"মা—অ-মা—আরো ভাত দে না"—

দুম করে ছেলের পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিল মালা। তারস্বরে কেঁদে উঠল ছেলেটা। বুড়ী খাওয়া বন্ধ করে মাথা নীচু করে স্তব্ধ হয়ে রইল।

বিপিন একবার নড়ে উঠল। ক্রন্দনরত ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ

তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, সারা শরীর গরম হয়ে উঠল। কী বিশ্রী দেখাচ্ছে ছেলেটাকে! আর কী বিশ্রী এই কান্না, কি বিশ্রী! অসহ্য মনে হল তার।

কর্কশ কণ্ঠে সে মালাকে প্রশ্ন করল, "ওকে মারলে যে?"

"বেশ করেছি"—উদ্ধত ভঙ্গিতে জবাব দিল মালা।

লোহা পিটানো হাতের মধ্যে এঁটো ভাত শুকিয়ে খড়খড় করছিল সেই হাত দিয়েই বিপিন মালার গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। ঠাস করে একটা শব্দ হল।

মালা কাঁদল না। কিন্তু আরো জোরে কেঁদে উঠল ছেলেটা আর কেঁদে উঠল বুড়ী। হাউমাউ করে।

বিপিন উঠে দাঁড়াল। আর টেঁকা যাচ্ছে না। কুৎসিত কান্নায় রান্না ঘরটা ভরে উঠেছে। কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় ভরাট ঘরে যেমন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তেমনি কষ্ট হচ্ছে তার। বুড়ী কাঁদছে। বলি-রেখাঙ্কিত মুখের চামড়ায় তার কান্নার প্রাবল্যে আরও ভাঁজ পড়েছে। গুমরে গুমরে কাঁদছে বুড়ী।

বিপিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। রাস্তায়। এলোমেলোভাবে বেড়াতে লাগল সে, ভাঁটিখানায় যাবার মত রসদ তো আর নেই।

ভোরবেলায় পরদিন উঠে দেখা গেল যে বুড়ী ঘরে নেই। মালা ছট্‌ফট্ করতে লাগল, বিপিন গিয়ে বস্তির এদিক ওদিক খোঁজ নিল, কোথাও পাওয়া গেল না বুড়ীকে! বেলা বাড়তে লাগল, দিন কাটল, বুড়ী আর ফিরল না। মালা অনবরত চোখের জল মুছতে লাগল কিন্তু বিপিন একটুও বিচলিত হল না। ভালই হয়েছে। আপদটা বিদেয় হয়েছে, এখন থেকে তবু দু-মুঠো বেশী খাওয়া যাবে।

তিন চারদিন কেটে গেল আরো। ধর্মঘটের অবস্থা ওদিকে একই রকম। কর্তৃপক্ষেরা মাঝে দালাল দিয়ে বিভেদ-সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, ফল হয়নি—শ্রমিকদের দৃঢ়তা তাতে আরো বেড়ে গেল।

কিন্তু আর যে চলে না।

মালা বলল "কোনমতে আরো দু-দিন চলবে, বুঝলে? আমার মা হতভাগী তো নিষ্কৃতি দিয়ে গেছে, তাই কোনমতে আরো দু-দিন তোমার পেট ভরাতে পারব—"

বিপিন ক্ষেপে গেল, "শুধু আমার পেট ভরাবে? আর তোমরা?"

মালা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমাদের কথা ভেবে তোমার দরকার কি গো—আমরা হাওয়া খেয়ে থাকবো—"

মালার চুলের গোছা টেনে, খারাপ একটা গাল দিয়ে বিপিন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "তোর বড় বাড় বেড়েছে মালা, সাবধান—"

বিপিনের চোখ মুখের চেহারা দেখে কেমন যেন ভয় পেল মালা। সে চুপ করল কিন্তু তার অন্তরের জ্বালা জল হয়ে বেরোল চোখ দিয়ে, আর তাই দেখে তাকে ছেড়ে দিয়ে পালাল বিপিন। কান্না—এই কান্না সে সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু কান্নার হাত এড়াবে কি করে বিপিন? বাচ্চা ছেলেটা সকালে বিকেলে খেতে চায়, অনবরত কাঁদে।

"ভাত খাব মা—ভাত—"

"মাগো, খেতে দে মা—"

তীক্ষ্ণ, একটানা সুরে কাঁদে ছেলেটা। একটা আহত জন্তুর মত। সে কান্না শুনে বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে বিপিনের।

ছেলের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলোয় সে, "কাঁদছিস কেন বাবা, এ্যাঁ? কাঁদিস্ না, থাম্ থাম্—"

কিন্তু ছেলেটা বোঝে না, শোনে না, অন্ধ আবেগে, শূন্য-জঠরের নিষ্ঠুর তাড়নায় সে সমানে কেঁদে চলে আর বলে, "ভাত খাবো মা—মাগো—মা—"

বুঝিয়েও কান্না থামাতে না পেরে ক্ষেপে ওঠে বিপিন, হঠাৎ ছেলেটার কান ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, "চুপ কর শুয়ারকা বাচ্চা-চু—প—"

ছেলেটার কান্না তাতে আরো সশব্দ হয়ে ওঠে, বিকট হয়ে ওঠে। বিপিন তখন পাগলের মত ঘর থেকে ছুটে বেরোয়।

মালার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে পেছন পেছন, "ছেড়ে দিয়ো না গো, মেরে ফেল, তুমি ওর জন্ম দিয়েছ, তুমিই ওকে শেষ করো, বুঝলে?"

বস্তির আঁকাবাঁকা, নোংরা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় বিপিন। সামনে যা পড়ে তাতেই পরম আক্রোশে লাথি মারে সে। হাঁস, মুরগী, কুকুর—কেউই রেহাই পায় না। কান্না সইতে পারে না সে। কেন কাঁদে বাচ্চাটা, কেন কাঁদে মালা আর কেনই বা কাঁদত সেই বুড়ীটা? বস্তির ঘরে ঘরে আরো কত লোক যে এমনি কাঁদে, কত অসংখ্য লোক কাঁদে সারা পৃথিবীতে!

ধর্মঘটের ইতিহাস ওদিকে বদলায় না। মুখোমুখি দু'দল দাঁড়িয়ে আছে। দু'দলই সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু কেউই হার মানছে না। একদল শুকিয়ে মেরে জিততে চায়—আর একদল শুকিয়ে মরেও জিততে চায়।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বিপিন বাড়ী ফিরে দেখল যে ছেলেটার প্রবল জর এসেছে। চোখ বুজে জরের ধমকে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে ছেলেটা, আর শিয়রের কাছে প্রস্তরমূর্তির মত বসে আছে মালা।

ছেলেকে দেখে বিপিনের মুখ দিয়ে কথা সরল না। হাতে পয়সা নেই, ওষুধ পথ্য কি করে আসবে ছেলের? এমন অসময়ে হঠাৎ ছেলেটারঅসুখ হল কেন?

কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে হঠাৎ জলে উঠল বিপিন, বলল, "বুড়ী—ঐ বুড়ীর শাপেই চ্যাংড়ার জর এসেছে—"

মালা জবাব দিল না, শুধু তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসতে লাগল।

"কাঁদছ! দূর ছাই"—

আবার সেই কান্না! বিপিন ছিট্‌কে বাইরে চলে গেল।

পরদিন সকালে একটা কাণ্ড ঘটল।

ছেলেটার জর সকালের দিকে কম দেখা দিল। সেই সুযোগে মালা গেল বড় রাস্তার ওদিককার একটা বাড়ীতে। সেখানে নাকি ঝি রাখা হবে। বিপিন বাড়ীতে রইল। ছেলের কাছে বসে চুপচাপ সে ভাবছিল আর কতদিন ধর্মঘট চলবে, আর কতদিন?

ঠিক এমনি সময়ে ক্ষীণকণ্ঠে কে যেন বাইরে থেকে ডাকল, "মালা—অ-মা"—ডাকতে ডাকতে কে যেন একেবারে ঘরের ভেতর এসে পড়ল। বিপিন তাকাল। তার বুড়ী শাশুড়ী।

"তুমি!" বিপিন উচ্চারণ করল।

বুড়ীর মুখটা কালো হয়ে গেল। ভয়ে, অপ্রত্যাশিত বিভীষিকার মত জামাইকে দেখে। বুড়ীর ছেঁড়া শাড়ীটা আরো ছিঁড়ে গেছে, ময়লা হয়ে গেছে। তার চোখে মুখে আরো বলিরেখা স্পষ্ট ও ঘন হয়ে উঠেছে, পিঠটা যেন আরো ভেঙ্গে গেছে।

অর্থহীন হাসি হেসে, শুষ্ক ও অস্পষ্টভাবে সে বলল, "মালা নেই, না?—"

"না"—বিপিন মাথা নাড়ল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বলল, "কিন্তু তুমি ফিরে এলে যে!"

বুড়ী ফোগলা দাঁত মেলে আবার হাসল, "এলাম। কোথায় আর যাব বাবা"—বলেই হঠাৎ কেঁদে ফেলল বুড়ী, "সাতদিন—সাতদিন কিছু খাইনি—"

বুড়ীর কান্না দেখে হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল বিপিন। কান্না! এরা শুধু কাঁদে। খায় আর কাঁদে। কিন্তু আর খাবার নেই, খাবার অত সস্তা নয়।

কঠিন কণ্ঠে সে বলল, "তুমি বেরোও এখান থেকে"—

"কোথায় যাব বাবা।"

যেখানে খুশি—কাজ করে খাওগে যাও—"

বুড়ী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, বলল, "সাতদিন ধরে কিছু খাইনি সোনা—ও আমার বিপিন—ও মানিক—"

হঠাৎ এগিয়ে এল বিপিন, জ্বলে উঠে বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলল, "ভাল ভাবে যদি না বেরোস বুড়ী, আমি গলা টিপে তোকে মেরে ফেলব—"

সভয়ে, সত্রাসে বুড়ী কান্না বন্ধ করল, মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "আচ্ছা আর আমি আসব না গোপাল—তোমরা সুখে থাকো"—যাওয়ার সময় বুড়ীর পিঠটা যেন আরো ভেঙে গেল। কাঠের পায়ের মত পা দুটোকে টেনে টেনে সে ধীরে ধীরে চলে গেল সেখান থেকে।

বিপিন হাঁপ ছাড়ল। বাঁচা গেল বাবা। নীচতা, নিষ্ঠুরতা, যাই বলুক লোকেরা, সে ভালভাবে বাঁচতে চায়।

পরদিন।

ছেলেটার অসুখ আরো বাড়ল। অতিকষ্টে এক জায়গা থেকে চার টাকা ধার করল বিপিন, দু-টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার ডেকে দেখাল।

অনেকক্ষণ ধরে দেখল ডাক্তার, দেখে বলল, "জ্বরটা ভাল নয় হে, ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও—"

"আজ্ঞে আচ্ছা—"

কিন্তু হাসপাতালে বেড নেই। সব হাসপাতালেই অতিরিক্ত ভীড়। তবু একটা প্রেস্‌ক্রিপসন নিয়ে ওষুধ পাবার সুযোগ করে দিল তারা।

ইতিমধ্যে ধর্মঘটের অবস্থা জটিল হল। ভেতরে ভেতরে ফ্যাক্টরীর মালিকেরা বিভেদ-সৃষ্টির কাজে খানিকটা সফল হল। পেটের দায়ে দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল শ্রমিকেরা। দালালেরা এবং ক্ষুৎকাতর শ্রমিকেরা একদিকে, অন্যদিকে সেই সব শ্রমিকেরা যারা ক্ষুধার জ্বালাকেও অস্বীকার করে নিজেদের অবস্থা ভাল করতে চাইছিল। একদল চাইল মিটমাট করে কাজে যোগ দিতে, অন্যদল চাইল ধর্মঘট চালিয়ে যেতে। একদল স্থির করল যে পরদিনই তারা যোগ দেবে, অন্যদল স্থির করল যে সহকর্মীদের তারা বাধা দেবে।

তাই হল। পরদিন দু-দলই গিয়ে ফ্যাক্টরীর দরজার সামনে ঠেলাঠেলি

আরম্ভ করল। চীৎকার কোলাহল, মারামারি। ফলে পুলিস এল, গুলি চলল, কিছু লোক গ্রেপ্তার হল। যারা বাধা দিচ্ছিল তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, অন্যদল কাজে যোগ দিল। দিনের শেষে আরো অনেকেই গিয়ে যোগ দিল। ধর্মঘট ভেঙে গেল। নামেই যারা চালু রাখল তা, বিপিন তাদের অন্যতম।

অথচ বাড়ীতে আর একদানাও চাল নাই, ছেলেটাও অসুস্থ। আহত অবস্থায় এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ী ফিরল বিপিন।

সব শুনে মালা গুম্ হয়ে রইল, পরে বলল, "তুমিও গেলে না কেন কাজ করতে, এঁ্যা ?"

"আমি! আমি যাব কেন? আমি কি কুত্তার বাচ্চা?"

মালা ঝংকার দিয়ে উঠল, "হয়েছে হয়েছে, ওসব বড় বড় কথা থামাও—মুরোদ নেই তার আবার—"

রক্তটা তখনও টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিল। বিপিন কাছে এগিয়ে এল, বলল, "কি বললি?"

"যা বললাম তা শোননি, কানে কি মোম ঢেলেছ নাকি!" ক্ষুধার জ্বালায় মালাও আজ হিংস্র হয়ে উঠেছে।

একটা কিছু করে বসত বিপিন, নিশ্চয়ই করে বসত। এমনি সময়ে ছেলেটা কেঁদে উঠল, ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, "ভাত খাব—অ'মা—মা—"

কুঁকড়ে গেল বিপিন, অবসন্নের মত একপাশে বসে পড়ল সে, বসে বসে ছেলের কান্না শুনতে লাগল। কী বিশ্রী এই কান্না! শুনতে শুনতে কেমন যেন অসহায় বোধ করে সে, দুর্নিবার একটা আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে, কাউকে দায়ী করতে ইচ্ছে হয় এই কান্নার জন্য।

বিড় বিড় করে সে মাঝে মাঝে বলতে লাগল, "কাঁদিস্ না, ওরে— কাঁদিস্ না বাবা—"

দু-পয়সার বার্লি দু-দিন ধরে চলছে। শুধু জলই বলা যায়। তাই খেয়ে ছেলেটা একসময় চুপ করল, আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল। জ্বর বাড়ছে তার।

"বিপিন—ওহে বিপিন—"

"কে?"

দরজার গোড়ায় বন্ধু সাধুচরণ এসে দাঁড়াল, "আমি। একবার বাইরে এস

তো। বাজারের বুড়ো বটগাছটার নীচে তোমাদের বুড়ী বোধ হয় মরে পড়ে আছে—”

“কি বললে ?”

বিপিন উঠে দাঁড়াল, যেন বিদ্যুতের চাবুক এসে পড়ল তার গায়ে।

“হ্যাঁ—তাই তো মনে হচ্ছে। খুব রোগা, চিনতে কষ্ট হয়—তবু ভুল করিনি আমরা —”

বিপিন ঘর থেকে বেরোল তাড়াতাড়ি। বাইরে এসে সে শুনতে পেল যে ঘরের মধ্যে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে মালা কাঁদছে আর মায়ের কান্না শুনে ছেলেটাও ভয় পেয়ে কাঁদছে। বিপিনের শরীর শিউরে উঠল। কী বিশ্রী এই কান্না! শুধু মৃত্যুশোকের কান্না তো এত কুৎসিত নয়। বার্ধক্যে, অনাহারে, পথের ওপর মা মারা গেছে বলেই বোধ হয় মালার কান্না এত ভয়াবহ।

সেইদিন থেকে যে তার কি আরম্ভ হল তা বিপিন বোঝাতে পারে না। যখন তখন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে মালা, নিঃশব্দে কাঁদে। আর কাঁদে ছেলেটা। জ্বর যখন কম থাকে তখনও ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকায় আর নাকী সুরে কাঁদতে থাকে, জানাতে থাকে তার অসংখ্য চাহিদাকে। ভাত খাবে, মাছ খাবে, এটা খাবে ওটা খাবে সে। রোগা হয়ে গেছে ছেলেটা, চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙ্গে গেছে, জিরজির করছে হাড়গুলো। দেখে চোখে জল আসে। আর কী বিশ্রী তার কান্না! সে কান্না শুনে বিপিনের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে, সেখানকার যন্ত্রপাতি যেন উলটে পালটে ভেঙে চুরে যাবার উপক্রম করে। গগনভেদী মনে হয় ছেলেটার কান্না। ছেলেটা যেন একা কাঁদছে না, তার সঙ্গে যেন আরো অসংখ্য ছেলেরা কাঁদছে। সেই সব ছেলেরা—যাদের বাপেরা মাটি কাটে, ফসল কাটে, যন্ত্র-দানবকে পরিচালিত করে, লোহা পিটোয় আর পাথর ভাঙে। অসহ্য মনে হয় তা। দু কানে আঙুল পুরে তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় বিপিন।

ধর্মঘটকারী যে ক-জন তখনও লড়াইটা জিইয়ে রেখেছিল তারা হঠাৎ দু-দিন বাদে আবিষ্কার করল যে ফ্যাক্টরী তাদের বাদ দিয়েই চলতে আরম্ভ করেছে—তাদের কথা যেন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য শ্রমিকেরা ভুলেই গেছে। বস্তিতে অবসর সময়ে তারা সহকর্মীদের বোঝাতে গিয়েও ব্যর্থ হল। সবাই কেমন যেন নিস্তেজ

হয়ে গেছে। তাই আরো দু দিন অপেক্ষা করে তারা শেষে এক পা এক পা করে ফ্যাক্টরীর গেটের সামনে হাজির হল। ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হল না সবাইকে। কয়েকজনকে মাত্র ডেকে নেওয়া হল। আধ ঘণ্টা বাদে বুড়ো দারোয়ান এসে একটা বড় কাগজ টাঙিয়ে দিয়ে গেল ফটকের সামনে। সবাই গিয়ে ভিড় করল সেখানে। কি ব্যাপার, কি লিখে জানাল মালিকেরা? দুরু দুরু বুকে পড়তে আরম্ভ করল সবাই, পড়ে তাদের হৃদ্‌স্পন্দন যেন থেমে যাবার উপক্রম হল, দু-চোখের তারায় ঝিক্‌মিক্ করে আগুন জ্বলে উঠল। তিন-চারজন ছাড়া বাকী বাইশজন লোক ফ্যাক্টরী থেকে বরখাস্ত হয়ে গেছে, তারা যেন পাঁচদিন বাদে তাদের প্রাপ্য টাকাকড়ি নিয়ে যায়।

বিপিনও খড়্গের ঘা থেকে রেহাই পেল না। ক্লান্তপদে যখন সে বাড়ী ফিরল তখন তার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, চোখের সামনে ঝিল্‌মিল্ করে দুলছে সব কিছু, চিন্তাশক্তি মাঝে মাঝে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। টাকা নেই, পয়সা নেই, আগুনের মত বাজার—চাকরিটা গেল! ছেলেটার অসুখ, মরে বাঁচে ঠিক নেই, ওষুধ পথ্য কেনার সঙ্গতি নেই। তবু চাকরিটা গেল! সুবিচার চেয়েছিল যারা, তাদের সঙ্গে সে হাত মিলিয়েছিল, চুরি করতে চায়নি, খুন করতে যায়নি—তবু বরখাস্ত হল সে! তাহলে? সব মিথ্যা। নীতি, ন্যায়, ধর্ম—সব বাজে কথা! মানুষের জীবনটা তাহলে অদৃশ্য এক অন্ধ নিয়তির ইঙ্গিতে চলে! তাই বিপদগ্রস্ত আরো বিপদাপন্ন হয়, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ে, অসংখ্যের রক্তমাংস দিয়ে মুষ্টিমেয়ের প্রাসাদ রচিত হয়! বিপিনের মাথা যেন ফেটে পড়বার উপক্রম হল।

কিন্তু বাড়ী ফিরেই আর একটা বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়াল সে। আগ্নেয়গিরির একমুখ থেকে আর একটা মুখে গিয়ে পড়ল সে। ছেলেটা জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। মালা কাঁদছে।

হাত পেতে, ভিক্ষুকের মত কথা বলে অনেক সময় ধার পাওয়া যায়। তা দিয়ে ডাক্তার ডাকাও হল কিন্তু ডাক্তার মাথা নাড়ল। দেরী হয়ে গেছে, টাইফয়েডের জটিলতম রূপ।

মালা বিনিয়ে বিনিয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বসে বসে বিপিন তাই দেখে। দেখে আর জ্বলে উঠে তার সারা দেহ। তার ছেলেটা মারা যাচ্ছে। ব্যাধি। কিন্তু তার মূলে কি? কাকে বলবে একথা বিপিন? এসব নিরর্থক। পৃথিবীতে এই হয়—নিঃশব্দে তা মেনে নেওয়াই ভাল।

অভিভূতের মত বসে বসে দেখতে লাগল বিপিন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে গেল। মালার মৃদু কান্না শুনতে শুনতে বুকের ভেতর কোথায় যেন হাড়গোড় চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ চমক ভাঙল তার, সে লাফিয়ে উঠল।

"বাবা—ও বাবা—মাণিক আমার"— মালা চিৎকার করে উঠল।

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল বিপিন, ফিস্‌ফিস্ করে, "কি হল? মরে গেল নাকি? এ্যাঁ?"

মালা তার কথা শুনতেই পেল না, একই ভাবে সে চিৎকার করে কেঁদে বলল, "আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলি বাবা?—বাবারে—"

সে কান্না ভয়াবহ।. পাঁচ বছরের মরা ছেলে কোলে করে মা কাঁদছে। মরে ছেলেটার মুখ গম্ভীর ও ভারিকী হয়ে গেছে। আর মালাকে যেন চেনাই যায় না। ও যেন মানুষ নয়, পুঞ্জীভূত বেদনার একটা স্তূপ। যে অসহায় বেদনা, অন্যায় আর বঞ্চনাতে জাগে বিপ্লব—ও যেন সেই বেদনার একটা বহ্নি। যুগ-সঞ্চিত পাহাড়। বিপিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর কোথা থেকে কি যেন সব হয়ে গেল। ছেলেটাকে পোড়ান হল, রাতটা কাটল, তারও পরের দিন কাটল। একসঙ্গে এতগুলো দুর্ঘটনা, এতগুলো আঘাত। সব সহ্য করে চুপ করে বসেছিল বিপিন। কিন্তু মালা চুপ ছিল না। বিনিয়ে বিনিয়ে, ক্লান্তকণ্ঠে কাঁদছিল সে। জীবন্ত মানুষের কান্না নয় তা। পাতালের ভেতরকার অন্ধকার কোন প্রকোষ্ঠে বসে যেন সে কাঁদছে—ছেলেটা যেন তার কাঁদবার শক্তি খানিকটা চুরি করে মারা গেছে, তাই সে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে কাঁদছে না।

বিপিন চুপ করে বসেছিল। বসে বসে মালার এই কান্না শুনছিল। বুড়িটা শেয়াল কুকুরের মত মারা গেল, চাকরি গেল, ছেলেটা মারা গেল। এবার ঘরের মধ্যে যেন একটা অশুভ ছায়া ঘনিয়ে উঠছে। আর এই কান্না অসহ্য। এই কান্না শুনলে মনে হয় যেন সে ভারী অসহায়, যেন সে একটা অদৃশ্য মানুষের হাতের পুতুল। তার মাথাটা গরম হয়ে উঠল, সব চিন্তা তালগোল পাকিয়ে গেল। বুকের ভেতরে আশার যে স্ফটিকের প্রাসাদটা ছিল তা যেন হঠাৎ রেণু রেণু হয়ে উড়ে গেল আর সৃষ্টি করল একটা দিকচিহ্নহীন মরুভূমিকে। চোখের সামনে আকাশের গায়ে যত সোনার রেখা ছিল, সব যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত চেপে সে উঠে দাঁড়াল, মালার কাছে গেল, বলল, "থামো"—

মালা থামল না।

"থামো মালা—কেঁদো না—ছিঃ—"

তবু মালা থামল না।

"কেঁদো না—শুনছ"—ধমকে উঠল বিপিন।

আরো জোরে কেঁদে উঠল মালা "ওরে বাবা, বাবা রে, না খেয়ে অচিকিচ্ছেয় যে তুই মারা গেলি রে বাবা—"

গর্জন করে উঠল বিপিন, "মালা—থামো—"

মালা এবার তাকাল, তার জলভরা চোখে বিদ্যুতের শিখা, তার ক্রন্দনাকুল মুখে চোখে মণিহারা সাপের ক্রূরতা।

সে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "না, থামব না—"

বিপিনের সমস্ত রক্ত যেন মস্তিষ্কের কোটরে গিয়ে জমা হল, কানের কাছে এসে সশব্দে তা যেন আছড়ে পড়তে লাগল। তার চোখ লালচে হয়ে উঠল, কপালের শিরগুলো মোটা হয়ে উঠল। না, মালার কান্নাকে থামাতেই হবে। সে অসহায় নয়, সে হার মানবে না, তার পেশীর মধ্যে যে শক্তি লুকানো আছে তাই দিয়ে আবার সব কিছু সে জয় করবে।

"থামবি না মালা!"

"না"—মালা গর্জে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, "কেন থামব? তুমি থামতে বলার কে? তুমিই তো আমার দশার জন্য দায়ী—"

"মানে? তার মানে?"

"আমার বুড়ি মাকে—আর কোলের ছেলেটাকে তো তুমিই খুন করেছ"—

"আমি!"

"হ্যাঁ"—

"চুপ কর হারামজাদী—"

সশব্দে, কান্নার অজস্রতায় ভেঙে পড়ল মালা, মাথা নেড়ে বলল "না, চুপ করব না—কি করবে তুমি? কি করবে আমার"—

মালা আর কথা বলতে পারেনি, আর কাঁদতে পারেনি। তার কান্নায় বিকৃত, বীভৎস মুখটার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল বিপিন, লোহা-পিটানো শক্ত দুটো হাত দিয়ে হঠাৎ সে মালার গলাটা টিপে ধরেছিল। মালার মাথা খারাপ

হয়েছে, এমনি ভাবে ঘা না মারলে ও থামবে না। মালার নরম গলার ওপর তার আঙুলগুলো বসে গেল। মালা বাধা দিল, মুক্ত হতে চাইল। মাঝে মাঝে দু-একটা উৎকট চীৎকারের টুকরো ছিটকে বেরোল তার গলা থেকে। বাধ্য হয়ে বিপিন তার গলাটা একটু জোরে টিপল। এখনো থামবে না মালা? বটে! বটে!

ঢং ঢং ঢং—। চমক ভাঙল বিপিনের, কান পাতল সে। জেলখানার বাইরে প্রহর ঘোষণা হল। ঢং ঢং—পাঁচটা বাজল। পাঁচটা। সময় শেষ। হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

খট্ খট্—খট্ খট্। তিন চার জোড়া বুটের শব্দ।

ঝন্‌ন্ ঝন্‌ন্—লোহার গেটটা সশব্দে খুলে গেল। ভেতরে এসে দাঁড়ালেন জেলর সাহেব, পেছনে বন্দুকধারী দুজন সেপাই ও একজন হাবিলদার।

"বিপিন দাস"—

"আজ্ঞে"—

উঠে দাঁড়াল বিপিন। হঠাৎ তার মাথাটা পরিষ্কার ও হাল্‌কা মনে হচ্ছে। পাঁচটা বেজেছে। বাইরে পৃথিবী এখনো শান্ত। কিন্তু কোথায় যেন কে এখনো কাঁদছে? একটানা কান্না। অনেকটা মালার কান্নার মত, ছেলেটার কান্নার মত, তার শাশুড়ীর কান্নার মত।

"জেলর সাহেব, কে যেন কাঁদছে, তাই না?"

জেলর সাহেব কান পাতলেন, মৃদু হেসে বললেন, "কৈ না তো।" একটু থেমে আবার তিনি বললেন, "বিপিন—এবার তোমাকে যেতে হবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—চলুন"

"তোমার কিছু বলবার আছে বিপিন?"

"বলবার?" বিপিন একটু ভেবে মাথা নাড়ল, "আছে হুজুর—"

"কি?"

"ওদের বলবেন যে আমি ভুল করেছি, আমার মাথার ঠিক ছিল না। গলা টিপে তো কান্না থামান যায় না।"—

"কি বলছ তুমি বিপিন?"

"ঠিকই বলছি হুজুর"—কেশে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বিপিন বলল, "[illegible] [illegible] যেন আমার মত ওরা যেন ভুল না করে, ওরা যেন না থামে"—

"কাদের বলব এ কথা ?"

"ওদের হুজুর—ওদের—যারা ছেলেবৌয়ের কান্না থামাবার জন্য এখনো লড়াই করছে—"

বুটের শব্দ তুলে করিডোর দিয়ে বেরোল ওরা। আগে জেলর সাহেব। পেছনে বিপিন, তার দু-পাশে দুই বন্দুকধারী সেপাই। আর সবার পেছনে হাবিলদার। কোন শব্দ নেই কারো মুখে। শুধু তিন জোড়া বুটের ছন্দোময় শব্দ উঠতে লাগল—খট্ খট্—খট্ খট্—লেফ্‌ট্ রাইট্ লেফট্—। তিন জোড়া পা যেন কথা বলছে, সদর্পে আত্ম-ঘোষণা করছে। আর তাদের মাঝে একজোড়া পা একেবারে নগ্ন, নিঃশব্দ। মৃত্যুর মত।

আকাশের আলোক-তোরণটা তখন একটু একটু করে খুলবার উপক্রম করেছে, জেল কম্পাউণ্ডের বড় বড় আম গাছের ডালে তখন পাখীরা প্রভাতী গান গাইছে, অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। আলো আঁধারে মেশানো বিস্তৃত উঠোনে হঠাৎ ফাঁসির মঞ্চটাকে দেখা গেল।

জেলর সাহেব বললেন, "হল্‌ট্—থামো।"

॥ —কান্না ॥

নিশুতি রাত নয়, রাত সাড়ে দশটা, কিংবা কে জানে এগারোটাও হতে পারে, যখন আর কি সব আলো নিভে যায়, চারিদিক চুপচাপ, ল্যাম্প—পোষ্টগুলো ঘুমে ঢুলতে থাকে, থেমে যায়, উঠোন ধোয়ার সপ্ সপ্ শব্দ, অসাবধানী ঝিয়ের হাতের বাসন গোছানোর ঠুং ঠাং বা ঝনঝনি আর বাজে না, যখন কচি ছেলের মা কাঁচা ঘুমের কান্না থামাতে অজপালিকে ঘুম-ঘুম চোখে দুধ খাওয়ায়, বুকের নয় তো বোতলের, যখন কিনা অনেক অন্ধকারের ওড়নায় পৃথিবীর মুখ ঢাকা পড়ে, আতঙ্কিত কালো রাতের পথে অজানা রহস্যের পদধ্বনিটুকুও শোনা যায় না, ছাদের কার্নিসে আর রাস্তার মোড়ের শিশু গাছের আড়ালে চোরা বিশ্রম্ভের অভিসার-আলাপ ফিসফিস করে না, যখন আশ্লেষশয়না নব দম্পতির অধরে ওষ্ঠে ঘটে মিলন, রাত মজে আসে যখন, তখন হয়তো কাঁকুলিয়ার সড়ক ধরে যেতে যেতে আপনি মেয়েলি কণ্ঠের একটি তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন।

সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটি নরম কণ্ঠের ব্যথাহত চিৎকার হয়তো শুনেছেন আপনি। এ পথের যে কোন হঠাৎ পথিকের কানেই এ কান্না বেজে ওঠে। বাতাস থমকে থেমে পড়ে এই মুহূর্তে, রাস্তার আলোর সারিও হয়তো চমকে চোখ তোলে, আর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস একটি মেয়ের সারা বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু। সেদিন দূরের ট্রাম-ডিপোর ঘণ্টা তখন এগারোটা বাজার সঙ্কেত জানায় নি। আর পড়শিদের চোখে তন্দ্রা ঘন হয়ে ঘুম হয় নি।

হ্যাঁ! চাঁদ ঢলে পড়েছিল। বাতাস বিলি দিচ্ছিলো গাছ-গাছালির গায়ে। পাড়ার শেষ-জাগরী পরীক্ষার পড়া-পড়ুয়া মেয়েটাও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে তখন।

জানালার পর্দাটা সরিয়ে, গরাদের ফাঁকে গাল চেপে অপেক্ষা করছিল শ্যামলী। থমথমে অন্ধকারে শ্যামলীর বোবা যৌবন প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলো।

ইন্দ্রনাথ।

অদূরে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেল শ্যামলী। আশায় আশায় চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, রাস্তার মোরম মাড়িয়ে কে যেন আসছে। ভারী পায়ের

জুতোর শব্দ শুনতে পেল ও। এক টুকরো মরা হাসির বিদ্যুৎ যেন দেখা দিল ওর মুখে, একটি মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর চোখ।

ইন্দ্রনাথই।

দোরের দিকে ছুটে গেল শ্যামলী। তার আগেই অধৈর্য হাতের কড়ানাড়ার আওয়াজ বেজে উঠেছে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে ও। ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকলো। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ। নাকে আঁচল চেপে কপাটে খিল দিলে শ্যামলী। তারপর ইন্দ্রনাথের ভারী চেহারার পেছনে পেছনে এসে ঘরে ঢুকলো।

আলোটা জ্বললো, নিভলো।

তারপরেই করুণ কাকুতি-ভরা ভীত-চকিত চিৎকার!

শিউলির দীর্ঘশ্বাসটা শুনতে পেল সুরঞ্জন। চোখ না চেয়েই মৃদু ভাবে শিউলির পিঠের ওপর হাতটা রাখলে। সান্ত্বনা। সমবেদনা।

সুরঞ্জনের হাতটা আঁকড়ে ধরলে শিউলি। কান্নায় কাঁপছে ও, সুরঞ্জন বুঝতে পারলে। তবু। উপায় কি!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ যেন ফুঁপিয়ে উঠলো শিউলি। গলার স্বর শুনে তাই মনে হ'ল সুরঞ্জনের।

—এর একটা বিহিত করতেই হবে। মরে যাবে মেয়েটা।

আজ নয়, কাল নয়। প্রতিদিন। ঐ একই ঘটনা ঘটে আসছে। আর শিউলির বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসে একটি দীর্ঘশ্বাস।—একটা বিহিত করতেই হবে। কিন্তু ও কি করতে পারে? কি করতে পারে ওরা!

শিউলি বলেছে, এ নরকে থাকা কেন তোর। বাবার কাছে চলে যা, শ্যামলী।

শ্যামলী হেসেছে।—কোথায় যাবো! পুরুষমানুষ অমন একটু আধটু হয়ই!

শিউলি চটে গেছে, বলেছে, তুই আর আমাকে পুরুষমানুষ চেনাস না, তোর দু'বছর আগে বিয়ে হয়েছে আমার।

হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে শ্যামলী। ব্যথার হাসি হাসে। অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ আর সুরঞ্জন, তফাৎটা নতুন করে চোখে পড়ে। শিউলিও বুঝতে পারে। অজান্তে আঘাত দিয়ে ফেলেছে শ্যামলীকে।

সান্ত্বনার সুরে বলে, ওকেই বা দোষ দেব কি। দোষ তো ওর নয়, দোষ নেশার।

শ্যামলী হাসে।—না দিদি, আমার অদৃষ্টের।

এরপর আর কি বলবে শিউলি। কথাটা তো মিথ্যে নয় যে প্রতিবাদ করবে! তাই ফিরে এসে সুরঞ্জনকে ধরে, আমার কথায় ও কান দেয় না। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো।

শিউ'লর ছোট বোন শ্যামলী। তার সঙ্গে সুরঞ্জনের সম্পর্ক সুখের, আনন্দের। আমোদমৈত্রী। ব্যথার, ব্যর্থতার কথা তার সঙ্গে আলোচনা করবে কি করে সুরঞ্জন।

—তবে চলো, আমরাই উঠে যাই কোথাও। অভিমান করে শিউলি।

সুরঞ্জন হাসে। ও জানে, শিউলি তা পারবে না। ইন্দ্রনাথ যখন এখানে বদলি হয়ে এলো, তখন থাকার জায়গা পায়নি সে। বাসা খুঁজে পায়নি। শিউলি, শিউলিই তো তখন জোর করে ডেকে আনলো ইন্দ্রনাথকে। সুরঞ্জনকে বললে নীচের তলাটা এমনি পড়ে থাকে, না হয় আমার বোনকেই ভাড়া দিলে।

সুরঞ্জন বলেছিল, শোনো শ্যামলী, দি'দটি তোমার কি স্বার্থপর। নিজে বিনা ভাড়ায় রয়েছে আর তোমার কাছ থেকে ভাড়া নিতে বলছে।

শ্যামলী কিন্তু রাজি হয় নি। ভাড়ার অঙ্কও একটা ঠিক হয়েছিল। দু'চার মাস ঠিক তারিখেই সে টাকা দিয়ে গেছে শ্যামলী। তারপরও দু'চার মাস। হাতের কঙ্কণ, কানের দুল্ কোথায় গেল তা না হ'লে! হ্যাঁ, শিউলি এ খবর যেদিন আঁচ করতে পেরেছে সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে সে-পথ।

তবু, ইন্দ্রনাথকে ফেলে রেখে যেতে চায় না শ্যামলী। কেন, কে জানে।

হয়তো দিনের সুমধুর অংশটুকুর লোভেই।

সত্যি। দিনের বেলায় ওদের দেখলে মনে হয় না, জীবনে ওরা ছন্দ হারিয়েছে।

ইন্দ্রনাথকে কিছু একটা বলবে, মনে মনে ঠিক করে এসেছিল শিউলি।

উঠানে একটা মোড়ার ওপর বসে দাড়ি কামাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ, আর অদূরে চা ছাঁকছিল শ্যামলী। কি একটা ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছিল দু'জনের মধ্যে। দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলে শিউলি। মনটা খুশীতে ভরে উঠলে ওর। কিন্তু। ও জানে, দুপুর শেষ হতে না হতে কিসের আতঙ্কে শ্যামলীর চোখে ভয় জেগে ওঠে; ও জানে, এ মিঠে মিতালির আয়ু সূর্যমুখী ফুলের মতই দিনাবদ্ধ। শেষ রোদ্দুরের সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত যায় শ্যামলীর সুখের

সমুদ্দুর। না, ইন্দ্রনাথকে কিছু একটা বলতেই হবে। মনে মনে শক্ত হয়ে নিলো শিউলি। তারপর একটু শব্দ করে ঘরে ঢুকলো।

ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি মোড়াটা ছেড়ে দিলে। সশ্রদ্ধ হাসি হেসে বললে, বসুন।

—বসতে আসিনি। একটু রুষ্ট ভাব ফোটাবার চেষ্টা করলে শিউলি।

বিস্ময়ের চোখ তুললে ইন্দ্রনাথ।

—বলছিলাম, শিউলি আমতা আমতা করে বলে, এত রাত করে বাড়ী ফেরো কেন? সোজা আর সরস কথাটা বলতে বোধ হয় বাধলো। বললে, আপিসের ছুটির পরে বাড়ী ফিরলেই তো পারো।

দিদির দিকে বিরক্তির চোখে একবার তাকিয়ে চায়ের পেয়ালাটা রেখে শ্যামলী পাশের ঘরে চলে গেল। ওর দুঃখ কম নয়, কষ্ট কম নয়। কিন্তু, অন্য কেউ, বিশেষ করে শিউলি এসে সহানুভূতি দেখাবে বা ইন্দ্রনাথকে উপদেশ দিতে আসবে —এ যেন অসহ্য ঠেকে শ্যামলীর কাছে।

—মেয়েরাও মানুষ, ইন্দ্র। স্বামীর কাছে একটু মায়া অন্ততঃ তারা আশা করে। তুমি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে···আমি আর কি বলবো।

শিউলির অনুরোধের স্বর যেন ওর বুক ছুঁয়ে গেল। চমকে চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, শিউলির চোখের কোনে কি যেন!

আত্মধিক্কারের লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলো ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু। দিনের আলোয় শ্যামলী আর ইন্দ্রনাথ কত সুখী। হাসাহাসি, হৈ হল্লা। ফুর্তিতে আর ফুরসতে যেন ডুবে আছে দু'জনে। অথচ সূর্য নিভলেই নেশায় ডুবতে চায় কেন ইন্দ্রনাথ। সংসার ভুলতে চায় কেন? হ্যাঁ, যৌবনে কে যেন স্পষ্ট একটা ছবি এঁকে রেখে গেছে ওর মনে। মনের পটে দুলে দুলে ওঠে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রবঞ্চনার মূর্তি। তাকে ভোলবার জন্যেই হয়তো।

শ্যামলী। হ্যাঁ, শ্যামলীকে ও অন্তরের অঙ্গ করে নিয়েছে। নিতে চায়। ঠিক্ বিয়ের পর কয়েকটা মাস কত খুশিয়াল স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটিয়েছিল ওরা। শ্যামলীর অসুখের কয়েকটা দিন। আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় ইন্দ্রনাথের। একটি মুহূর্তের জন্যেও কাছ ছাড়া হতে পারতো না সে। আশা আর আশঙ্কা। স্থির চোখে চেয়ে দেখতো শ্যামলীর রোগপাণ্ডুর মুখ। মাথায় আইস-ব্যাগ ধরে না—দিন্ রাত কাটিয়ে দিয়েছে।

কত মিষ্ট হাসি, মধুর কথালাপ। ভরসা দিয়ে বাঁচিয়ে তুললো ও শ্যামলীকে। সে-সব দিন কোথায় হারিয়ে গেল। কে জানে।

না। অনেক ভাল মেয়ে শ্যামলী। নরম মনের মেয়ে।

কিন্তু।

সন্ধ্যা হতে না হতে কিসের ডাক শুনতে পায় যেন ইন্দ্রনাথ। নেশার!

সব ভুলে যায় ও।

দোতলার জানালা থেকে দেখতে পায় শিউলি। আবছা অন্ধকারের রাস্তায় টলতে টলতে আসছে ইন্দ্রনাথ।

কপাট খুললো, কপাট বন্ধ হ'ল। ভয়ে আশঙ্কায় বুক দুলে উঠলো শিউলির। চোখ ঠেলে কান্না এলো। ওর হাত কাঁপছে, পা টলছে। রাগে, ব্যথায়, দুঃখে। তবু। তবু তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো শিউলি। তারপর মাঝপথেই থমকে দাঁড়িয়ে রইলো।

সপ্ সপ্ করে দু'বার শব্দ হ'ল। বেতের? শ্যামলীর নরম পিঠের ওপরই কি পড়লো নাকি? হ্যাঁ, আবার বাতাস চিরে ভেসে উঠলো শ্যামলীর কান্না। কান্না, কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, না কান্না চাপা দেবার চেষ্টা করছে?

—চুপ্। ইন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠলো।

আর সত্যিই চুপ করে গেল শ্যামলী।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের গলার স্বর শুনতে পেল শিউলি।—চুপ্ হারামজাদী। দিদির কাছে গিয়ে লাগাবি আর?

রাগে ফোঁসফোঁস করছে ইন্দ্রনাথ, শিউলি শুনতে পেল।

শুনতে পেল ইন্দ্রনাথ বলছে, আমি নেশা করি, আমি মারধোর করি!

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না শিউলি। ছুটে ওপরে উঠে এলো। এক ছুটে। এসেই বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

শ্যামলীর উপকার করতে গিয়ে একি করে বসেছে সে!

সকালে ওপরের বারান্দা থেকে শিউলি দেখতে পেল শ্যামলীর পিঠের ওপর আড়াআড়ি ভাবে দুটো কালসিটের দাগ। বেতের আঘাতে দুটো বেগনী রেখা ফুটে উঠেছে। পিঠের কাপড় সরিয়ে কি যেন লাগাচ্ছিল শ্যামলী, শিউলি দেখতে পেল।

না। আর কোনদিন কিছু বলবে না সে ইন্দ্রনাথকে।

শেফালী আর শ্যামলী। দু'বোন, বন্ধুও। আদরে আহ্লাদে ক্রোধে কান্নায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। কৈশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধন। যৌবনের চঞ্চলতা। হ্যাঁ, ওদের একজনের প্রথম যৌবনের উৎসুক আবেশ আর ব্যর্থ বিহ্বলতা আরেকজনের কাছে গোপন থাকেনি।

রেলিংয়ের থামটায় ঠেস দিয়ে ভাবছিল শিউলি। ভাবতে বসলেই কত কথা মনে পড়ে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস চোখ চেয়ে তাকালো শিউলি। দূরের আকাশের দিকে।

বিকেল ঝরে পড়ছে। পাড়াটা এমনিতেই নির্জন, নিস্তব্ধ। আজ যেন আরো নিশ্চুপ, আরো জনহীন মনে হ'ল। ছোট ছোট বাড়ীর সারি, পথের পাশে পাশে নাম-না-জানা গাছের ছায়া। শালিকের ডাক, চড়ুই পাখির হঠাৎ পাখা নাড়ার আওয়াজ। আর আকাশে মিইয়ে-আসা রোদের ঝিকামকি। কেমন একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ হাওয়া দুলছে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন পৃথিবীর পাঁজরের তলায় চমকে চুপ করে গেছে।

চোখের মত মনটাও উদাস হয়ে যায় শিউলির। খেয়াল থাকে না, কখন নিজেরই অজান্তে ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়েছে। তিন বছরের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ের দেহভারটুকুও টের পায় না।

ঠাণ্ডা মেয়ে খুশি। তবু কতক্ষণ আর চুপচাপ থাকতে পারে। মা'র বুক নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করলে নিজের মনেই। তারপর কি যেন বললে! শিউলির কানে গেল না।

ও তখন ভাবছে ছোটবেলাকার কথা। শিউলির সেই অসুখের সময়! কতই বা বয়স তখন ওর। শিউলির হাতে ইন্‌জেকসনের ছুঁচটা ফোটাতে দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল শ্যামলী। যেন ওরই হাতে ফুটলো ছুঁচটা। সেদিন ওর ভয় দেখে হেসেছিল শিউলি! তারপর। অনেক দিন। রোগশয্যায় পড়ে পড়ে শিউলি বুঝি ভাত খাবার বায়না ধরতো! তাই শ্যামলী একদিন লুকিয়ে ওর জন্যে মাছ আর ভাত নিয়ে এসে দিয়েছিল।

বলেছিল, দিদি, খেয়ে নে। মা ছাদে গিয়েছে, জানতে পারবে না।

মনে পড়লে হাসি পায় আজ।

শিউলির হাতে একটা ফোড়া হয়েছিল একবার। শ্যামলীরই বয়স তখন

পনেরোর কাছাকাছি। অথচ। ফোড়াটা কাটানোর সময় শ্যামলী কাছেই ছিল। হঠাৎ, শুধু রক্ত দেখেই কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল শ্যামলী?

অনেক, অনেক কথা মনে পড়ে শিউলির। দূরের দিগন্ত থেকে উদাস চোখ আর ফিরে আসতে চায় না। তবু। চোখে আর নাকে খুশির নরম হাল্কা হাতের স্পর্শে তন্ময়তা ভেঙে যায়। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুশির মুখটা গালের ওপর চেপে ধরে।

আদর পাবার মত, আদর করবার মত শ্যামলীর কোলেও যদি একটা কেউ থাকতো! শিউলির ভুলের জন্যেই হয়তো চটে আছে শ্যামলী। খুশিকে নিতে আসেনি আজ আর। কৌতুকের হাসি হেসে খুশিকে কোলে নিয়ে তরতর করে নীচে নেমে যায় শিউলি। তারপর শ্যামলীর পিঠের ওপর ওকে ঝুপ করে নামিয়ে ধরে বলে, মাসী মাসী করে সারা হ'ল ও, আর মাসীর সাড়াই নেই।

শ্যামলীও হেসে ওকে কোলে তুলে নেয়।

কিছু সময় খুশিকে নিয়েই কেটে যায় শ্যামলীর। আদর করে, শাসন করে।

কিন্তু। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেই কেমন যেন বিষণ্ণ দেখায় ওকে। চোখের তারায় ভেসে ওঠে কেমন এক ধোঁয়াটে দৃষ্টি।

তারপর। তারপর শিশুসন্ধ্যা ক্রমশ রাত হয়। রাত গভীর হয়। এপাশের ওপাশের বাড়ীর আলো নিভে যায়। আওয়াজের দমক মিইয়ে আসে। আবার সেই নির্জন, নিস্তব্ধ রাত্রি। ঈষৎ হাওয়ায় জানালার পর্দা ভাঙে, শুকনো পাতার শব্দ ভাসে। কালো কালো পীচের রাস্তা, কালো কালো গাছের গুঁড়ি। আর চাঁদের ছায়ায় ভেজা নির্জীব ইঁট-কাঠ-কংক্রিটের তাঁবুগুলো পড়ে থাকে নিঃশব্দে। আকাশের কোনে হয়তো মেঘ জমে, চাঁদ আড়াল পড়ে। তারা-জ্বলা ছায়েলা বীথিটাও নিষ্প্রভ হয়। শুধু দু'একটা রেতো বাদুড়ের ডাক শোনা যায়। আর দূরের কচিৎ ট্রামের ঘন্টি।

জানালার গরাদ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে শ্যামলী। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকে ওর দৃষ্টি। অন্ধের মত। কোন কিছুর দিকেই যেন চোখ যায় না ওর। আশা আর আশঙ্কায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে ও।

সিল্যুটের ছবির মত একটা সুদৃঢ় চেহারা দেখা যায়। অসংযত পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে আসছে ইন্দ্রনাথ। শ্যামলী দেখতে পায়। আর পরমুহূর্তেই ছুটে যায় দরজা খুলতে।

ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢোকে। কপাটে খিল লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় শ্যামলী। আর ইন্দ্রনাথের চোখের দিকে তাকিয়েই ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। সেই অতিপরিচিত নৃশংস দৃষ্টি ইন্দ্রনাথের চোখে। অন্ধকারে যেন দুটো অগ্নিকুণ্ড জলে উঠলো। ধ্বক করে। রক্তলোলুপ বাঘের চোখের মত—হিংস্র উত্তেজনা সে দৃষ্টিতে। শ্যামলীর চুলের মুঠির দিকে হাত বাড়ালে ইন্দ্রনাথ।

আর পরমুহূর্তেই বাতাস চিরে চিরে ভেঙে পড়লো একটা ভীতবিহ্বল নারীকণ্ঠের চিৎকার।

চমকে চোখ তুললে শ্যামলী। বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালে দোতালার দিকে। ইন্দ্রনাথের চোখেও বিমূঢ় দৃষ্টি। অবোধ্য বিস্ময়ে এদিকে ওদিকে তাকালে ও।

শিউলির কণ্ঠস্বর। ওরা দু'জনেই বুঝলে। কিন্তু। দোতলার দিকে অনুবীক্ষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। না, একটা ছায়াও দেখা গেল না।

শুধু সেদিনই নয়। প্রতিদিন।

ঠিক ঐ মুহূর্তটিতে। বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায় ও। শিউলির চিৎকার। কান্না-ভরা চিৎকার।

কিন্তু, কেন? কেন, কে জানে!

মায়া হয়। বেদনা বোধ করে ইন্দ্রনাথ। শিউলির জন্যে। আর সুরঞ্জনের ওপর ক্রোধ।

হঠাৎ মোড় ফিরে গেল ইন্দ্রনাথের জীবনের। বিকেলে আপিসের ছুটির পরই ফিরে আসে ইন্দ্রনাথ। সারা সন্ধ্যাটা শ্যামলীর সঙ্গে গল্প করে। টুকিটাকি সাহায্য করে শ্যামলীকে, তার কাজে। কাজ বাড়ায় তার চেয়ে বেশি। শ্যামলীকে টেনে বসায় নিজের কাছে। কখনো বা ওর হাত থেকে এটা ওটা কেড়ে নিয়ে চটিয়ে তোলে। শ্যামলী তবু খুশি। হঠাৎ যেন ওর মনে হয়, ও নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে।

রাত ঘন না হতেই দু'জনে শুয়ে পড়ে খাওয়াদাওয়া সেরে। কিন্তু ঘুম নামে না শ্যামলীর চোখে। ও অপেক্ষা করে। প্রতিদিনই অপেক্ষা করে থাকে ও। যতক্ষণ না শিউলির চিৎকারটা শুনতে পায়।

তারপর। একটা দীর্ঘশ্বাস।

অন্ধকারেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্তনবাস আর অন্তরাবরণ খুলে রাখে শ্যামলী। তারপর হাল্কা ভাবে একটা হাত রাখে ইন্দ্রনাথের পিঠের ওপর। তন্দ্রার ঘোর কাটে ইন্দ্রনাথের। আরো ঘনিষ্ঠ করে কাছে টেনে নেয় ও শ্যামলীকে। খুশিয়াল এক জোড়া সাপের মত আনন্দের আবেশে ডুবে যায় ওরা। শুধু কোথায় একটা মনের কোমল কোনে খোঁচা লাগে একটু। শিউলির চিৎকারটা বড় অসহায় করে তোলে শ্যামলাকে।

ঠিক্ ওদের সেই পুরোনা জীবনটাই যেন শিউলিকে ছুঁয়েছে। ঠিক্ ইন্দ্রনাথের মতই তো হাসিখুশি থাকে সুরঞ্জন। সারাটা দিন দেখে মনেই হবে না শিউলির জীবনে কোথাও কোনো খেদ আছে। কোন ছন্দপতন! কিন্তু।

শ্যামলী মনে মনে ঠিক করলে, সুরঞ্জনকে ও বাধা দেবে। অত্যাচার নিজে সহ্য করে এসেছে ও এতদিন। তাই জানে, ব্যথাটা কোথায়। ও আজ বাধা দেবেই সুরঞ্জনকে।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল শ্যামলী, নিঃশব্দে। তারপর শিউলির ঘরের দিকে পা বাড়ালে। আর, ঠিক এই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠলো শিউলি।

ছুটে গিয়ে জানালায় উঁকি দিলো শ্যামলী। পরমুহূর্তেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ও। দেখলে, খিলখিল করে হাসছে শিউলি।

হঠাৎ কানে গেল শ্যামলীর, সুরঞ্জন বলছে, কি ছেলেমানুষি করো!

শিউলি হেসে উত্তরে দিলো, শ্যামলী তো সান্ত্বনা পায়।

॥—অভিসার রজনী।

সকালে একটা পার্শেল এসে পৌঁছেছে। খুলে দেখি এক জোড়া জুতো।

না, শত্রুপক্ষের কাজ নয়। এক জোড়া পুরোনো ছেঁড়া জুতো পাঠিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতার চেষ্টাও করেনি কেউ। চমৎকার ঝকঝকে বাঘের চামড়ার নতুন চটি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পায়ে দিতে লজ্জা বোধ হয় দস্তুরমতো। ইচ্ছে করে বিছানায় শুইয়ে রাখি।

কিন্তু জুতোজোড়া পাঠাল কে? কোথাও অর্ডার দিয়েছিলাম বলেও তো মনে পড়ছে না। আর বন্ধুদের সব কটাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন এক জোড়া জুতো পাঠানোর মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাঁক কারো আছে বলেও জানি না। তাহলে ব্যাপারটা কী?

খুব আশ্চর্য হব কি না ভাবছি, এমন সময় একখানা সবুজ রঙের কার্ড চোখে পড়লো। উইথ্ বেস্ট কমপ্লিমেণ্টস অব্ রাজাবাহাদুর এন, আর চৌধুরী, রামগঙ্গা এস্টেট্!

আর তখনি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আট মাস আগেকার এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকার-কাহিনী।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আলাপের ইতিহাসটা ঘোলাটে, সূত্রগুলো এলোমেলো। যতদূর মনে হয়, আমার এক সহপাঠী তার এস্টেটে চাকরি করত। তারই যোগাযোগে রাজাবাহাদুরের এক জন্মবাসরে আমি একটা কাব্য-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলাম। ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস চুরি করে যে প্রশস্তি রচনা করেছিলাম তার দুটো একটা লাইন এই রকম :—

ত্রিভুবন-প্রভাকর ওহে প্রভাকর,
গুণবান্ মহীয়ান্ হে রাজেন্দ্রবর।
ভূতলে অতুল কীর্তি রামচন্দ্র সম—
অরাতি-দমন ওহে তুমি নিরুপম।

কাব্যচর্চার ফললাভ হল একেবারে নগদ নগদ। পড়েছি—আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খান্খানান্ হিন্দী কবি গঙ্গের চার লাইন কবিতা শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। দেখলাম সে নবাবী মেজাজের ঐতিহ্যটা গুণবান্ মহীয়ান্ অরাতিদমন মহারাজ এখনো বজায় রেখেছেন। আমার মতো দীনাতি-

দীনের ওপরেও রাজদৃষ্টি পড়ল, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, প্রায়ই চা খাওয়াতে লাগলেন, তারপর সামান্য একটা উপলক্ষ্য করে দামী একটা সোনার হাতঘড়ি উপহার দিয়ে বসলেন এক সময়ে। সেই থেকে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে আছি আমি। নিছক কবিতা মেলাবার জন্য বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে সুরু করেছি।

রাজাবাহাদুরকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর গুণগ্রাহী লোককে শ্রদ্ধা করাই তো স্বাভাবিক। বন্ধুরা বলে, মোসাহেব। কিন্তু আমি জানি ওটা নিছক গায়ের জ্বালা, আমার সৌভাগ্যে ওদের ঈর্ষ্যা। তা আমি পরোয়া করি না। নৌকা বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড়ঝাপ্‌টার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তাই মাস আষ্টেক আগে রাজাবাহাদুর যখন শিকারে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন তখন তা আমি ঠেলতে পারলাম না। কলকাতার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়া গেল। তা ছাড়া গোরা সৈন্যদের মাঝে মাঝে রাইফেল উঁচিয়ে শকুন মারতে দেখা ছাড়া শিকার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণাই নেই আমার। সেদিক থেকেও মনের ভেতরে গভীর এবং নিবিড় একটা প্রলোভন ছিল।

জঙ্গলের ভেতরে ছোট একটা রেললাইনে আরো ছোট একটা স্টেশনে গাড়ী থামল। নামবার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী-তক্‌মা-আঁটা ঝক্‌ঝকে-পোষাক-পরা আর্দালি এসে সেলাম দিল আমাকে। বললে—হুজুর চলুন।

স্টেশনের বাইরে মেটে রাস্তায় দেখি মস্ত একখানা গাড়ি—যার পুরো নাম রোল্‌স রয়েস্‌, সংক্ষেপে যাকে বলে 'রোজ'। তা 'রোজ'ই বটে। মাটিতে চলল না, রাজহাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা বটে। মাটিতে চলল না রাজহাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। চামড়ার খট্‌খটে গদী নয়, লাল মখমলের কুশন। হেলান দিতে সংকোচ হয়, পাছে মাথার সস্তা নারকেল তেলের দাগ ধরে যায়। আর বসবার সঙ্গেই মনে হয়—সমস্ত পৃথিবীটা নিচের মাটির ডেলার মতো গুঁড়িয়ে যাক—আমি এখানে সুখে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

হাঁসের মতো ভেসে চলল 'রোজ'। মেটে রাস্তায় চলেছে অথচ এতটুকু

ঝাঁকুনি নেই। ইচ্ছে হলো একেবার ঘাড় বার করে দেখি গাড়িটা ঠিক মাটি দিয়েই চলেছে, না দুহাত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওর চাকাগুলো।

পথের দুপাশে তখন নতুন একটা জগতের ছবি। সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা-বাগানের বিস্তার ; চকচকে উজ্জ্বল পাতার শান্ত, শ্যামল সমুদ্র। দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখা।

ক্রমশঃ চা-বাগান শেষ হয়ে এল, পথের দুপাশে ঘন হয়ে দেখা দিতে লাগল অবিচ্ছিন্ন শালবন। একজন আর্দালি জানাল, হুজুর ফরেস্ট এসে পড়েছে।

ফরেস্টই বটে। পথের ওপর থেকে সূর্যের আলো সরে গেছে, এখন শুধু শান্ত আর বিষণ্ণ ছায়া। রাত্রির শিশির এখনও ভিজিয়ে রেখেছে পথটাকে। 'রোজে'র নিঃশব্দ চাকার নীচে মড় মড় করে সাড়া তুলছে শুক্‌নো শালের পাতা। বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো শালের ফুল ঝরে পড়ছে পথের পাশে, উড়ে আসছে গায়ে। কোথা থেকে চকিতের জন্যে ময়ূরের তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে এল। দুপাশে নিবিড় শালের বন, কোথাও কোথাও ভেতর দিয়ে খানিকটা খানিকটা দৃষ্টি চলে, কখনো কখনো বুনো ঝোপে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো কাঠের গায়ে লেখা ১৯৩৫, ১৯৪০। মানুষ বনকে শুধু উচ্ছন্ন করতে চায় না, তাকে বাড়াতেও চায়। এই সব প্লটে বিভিন্ন সময়ে নতুন করে শালের চারা রোপন করা হয়েছে, এ তারই নির্দেশ।

বনের রূপ দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ভয়ও যে না করছিল এমন নয়। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ যদি গাড়ির এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, আর তাক বুঝে যদি লাফ মারে একটা বুনো জানোয়ার তা হলে—

তা হলে পকেটের ফাউন্টেন পেনটা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোনো অস্ত্রটা সঙ্গে নেই।

শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম—হাঁরে, এখানে বাঘ আছে ?

ওরা অনুকম্পার হাসি হাসল।

—হাঁ, হুজুর।

—ভালুক ?

রাজা-রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুই উত্তর। ওরা বলল—হাঁ হুজুর।

দীনের ওপরেও রাজদৃষ্টি পড়ল, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, প্রায়ই চা খাওয়াতে লাগলেন, তারপর সামান্য একটা উপলক্ষ্য করে দামী একটা সোনার হাতঘড়ি উপহার দিয়ে বসলেন এক সময়ে। সেই থেকে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে আছি আমি। নিছক কবিতা মেলাবার জন্য বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

রাজাবাহাদুরকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর গুণগ্রাহী লোককে শ্রদ্ধা করাই তো স্বাভাবিক। বন্ধুরা বলে, মোসাহেব। কিন্তু আমি জানি ওটা নিছক গায়ের জ্বালা, আমার সৌভাগ্যে ওদের ঈর্ষ্যা। তা আমি পরোয়া করি না। নৌকা বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড়ঝাপ্‌টার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তাই মাস আষ্টেক আগে রাজাবাহাদুর যখন শিকারে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন তখন তা আমি ঠেলতে পারলাম না। কলকাতার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে উর্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়া গেল। তা ছাড়া গোরা সৈন্যদের মাঝে মাঝে রাইফেল উঁচিয়ে শকুন মারতে দেখা ছাড়া শিকার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণাই নেই আমার। সেদিক থেকেও মনের ভেতরে গভীর এবং নিবিড় একটা প্রলোভন ছিল।

জঙ্গলের ভেতরে ছোট একটা রেললাইনে আরো ছোট একটা স্টেশনে গাড়ী থামল। নামবার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী-তক্‌মা আঁটা ঝক্‌ঝকে-পোষাক-পরা আর্দালি এসে সেলাম দিল আমাকে। বললে—হুজুর চলুন।

স্টেশনের বাইরে মেটে রাস্তায় দেখি মস্ত একখানা গাড়ি—যার পুরো নাম রোল্‌স রয়েস্‌, সংক্ষেপে যাকে বলে 'রোজ'। তা 'রোজ'ই বটে। মাটিতে চলল না, রাজহাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা বটে। মাটিতে চলল না রাজহাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। চামড়ার খট্‌খটে গদী নয়, লাল মখমলের কুশন। হেলান দিতে সংকোচ হয়, পাছে মাথার সস্তা নারকেল তেলের দাগ ধরে যায়। আর বসবার সঙ্গেই মনে হয়—সমস্ত পৃথিবীটা নিচের মাটির ডেলার মতো গুঁড়িয়ে যাক—আমি এখানে সুখে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

হাঁসের মতো ভেসে চলল 'রোজ'। মেটে রাস্তায় চলেছে অথচ এতটুকু

ঝাঁকুনি নেই। ইচ্ছে হলো একেবার ঘাড় বার করে দেখি গাড়িটা ঠিক মাটি দিয়েই চলেছে, না হঠাত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওর চাকাগুলো।

পথের হুপাশে তখন নতুন একটা জগতের ছবি। সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা-বাগানের বিস্তার; চকচকে উজ্জ্বল পাতার শান্ত, শ্যামল সমুদ্র। দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখা।

ক্রমশঃ চা-বাগান শেষ হয়ে এল, পথের হুপাশে ঘন হয়ে দেখা দিতে লাগল অবিচ্ছিন্ন শালবন। একজন আর্দালি জানাল, হুজুর ফরেস্ট এসে পড়েছে।

ফরেস্টই বটে। পথের ওপর থেকে সূর্যের আলো সরে গেছে, এখন শুধু শান্ত আর বিষণ্ণ ছায়া। রাত্রির শিশির এখনও ভিজিয়ে রেখেছে পথটাকে। 'রোল্সে'র নিঃশব্দ চাকার নীচে মড় মড় করে সাড়া তুলছে শুক্‌নো শালের পাতা। বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো শালের ফুল ঝরে পড়ছে পথের পাশে, উড়ে আসছে গায়ে। কোথা থেকে চকিতের জন্যে ময়ূরের তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে এল। হুপাশে নিবিড় শালের বন, কোথাও কোথাও ভেতর দিয়ে খানিকটা খানিকটা দৃষ্টি চলে, কখনো কখনো বুনো ঝোপে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো কাঠের গায়ে লেখা ১৯৩৫, ১৯৪০। মানুষ বনকে শুধু উচ্ছন্ন করতে চায় না, তাকে বাড়াতেও চায়। এই সব প্লটে বিভিন্ন সময়ে নতুন করে শালের চারা রোপন করা হয়েছে, এ তারই নির্দেশ।

বনের রূপ দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ভয়ও যে না করছিল এমন নয়। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ যদি গাড়ির এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, আর তাক বুঝে যদি লাফ মারে একটা বুনো জানোয়ার তা হলে—

তা হলে পকেটের ফাউণ্টেন পেনটা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোনো অস্ত্রটা সঙ্গে নেই।

শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম—হাঁরে, এখানে বাঘ আছে?

ওরা অনুকম্পার হাসি হাসল।

—হাঁ, হুজুর।

—ভালুক?

রাজা-রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুই উত্তর। ওরা বলল—হাঁ হুজুর।

—অজগর সাপ?

—জী মালিক।

প্রশ্ন করার উৎসাহ ওই পর্যন্তই এসে থেমে গেল আমার। যে রকম দ্রুত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো প্রশ্নই যে 'না' বলে আমাকে আশ্বস্ত করবে এমন তো মনে হচ্ছে না। যতদূর মনে হচ্ছিল গরিলা, হিপোপোটেমাস, ভ্যাম্পায়ার কোনো কিছুই বাকি নেই। এখানে জুলু কিংবা ফিলিপিনেরাও এখানে বিষাক্ত বুমেরাং বাগিয়ে আছে কি না এবং মানুষ পেলে তারা বেগুন-পোড়া করে খেতে ভালবাসে কি না এ জাতীয় একটা কুটিল জিজ্ঞাসাও আমার মনে জেগে উঠেছে ততক্ষণে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম।

খানিকটা আসতেই গাড়িটা ঘস্ ঘস্ করে ব্রেক্ কষল একটা। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম—কি রে বাঘ নাকি?

আর্দালিরা মুচকে হাসল—না হুজুর, এসে পড়েছি।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো। এসে পড়েছি সন্দেহ নেই। পথের বাঁ দিকে ঘন শালবনের ভেতরে একটুখানি ফাঁকা জমি। সেখানে কাঠের তৈরী বাংলো প্যাটার্নের একখানি দোতলা বাড়ি। এই নিবিড় জঙ্গলের ভেতর যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

গাড়ির শব্দে বাড়িটার ভেতর থেকে দু-তিন জন চাপরাসী বেরিয়ে এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম বাড়ির সামনে চওড়া একটা গড়খাই কাটা। লোকগুলো ধরাধরি করে মস্ত বড় একফালি কাঠ খাদটার ওপরে সাঁকোর মতো বিছিয়ে দিলে। তারই ওপর দিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল রাজাবাহাদুর এন, আর চৌধুরীর হান্টিং বাংলোর সামনে।

আরে আরে কী সৌভাগ্য! রাজাবাহাদুর স্বয়ং এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন আমার অপেক্ষায়। এক গাল হেসে বললেন, আসুন, আসুন, আপনার জন্য আমি এখনো চা পর্যন্ত খাইনি।

শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। মুখে কথা জোগাল না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থের হাসি হাসলাম একগাল।

রাজাবাহাদুর বললেন—এত কষ্ট করে আপনি যে আসবেন সে ভাবতেই পারিনি। বড় আনন্দ হল। চলুন, চলুন ওপরে চলুন।

এত গুণ না থাকলে কি আর রাজা হয়! একেই বলে রাজোচিত বিনয়।

রাজাবাহাদুর বললেন—আগে স্নান করে রিফ্রেশড্ হয়ে আসুন, টি ইজ গেটিং রেডি। বোয়, সাহেব কো গোসল খানামে লে যাও।

চল্লিশ বছরের দাড়িওয়ালা বয় নিঃসন্দেহে বাঙালী। তবু হিন্দী করে হুকুমটা দিলেন রাজাবাহাদুর, কারণ ওটাই রাজকীয় দস্তুর। বয় আমাকে গোসলখানায় নিয়ে গেল।

আশ্চর্য, এই জঙ্গলের ভেতরও এত নিখুঁত আয়োজন। এমন একটা বাথ-রুমে জীবনে আমি স্নান করি নি। ব্র্যাকেটে তিন চারখানা সম্ভ পাট-ভাঙা নতুন তোয়ালে, তিনটে দামী সোপকেসে তিন রকমের নতুন সাবান, র‍্যাকে দামী দামী তেল, লাইমজুস। অতিকায় বাথ্‌টার্ ওপরে ঝাঁঝরি। নিচে টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে এখানে ধারাস্নানের ব্যবস্থা। একেবারে রাজকীয় কারবার—কে বলবে এটা কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেল নয়!

স্নান হ'য়ে গেল। ব্রাকেটে ধোপদুরস্ত করা ফরাসডাঙার ধুতী, সিলকের লুঙ্গি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।

বয় বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, নিয়ে গেল ড্রেসিং রুমে। ঘরজোড়া আয়না, পৃথিবীর যা কিছু প্রসাধনের জিনিস কিছু আর বাকি নেই এখানে।

ড্রেসিং রুম থেকে বেরুতে সোজা ডাক পড়ল রাজাবাহাদুরের লাউঞ্জে। রাজাবাহাদুর একখানা চেয়ারে চিত হয়ে শুয়ে ম্যানিলা চুরুট খাচ্ছিলেন। বললেন, আসুন চা তৈরী।

চায়ের বর্ণনা না করাই ভালো। চা, কফি, কোকো, ওভ্যালটিন, রুটি, মাখন, পনির, চর্বিতে জমাট ঠাণ্ডা মাংস। কলা থেকে আরম্ভ করে পিচ্ পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফল।

সেই গন্ধমাদন থেকে যা পারি গোগ্রাসে গিলে চললাম আমি। রাজা-বাহাদুর কখনো এক টুকরো রুটি খেলেন, কখনো একটু ফল। অর্থাৎ কিছুই খেলেন না, শুধু পর পর কাপ তিনেক চা ছাড়া। তারপর আর একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—একবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখুন।

দেখলাম। প্রকৃতির এমন অপূর্ব রূপ জীবনে আর দেখিনি। ঠিক জানলার নিচেই মাটিটা খাড়া তিন চারশো ফুট নেমে গেছে; বাড়িটা যেন ঝুলে আছে সেই রাক্ষুসে শূন্যতার ওপরে। তলায় দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল, তার মাঝ দিয়ে

পাহাড়ী নদীর একটা সঙ্কীর্ণ নীলোজ্জ্বল রেখা। যতদূর দেখা যায়, বিস্তীর্ণ অরণ্য চলেছে প্রসারিত হয়ে ; তার সীমান্তে নীল পাহাড়ের প্রহরা।

আমার মুখ দিয়ে বেরুল—চমৎকার !

রাজাবাহাদুর বললেন—রাইট্। আপনারা কবি মানুষ, আপনাদের তো ভালো লাগবেই। আমারই মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে মশাই। কিন্তু নিচের ওই যে জঙ্গলটি দেখতে পাচ্ছেন ওটি বড় সুবিধের জায়গা নয়। টেরাইয়ের ওয়ান্ অব্ দি ফিয়ার্সেস্ট ফরেস্টস্। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।

আমি সভয়ে জঙ্গলটার দিকে তাকালাম। ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট ! কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। চারশো ফুট নিচে ওই অতিকায় জঙ্গলটাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন বেঁটে গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে, নদীর রেখাটাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল একখানা পাতের মতো। আশ্চর্য সবুজ, আশ্চর্য সুন্দর। অফুরন্ত রোদে ঝলমল করছে অফুরন্ত প্রকৃতি—পাহাড়টা যেন গাঢ় নীল রঙ্ দিয়ে আঁকা। মনে হয়, উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ওই স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য যেন আদর করে বুকে টেনে নেবে—রাশি রাশি পাতার একটা নরম বিছানার ওপরে। অথচ—

আমি বললাম—ওখানেই শিকার করবেন না কি ?

ক্ষেপেছেন, নামব কী করে। দেখছেন তো, পেছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো শিকারীর বন্দুক গিয়ে পৌঁছোয় নি। তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি মাঝে মাঝে মাছ ধরি ওখান থেকে।

—মাছ ধরেন !—আমি হাঁ করলাম ঃ মাছ ধরেন কি রকম ? ওই নদী থেকে নাকি ?

—সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। দরকার হলে পরে দেখতে পাবেন—রাজাবাহাদুর রহস্যময় ভাবে মুখ টিপে হাসলেন ঃ আপাতত শিকারের আয়োজন করা যাক, কিছু না জুটলে মাছের চেষ্টাই করা যাবে। তবে ভালো টোপ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, আর তাতে অনেক হাঙ্গামা।

—কিছু বুঝতে পারছি না।

রাজাবাহাদুর জবাব দিলেন না, শুধু হাসলেন। তারপর ম্যানিলা চুরুটের খানিকটা সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে বললেন—আপনি রাইফেল ছুঁড়তে জানেন ?

বুঝলাম কথাটি চাপা দিতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকে দমন করে ফেললাম, এর পরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে না, শোভনও নয়। সেটা কোর্ট-ম্যানারের বিরোধী।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন,—রাইফেল ছুঁড়তে পারেন ?

বললাম—ছেলেবেলায় এয়ার গান ছুঁড়েছি।

রাজাবাহাদুর হেসে উঠলেন—তা বটে। আপনারা কবি মানুষ, ওসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার আপনাদের মানায় না। আমি অবশ্য বারো বছর বয়সেই রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আপনি চেষ্টা করে দেখুন না, কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

উঠে দাঁড়ালেন রাজাবাহাদুর। ঘরের একদিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমি দেখলাম—এ শুধু লাউঞ্জ নয়, রীতিমতো একটা ন্যাচারাল্ মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগার। খাওয়ার টেবিলেই নিমগ্ন ছিলাম বলে এতক্ষণ দেখতে পাইনি, নইলে এর আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

চারিদিকে সারি সারি নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র। গোটাচারেক রাইফেল, ছোট বড় নানা রকম চেহারা। একটা হুকের সঙ্গে খাপে আঁটা এক জোড়া রিভলভার ঝুলছে; তার পাশেই ঝুলছে খোলা একখানা লম্বা শেফিল্ডের তলোয়ার—সূর্যের আলোর মতো তার ফলার নিষ্কলঙ্ক রঙ। মোটা চামড়ার বেলটে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ—রাইফেলের, রিভলভারের। জরিদার খাপে খান তিনেক নেপালী ভোজালি। আর দেয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানা রকমের চামড়া—বাঘের, সাপের, হরিণের, গো-সাপের। একটা টেবিলে অতিকায় হাতীর মাথা—দুটো বড় বড় দাঁত এগিয়ে আছে সামনের দিকে। বুঝলাম—এরা রাজাবাহাদুরের বীরকীর্তির নিদর্শন।

ছোট একটা রাইফেল তুলে নিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন—এটা লাইট জিনিস। তবে ভালো রিপিটার; অনায়াসে বড় বড় জানোয়ার ঘায়েল করতে পারে।

আমার কাছে অবশ্য সবই সমান। লাইট রিপিটার যা, হাউইট্জার কামান ও তাই; তবু সৌজন্য রক্ষার জন্যে বলতে হলো—বাঃ, তবে তো চমৎকার জিনিস।

রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে: তা হলে চেষ্টা করুন। লোড করাই আছে, ছুঁড়ুন ওই জানালা দিয়ে।

আমি সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেলাম! জীবনে বেকুবি অনেক করেছি, কিন্তু তার পরিমাণটা আর বাড়াতে প্রস্তুত নই। যুদ্ধ-ফেরত এক বন্ধুর মুখে তাঁর রাইফেল ছোঁড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা শুনেছিলাম—পড়ে গিয়ে পা ভেঙে নাকি তাঁকে একমাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। নিজেকে যতদূর জানি—আমার ফাঁড়া শুধু পা ভাঙার ওপর দিয়েই কাটবে বলে মনে হয় না।

বললাম—ওটা এখন থাক, পরে হবে না হয়।

রাজাবাহাদুর মৃদু কৌতুকের হাসি হাসলেন। বললেন—এখন ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু একবার ধরতে শিখলে আর ছাড়তে চাইবেন না। হাতে থাকলে বুঝবেন কতবড় শক্তিমান আপনি। ইউ ক্যান্ ইজিলি ফেস্ অল্ দ্য রাস্কেল্স্ অব্—অব্—

হঠাৎ তাঁর চোখ ঝক্ঝক্ করে উঠল। মৃদু হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে উঠল মুখের পেশীগুলো : এ্যাণ্ড এ রাইভ্যাল্—

মুহূর্তে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। রাজাবাহাদুরের দু'চোখে বন্য হিংসা, রাইফেলটা এমন শক্ত মুঠিতে বাগিয়ে ধরেছেন যেন সামনে কাউকে গুলি করবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন তিনি। উত্তেজনার ঝোঁকে আমাকেই যদি লক্ষ্যভেদ করে বসেন তা হলে—

আতঙ্কে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। কিন্তু ততক্ষণে মেঘ কেটে গেছে—রাজা-রাজড়ার মেজাজ! রাজাবাহাদুর হাসলেন।

—ওয়েল, পরে আপনাকে তালিম দেওয়া যাবে। সবই তো রয়েছে, যেটা খুশি আপনি ট্রাই করতে পারেন। চলুন, এখন বারান্দায় গিয়ে বসা যাক, লেট্স্ হ্যাভ সাম এনার্জি।

প্রাতঃরাশেই প্রায় বিন্ধ্যপর্বত উদরসাৎ করা হয়েছে, আর কি হলে এনার্জি সঞ্চিত হবে বোঝা শক্ত। কিন্তু কথাটা বলেই রাজাবাহাদুর বাইরের বারান্দার দিকে পা বাড়িয়েছেন। সুতরাং আমাকেও পিছু নিতে হল।

বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল। এখানে ঢোকবার পরে এমন সব বিচিত্র রকমের আসরে বসছি যে আমি প্রায় নার্ভাস হয়ে উঠেছি। তবু যেন বেতের চেয়ারে বসতে পেয়ে খানিকটা সহজ অন্তরঙ্গতা অনুভব করা গেল। এটা অন্তত চেনা জিনিস।

আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল এনার্জি কথাটার আসল তাৎপর্য কি।

বেয়ারা তৈরীই ছিল, ট্রেতে করে একটি ফেনিল গ্লাস সামনে এনে রাখল -অ্যাল্‌কোহলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

রাজাবাহাদুর স্মিত হাস্যে বললেন—চলবে ?

সবিনয়ে জানালাম, না।

—তবে বিয়ার আনবে ? একেবারে মেয়েদের ড্রিঙ্ক! নেশা হবে না।

—না থাক। অভ্যেস নেই কোনোদিন।

—হুঁ, গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ—পাওয়া ছেলে! রাজাবাহাদুরের স্বরে অনুকম্পার আভাস : আমি কিন্তু চোদ্দ বছরের বয়সেই প্রথম ড্রিঙ্ক ধরি।

রাজা-রাজড়ার ব্যাপার—সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা। সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যক। ট্রে বারবার যাতায়াত করতে লাগল। রাজাবাহাদুরের প্রখর উজ্জ্বল চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে এল ক্রমশ, ফর্সা মুখ গোলাপী রং ধরল। হঠাৎ অসুস্থ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

—আচ্ছা বলতে পারেন, আপনি রাজা নন কেন ?

এ রকম একটা প্রশ্ন করলে বোকার মতো দাঁত বের করে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমিও তাই করলাম।

— বলতে পারলেন না ?

— না।

— আপনি মানুষ মারতে পারেন ?

— এ আবার কী রকম কথা! আমার আতঙ্ক জাগল।

—না।

— তা হলে বলতে পারেন না। ইউ আর্ অ্যাব্‌সোলিউটলি হোপলেস।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন রাজাবাহাদুর। বলে গেলেন : আই পিটি ইউ।

বুঝলাম নেশাটা বেশ চড়েছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ করে বসে রইলাম সেইখানেই। খানিক পরেই ঘরের ভেতরে নাক ডাকার শব্দ। তাকিয়ে দেখি তাঁর লাউঞ্জের সেই চেয়ারটায় হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন রাজাবাহাদুর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি উড়ছে ভনভন করে।

* * *

সেইদিন রাত্রেই শিকারের প্রথম অভিজ্ঞতা।

জঙ্গলের ভেতর বসে আছি মোটরে। দুটো তীব্র হেড লাইটের আলো পড়েছে সামনের সঙ্কীর্ণ পথে আর দুধারের শালবনে। ওই আলোর রেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গলটায় যেন প্রেতপুরীর জমাট অন্ধকার রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারিদিকে—অনুভব করছি সমস্ত স্নায়ু দিয়ে। এখানে হাতীর পাল ঘুরছে দূরের কোনো পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে, ঝোঁপের ভেতরে অজগর প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হরিণের পাল আর কোনো একটা খাদের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে 'ক্ষুধার্ত' বাঘের চোখ। কালো রাত্রিতে জেগে আছে কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবন।

রোমাঞ্চিত ভীত প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে আছি মোটরের মধ্যে। কিন্তু হিংসার রাজত্ব শালবন ডুবে আছে একটা আশ্চর্য স্তব্ধতায়। শুধু কানের কাছে অবিশ্রান্ত মশার গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে অল্প বাতাস দিচ্ছে—শালের পাতায় উঠেছে এক একটা মৃদু মর্মর। আর কখনো ডাকছে বনমুরগী, ঘুমের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে ময়ূর। মনে হচ্ছে এই গভীর ভয়ঙ্কর অরণ্যের ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলো যেন নিশ্বাস বন্ধ করে একটা নিশ্চিত কোনো মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে আছে।

আমরাও প্রতীক্ষা করে আছি। মোটরের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে বসে আছি আমরা—একটি কথাও বলবার উপায় নেই। রাইফেলের নল এঞ্জিনের ওপরে বাড়িয়ে দিয়ে শিকারী বাঘের মতোই তাকিয়ে আছেন রাজাবাহাদুর। চোখ-দুটো উগ্র প্রখর হয়ে আছে হেডলাইটের তীব্র আলোক-রেখাটার দিকে, একটা জানোয়ার ওই রেখাটা পেরুবার দুঃসাহস করলেই রাইফেল গর্জন করে উঠবে।

কিন্তু জঙ্গলে সেই আশ্চর্য স্তব্ধতা। অরণ্য যেন আজ রাত্রে বিশ্রাম করছে, একটি রাত্রের জন্য ক্লান্ত হয়ে জানোয়ারগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে খাদের ভেতরে, ঝোপের আড়ালে। কেটে চলেছে মন্থর সময়। রাজাবাহাদুরের হাতের রেডিয়ম ডায়াল ঘড়িটা একটা সবুজ চোখের মত জ্বলছে, রাত দেড়টা পেরিয়ে গেছে। ক্রমশ উসখুস করছেন উৎকর্ণ রাজাবাহাদুর—নাঃ হোপলেস! আজ আর পাওয়া যাবে না।

বহুদূর থেকে একটা তীক্ষ্ণ গম্ভীর শব্দ, হাতীর ডাক। ময়ূরের পাখা-ঝাপটানি চলছে মাঝে মাঝে। এক ফাঁকে একটা প্যাঁচা চেঁচিয়ে উঠল, রাত্রি ঘোষণা

করে গেল শেয়ালের দল। কিন্তু কোথায় বাঘ, কোথায় বা ভালুক? অন্ধকার বনের মধ্যে দ্রুত কতকগুলো ছুটন্ত খুরের আওয়াজ—পালিয়ে গেল হরিণের পাল।

কিন্তু কোনো ছায়া পড়ছে না আলোকবৃত্তের ভেতরে। মশার কামড় যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

—বৃথাই গেল রাতটা। রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি ভেঙে পড়ল: ডেভিল্ লাক। সীটের পাশ থেকে একটা ফ্লাস্ক তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে ঢাললেন গলাতে, ছড়িয়ে পড়ল হুইস্কির কটু গন্ধ।

—থ্যাঙ্ক হেভনস্।—রাজাবাহাদুর হঠাৎ নড়ে বসলেন চকিত হয়ে। নক্ষত্র-বেগে হাতটা চলে গেল রাইফেলের ট্রিগারে। শিকার এসে পড়েছে। আমিও দেখলাম। বহুদূর আলোর রেখাটার ভেতরে কী একটা জানোয়ার দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। এমন একটা জোরালো আলো চোখে পড়াতে কেমন দিশেহারা হবে গেছে, তাকিয়ে আছে এই দিকেই। দুটো জোনাকির বিন্দুর মতো চিক চিক করছে তার চোখ।

ড্রাইভার বললে—হায়না।

— ড্যাম্।—রাইফেল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন রাজাবাহাদুর কিন্তু পর মুহূর্তেই চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন—থাক, আজ ছুঁচোই মারব।

দুম্ করে রাইফেল গর্জন করে উঠল। কানে তালা ধরে গেল আমার, বারুদের গন্ধে বিস্বাদ হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র। অব্যর্থ লক্ষ্য রাজাবাহাদুরের—পড়েছে জানোয়ারটা।

ড্রাইভার বললে—তুলে আনব হুজুর?

বিকৃতমুখে রাজাবাহাদুর বললেন, কী হবে? গাড়ি ঘোরাও।

রেডিয়াম ডায়ালের সবুজ আলোয় রাত তিনটে। গাড়ি ফিরে চলল হাণ্টিং বাংলোর দিকে। একটা ম্যানিলা চুরুট ধরিয়ে রাজাবাহাদুর আবার বললেন—ড্যাম্।

কিন্তু কী আশ্চর্য—জঙ্গল যেন রসিকতা সুরু করেছে আমাদের সঙ্গে। দিনের বেলা অনেক চেষ্টা করেও দুটো একটা বনমুরগী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না—এমন কি একটা হরিণ পর্যন্ত নয়। নাইট—শুটিংয়ে সেই অবস্থা। পর পর তিন রাত্রি জঙ্গলের নানা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চেষ্টা করা হল, কিন্তু নগদ লাভ যা ঘটল তা অমানুষিক মশার কামড়। জঙ্গলের হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ মিলল না

বটে, কিন্তু মশাগুলোকে চিনতে পারা গেল। এমন সাংঘাতিক মশা যে পৃথিবীর কোথাও থাকতে পারে এতদিন এ ধারণা ছিল না আমার।

তবে মশার কামড়ের ক্ষতিপূরণ চলতে লাগল গন্ধমাদন উজাড় করে। সত্যি বলতে কি, শিকার করতে না পারলেও মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না আমার। জঙ্গলের ভেতরে এমন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন কল্পনারও বাইরে। জীবনে এমন দামী খাবার কোনো দিন মুখে তুলিনি, এমন চমৎকার বাথরুমে স্নান করিনি কখনো, এত পুরু জাজিমের বিছানায় শুয়ে অস্বস্তিতে প্রথম দিন তো ঘুমুতেই পারিনি আমি। নিবিড় জঙ্গলের নেপথ্যে গ্র্যাণ্ড হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছি—শিকার না হলেও কণামাত্র ক্ষতি নেই আমার। প্রত্যেক দিনই লাউঞ্জে চা খেতে চারশো ফুট নিচেকার ঘন জঙ্গলটার দিকে চোখ পড়ে। সকালের আলোয় উদ্ভাসিত শ্যামলতা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে অপরূপ প্রসন্নতায়। ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট ফরেস্ট্‌স, বিশ্বাস হয় না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বাতাসে আকার-অবয়বহীন পত্রাবরণ সবুজ সমুদ্রের মতো দুলছে, চক্র দিচ্ছে পাখির দল—এখান থেকে মৌমাছির মতো দেখায় পাখীগুলোকে; জানালার ঠিক নিচেই ইস্পাতের ফলার মতো পাহাড়ী নদীটার নীলিমোজ্জ্বল রেখা—দুটো একটা নুড়ি ঝকমক করে মণিখণ্ডের মতো। বেশ লাগে।

তার পরেই চমক ভাঙে আমার। তাকিয়ে দেখি ঠোঁটের কোণে ম্যানিলা চুরুট পুড়ছে, অস্থির চঞ্চল পায়ে রাজাবাহাদুর ঘরের ভেতরে পায়চারি করছেন। চোখেমুখে একটা চাপা আক্রোশ—ঠোঁট দুটোয় নিষ্ঠুর কঠিনতা। কখনো একটা রাইফেল তুলে নিয়ে বিরক্তিভরে নামিয়ে রাখেন; কখনো ভোজালি তুলে নিয়ে নিজের হাতের ওপরে ফলাটা পরীক্ষা করেন সেটার ধার; আবার কখনো বা জানালার সামনে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিচের জঙ্গলটার দিকে। আজ তিন দিন থেকে উল্লেখযোগ্য একটা কিছু শিকার করতে পারেন নি—ক্ষোভে তাঁর দাঁতগুলো কড়মড় করতে থাকে।

তার পরেই বেরিয়ে যান এনার্জি—সংগ্রহের চেষ্টায়। বাইরের বারান্দায় গিয়ে হাঁক দেন—পেগ।

কিন্তু পরের পয়সায় রাজভোগ খেয়ে এবং রাজোচিত বিলাস করে বেশি দিন কাটানো আর সম্ভব নয়—আমার পক্ষে। রাজাবাহাদুরের অনুগ্রহ একটি

দামী জিনিস বটে, কিন্তু কলকাতায় আমার ঘর-সংসার আছে, একটা দায়িত্ব আছে তার। সুতরাং চতুর্থ দিন সকালে কথাটা আমাকে পাড়তে হল।

বললাম, এবার আমাকে বিদায় দিন তা হলে।

রাজাবাহাদুর সবে চতুর্থ পেগে চুমুক দিয়েছেন তখন। তেমনি অসুস্থ আর রক্তাভ চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি যেতে চান?

— হাঁ কাজকর্ম রয়েছে—

— কিন্তু আমার শিকার আপনাকে দেখাতে পারলাম না।

— সে না হয় আর একবার হবে।

— হুম্। চাপা ঠোঁটের ভেতরেই একটা গম্ভীর আওয়াজ করলেন রাজাবাহাদুর : আপনি ভাবছেন আমার ওই রাইফেলগুলো, দেওয়ালে ওই সব শিকারের নমুনা—ওগুলো সব ফার্স?

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না, তা কেন ভাবতে যাব। শিকার তো খানিকটা অদৃষ্টের ব্যাপার—

— হুম্! অদৃষ্টকেও বদলানো চলে—রাজাবাহাদুর উঠে পড়লেন : আমার সঙ্গে আসুন।

দুজনে বেরিয়ে এলাম। রাজাবাহাদুর আমাকে নিয়ে এলেন হাণ্টিং বাংলোর পেছন দিকটাতে। ঠিক সেখানে—যার চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের অন্যতম হিংস্র অরণ্য বিস্তীর্ণ হয়ে আছে।

এখানে আসতে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। দেখি কাঠের একটা রেলিং দেওয়া সাঁকোর মতন জিনিস সেই সীমাহীন শূন্যতার ওপরে প্রায় পনেরো ষোল হাত প্রসারিত হয়ে আছে। তার পাশে দুটো বড় বড় কাঠের চাকা, তাদের সঙ্গে দুজোড়া মোটা কাছি জড়ানো। ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আসুন।—রাজাবাহাদুর সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। একটা আশ্চর্য বন্দোবস্ত। ঠিক সাঁকোটার নিচেই পাহাড়ী নদীটার রেখা, নুড়ি-মেশানো সঙ্কীর্ণ বালুতট তার দুপাশে, তাছাড়া জঙ্গল আর জঙ্গল। নিচে তাকাতে আমার মাথা ঘুরে উঠল। রাজা-বাহাদুর বললেন, জানেন এসব কী?

—না।

—আমার মাছ ধরবার বন্দোবস্ত। এর কাজ খুব গোপনে—নানা হাঙ্গামা আছে। কিন্তু অব্যর্থ।

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আজ রাত্রেই বুঝতে পারবেন। শিকার দেখাতে আপনাকে ডেকে এনেছি, নতুন একটা শিকার দেখাব। কিন্তু কোনোদিন এর কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।

—কিছু না বুঝেই মাথা নাড়লাম—না।

—তা হলে আজ রাতটা অবধি থাকুন। কাল সকালেই আপনার গাড়ীর ব্যবস্থা করব। রাজাবাহাদুর আবার হান্টিং বাংলোর সম্মুখের দিকে এগোলেন : কাল সকালের পর এমনিতেই আপনার আর এখানে থাকা চলবে না।

একটা কাঠের সাঁকো, দুটো কপিকলের মতো জিনিষ। মাছ ধরার ব্যবস্থা। কাউকে বলা যাবে না এবং কাল সকালেই চলে যেতে হবে! সবটা মিলিয়ে যেন রহস্যের খাসমহল একেবারে। আমার কেমন এলোমেলো লাগতে লাগল সমস্ত। কিন্তু ভালো করে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না; রাজাবাহাদুরকে বেশি প্রশ্ন করতে কেমন অস্বস্তি লাগে আমার। অনধিকার-চর্চা মনে হয়।

বাংলার সামনে তিন চারটে ছোট ছোট নোংরা ছেলেমেয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, হিন্দুস্থানী কীপারটার বেওয়ারিশ সম্পত্তি। কীপারটাকে সকালে রাজাবাহাদুর শহরে পাঠিয়েছেন, কিছু দরকারী জিনিষপত্র কিনে কাল সে ফিরবে। ভারী বিশ্বাসী আর অনুগত লোক। মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন ছুটোপাটি করে ডাক-বাংলোর সামনে। রাজাবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোখে দেখেন ওদের। দোতালার জানলা থেকে পয়সা, রুটি, কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন, নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকে।

আজও ছেলেমেয়েগুলো হুল্লোড় করে তাঁর চারিপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। বললে—হুজুর, সেলাম।—রাজাবাহাদুর পকেটে হাতে দিয়ে কতকগুলো পয়সা ছড়িয়ে দিলেন ওদের ভেতরে। হরির লুঠের মতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

বেশ ছেলেমেয়েগুলি। দুই থেকে আট বছর পর্যন্ত বয়েস। আমার ভারী ভালো লাগে ওদের। আরণ্যক জগতের শাল শিশুদের মতো সতেজ আর জীবন্ত প্রকৃতির ভেতর থেকে প্রাণ আহরণ করে যেন বড় হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যায় ডিনার টেবিলে বসে আমি বললাম, আজ রাত্রে মাছ ধরবার কথা আছে আপনার।

চোখের কোণা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন রাজাবাহাদুর। লক্ষ্য করেছি আজ সমস্ত দিন বড় বেশি মদ খাচ্ছেন আর ক্রমাগত চুরুট টেনে চলেছেন। ভালো করে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন নি। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটে চলেছে তাঁর।

রাজাবাহাদুর সংক্ষেপে বললেন—হুম্।

আমি সসংকোচে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন হবে?

একমুখ ম্যানিলা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে তিনি জবাব দিলেন—সময় হলে ডেকে পাঠাব। এখন আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। স্বচ্ছন্দে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

শেষ কথাটা পরিষ্কার আদেশের মতো শোনালো। বুঝলাম আমি বেশিক্ষণ আজ তাঁর সঙ্গে কথা বলি এ তিনি চান না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলাটা অতিথিপরায়ণ গৃহস্থের অনুনয় নয়, রাজার নির্দেশ। এবং সে নির্দেশ পালন করতে বিলম্ব না করাই ভালো।

কিন্তু অতি নরম জাজিমের বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছে না। মাথার ভিতর আবর্তিত হচ্ছে অসংলগ্ন চিন্তা। মাছধরা, কাঠের সাঁকো, কপিকল, অত্যন্ত গোপনীয়! অতল রহস্য!

তারপর এ পাশ ওপাশ করতে করতে কখন যে চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল তা আমি নিজেই টের পাই নি।

মুখের ওপর ঝাঁঝালো একটা টর্চের আলো পড়তে আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। রাত তখন কটা ঠিক জানি না। আরণ্যক পরিবেশে নির্জনতা আবির্ভূত। বাহিরে শুধু তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝির ডাক।

আমার গায়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত পড়েছে কার। সে হাতের স্পর্শে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমার। রাজাবাহাদুর বললেন—সময় হয়েছে, চলুন।

আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম—ঠোঁটে আঙুল দিলেন রাজাবাহাদুর।—কোনো কথা নয়, আসুন।

এই গম্ভীর রাত্রে এমনি নিঃশব্দে আহ্বান—সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর

উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েছে যেন। কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল আমার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজাবাহাদুরের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলাম।

হান্টিং বাংলোটা অন্ধকার। একটা মৃত্যুর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক—চারিদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমার ভয় করেছিল, আজও ভয় করছে। কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা—এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে আছে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পা-ও সরতে চাইছে না আমার। মুখের ওপরে একটা টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেত !

টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর আমাকে সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার কাছে নিয়ে এলেন। দেখি তার উপরে শিকারের আয়োজন। দুখানা চেয়ার পাতা, দুটো তৈরী রাইফেল। দুজন বেয়ারা একটা কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে কী একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য রাজাবাহাদুর তাঁর নয় সেলের হান্টিং টর্চটা নিচের দিকে ফ্ল্যাস করলেন। প্রায় আড়াই শো ফুট নিচে সাদা পুঁটলির মতো কী একটা জিনিষ কপিকলের দড়ির সঙ্গে নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।

আমি বললাম, ওটা কি রাজাবাহাদুর ?

—মাছের টোপ।

—কিন্তু এখনও কিছু বুঝতে পারছি না।

—একটু পরে বুঝবেন। এখন চুপ করুন।

এবারে স্পষ্ট ধমক দিলেন আমাকে। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে হুইস্কির তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। রাজাবাহাদুর প্রকৃতিস্থ নেই। আর কিছুই বুঝতে পারছি না আমি—আমার মাথার ভেতর সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। একটা দুর্বোধ্য নাটকের নির্বাক দ্রষ্টার মতো রাজাবাহাদুরের পাশের চেয়ারটাতে আসন নিলাম আমি।

ওদিকে ঘন কালো বনান্তের উপরে ভাঙা চাঁদ দেখা দিল। তার খানিকটা ম্লান আলো এসে পড়ল চারশো ফুট নিচের নদীর জলে, তার ছড়ানো মনিখণ্ডের মতো নুড়িগুলোর উপরে। আবছাভাবে যেন দেখতে পাচ্ছি—কপিকলের দড়ির

সঙ্গে বাঁধা সাদা পুঁটলিটা অল্প অল্প নড়ছে বালির ওপরে। এক হাতে রাজা-বাহাদুর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আছেন, আর এক হাতে মাঝে মাঝে আলো ফেলছেন নিচের পুঁটলিটায়। চকিত আলোয় যেটুকু মনে হচ্ছে—পুঁটলিটা যেন জীবন্ত, অথচ কী জিনিস কিছু বুঝতে পারছি না। এ নাকি মাছের টোপ! কিন্তু কী এ মাছ—এ কিসের টোপ?

আবার সেই স্তব্ধতার প্রতীক্ষা। মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। রাজাবাহাদুরের টর্চের আলো বারে বারে পিছলে পড়ছে নিচের দিকে। দিগন্ত-প্রসার হিংস্র অরণ্য ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তরঙ্গিত একটা সমুদ্রের মতো। নিচের নদীটা ঝকৃঝক্ করছে যেন একখানা খাপ-খোলা তলোয়ার। অবাক বিস্ময়ে আমি বসে আছি। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। টোপ ফেলে মাছ ধরছেন রাজাবাহাদুর।

অথচ সব ধোঁয়াটে লাগছে আমার। কান পেতে শুনচি—ঝিঁঝির ডাক, দূরে হাতীর গর্জন, শালপাতার মর্মর। এ প্রতীক্ষার তত্ত্ব আমার কাছে দুর্বোধ্য। শুধু হুইস্কি আর ম্যানিলা চুরুটের গন্ধ এসে লাগছে আমার। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ির কাঁটা চলেছে ঘুরে। ক্রমশ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম, ক্রমশ যেন ঘুম এল—আমার। তারপরেই হঠাৎ কানের কাছে বিকট শব্দে রাইফেল সাড়া দিয়ে উঠল—চারশো ফুট নিচ থেকে উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল প্রচণ্ড বাঘের গর্জন। চেয়ারটা শুদ্ধ আমি কেঁপে উঠলাম।

টর্চের আলোটা সোজা পড়ছে নুড়ি-ছড়ানো বালির ডাঙাটার ওপরে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম ডোরাকাটা অতিকায় একটা বিশাল জানোয়ার সাদা পুঁটলিটার ওপরে একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সাপের মতো ল্যাজ আছড়াচ্ছে অন্তিম আক্ষেপে। ওপর থেকে ইন্দ্রের বজ্রের মতো অব্যর্থ গুলি গিয়ে লেগেছে তার মাথায়। এত ওপর থেকে এমন দুর্নিবার মৃত্যু নামবে আশঙ্কা করতে পারে নি। রাজাবাহাদুর সোৎসাহে বললেন—ফতে!

এতক্ষণ মাছ ধরবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। সোৎসাহে সোল্লাসে বললাম—মাছ তো ধরলেন, ডাঙায় তুলবেন কেমন করে?

—ওই কপিকল দিয়ে। এই জন্যই তো ওগুলোর ব্যবস্থা।

ব্যাপারটা যেমন বিচিত্র তেমনি উপভোগ্য। আমি রাজাবাহাদুরকে

অভিনন্দিত করতে যাব, এমন সময়—এমন সময়—পরিষ্কার শুনতে পেলাম শিশুর গোঙানি। ক্ষীণ অথচ নির্ভুল। কিসের শব্দ।

চারশো ফুট নিচ থেকে ওই শব্দটা আসছে। হ্যাঁ—কোনো ভুল নেই! মুখের বাঁধন খুলে গেছে, কিন্তু বড় দেরীতে। আমার রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার। কি দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?

—চুপ—একটা কালো রাইফেলের নল আমার বুকে ঠেকালেন রাজাবাহাদুর। তারপরেই আমার চারিদিকে পৃথিবীটা পাক খেতে খেতে হাওয়ায় গড়া একটা বুদ্বুদের মতো শূন্যে মিলিয়া গেল। রাজাবাহাদুর ঝাপটে না ধরলে চারশো-ফুট নিচেই পড়ে যেতাম হয় তো।

*   *   *   *

কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে থাকে তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর—লোককে ডেকে দেখানোর মতো।

তাই আট মাস পরে এই চমৎকার চটি-জোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম।

খুনীর ছেলে

ননী ভৌমিক

খুনীর ছেলে রহিম। ওর বাপ ছিল ফিরিওয়ালা। মফস্বল শহরে রাস্তায় রাস্তায় সওদা হেঁকে বেড়াত, ছুরি, কাঁচি, রবারের পুতুল, চুল বাঁধার ফিতে, পুঁতি, টিপ—জার্মান, জার্মান মাল সব। ইস্কুলের ছেলেরা কিনত দু-ফলা তিন-ফলার ছুরি, পেতলের খাপে এক মুখে পেন্‌সিল, আর এক মুখে কলম। দুপুরে বৌ-ঝিরা ঘুম নষ্ট করে খুকীদের জন্যে কিনত টুনকো পুতুল, আর নিজেদের জন্যে চুল বাঁধার ফিতে। মেপে দেওয়ার সময় একটু শয়তানী করবে লোকটা, হাত-আন্দাজ মাপটা কেমন করে খাটো করে ফেলত। টের পেলে অবিশ্যি রক্ষা রাখে না মেয়েরা। কিন্তু ফিতে কাটা হয়ে গেছে—কাটা ফিতে ফেরত নেওয়ার মতো বান্দাও ও নয়। শেষকালে রফা হত একটা, ও কিছু ছেড়ে দিচ্ছে, আপনারাও কিছু ছেড়ে দিন, এই রকম।

দেখে মনে হত যে দু-চার পয়সা কামাচ্ছে লোকটা। ফিরিওয়ালাদের চেহারা সাধারণত যে রকম রোগা হয়ে থাকে ওর তা নয়। কড়া যোয়ান চেহারা। রোদে পোড়া মুখটা থ্যাব্‌ড়া কিন্তু নিষ্ঠুর নয়। ছোট করে ছাঁটা মোচের দু ধারটা একটু লম্বা, মেহেদির পাতায় রাঙানো। চৌকো ছাঁটের ফতুয়ার হাতার বাইরে কনুই থেকে হাত দুটো চ্যাটালো ও পেশীর পাক খাওয়া। পরিশ্রম করে দু বেলা পেট পুরে খেতে না পেলে ও রকম গতর হয় কারো? তবু, মানুষের কি দুর্মতি, তলে তলে যে নিজের সর্বনাশ সেধে রেখেছিল, কেউ জানত না। কালীচরণ সরকারের কাছে বেচারী এককুড়ি টাকা ধার নিয়েছিল বৌয়ের সোনাবাঁধা বালা বন্ধক রেখে। একদিন গেল ছাড়িয়ে আনতে। রেজগি আর টাকায় মিলিয়ে এককুড়ি টাকা গুনে দিয়ে জোড় হাত করে বসে রইল তক্তপোশের সামনে। কালীচরণ নীরবে টাকা কটা তুলে রাখল সিঁদুরমাখা ক্যাশবাক্‌স্‌টায়, তারপর তুলোট কাগজের খাতাটা বার করে কি সব লিখলে। লেখা হয়ে গেলে তুড়ি দিয়ে আয়েস করে যা বললে তা বয়স হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারেনি লোকটা।

কুড়ি টাকা ধার নিয়েছিলে বাপু, টাকায় আট আনা সুদ; তিন বছর হয়ে এল, সুদই তোমার গিয়ে পড়বে সাড়ে বাইশ টাকা। কুড়ি টাকা উশুল নিলাম, তাহলে গিয়ে এবছরের দরুণ সুদের রইল আড়াই টাকা, আর ওদিকে তো দু-কুড়ি পাঁচ টাকা আসল, বুঝলে?

অনেকখন কালীচরণের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়েছিল লোকটা, বুঝতে পারেনি। যখন পারল সামনের ক্যাশবাক্স্‌টা দুই হাতে তুলে নিয়ে ঝাঁ করে বসিয়ে দিল কালীচরণের মাথায়। থেঁতো খুলি থেকে ঘিলু আর রক্ত ছিট্‌কিয়ে ছড়িয়ে নোংরা করে দিল তক্তপোশটা।

ইস্কুলের দুষ্টু ছেলে আর কঞ্জুস বৌ-ঝিদের সঙ্গে হাজারটা দেনা-পাওনায় যাকে কোনদিন চটে উঠতে দেখা যায়নি, সেই লোকটা কোম্পানীর খুঁতখুঁতে আইনে দ্বীপে চালান হয়ে গেল।

সেই বাপের ছেলে রহিম। বড়ো হয়ে উঠে চুলবাঁধার ফিতে ফিরি করার ইচ্ছে হল না ওর; দেলুয়ার ছ্যাক্‌রা গাড়ীর আড়তে গিয়ে জুটল। প্রথমে ঘোড়ার খবরদারি করা শিখল ও, প্যাসেঞ্জারদের জন্যে গাড়ীর দরজা খুলে দেওয়া, ছাতের ওপর মালপত্তরগুলো গুছিয়ে রাখা। তারপর একদিন দেলুয়া, তার পুরনো ঝরঝরে একটা গাড়ীকে সারিয়ে নতুন করে তুলল, চাকার অকেজো স্প্রিং দুটোকে বদলিয়ে, আর হাল ফ্যাসানের রবারের টায়ার লাগিয়ে। চকচকে রঙ করে, নকসা এঁকে, সিটের চামড়া পাল্‌টে গাড়ীর ভিতর লিখে দিলে—"মালিক শ্রীদেলুয়া তেওয়ারী"। টাটকা রঙ-চামড়ার গন্ধে রহিমের মনটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল; ঝানু গাড়োয়ান বুড়ো মিঞাকে গিয়ে ধরলে—কেনে, গাড়ী আমি চালাইতে লারব, না কি বলছ তুমি?

বুড়ো স্বীকার করল, তা বটে অনেকদিন চুরি করে করে অন্য গাড়োয়ানের গাড়ী চালিয়েছে ও।

তা হলে দেলুয়াকে বলে দাও কেনে, গাড়ীটা আমি চালাই?

তা বটে, বুড়ো মিঞা মাথা ঝাঁকাল, সেয়ানা হয়ে উঠেছে ছোঁড়াটা।

যোয়ান মানুষের মত রোজগার এখন না হলে চলবে কেন।

দেলুয়া আপত্তি করে নি। তাই কুড়ি বছরের রহিম কাঁচা রোদ লাগা চোখে কোচম্যানের বাক্‌সে উঠে খুশি হয়ে উঠবে না তো কি? তাছাড়া সত্যি কথা বলতে গেলে খুশির কারণ যে চকচকে গাড়ীটা তা নয়। কেন, ওই তো রফিক যে গাড়ীটা চালায় সেটাও তো কম সুন্দর নয়। তবে? কারণ আছে বই কি, আসুক দেখি রফিক গাড়ী ছুটিয়ে পাল্লা দিক ওর সঙ্গে—

কারণ হচ্ছে একটা ঘোড়া। টগবগে তাজা চেহারা, রহিমের মতো যোয়ান। আশেপাশের গাড়ীটানা মরখুটে ঘোড়াগুলোর মধ্যে ওটা চোখে পড়বেই।

আস্তাবলে কাজ করার সময় এই ঘোড়াটাকে ও চিরকালই একটু বেশী যত্ন করে এসেছে। নতুন গাড়ীটার ভার নেওয়ার সময় তেওয়ারীর কাছ থেকে চেয়ে নিল ঘোড়াকে।—এই ঘোড়াটাকে নোতুন গাড়ীতে যুতে দিলাম তেওয়ারীজি।

জোড় মিলবে না যে রে, টানতে পারবে না—গুলিখোর বুড়ো মিঞা চটে গিয়ে গালাগালি দেয়।

না মিলুক।

ঘোড়াটা নিয়ে রহিম সত্যিই পাগল। পক্ষিরাজ, আদর করে ডাকে ও। নীল মোটা মোটা পুঁতির মালা দিয়ে সাজিয়েছে ওকে, মাথার ওপর উঁচিয়ে দিয়েছে পালকের সাজ। বাদামী রঙের জানোয়ারটার কপালে আছে শাদা লবঙ্গফুলের মতো একটা চিহ্ন। সেইখানে মেহেদি পাতা ঘষে দেয় মাঝে মাঝে। এখন সখ গিয়েছে, দুই কানে দুটো পিতলের মাকড়ি পরিয়ে দেবে।

তু উকে সাদী করে লে রহিম, ঠাট্টা করে রফিক। সত্যি করে ভালবাসতে পারলে যেমন হয়, রহিমের মুখটা খুশিতে মিষ্টি হয়ে আসে; বলে, ডাঁড়া মাকড়িটো পরিয়ে দেই, তারপর দেখিস শালা—

পক্ষিরাজের পিঠ বাঁচিয়ে বাঁ দিকের জুড়ি ঘোড়াটার ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাবুকের বাড়ি মারে। কায়দা করে লাগামটা ধরে হাঁক দেয়—এই যে—যাবে, যাবে স্টেশন ?

রফিক প্যাসেঞ্জার খুঁজে বেড়ায়। খাটো মাপের রাস্তাটা একবার ঘুরে এসে চৌমাথায় রহিমের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় খোঁচা মেরে যায়—তুর এক চোখ কানা বটে রহিম। উ ঘোড়াটাকে মেরে মেরে পিঠের খাল খিঁচে দিলি যে—

শালা, উ-কি ঘোড়া আছে নাকি ? পক্ষিরাজের পিঠ বাঁচিয়ে মরখুটে জানোয়ারটাকে আবার চাবুক মারে ও—কৃচ্যা—কৃচ্যা—কৃচ্যা স্টেশন, যাবে স্টেশন ?

স্টেশন থেকে ফেরার সময় প্যাসেঞ্জার কেড়ে নেওয়ার হিড়িক; দেলুয়ার দৈনিক জমা পাঁচ সিকে পয়সা না মিটিয়ে উপায় নেই।

আসুন মাশায়, এই যে বাবু, এই গাড়ীতে—রবারের চাকা দেখে উঠবেন—

ওই বাবু, আপনাকে রোজই লিয়ে যাই যে আমি ?

ঘোড়া দেখে উঠবেন বাবু, পক্ষিরাজ ঘোড়া—

তিনটে সিট হয়ে গেছে বাবু, আর একটা শেয়ার।

এই যে বাবু শেয়ারে যাবেন নাকি ?

ছাড়ল ! ছাড়ল ! খালি গাড়ী আছে মাশায় ।

রমজানের সঙ্গে ঝগড়া হয়, গোলাম আলির সঙ্গে ; গুলিখোর বুড়ো মিঞার সঙ্গে কুৎসিত গালাগালির পাল্লা চলে। তারপর ব্যস্ত ভঙ্গী দেখিয়ে লাগামটা টেনে নিতে নিতে ঝগড়ার কথা একদম ভুলে যায় ও। কথামতো গাড়ী ছাড়তে একটু দেরী করে। ভেতর থেকে প্যাসেঞ্জাররা তাগিদ দেয়,—কই হে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? রহিম তবু দাঁড়িয়ে থাকে ; লাগাম টানার কায়দায় গাড়ীটা চলবে এই রকম ভাব দেখিয়েও তবু চলে না। রফিকের প্যাসেঞ্জার তিনটের সঙ্গে হয়রানি দর-কষাকষি শেষ হলে লড়াইয়ে ডাকে—কি রে, ছুটবি ? রফিক দৌড়ে নামবার আগে খতিয়ে নেয় ব্যাপারটা—তুর কটা সওয়ারী ?

পাঁচটো সোয়ারী, আর এই দেখ মাল—লে আয়—

জেতবার সম্ভাবনা রফিকের ষোল আনা ; কেন না ওর মাত্র তিনটে সওয়ারী, শহরে এসেছে মামলা করতে। মালপত্তরও কিছু নেই। তাই বাজী ধরল—লে হাঁকা—

কৃচ্যা—কৃচ্যা—কৃচ্যা—হে-হে-হে-হা হা-হা—

ছুটল দুই গাড়ী। আশেপাশের স্টেশন-ফিরতি গাড়ীগুলোকে পেছনে ফেলে। গাড়ীর ভেতর সাবধানী আরোহীদের মৃদু আপত্তি লোহাকাঠের হাজার শব্দে নিভে গেল। দুই মাইল পথটা দু মিনিটে পাড়ি দেওয়ার অসম্ভব ঝোঁক চেপেছে রহিমের—রফিকের হালকা তরতরে গাড়ীটাকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। তাজা পক্ষিরাজের সঙ্গে সমান পাল্লায় জোড় মিলাতে পারছে না পাশের জানোয়ারটা। যা কখনো করে নি, রহিম পক্ষিরাজের পিঠের ওপর অসহিষ্ণু বাড়ি মারলে। হুমড়ি দিয়ে পড়ল বাঁ দিকের বদখত জানোয়ারটা, সামনের দুই পা ভেঙে গাড়ীটাকে কাত করে। একটু আগে রফিকের গাড়ীটাও দাঁড়িয়ে পড়ল মজা দেখতে।

সমস্ত কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল রহিমের, পিঠের ওপর ভয়ার্ত প্যাসেঞ্জারদের তিরস্কার আছড়ে পড়ছিল আগুনের হল্‌কার মতো। হাঁটু-ভাঙা ঘোড়াটাকে ঠেলেঠুলে খাড়া করতে গেল রহিম। পা ভাঙে নি ওর। খাটবার, রহিমের ইচ্ছায় সায় দিয়ে দৌড়াবার মন না থাকলে অমনিভাবে পা গুটিয়ে বসে পড়ার শয়তানী ফন্দিটা আয়ত্ত করে ফেলেছে শালা !

কি বে—ছোটাবি আর ?

কুৎসিত আক্রমণের মত শোনাল রফিকের কথাটা। তাই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল রহিম, ছুটে গিয়ে গাড়ীটার চাকার ওপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের চাবুকটা দিয়ে কষে বাড়ি মারল একটা। খট করে একটা শব্দ হয়ে এক আঙুল ফাঁক হয়ে গেল রফিকের খুলি।

খুনী; খুনীর ছেলে রহিম। সহিস আর গাড়োয়ানরা সেদিন বুঝতে পেরেছিল তা। জাত খুনী ও। কালো ঝাঁঝাল রক্ত বইছে ওর শিরায়। কুড়ি বছরের যোয়ান বুকের অনেক তলে দুরূহ, শুদ্ধ একটা বাঁকা ভঙ্গী, নিজের ওপর কোন আক্রমণই যে সহ্য করবে না। দুশমনের রক্তের স্বাদে মরা বাচ্চার বাঘিনী-মায়ের মতো সে হিংস্র।

রহিমও জানে তা। এমন এক একটা সময় আসে যখন শরীরের সমস্ত হাড়-গোড় থেকে নিঃশব্দ দ্রুত একটা ঢেউ অস্পষ্ট গর্জন করে বুকের ফাটলে ফাটলে এসে জমে। বাঁধের পেছনে অন্ধকার বন্যার মতো ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতে থাকে,—নাক, কান, চোখ, কপালের রগ অতিক্রম করে তালুর নীচে গিয়ে ঠেকে। ক্রুদ্ধ, দুরন্ত সেই স্রোত কানা শুয়োরের মতো যে কোন একটা পথ খুঁজে বেড়ায়। মানুষকে তখন ও সহজেই খুন করতে পারে।

তবু এ পর্যন্ত কাউকে খুন করেনি ও। রফিককেও না : ভাঙা খুলি তো ওর পনের দিনেই জোড়া লাগল। পক্ষিরাজের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে রহিম কসম খায়—না খুন আমি কাউকে করব না ; কিন্তুক তুর সাথে কেউ দুশমনী করবে তো তাখে দেখে লিব আমি !

স্টেশন থেকে শহর, শহর থেকে স্টেশন—পাঁচটা ট্রেন ধরতে পাঁচ ক্ষেপ। ঘোড়াগুলোকে খেতে দেয়। নিজেরা সিগারেটের টিনের কৌটোয় স্টেশনের দোকান থেকে ঘোড়া রঙের চা নিয়ে আসে। ঝগড়া করে, ঔর থোড়া দাও বাবু, এক কাপ হয়ে গেল ? চায়ের ভেণ্ডার সেয়ানা লোক, ওদের কথা মোটেই শোনে না। ওরাও জানে শুনবে না, তাই কিছুক্ষণ পরে অন্য অনুরোধ করে—তেবে দাও খানিক গরম পানি ঢেলে দাও। সিগারেটের কৌটো এতক্ষণে ভরে ওঠে, ঘোলা রঙটা ফিকে হয়ে যায়, আস্বাদটা আরও পানসে। তা হোক। খিদেটা কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত মরা মনে হবে। গোল হয়ে বসে জটলা পাকায়, শালা জিনিসপত্তরের দাম বেড়ে গেছে···

বুড়ো মিঞা সংসারের জন্তে চাল না কিনে সেই পয়সা দিয়ে দুধ কিনে খেয়ে ফেলে মাঝে মাঝে। গুলিখোর মানুষটার ভীষণ ঝোঁক দুধের ওপর। সেদিন অবিশ্যি বাড়ীতে তুমুল ঝগড়া হয়, ছেলে আর বৌ-এর হাতে মার খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়, কিন্তু মনটা খুশি থাকে বুড়ো মিঞা বসে স্বপ্ন দেখে পুরনো দিনের। বলে, কোথায়, এতগুলো গাড়ী ছিল নাকি তখন? উকিলবাবুরা গাড়ী চেপে কাছারীতে যেতেন। বুড়ো মিঞার মাসিক বরাদ্দ ছিল পনের টাকা আর তা ছাড়া ভদ্দর লোকদের ঘরের বৌ-ঝিরা তো এমনি আজকালকার মতো সড়ক দিয়ে হেঁটে যাওয়া আসা করত না। ইজ্জৎ সরম এসব ছিল। এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী যাওয়ার সময় তাই গাড়ী ভাড়া করত। স্টেশনের ছুটকো শেয়ারের জন্তে কেউ মাথা ঘামাত নাকি তখন? আজকাল বড়োলোকেরা হাওয়াগাড়ী চাপে; ভদ্রলোকেরা পারত পক্ষে গাড়ীতে ওঠে না। তারপর ঐ—শালা কয়েকখানা টেক্সি 'আসতে শুরু করেছিল, স্টেশনে দু পয়সা করে শেয়ার নিয়ে গেছে ওরা। ভাগ্যিস এখন আর পেট্রল মিলছে না, তাই—

কিন্তুক জিনিসপত্তরের দাম বেড়ে গেছে যে ইদ্দিকে, চালের দাম?

হুঁ, তা তো বটেই। বর্ত্তমানে ফিরে আসা কি অসম্ভব বুড়ো মিঞার পক্ষে। রহিমের পক্ষে কিন্তু নয়। ওর কি? বাড়ীতে শুধু আছে একটা পেট, ওর চাচা। তা ছাড়া বুড়ো মিঞার তো ওগুলো গল্প—গল্প শুনে মন যতোখানি খারাপ হয় তার বেশী নয়। কিন্তু জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে বাপু এ ঠিক কথা।

দুপুরে সাড়ে এগারোটায় গাড়ী ধরে তারপর তিনটে অবধি বিশ্রাম। পক্ষিরাজকে খুলে চান করাতে নিয়ে যায় রহিম। কয়েক পা যাওয়ার পর কি মনে করে শয়তান ঘোড়াটাকেও খুলে নিয়ে যায়,—লে শালা তুখেও গোসল করিয়ে দিব আজ।

মজা পুকুর। অনেকদিন আগে সুদৃশ্য বাঁধান সিঁড়ি ছিল, হয়ত বুড়ো মিঞা দেখেছে তা, এখন ভাঙা। অসমান ইঁট আর মাটির স্তূপ। এক কোণে বাউড়ীদের দুটো মেয়ে বাবুদের বাড়ীর এঁটো বাসন মাজছে। রহিম ঘোড়া দুটোকে নিয়ে হুড়মুড় করে সবুজ রঙের জলের ভেতর আছড়ে পড়ল। বাউড়ীদের মেয়ো দুটো ভান-করা আতঙ্কে শিউরে ওঠে:

মা-গো-মা, আমাদের মারবে নাকি গো—ওই মিনসে ঘোড়ার কানে মাকড়ি পরিয়েছে লো, হেঁসে মরে যাই—রহিম খুশি হয়ে ওঠে, মেয়ে দুটিকে এত ভাল

মনে হচ্ছে। ওদের ঠাট্টার সুরে পক্ষিরাজকে আঘাত করার নোংরামি নেই। খুশি হয়ে পানাপচা ডোবাটায় হুস হুস করে ডুব দেয় কয়েকটা—তুদের চাইতে ভাল মাকড়িয়ে বেটি।

ঝামা ইঁট নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঘষে রহিম। নাকের ভেতর জল ঢুকে ঘোস্ ঘোস্ শব্দ করে ঘোড়া। বুকজল পুকুরটার পানা-পাঁকের ভেতর ক্ষুর ছুঁড়ে সাঁতার দিতে চায়। বাঁ হাতে ঘাড়টা ঠেলে ধরে ডান হাতে পিঠের ওপর থাবা থাবা চাপড় মারে, শব্দ করে। আরামে পক্ষিরাজের পিঠের চামড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে।

একচোখো রহিম। পক্ষিরাজের শুশ্রূষাতেই সময় ও সামর্থ্য ফুরিয়ে যায়। নিজের পেটের ভেতর রাক্ষুসে খিদেটা চন্ চন্ করে ওঠে। তাই বদ্খত জুড়ি ঘোড়াটার গোসল কোন রকমে শেষ করে উঠে পড়ে।

জলে ভিজে পক্ষিরাজের লম্বা কেশর আর লেজ কি রকম চুপসিয়ে থাকে, ভেজা ভেজা চোখে কেমন যেন দুর্বলতা। হঠাৎ বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে রহিমের, রোগা হয়ে যাচ্ছে নাকি পক্ষিরাজ ?

শালা চামার—আপন মনে গাল দিতে দিতে বাড়ী ফেরে রহিম, ঐ বেটা দেলুয়া, ঘোড়াকে খাওয়াবি না, পয়সা খরচ করবি না, অমনি অমনি গাড়ী টানবে তুর ? শালা গিরগিটির পারা মাথা ঝঁকিয়ে বলবে, দাম বেড়েছে। বলে, আগে দু পয়সা দিলে দুই বোঝা দল দিয়ে যেত সেধে, আজ দু আনা পয়সা চায় ; কেনে ? তাই বলে খরচ করবি না তুই, না খাইয়ে রাখবি ?

জিনিসপত্তরের দাম বেড়েছে। দেশে লড়াই বাধলে নাকি দাম চড়ে যাবেই। চালাক ব্যবসায়ীরা টের পেয়ে মাল ধরে রাখে—আজ ফকির কাল রাজা। ব্যবসার নিয়মই এই।

রহিমের মনটা বিদ্‌ঘুটে রকম খিঁচড়ে যায়। চন্‌চনে খিদেটা ঠাণ্ডা করে নেওয়ার মতো যথেষ্ট ভাত হয়ত বাড়ীতে থাকবে না। বুড়ো অকেজো মানুষটা ওরই চাচা, তাড়িয়ে তো দিতে পারে না—অথচ খাটবে না, রোজগার করবে না। রহিমের পয়সায় টাকায় দু সের চাল কিনে এনে তিন দিন চালাতে পারে না, খিদের ঝোঁকে বেশী খেয়ে ফেলে, রহিমের ভাগে কম পড়ে যায়।

শালা, খালভরা, দেলুয়া আর চাচাকে গাল দিতে দিতে বাড়ী ফেরে রহিম। টাকায় দু সের চাল কমে গেল আরো ; দেড় সের, সোয়া সের, টাকা সের।

কেউ বললে লড়াই, কেউ বললে আকাল। তবে দু-তিন দিনের ভেতরই দাম কমে যাবে, সবাই বললে। না কমলে চলে? কত লোক মারা যাবে গো? তাই কমে যাবে।

তবু কমল না। বুড়ো মিঞা মাথা ঝাঁকাল, এর আগে একটা লড়াই ও দেখেছে, কিন্তু এবার—শালা!

পাড়ার টিকেউলী মাগীটাকে জিজ্ঞেস করলে রহিম—কত করে টিকে বিচছো গো?

আনায় ছটা।

হুঁ, দরটা বাড়িয়ে দিলে লাগছে? রহিম বোঝবার চেষ্টা করল।

টিকেউলী মাগীটা নোংরা কালো হাত তুলে মারতে এল—টাকায় ক-সের চাল রে হতভাগা?

রাস্তায় রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঝগড়া করে বেড়াতো রমজানের মা। গরজ করে তার ঘরে গিয়ে উঠল রহিল—কি গো চাচী?

চাচীর উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। লছমী মারোয়াড়ীর বজরার খিচুড়ি খেয়ে হেগে মুতে, সারাটা মেঝে থেকে বেড়ালের মতো আঁচড়ে আঁচড়ে মাটি ছাড়িয়ে এখন ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ঘুঁটের দর বাড়িয়েছে কিনা জেনে নেওয়া হল না।

তা হোক, কি করতে হবে রহিম আন্দাজ করেছে। স্টেশনে সবাই জুটলে রহিম বললে—আর লয়কো, ভাড়া বাড়িয়ে দাও গাড়ীর। এক গাড়ী ছ-আনা চলবে না আর, আট আনা; না খেয়ে মরব নাকি সবাই, বলো?

ভাড়া বাড়াইলে যদি না রাজি হয় প্যাসেঞ্জাররা?

না বললেই হল নাকি? ওই? চালের দর কতো? বলব, এক কথা, আট আনা গাড়ী বাপু, হয় তো উঠুন—

এ্যাই, হয় তো উঠুন।

রাজি হয়ে গেল সবাই। গুলিখোর বুড়ো মিঞা সব চেয়ে বেশী চীৎকার করলে, গালাগালি দিলে। গুলি খেয়ে খেয়ে শরীরের শিরাগুলো টান টান হয়ে এসেছে ওর, জল রোদ্দুরে পাকানো পুরনো নাগরা জুতোর মতো বেঁকে কুঁকড়িয়ে এসেছে শরীরটা। খালে ঢোকা পেটের তল থেকে কিট্‌কিটে কথাগুলো টেনে টেনে ছুঁড়ে মারল ও—শালা খেতে লাগবে না আমাদের?

কেনে আট আনা ভাড়া দিবে না উয়োরা? টাকা নাই উয়োদের পকেটে? কোতো বাবু হয়ে গেইছে সব? তা বলুক, ভাড়া দিব না, তা হলে দেখে লিছি আমরা—

এ্যাই, দেখে লিছি আমরা।

রহিমের মনটা খুশি ছিল। একটু দূরে একটা বুড়ো বসে বসে ধুঁকছিল। মানুষ নয়, হাড়। শুকনো আমগাছের মতো অসমান, উঁচু নীচু, ভাঙাচোরা ন্যাড়া খুলির ওপর কয়েকটা শাদা রেঁায়া কোনরকমে থেকে গেছে এখনও। অন্যান্য মাগী ও ছেলেরা স্টেশনের গেটে, প্ল্যাটফর্মে, প্যাসেঞ্জারের পেছু পেছু ছড়িয়ে পড়েছে। বুড়োটা একা। রহিম তার কৌটো থেকে চা ঢেলে দিতে চাইল—লে হাঁ কর।

কী?

চা লে, হাঁ কর,—শালা খিদে তেষ্টা বহুত কমে যাবে। বুড়ো হাঁ করল না। নিশ্বাসের মতো শব্দে বহু কষ্টে বললে—খানিক ভাত দাও কেনে?

ওই শালা বুড়ো ভাতের লেগে লেলাইছে দেখ, বুড়ো মিঞা পুনরায় চটে উঠল; তেড়ে মারতে এল ও। রহিম আটকাল, মনটা খুশি ছিল রহিমের।

ভাড়া বাড়ল বটে, কিন্তু বাড়তি ভাড়াটুকু পাওয়া গেল না। ঠিক দু দিন পরেই দেলুয়া এসে বললে, মুদীরা বলছে চোদ্দ ছটাক চাল নিতে হবে—

হ্যাঁ তা তো বটেই বাপু, বলছে তো।

হরেক জিনিসের দাম আগুন, ছেঁায়া যাচ্ছে না—পুড়ে যাচ্ছে হাত।

কি হাল হল দেশের, গরিব লোকেরা বিলকুল মরে যাবে। ভদ্দর লোকেরা চাকরি বাকরি করছে, সরকার তাদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে—এ্যাই, আমরাও দু আনা ভাড়া বাড়িয়ে দিলাম, তবু খেতে মিলছে না তেওয়ারীজি।

লেকিন পাঁচ সিকে জমায় হবে না আর, তেওয়ারীর থাকবে কী? দু টাকা পুরিয়ে দিতে হবে এবার থেকে।

হাঁ হাঁ করে উঠল গাড়োয়ান সহিসেরা—বিলকুল মরে যাবো, জানে মেরো না তেওয়ারীজি, হেই বাবু।

নয়ত ছেড়ে দাও আমার গাড়ী; দু রূপেয়ার কম্‌তি হবে না; আমি আপনার লোক দেখে লিব।

সাফ কথা বলে উঠে গেল দেলুয়া। বোকা বোকা লোকগুলো হাঁ করে

তাকিয়ে থাকে। গাড়ীটা যে ওদের নয় একথাটা কিছুতেই মনে থাকে না ওদের। কেউ মনে করিয়ে দিলে খুব কষ্ট হয় বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি—যার জিনিস সে আপনার যা মন তাই করবে, কেউ দু কথা বলতে এলে শুনবে। গাড়ী যে দেলুয়া তেওয়ারীর। রমজানের নয়, রফিকের নয়, রহিমের নয়, গোলাম-আলির নয়। এককালে চাকায় রবারের টায়ার পরানো চক্‌মকে গাড়ীর চেহারা আজকে মোটেই সুদৃশ্য নয়। পাদানির ওপর দরজাটা ট্যারচা হয়ে কাত হয়ে আছে। জানলার ওপর কাঠের ফ্রেমটা ভাঙা। ফাটা সিটের চামড়ার আস্তর জীর্ণ হয়ে নারকেলের ছোবড়া বেরিয়ে আসছে। চলতে গেলে রবারহীন ইস্পাতের সঙ্গে ধাক্কায় নড়বড়ে ঠেকাঠুকো খোলটার যে কোন অংশ যে কোন সময় খসে আসতে পারে। তবু মিউনিসিপ্যাল লাইসেন্সের চৌকো ফ্রেমটার ওপরে অনেকদিন আগেকার পুরনো শাদা রঙে লেখা আছে: মালিক—শ্রীদেলুয়া তেওয়ারী।

মালিক! বিষিয়ে উঠল রহিম। কেন গাড়ীটার নতুন রঙ করে নিতে যার মন নেই, ভাঙা তক্তাগুলো বদ্‌লিয়ে ভাল করে তুলতে টাকা খরচ যে করবে না, সেই কৃপণ টাকা-চাটা গিরগিটিটা হবে কিনা মালিক। লড়াইয়ের বাজার—কাঠের দাম কতো, রঙের দাম কতো—হাজারটা ওজর তুলে রহিমের আবদার আটকেছে। জিনিসকে যে ভালবাসে না, সেই-ই হবে জিনিসের মালিক?

পক্ষিরাজের গলা ধরে আদর করল রহিম। মনটাকে হালকা করে চাঙ্গা করে নিতে হবে। নিজের জন্যে দুটো ভাতের যোগাড় করতেই হয়রান হয়ে যাচ্ছে মানুষ— পেয়ারের ঘোড়াটাকে তোয়াজ করার সময় হয় না। ঘাড় থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলা হয়নি, গায়ের লোম থেকে আঁটুলি; কতো রকম নালিশ জমিয়ে রেখেছে পক্ষিরাজ। আর বুকের ভেতরটা হিমহিম করে এল রহিমের। হাত দুটো হঠাৎ যেমন দুর্বল মনে হল: কী চেহারা হয়েছে পক্ষিরাজের!

বুড়ো হয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটা, চব্বিশ বছরের রহিমকে যে রকম বুড়ো দেখায় আজকাল। ঢালু শক্ত বুক পিঠটা ফোঁপরা হয়ে ফুলে ঢপ্‌ঢপ্ করছে। গলাটা সরু হয়ে চোয়ালের জায়গাটা কড়া কুৎসিত দেখাচ্ছে। সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরতেই এত হাঁপিয়ে গেছে যে নিশ্বাসের ঝোঁকে সমস্ত শরীরটা রোগা রোগা চারটে পায়ের ওপর ক্রমাগত নড়ছে, সামনে পেছনে ঢালু ঘাড় বেয়ে মাথাটা ঝুঁকে এসেছে মাটির দিকে অবসাদে। আশেপাশের ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ঘোড়াগুলো থেকে আলাদা করে চেনার উপায় রাখে নি আর।

ছেঁড়া-খোঁড়া গলায় ডাকল রহিম—পক্ষিরাজ? পক্ষিরাজ তাকাল; ওর তাকানির মানে স্পষ্ট; খেতে চায় ও। অনেকদিন ভাল করে খেতে চায় ও। অনেকদিক ভাল করে খেতে পায়নি কেউ, আকাল এসেছে যে দেশে। তাগড়াই যোয়ান মানুষই শুকিয়ে মরে গেছে রে বেটা! দু দিন সবুর করতে হবে তুখে। খানিক কষ্ট হবে তুর। কিন্তু মন খারাপ করিস না বেটা—ফির চাঙ্গা করে তুলব আমি।

আস্তে আস্তে চাপড় মারল পক্ষিরাজের পিঠে। পেছনের দিকে তিনকোণা হাড় দুটো হাতে লাগল। তিনটে আঁটুলি খুঁজে খুঁজে বার করল রহিম। পায়ের হাড়ের ওপর শুকনো টান টান মাংসের ভাঁজগুলো ডলে ডলে আরাম দিতে চাইল পক্ষিরাজকে। তারপর খেতে দেবে বলে চানার বস্তাটা পেড়ে আনতে গিয়ে থম্‌কে গেল রহিম: চানা কই?

চড়া বাজারে পক্ষিরাজের জন্যে বরাদ্দ আনা কয়েকে কিছুই হয় না। চামারটার কাছ থেকে বেশী পয়সা আদায় করা যায় না বলে রহিম নিজের রোজগার থেকে কেটে পক্ষিরাজের চানার যোগান দিয়ে আসছে। কালকেও চানা কিনে আস্তাবলের কোণে ঝুলিয়ে রেখেছিল বস্তাটা।

চানা কি হয়েছিল বোঝা গেল বাড়ী ফিরে। চুপচাপ বসে থাকত, খাটত না, রোজগার করত না, রহিমের সেই বুড়ো অথর্ব চাচা বমি করছে; আর বমির মধ্যে আস্তো চানার টুকরো। চুরি করে খেয়েছিস তুই? বুড়ো লোকটার কাঁধ ধরে নির্দয় ঝাঁকুনি দিল রহিম—আমার ভাগের ভাত থেকে খেয়েও খিদে মেটেনি শালার?

মারিস না বাপ রহিম, থোড়া খেয়েছি ভুখসে। এ বেটা রহিম—

ভুখসে? পক্ষিরাজের পাঁজরার হাড় বেরুবে, আর বেঁচে থাকবে ঐ বেটা গোরস্তানের কুত্তা? দ্বিতীয়বার ঝাঁকুনি দেয়ার আগে রহিম অনুভব করল, ওর শরীরের সমস্ত হাড় মাংস থেকে নিঃশব্দ দ্রুত একটা ঢেউ অস্পষ্ট গর্জন করে বুকের কাটলে এসে জমেছে। বাঁধের পেছনে অন্ধকার বন্যার মতো উঁচু হয়ে উঠে নাক, চোখ, কপালের রগ অতিক্রম করে যাচ্ছে। কালো বোবা একটা আদেশ নির্দয় হয়ে উঠবে এখনি—

হিড় হিড় করে টেনে এনে খাটের মড়াটাকে দরজার বাইরে ফেলে দিল রহিম। বাঁশের খুঁটিটায় ছ্যাচড়ানো পাটা বেকায়দায় ধাক্কা খেল।

যা শালা ফ্যান চেয়ে বেড়া রাস্তায়, বড়ো মসজিদের দরজায় উপুড় হয়ে পড়ে থাক খোদাতালার কাছে !

পক্ষিরাজের দুশমনকে খুন করে ফেলতে পারত রহিম।

খুনীর ছেলে। ওর বাপ কোথাকার কয়েদখানায় আজো বন্ধ। তবু চাচাকে খুন করলে না ও। কেমন যেন টের পেয়েছে পক্ষিরাজের আসল দুশমন ও নয়। আর পক্ষিরাজের যে দুশমন, সেই তো ওরও দুশমন। অনেকবার সে আক্রান্ত হয়েছে, অনেকবার আহত হয়েছে সে নিজে। রহিমের চেহারায় হাড়ের কাঠামোটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজকাল। কড়া হাড়ের ওপর শিরার জটগুলো জাহান্নমের সাপের মতো। কালো রক্তের স্রোতে জড়িয়ে জড়িয়ে আছে বহু মৃত্যুর আগেকার এক বাক্যহীন স্মৃতি।

পক্ষিরাজকে তাজা করে তুলবে বলেছিল রহিম। কথা রাখতে পারছে না। সবুর কর, আরো কিছু সবুর কর, বেটা।

কতোদিন ? বোবা চোখ তুলে আস্তাবলের অন্ধকারে জিজ্ঞেস করলে ঘোড়াটা।

দেলুয়া হাসল, ঘোড়াকে না ভালবাসলে মানুষ যে রকম ভাবে হাসে—বাংলাদেশের জলহাওয়ায় ঘোড়া তাজা থাকে কখনো। পাঁচ বছর গাড়ী টানলেই উশুল হয়ে যাবে। বেঁচে থাকলে সস্তা দামে বোকা খদ্দের ধরে বিচে দাও ব্যস—

ঠাহর হয় না রহিমের, চারিদিকে কি হচ্ছে। শহর থেকে স্টেশন, স্টেশন থেকে শহর। একটা ট্রেন উঠে যাওয়াতে আজকাল তিন ক্ষেপ সওয়ারী। ক্যাঁচ্, ক্যাঁচ্, ক্যাঁচ্—বর্মা মুলুক থেকে যারা পালিয়ে আসবে তাদের জন্যে শর, কাশ হোগলার ছোট ছোট খুপরী বানানো হয়েছিল; সেগুলো ভরে গেছে ভিখিরীতে। চৌমাথায় বড়ো মসজিদের দরজায় ফ্যান চাইতে চাইতে মরেছে ওর চাচা। লোকে বললে দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে গেছে, এবার মহামারী।

কিন্তু নিমক ; নিমক মিলছে কোন্ দোকানে বলো ভাই। গাড়ীভর্তি ধান যাচ্ছে ধান-কলের দিকে। দর নেমে গেছে গো বারো টাকা মন।

ক্যাঁচ্—ক্যাঁচ্, ক্যাঁচ্—কলকাতা থেকে আনানো ওষুধের বাক্স দুটো গাড়ীর মাথায় চাপিয়ে পৌছে দিল ডাক্তারবাবুর বাসায়। ডাক্তারবাবু ঠাট্টা করেছিল, জানিস বাজারে ছাড়লে লাখ টাকা। স্টেশন যাবে স্টেশন। কিন্তু নিমক, মাইরী দু আনা বেশী দিব আমি, খানিক যোগাড় করে দাও মাইরী—

গফুরের মেয়েটাকে দেখে ভাল লেগেছিল; কি যেন হয়েছে মেয়েটার, এত ভাল লাগছে কেন? মাইরী, মাইরী ঠুঁটো কাপড় পরেছে বেটি, গতরের সবটা ঢেকে রাখতে পারে নি!

রফিক চাবুকের ডগা দিয়ে দেখাল—এ বে দেখেছিস?

কি!

শালা সাইকেল রিক্সা। রফিক চটে উঠছে।

আধখান সাইকেলের সঙ্গে বড়লোকদের বাড়ীর খোকাখুকুদের বেড়িয়ে নিয়ে আসার মতো একখান খেলা-গাড়ী। দুজন তিনজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে ছুটছে।

দেলুয়া দুটো কিনেছে। বলছে গাড়ীগুলো সব ভেঙে চুরে গেছে, ঘোড়াগুলো মরে যাবে দু দিন বাদে, এই ভাল।

ভাল! হাসবার ইচ্ছে হল রহিমের, ঠোক্কর খেয়ে উলটিন যাবে যে বে—রফিক মোটেই হাসল না। রহিমের চাউনি এড়িয়ে বললে—পাঁচটা ঘোড়া বিচে দিবে দেলুয়া। তুর পক্ষিরাজকেও বিচে দিবে। নীলামে চড়াবে গাড়ীগুলান। বললে যে, যা দাম মিলবে তাথে নাকি সাতটা সাইকেল রিক্সা কেনা চলবে।

রহিম উত্তর দিল না; প্যাসেঞ্জার কাড়াকাড়ির জন্যে ব্যস্ত হয়েও উঠল না। আস্তে আস্তে কোচ্‌ম্যানের বাক্স থেকে নেমে এসে দাঁড়াল পক্ষিরাজের পাশে। বুড়ো হয়ে গেছে পক্ষিরাজ, আর বুড়ো। চিকণ, মসৃণ ঝিলিক-দেয়া গায়ের লোম হয়ে গেছে ধুলোটে, কর্কশ, পিঠের ওপর শিরদাঁড়ার হাড়গুলো গিঁটগিঁটে। গলাটা আরো রোগা হয়ে গিয়ে চোয়ালের হাড়টাকে অসহ্য করে তুলেছে। লম্বা কুমীরের মতো মুখটা মাটির দিকে ঝুঁকে। মেহেদি পাতা ঘসত যেখানে, শাদা লবঙ্গ ফুলের মতো সেই জায়গাটা কর্কশ লোমের দরুণ কুষ্ঠক্ষতের মতো দেখাচ্ছে। অনেক কাল আগে সখ করে মাকড়ি পরিয়ে দিয়েছিল কানে; লোম উঠে উঠে সেই জায়গাটা নেড়ীকুত্তার তলপেটের চামড়ার মতো।

ক-দিন সবুর করব? বোবা চোখ তুলে ঘোড়াটা জিজ্ঞেসও করলে না। রহিমের মুরোদ বোঝা গেছে। নাকের ফুটো দুটো ছোট বড়ো হয়ে হাঁপানির টান-খাওয়া নিশ্বাস যাওয়া-আসার পথ করে দিল শুধু।

তুথে বিচে দিবে দেলুয়া!

এক মুহূর্ত থমকে রইল রহিম। তারপর অস্পষ্ট গর্জন শুনতে পেলে ও;

নিঃশব্দে দ্রুত একটা ঢেউ বুকের ফাটলে ফাটলে ছড়িয়ে পড়েছে ; নাক চোখ কপালের রগ বেয়ে খুলির তলে গিয়ে নিষ্ঠুর চাপ সৃষ্টি করে রইল। বাঁকা বোবা একটা হুকুম জাহান্নমের সাপের মতো হিসিয়ে উঠছে কোথাও।

রাত আটটার প্যাসেঞ্জার পৌছিয়ে রহিমকে কি একটা বলতে এসে বললে না রফিক। অন্ধকারে ওর আবছা মুখটা কি রকম দেখাচ্ছিল। গুলিখোর বুড়ো মিঞা গোড়ালি উঁচু করে হেঁটে যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়াল ; তারপর বিড় বিড় করে বক্‌তে বক্‌তে সরে গেল সামনে থেকে—খুনী, জাত-খুনী বেটা—উর দিকে চাইতে ডর লাগে গো—আরো একটু রাত হতে ঝিঙ্গেফুলী বাঘের মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রহিম।

মফস্বল শহরের প্রান্তগুলো ইতিমধ্যেই মরে যেতে শুরু করেছে। কেরোসিন তেলের দু-একটা বাতি দগ্‌দগ্‌ করছে অন্ধকারে। কয়েকজন মাতাল সৈন্য এখানে ওখানে টলছে। একটা মিলিটারি ট্রাক খাপছাড়া ভাবে থেমে রয়েছে রাস্তায়। কুইনিন কিনবার জন্যে ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার পকেটে এক তাড়া নোট নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাইল দেড়েক দূরে একটা ফৌজের আস্তানা আছে, তাই এখানে রোজগার হতে পারে বলে কয়েকটা মাগী জুটে পড়েছে কোত্থেকে। সোভান কনট্রাকটার একটা হারিকেন নিয়ে তার হারানো গরু খুঁজে বেড়াচ্ছে, কাল সকালে সেটাকে জবাই করে এরোড্রামের দৈনিক মাংসের বরাদ্দ যোগান দিতে হবে তাকে।

রহিমকে দেখে একটা মেয়ে খিলখিল করে হাসল—এসো হে পান খাও।

আরো এগিয়ে গিয়ে শুঁড়ির দোকানটায় থামল রহিম। রাস্তার ওপর চিৎপাত দিয়ে ঘুমুচ্ছে একটা লোক। আর একটা লোক দুই হাঁটু জোড় করে পাখীর মতো বসে বসে বিড়ি টানছে। রাত বেশী হয় নি বলে এখনও ভীড় জমে নি। রহিম একটা বোতল নিয়ে বসল। খুলির নীচে তীব্র নিষ্ঠুর চাপটা চরমে উঠছে আস্তে আস্তে। পক্ষিরাজের দুশমনকে দেখে নিতে হবে।

পাশের লোকটা একতরফা কথা বলে যাচ্ছিল ফিসফিস করে—টাকায় চাঁদি কোথাকে ? ধরো দু আনা চাঁদি লাভ রইল মেয়ে কেটে ; কিন্তুক কত হাঙ্গামা ?

হু-হু গর্জন করে সেই স্রোত রহিমকে ছিঁড়ে ফুঁড়ে আগুনের হল্‌কা হয়ে সারা দুনিয়ায় নেচে বেড়াবে।

তাথে চাইতে এ্যাই একটো! চালাও তো কাম ফতে। লোকটা একটা পাঁচ টাকার জাল নোট রহিমের হাতে গুঁজে দিল, লাও চালিয়ে দেখো, প্রেত্যেক পাঁচ টাকায় তিন টাকা তুমার—

শেষ ঢোঁক মদ খেয়ে উঠে দাঁড়াল রহিম। মোটেই নেশা হয় নি। ফৌজের সৈন্যদের টুকিটাকি জিনিসের দোকান খুলে বসে আছে একটা লোক; সৌখিন ছড়ি, চামড়ার ব্যাগ, ক্ষুর, ফুলদানী নানা রকম জিনিস। একটা ছুরি বেছে নিল রহিম—কতো দাম?

আড়াই টাকা।

কুচ পরোয়া নেহি। রহিম পাঁচ টাকার নোটটা এগিয়ে দিল। গুনে গুনে ফেরত আড়াই টাকা ট্যাঁকে গুঁজল।

তারপর আশ্চর্য, রহিমের খুলির নীচে সেই রাক্ষুসী চাপটা আর নেই। ভাঁটির নিঃশব্দ টানে কোথায় সরে গেছে টের পায় নি।

হি, হি, লাও এবার, ছেলেবেলাকার থুকথুকে অভ্যাসে একলা একলা অন্ধকারে হাসল রহিম। এ শালা ভালই হল, একটো নোট চালাও, তিন টাকা তুর, হি-হি-হি—

যে মেয়েটি পান খেতে ডেকেছিল রহিম তাকে আপ্রাণ চেষ্টায় জড়িয়ে ধরেছে, পিষে মেরে ফেলতে চাচ্ছে একেবারে, পারছে না।

মেয়েটা রীতিমতো বিরক্ত হল: ওইই মিনসেটো কেমন ফুক্কুরি লাগালছে দেখ। পেটে ভাত পড়েনি, দেহে বল নাইকো, টাকা দেখিয়ে ফুক্কুরি মারছে দেখ—

গত দু বছরের বৃহত্তর দুর্ভিক্ষে তিলে তিলে কতোখানি প্রাণশক্তি ক্ষয়ে গেছে, রহিম জানত না। আহতভাবে বললে, জানিস খুন করতে যেছিলাম দেলুয়াকে—

মেয়েটা বিরক্ত হয়ে ধাক্কা দিল রহিমকে—মিনসের দেমাক কতো!

ময়লা বিছানাটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইল রহিম।

। —ধানকানা ॥

আত্মা

শ্রীসুশীল জানা

১

দলের রাতকানা লোকটা জিজ্ঞেস করলে, 'আর কত্‌টা পথ হে?'

—'হেঁঃ—রাত দু-পহর তক্ হাঁট শালা এখন—তারপর হাট-চালায় যেয়ে মাথা গুঁজবি।' পাশের জোয়ান মতো ছোকরাটি বললে, 'হাঁট এখন মুখ বুজে।'

কিন্তু মুখ বুজে থাকা তার পক্ষে কঠিন—হোঁচট খাচ্ছে সে পায় পায়, যদিও হাত ধরে চলেছে একজনের। বকে মরছে বিড় বিড় ক'রে। দলের আর সবাই চুপ। মাথায় কাঁধে মোট—পিঠে বোঁচকা, কোনো মেয়ের বোঁচকায় ঘুমন্ত শিশু। দলটিতে প্রায় মেয়ে মরদ ক'রে জনা দশেক হবে—চলেছে কোনো নতুন হাট-খোলার উদ্দেশ্যে পুরানো কোন হাট-খোলা ছেড়ে। মাথায় পিঠে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে ঘর-সংসার—হাঁড়িকুড়ি কাঁথা চ্যাটাই—মায় টঙ বাঁধার বাঁশ-বাখারিটি পর্যন্ত।

জাতে ওদের বলে 'কাক-মারা'—কোন্ বুনো পূজোর পদ্ধতিতে কাক ধরে ধরে বলি দেয়, কাকের মাংস খায় পরম উল্লাসে। ব্যাধের মতো পাখী শিকার করে—হয়তো বুনো পাখী সব সময় সহজলভ্য নয় বলে সুপ্রচুর কাককুল ওদের পরম ভোজ্য। বেদের মতো ঘুরে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মাথা গোঁজে হাট-চালার আশেপাশে। গলায় লাল নীল কাঁচের মালা। পুরুষেরা পাখী ধরে ভেল্কি ভোজবাজী দেখায়, আর তেড়ে নেশা করে গাঁজাগুলির। মেয়েরা ঝুড়িতে ক'রে বেচতে নিয়ে আসে সস্তা দামের সাবান তেল আয়না ইত্যাদি। গ্রামের গেরস্থ মেয়ে-ভোলানো শৌখীন টুকিটাকি জিনিস, আর নবীন যুবক চাষী ছোকরাদের টান মারে কখনো বা চোখ ঘুরিয়ে। জীবিকার পক্ষে উপযোগী হলে নিজেরা টঙ বাঁধে হাট-খোলার আশেপাশে যতোখানি আগ্রহে, ঠিক ততোখানি ঔদাসীন্যেই আবার ছুট ক'রে চলে যায় কবে সব ভেঙে দিয়ে। মাতৃভাষা তেলেগু—কিন্তু দিব্যি কথা বলতে পারে স্থানীয় ভাষায়। কবে ওরা মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন কে জানে—দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলার সীমান্তের অঞ্চল থেকে অঞ্চলে।

দলের রাতকানা লোকটা পড়ে গেল দড়াম ক'রে একেবারে হুমড়ি খেয়ে।

পাশের জোয়ান মতো ছোকরাটি গালাগাল দিয়ে বলে উঠলো, 'শালা গোবনা সাঁঝ-পহর থেকে দড়াম দড়াম ক'রে পড়তে লেগেছে গো।'

শুধু পড়া নয়—এবার গোবনা পড়ে আর উঠছেও না। যার হাত ধরে যাচ্ছিল সে বলে উঠলো, 'উঠছে না যে গো!'

'মরেছে!'

দল দাঁড়ালো থমকে।

শীতের রাত। চাঁদের আলো নেই। কুয়াশায় সবটা আচ্ছন্ন।

বাগাম্বর বুড়ো ঘোলাটে চোখ তুলে চারদিকে চেয়ে বললে, 'কত্‌খানি এলম বলো দেখি?'

কে একজন বললে, 'নদীচরের জালপাই মহাল এখনও ছাড়াতে পারি নি হে।'

'তবে!'

রাতকানা গোবনা ততক্ষণে উঠেছে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে। বললে, 'পা ছুটা মোর বশ থাকছে না কোনো রকমে।'—

পাশের জোয়ান ছোকরাটি খেঁকরে উঠে বললে, 'তবু বলবে না শালা—চোখে দেখতে পায় না।'

বাগাম্বর বললে, 'এক কাজ করা যাক এসো।'

দলের বুড়ো লোকটির কথা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো সবাই।

বাগাম্বর বললে, 'মোদের এক বেটির ঘর এইখেনে—আজ রাতটা থাকি চলো সেখেনে যেয়ে।'

'মোদের বেটি?'—

'হাঁ গো—মোদের জাতের মেয়া। দল ছেড়ে চলে গেল একদিন সে একটা উদো চাষীর সঙ্গে। তার ঘর এই জালপাই মহালে।' বাগাম্বর বললে, 'জমিন গোরু ছাগল, হাঁস মুরগী—ঘরদোর সব জমজমাট। মেয়াটা মোদের ভারী পয়মন্ত কি-না।'

'কে বলো দিকিন।'

'আন্নি। মোর এক স্যাঙাতের বেটি। চিনবেনি তোমরা।'

'কিন্তু তোমাকে সে চিনবে তো?'

'চিনবেনি! বল কি!' বাগাম্বর এক গাল হেসে বললে, 'মোরা যাই না

বলে কত গোসা করে বেটি মোদের। গেলে খাতির করবে কত! আর তার স্বভাবই বা কি বলো। গোলায় ধান, গোয়ালে গোরু, পুকুরে মাছ।'

ভূতের মতো লোকগুলোর জিভের তলায় জল এসে গেছে ততোক্ষণে, সমস্বরে প্রায় বলে উঠলো সবাই, 'চলো তবে।'

দলটি মোড় ফিরলো উত্তর থেকে পূবে।

রাতকানা গোবনা ঝুপ. ঝুপ্. ক'রে চলতে চলতে বললে, 'মোদের জন্যে তা হলে মাছটাছ ধরবে—কি বলো?'

বাগাম্বর বুড়ো বললে, 'অতো রাতে মাছ কি আর ধরবে! তবে হাঁস মুরগী একটা কিছু মারতে পারে।'

মাছ নয়—একেবারে মাংস! কাক-খাওয়া তিতকুটে মুখগুলো এক লহমায় যেন সজল হয়ে উঠলো স্বাদে আর গন্ধে। দলের বুড়ো বাগাম্বরের পেছনে পেছনে চলেছে ওরা—হাঁটার গতি গেছে বেড়ে—মায় গোবনার পর্যন্ত।

দলের সামনের একজন বলে উঠলো, 'নতুন হাঁড়ি পড়ে আছে গো দাদা।'

বাগাম্বর শুধালো, 'শ্মশান?'

'তাই তো দেখি।'

বাগাম্বর বললে, 'এসে পড়েছি তা হলে। শ্মশান পার হয়ে বাঁয়ে বেঁকবে।

আগের লোকটার চোখ তখনো শ্মশানের মড়াফেলা হাঁড়ির দিকে। বললে, 'অনেক হাঁড়ি গো।'

গোবনা বললে, 'মোর ভাতের হাঁড়ি নাই—একটা বেছে তুলে দে না ভাই হাতে।'

বাগাম্বর বললে, 'সে সব সকালে হবে। এ মস্ত শ্মশান—অনেক হাঁড়ি পাবে মনের সুখে তখন বাছবে। চলো এখন।'

দু-একজন তবু হাঁড়ির লোভ ছাড়তে পারে না—হাতে তুলে নেয় দু-একটা। ঠন্ ঠন্ ক'রে বাজিয়ে দেখে কানের কাছে—ভালোই আছে। শ্মশানের মড়া-ফেলা হাঁড়ি কলসীর জন্যে ওদের ঘৃণাও নেই—ভয় সংকোচও নেই। তাইতে গুষ্টিশুদ্ধ রাঁধে-বাড়ে খায় আর গাছ তলায় শোয়। মরে আর জন্মায় বংশ-পরম্পরায়। এই ওদের জীবন।...

এর মধ্যে ব্যতিক্রম যেন আন্দি—উদো চাষী জগার বিধবা। তিনটে

নাবালক ছেলে রেখে সাপ-কাটিতে জগা মরে গেছে। কিন্তু তার জমি-জিরেত ঘর-সংসার অটুট আছে আন্দির কাছে। বলদ হাঁকিয়ে নিজেই সে চাষ-আবাদ করে একটা জোয়ান মরদের মতো। তিন ছেলের মা কিন্তু এখনও সে ভরাযৌবনা, বেদের মেয়ের নির্ভীকতার সঙ্গে মিশেছে কিসান বউয়ের লক্ষ্মীশ্রী। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে ঘরদোর উঠোন দাওয়া।

বাগাম্বরের বুনো 'কাক-মারার' দল সেই উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ-করে চেয়ে রইলো।

বাগাম্বর গলা ফুলিয়ে বললে, 'এই মোদের বেটি-জামায়ের ঘর।'

হঠাৎ অন্ধকারে অতগুলো মানুষের কলকলানি শুনে আন্দি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথাকার লোক বটে গো?'

বাগাম্বর এগিয়ে গিয়ে এক গাল হেসে বললে, 'এলম গো বেটি। কতোদিন ভেবেছি আসবো আসবো—তা আর হয় না। আজ ভাবলাম—যাই একবার ঘুরে মোদের বেটি-জামায়ের ঘর। কতদিন যে দেখিনি বেটি তোকে।' বাগাম্বরের গলাটা নরম হয়ে এলো দরদে।

কিন্তু বেটির মুখের তখন দ্রুত ভাবান্তর শুরু হয়েছে! বাগাম্বরের মাথায় গোঁজা কাকের পালক আর গলায় লাল-নীল কাচের মালা দেখেই বুঝেছে আন্দি—উঠোনে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কারা! সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ পড়লো তার জঞ্জাল সাফ-করা ঝাড়ুর।

'যতো বেহায়া নাক-কাটা, ভাগাড়ের হারাম—ঝেঁটিয়ে সাফ করবো আজ। এত দুর দুর করি—তবু লাজসরম নাই!'—

এক লহমায় বুঝে নিল বাগাম্বর—আগেও তা হলে বহু দল তাড়া খেয়ে গেছে। তার নিজের ইজ্জৎ যায় যায় প্রায় তার দলের কাছে। বাগাম্বর হাসি-মুখে তবু বললো, 'মোরা তো কখনো আসিনি বেটি।'

'ওরে আমার বাপের ঠাকুর রে!' আন্দি এবার ঝাড় ছেড়ে বঁটির খোঁজ করলে।

অন্ধকার উঠোনে অপেক্ষমান দলটির মধ্যে এবার চাঞ্চল্য দেখা গেল।

বাগাম্বর মোলায়েম ক'রে বললে, 'মোরা শুধু রাতটা থাকবো একটু মাথা গুঁজে বেটি—কাছাকাছি কোনো হাট-খোলা নাই যে থাকি। আর এই জাড়ের দিন!—কাল সকালে উঠেই চলে যাবো মোরা।'

'যাবে—নড়বে তোমরা ভাগাড়ের শকুন!' আন্দি সমানে গাল পাড়তে লাগলো, 'যত্তো বেহায়া পাত-চাটা কুত্তা'—

বাগাম্বর বললে, 'বেশ—সকালে উঠে না চলে গেলে তখন বলিস। মানে একটা রাতকানা আছে মোদের দলে—বেচারা পড়ে যাচ্ছে শুধু দড়াম দড়াম ক'রে। একটা রাত শুধু বেটি!'—

আন্দি বোধ হয় একটু নরম হলো। তবু গর্‌গর্‌ করতে করতে বললে, 'অতো গুলান লোকের মুখে দেবো কি ছাই। কোথায় পাবো এত রাতে হাঁড়ি-কড়াই।'—

কথার ধারা বদলেছে দেখে দলের মধ্যে হঠাৎ একটা আশার সঞ্চার হলো যেন। গোবনা বলে উঠলো, 'হাঁড়ির অভাব কি গো। এই তো পাশের শ্মশানে কত বড় বড় হাঁড়ি সব গড়াগড়ি যাচ্ছে।'—

আর যাবে কোথায়। যুগপৎ ঝাড়ু, বঁটি কাটারি ইত্যাদির ঘন ঘন উল্লেখ ও হুহুংকার একযোগে আন্দিকে উত্তাল ক'রে তুললে। তাকে আর নরম করতে পারে না কোনো রকমে বাগাম্বর। সত্যি সত্যি আন্দি হাতে ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র মূর্তিতে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে সে—শ্মশানের হাঁড়িনাড়া এ ভূতের দলকে আশ্রয় দিয়ে কেমন ক'রে সে অকল্যাণ ডেকে আনে!

চতুর বাগাম্বর আন্দির সুরে সুর মিলিয়ে গাল পাড়তে লাগলো গোবনাকে, 'তাড়িয়ে দে শালা কানাকে। বেটির মান রাখতে জানে না শালা ছোটলোক।'

শেষ পর্যন্ত রফা হলো—আন্দির দাওয়ায় থাকবে ওরা একটা রাত। ভাত-টাত হবে না, মুড়ি পাবে সবাই চাট্টি চাট্টি। রাত থাকতে থাকতে পালাতে পাবে না কেউ—যাওয়ার সময় ঝোলাঝুলি সব খুলে দেখিয়ে যেতে হবে আন্দিকে। হাঁস মুরগীর একটা কোনো কিছুতে হাত দেবে তা বেধড়কা ঝাঁটা খাবে সবাই।

মাথা দুলিয়ে তাতেই সায় দিলে বাগাম্বর। তারপর একগাল হেসে হাত বাড়ালো আন্দির বছর তিনেকের ছোট ছেলেটার দিকে, 'এসো দা-দা।'

'ওরে আমার চৌদ্দ পুরুষের দাদারে!' আন্দি খেঁকরে উঠলো। তারপর ছেলে তিনটেকে টেনে নিয়ে রাগে গর্‌ গর্‌ করতে করতে ঘরে ঢুকে গেল।

২

আন্দির মেজছেলেটার বয়স হবে বছর ছয়েক। সবটা বুঝুক না বুঝুক—কৌতূহল তার সব দিকে। মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে রাত্তিরে সে জিজ্ঞেস করলে, 'ওরা সব কারা এসেছে আম্মা ?'

বড় ছেলে ভুটে একটু বেশী সেয়ানা—বয়স তার বছর দশেক। সে বললে, 'ওরা সব মামা—সেই যে আগে এসেছিল আরো !'—

মেজাজ চড়ে আছে আন্দির নানান ঝঞ্চাটে। ভুটের ওপরে খেঁকরে উঠে বললে, 'ফের যদি মামা বলবি তো কেটে ফেলাব।'

আন্দি বলে কেউ ছিল কোনোদিন এই ভবঘুরে কাকমারার দলে—সে কথা ভুলতে চায় সে। চাষীর বউ সে এখন—ঘরগেরস্থালী নিয়ে ছেলেপুলের মা। কিসান-জননী।

ভুটে কিন্তু ফের জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা আম্মা—মোদের ঘরে কোনো কুটুম তো আসে না।'

'কুটুম এসে একেবারে রাজ্যি দেবে! নাই বা এলো—মোদের কি চলছে না !'

মায়ের মেজাজ দেখে ভুটে থামলো।

আন্দি একটু থেমে বললে, 'আছে—তোর কাকারা আছে, জ্যাঠারা আছে, হোই উত্তর দেশে সে এক গাঁয়ে।' অর্থাৎ স্বামীর সম্পর্কিত চাষী গেরস্থরা সব। একটু দম নিয়ে আন্দি আবার বললে, 'কত জমি জায়গা, গোরু বাছুর তাদের সব—গোলায় ধান, পুকুরে মাছ।'

কাকমারা বেদিনীর মনে গজিয়েছে শেকড়—একদিকে আঁকড়ে ধরেছে পৃথিবীর মাটি আর একদিকে পল্লবিত হয়ে উঠেছে ঘরে গেরস্থালীতে পুষ্পিত মেহগ্‌নি গাছের মতো।

ভুটে বললে, 'আমরা তবে যাই না কেন কাকাদের কাছে ?'

'না—আমরাও যাই না, তারাও আসে না। আসবে কেন তারা ? সে যে চলে এলো একদিন সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে।'

'কে আম্মা ?'

'কে আবার—তোদের বাপ। তোরা তখনো জন্মাসনি।'

তখন সবে রঙ লেগেছে বাইশ বছরের জোয়ান চাষী জগার চোখে—ঘুর-ঘুর করে সারা দিনরাত গাঁয়ের হাটচালার ধারে কাকমারার ঝুপড়ি টঙগুলোর আশেপাশে। নবযৌবনের মোহ—আন্দিকে ঘিরে তখন তার অনাস্বাদিত আনন্দের স্বর্গ। তার জাতের শাসন আর গাঁয়ের বাঁধন—কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারলে না তাকে শেষ পর্যন্ত। কি ছিল শ্যামলা মেয়েটার চিকন মুখে চোখে—একদিন বাউরা হয়ে বেরিয়ে গেল সে ওই ভবঘুরের দলের সঙ্গে। ঘুরে বেড়ালো কতদিন গাছতলায় গাছতলায়—হাটচালায়-চালায়। দিনগুলো ভাসে আন্দি বেওয়ার চোখে। ভালবাসার জাতবর্ণ নেই। এই বেদিনী মেয়েটার চোখ ছল ছল করে অন্ধকারে সেই একটা লোকের জন্যে—যে নোঙর-ছেঁড়া জীবনে তাকে দিল স্বস্তির স্বাদ, শান্তির স্বাদ—রঙের মাতলামীই শুধু নয়।

চাষীর রক্তে আছে ঘরের টান—মাটির টান। একদিন তাই জগা বললে, 'আর ঘর বাঁধি—চাষ-আবাদ করি।'

কিন্তু কাকমারা মেয়েকে বউ ক'রে কোন গাঁয়ে সে বাস করবে চাষীর মতো! তার সমাজ তাকে বেইজ্জৎ করবে পদে পদে। ঘুরে ঘুরে এসে পড়লো সে এই চরে। এ চর তখন সবে হাঁসিল হচ্ছে। সে হলো 'মুড়াকাটি' প্রজা—অর্থাৎ বনবাদা কেটে যারা আবাদ ক'রে প্রথমে এসে—ঘর বাঁধে।

বানভাসি বেদেনীর লাগলো নতুন নেশা—জমির নেশা, ঘরের নেশা। স্বামীর সঙ্গে মিলে যতোটা পারলে আবাদ করলে দু-হাতে। তারপর সে হলো জননী—জন্ম দিল এ চরের নতুন তিনটি প্রজার, বাদা-হাঁসিল-করা জমির উত্তরাধিকার। স্বামী তার বাঁধ বাঁধলো, ফসল ফলালো, ঘর গড়লো এ চরে।

ভুটে বললে, 'শুধু তুই আর বাবা গোটা চর আবাদ করলি?'

'না—আরও লোক ছিল। কিন্তু তোর বাপের মতো চাষী ছিল কে! কে ছিল অমন জোয়ান মরদ—শক্ত কাজের লোক!' বেদিনীর মুগ্ধ নারী-সত্তা এই নগণ্য চাষীর কুঁড়ের অন্ধকারকে মুহূর্তে যেন মুখর ক'রে তোলে। এই অবোধ শিশুগুলো বাপের কথা শুধু শোনেই—বোঝে না মায়ের উত্তেজনা, তার সহসা চকিত ভাবান্তর।

ছেলেগুলো ঘুমিয়ে পড়লো একে একে। বাইরে কাকমারার দলও নীরব

নিঃসাড় হয়ে গেছে। আন্দি জেগে রইলো উৎকর্ণ হয়ে। একটি লোকের প্রতীক্ষা করতে লাগলো সে, আর ছটফট করতে লাগলো মনে মনে।

মাগন মণ্ডল এলো অনেক রাত ক'রে। তার কাশির শব্দ শুনে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো আন্দি। দরোজা খুলে দিল।

মাগন বললে, 'হলো না কিছুই—শালা তশীলদার জরিপ-সাহেবকে একেবারে হাত করে ফেলেছে, মায় আমিন পর্যন্ত।'

আন্দি প্রায় দম বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলো, 'জরিপ সাহেব কি বললে?'

'বলবে আর কি—যা করবার তাই করলে।' মাগন বললো, 'জগার সব জমি—মায় ভিটে পর্যন্ত খাস হয়ে গেল জমিদারের নামে। জগার কোনো ওয়ারিশ নাই—এই কথা মেনে নিল জরিপ সাহেব।'

'আর এই তিন-তিনটা ব্যাটা, আমি!' আন্দি দাঁতে দাঁত চেপে বললে।

'সব কথাই আমি বলেছি আন্দি।'

'বলেছ সব? বলেছ, কেমন ক'রে আবাদ করেছিলম এ চর, কেমন ক'রে গতর দিয়ে করেছিলম একে সোনার মাটি। বলেছ?—মোর মনে হয়, বুঝিয়ে বলতে পারোনি সব।'

'মোকে শুধু অবিশ্বাস করবি আন্দি চিরকাল?'

আন্দি বললে, 'আমি আর কারোকে বিশ্বাস করি না। এই তিন-তিনটা ব্যাটা, তার বাপের কেউ নয়—এই কথাটাই সত্যি বলে দাগা হয়ে যাবে সরকারী কাগজে?'

'আহা—বুঝলি না? এ শালা সেই গোবিন্দ তশীলদারের কারসাজি আর মালিকের ঘুষের জোর। আমি কি আর বলতে কিছু বাকি রেখেছি!'

'তবে?' আন্দি জ্বলে উঠে বললে, 'ভিটে ছাড়া করবে বলে তশীলদার হুমকি দেখায় মোকে,—কেড়ে লেবে মোর ব্যাটার হক পাওনার জমি!—বলেছ সব?'

'আহা—সে সব কি আর বলিনি!'

'কে জানে—বলেছ কি-না।' আন্দি গর্ গর্ ক'রে বললে, 'মোর ব্যাটাদের জমির ওপরে সব শালা ট্যামনার লোভ—মায় মালিক পর্যন্ত। বিশ্বাস করি কাকে!'

হঠাৎ এ কথায় মাগনের মুখটা শুকিয়ে আমশি হয়ে গেল একেবারে।

অন্ধকারে দেখতে পেল না আন্দি—দেখতে পেলে হয়তো থমকে যেত। সে এক পুরানো কথা—হিয়ের কথা মাগনের। ঠিক ওই ভাষায় অমনি ক'রেই আন্দি জবাব দিয়েছিল আরও একদিন—জগার মরার পর মাগন যে দিন একসঙ্গে ঘর বাঁধার প্রস্তাব করেছিল। একেবারে নিঃসঙ্গ টিংটিংয়ে এই লোকটার হিয়ের কথা যেন দাগই কাটেনি এই যুবতীর মনে। এক হাতের ঝাঁটা দেখিয়ে চরের চ্যাংড়া ইল্লতে মরদগুলোকে যেমন দাঁড় করিয়ে রেখেছিল তফাতে—তেমনি হাঁকড়ে দিয়েছিল মাগনকেও।

আজও সেই মহাস্ত্রটার উল্লেখ ক'রে ফের বললে আন্দি, 'ঝাঁটা মারি ওই চ্যামনা গোবিন্দর মুখে।'

মাগন বললে, 'তা মারিস তাকে একশোবার। কিন্তু আমি তোর কি করলম আন্দি! তোর ব্যাটার জমির জন্যে, ভিটের জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাঠে-ঘাটে, আমিনের কাছে, জরিপ-হাকিমের কাছে।'—

কথাটা মিথ্যে নয়। আন্দি চুপ ক'রে রইলো।

মাগন বললে—যেন কিছুটা অভিমানে, 'যা ভাবিস তোর ইচ্ছে। কাল হয়তো জরিপ-হাকিম তোকে ডেকে শুনবে তোর কথা। আজ অনেক বলে কয়ে সেই বিচার চেয়ে এসেছি।'

মাগন চলে গেল। বাকী রাতটা কাটলো আন্দির ছটফটিয়ে—কাল কখন যাবে সে জরিপ-হাকিমের কাছে।

রাত থাকতে থাকতে দাওয়ায় বেরিয়ে এসে দেখলো—বাগাম্বরের দল তল্পিতল্পা বেঁধে বসেছে, এবার যাবে। ওদের দেখে খেঁকরে উঠে আন্দি বললে, 'ঝোলাঝুলি না দেখিয়ে যাচ্ছ যে বড় সব!'

হকচকিয়ে তাকালো সবাই। দেখতে দেখতে বিভ্রাট বেধে গেল একটা। এর ওর ঝোলাঝুলি থেকে কক্ কক্ ক'রে উড়ে বেরিয়ে এলো মুরগীর বাচ্চা, আর কাপড়ের তলা থেকে প্যাঁক প্যাঁক ক'রে উঠলো ধাড়ি হাঁস। গোবনা বিপদ বুঝে ঝোলা চেপে বসে পড়লো মাটিতে—মড় মড় করে ভেঙে গেল ডিমের কাঁড়ি, উঠোন ভেসে গেল ভাঙা ডিমের কুসুমে। রাত-কানা বেচারী অন্ধকারে হাঁস মুরগী ধরতে পারেনি—হাতড়ে কিছু ডিম ভরেছিল ঝোলায়। কাঠ মেরে দাঁড়ালো বুড়ো বাগাম্বর। আন্দির হাতে ঘন ঘন ঝাঁটার আস্ফালন।

৩

মুখ বুজে অনেক গালাগালি হজম ক'রে, নাকে খত দিয়ে বাগাম্বরের দল যখন ছাড়া পেল তখন সূর্য উঠেছে আকাশে।

বাগাম্বর বললে, 'কাজটা খুব খারাপ করেছ সবাই। বেটির কাছে মোদের ইজ্জত রইলো না।'

দল নীরব। তাদের বলার কিছু নেই। নীরবে চলেছে মাথা নীচু ক'রে।

বাগাম্বর বললে ফের, 'তোমরা হয়তো ভেবেছিলে—বেটি মোদের বোকা হাবা মেয়া কিন্তু দেখলে তো।'—

সে যে কি দেখা—সকলেরই মুখে চোখে তা একেবারে দাগা।

শ্মশান পেরিয়ে একটা বাঁক নিতেই দলটা এসে পড়লো একেবারে মালিকের কাছারি বাড়ির কাছে। ওদের দেখে গোবিন্দ তশীলদার দাঁড়ালো সামনে এসে। সকৌতুকে বললে, 'ইদিকে কোথায় গেছলে সব হে—কুটুম-বাড়ি?'

বাগাম্বর আভূমি সেলাম ক'রে বললে, 'হাঁ হুজুর—মোদের বেটির ঘর।'

'ভালো ভালো। তা এখানে সব ডেরা বেঁধে থাকবে তো—নাকি?'

বাগাম্বর এক গাল হেসে মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, 'বেটি কুটুমের ঘরের কাছে থাকলে মোদের কি আর ইজ্জৎ থাকবে হুজুর। বাগাম্বরের কাছে সেটি হবেনি কখনো। এই মোরা চলে যাচ্ছি।'

'বলো কি হে! আজই চলে যাবে বেটির গাঁ ছেড়ে?' গোবিন্দ বললে, 'থাক এসে মোদের কাছারির অতিথ্‌শালায়—ইজ্জৎ যাওয়ার কোনো ভয় নাই তোমার।' শেষে গোবিন্দ যেন 'হায় হায়' ক'রে বললে, 'কই কেউ আস না তোমরা। তোমাদের পেয়েছি যখন—অন্তত একটা দিন থেকে যাও।'

লোকটা ঠাট্টা করছে কি না বুঝতে না পেরে বাগাম্বর তাকিয়ে রইলো বোকার মতো।

গোবিন্দ গোরু খেদানোর মতো ক'রে নিয়ে চললো সবাইকে। আফশোস করতে লাগলো বার বার—এমন সুন্দর কাক-মারারা এ চরে এসে ডেরা বাঁধে না বলে।

কাল থেকে দল প্রায় অভুক্ত। যন্ত্র-চালিতের মতো চললো গোবিন্দর পেছনে পেছনে।

ভোজের হৈ চৈ পড়ে গেল কাছারি-বাড়িতে। তিন-তিনটে চাকর ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে গোবিন্দ চক্কোত্তির ফরমাসে। পুকুরে পড়লো জাল, গাঁজা এলো ভরি ভরি, নিজে তদারক করতে লাগলো গোবিন্দ। কাকমারার দল দিব্যি বসে বসে খেতে লাগলো শুধু একদিন নয়—পুরো ছুটো দিন। চরের চাষাভুসোরা অবাক্ হলো প্রথমে—তারপর কানাঘুষো করতে লাগলো এই বলে, 'ও আর কিছু নয়—দলে চেংড়ি যুবতী আছে কটা, তশীলদারের নজর পড়েছে সেই দিকে। শালা চরে এবার কাকমারা বসাবে গো।'

কিন্তু বাগাম্বর গাঁজায় দম দিয়ে দলের লোককে বোঝালে, 'এত খাতির তাদের—শুধু পয়মন্ত সেই বেটির জন্যে।'

ছু-দিন তারিখ পেছিয়ে জরিপ-হাকিমের তাঁবুতে ডেপুটেশনের এজলাস বসলো তৃতীয় দিনে। এ ছু-দিন কি ক'রে যে কেটেছে আন্দির—এ শুধু সেই জানে। ভিটে ছাড়ার হুম্‌কী দিয়ে গেছে গোবিন্দ—যাচ্ছেতাই ক'রে বলে গেছে তার পেয়াদারা। মুখ শুকনো ক'রে নিরুপায়ের মতো ঘুরে ঘুরে গেছে মাগন মণ্ডল। চরের পুরানো প্রজারা দেখিয়ে গেছে কপাল। পাথরের মতো মুখ ক'রে থেকেছে আন্দি। তিন দিনের দিন ছুটলো সে তাঁবুতে তিনটে ছেলেকে সঙ্গে ক'রে। তখন সন্ধ্যে।

মাগন বললে, 'এই হলো জগার বউ হুজুর।'

গোবিন্দ খেঁকরে উঠলো, 'বউ না আর কিছু! জগার রক্ষিতা, হুজুর।'

হাকিম জিজ্ঞেস করলে, 'জগার সঙ্গে তোমার বিয়ে-সাদি হয়েছিল?'

গোবিন্দ মহা একটা রসিকতার কথা শুনে যেন খ্যাক খ্যাক ক'রে হেসে উঠলো। বললে, 'কাকমারা মাগীর সঙ্গে সচ্চাষীর বিয়ে-সাদি হুজুর!'

হাকিম শুধালো আন্দিকে, 'তোমার জাত কি?'

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে আন্দি—যেন এখনও কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছে না।

গোবিন্দ নিজের চাকরকে দিয়ে ডেকে পাঠালো বাগাম্বরকে। সব তৈরী ছিল গোবিন্দর। বাগাম্বর এসে দাঁড়ালো তার অদ্ভুত বেশবাস নিয়ে—মাথায় কাকের পালক গোঁজা, লাল শালুর পাগড়ী, গলায় লাল নীল কাঁচের মালা, হাতে লোহার বালা আর কানে কুণ্ডল।

গোবিন্দ বললে, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন হুজুর। ও ওদেরি জাত।'

হাকিম আন্দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ওকে তুমি চেন ?'

বাগাম্বর আভূমি সেলাম ক'রে বললে, 'হাঁ হুজুর—মোদের বেটি, খুব পয়মন্ত বেটি।'—

বাকীটুকু বললে গোবিন্দ—কেমন ক'রে জগা ওই কাকমারার মেয়েকে নিয়ে চরে এসে ঘর বেঁধেছিল, সেই সব কথা। শেষে বললে, 'এরকম একছার হয় হুজুর। উদো চাষাভূসো যেমন ফাঁদে পড়ে তেমন ও মাগীরাও একটা থেকে আর একটার কাঁধে চাপে। সব বেশ্যার সামিল।'

আচ্ছন্ন মগজে এতক্ষণে যেন কথাগুলো ছুরির মতো কেটে কেটে বসছে আন্দির। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠলো, 'কি বললি হারামের ব্যাটা—আমি বেশ্যা!'

'না তুই সতী লক্ষ্মী।' গোবিন্দ ডাকলে তার নিজের কাছারি বাড়ীর চাকর হারাধনকে। জিজ্ঞেস করলে, 'সত্যি কথা বল ব্যাটা বামুনের সামনে—হুজুরও রয়েছেন, কতদিন থেকে যাওয়া-আসা করছিস ওই মাগীটার কাছে ?'

হারাধন মাথা নীচু ক'রে বললে, 'জগা মরার মাস দুই পর থেকে হুজুর।'

গোবিন্দ বললে হাকিমকে, "এই সব ছোটলোকের জাত হুজুর। নোংরা কথা শুনে হয়তো আপনার কষ্ট হচ্ছে।"

মুখ টিপে হাসলো হাকিম সাহেব। তাকালো আন্দির দিকে। দেখতে দেখতে ঘাবড়ে-যাওয়া ফ্যাকাশে মুখে ফিরে এসেছে ওর যৌবনের বলিষ্ঠ উচ্ছ্বাস—ওর গভীর কালো চোখে ঝিকিয়ে উঠেছে সেই বেপরোয়া বেদিনী। কোলের ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে একটা বাঘিনীর মতো ছুটে গেল সে হারাধনের দিকে। এক লহমায় গিয়ে চেপে ধরলো তার গলা :

'হারামির বাচ্চা!'—

হৈ-চৈ করে উঠলো গোবিন্দ। হারাধন চেঁচাতে লাগলো প্রাণপণে। ছুটে এলো পেয়াদারা। ধরাধরি করে ছাড়িয়ে দিল হারাধনকে। বোকার মতো খাপছাড়াভাবে হাকিমের দিকে চেয়ে আবার চিৎকার ক'রে উঠলো আন্দি নিজের তিনটে ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, 'ওরা মোর ব্যাটা—হোই ছাখ অবোধ বালকরা মোর। ওরা পাবে না তার বাপের হাঁসিল-করা জমিন! বল—বল—আমি ওদের আম্মা! বল মোকে'—

গোবিন্দ ভেংচি কেটে বললে, 'রক্ষিতার বাচ্চা, সে আবার ওয়ারিশ! তোর জাতের দল বসে আছে হোই বাইরে—চলে যা তাদের সঙ্গে!'—

'তোকে মেরে ফেলাবো—মেরে ফেলাবো হারামি'—গর্জে উঠে ছুটে গেল আন্দি গোবিন্দের দিকে।

গোবিন্দ টপ্ করে লাফ দিয়ে হুজুরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখুন হুজুর—ছোট জাতের স্বভাব।'

'তোর ভদ্দরলোকের মুখে মারি লাথ!'—

এমন সময় বাইরে একটা কলরব পাকিয়ে ওঠে সহসা। বহুদূর থেকে চেঁচাচ্ছে যেন কে:

'আগুন আগুন'·····

কে বললে, 'তোর ঘরে আগুন আন্দি!'—

কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো আন্দি। তার পর ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে ছুটলো সে তাঁবু ছেড়ে ঘরের দিকে। অন্য দুটো ছেলে কেঁদে উঠলো পেছনে ভয় পেয়ে। তারা ছুটলো মায়ের পেছনে পেছনে।

চাষীর কুঁড়ে। পুড়ে শেষ হতে আর কতোক্ষণই বা লাগে। দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে আগুন ধরে জলে শেষ হ'য়ে গেল। কেরোসিন তেল চুম্বকের মতো টেনে নিল আগুনকে। দড়ি ছিঁড়ে গোরুগুলো পালালো কোথায় বনে বাদাড়ে, দম বন্ধ হয়ে মরে গেল কটা ছাগল, পুড়ে মরে গেল প্রায় সব হাঁস মুরগীগুলো। সেই ছাই ভস্মের পাশে তিনটে ছেলেকে নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলো আন্দি।

ব্যাপারটার গভীরত্ব বুঝেই বোধ হয় বুড়ো বাগাম্বর গেল সান্ত্বনা দিতে, 'ও সব ঝুটমুটের জন্যে দুখ্ করিসনি বেটি! মোরা কাকমারার জাত! ওরা যখন তাড়াবেই তো চল মোদের সঙ্গে। দল বসে আছে তোর জন্যে। কেউ যাইনি মোরা—চল।'

···আবার সেই নোঙর-ছেঁড়া জীবন!—

কিন্তু আন্দির চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখে আর কথাটি মাত্র না বলে পালিয়েছে বুড়ো বাগাম্বর। ওই ভঙ্গীর পরিচয় সে পেয়েছে এই ক'দিন আগে। আন্দি খাড়া দাঁড়িয়ে রইলো এক জায়গায়।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটা ঢিল এসে টাঁই করে লাগলো মেজছেলেটার কপালে। দেখতে দেখতে কচি তাজা রক্তের ধারায় ভেসে গেল তার মুখ। 'আম্মা গো' বলে বসে পড়লো ছেলেটা। তার রক্ত-ধারার দিকে চেয়ে চেয়ে ঝকমক ক'রে উঠলো আন্দির পাথর-কালো চোখ দুটো।

মাগন ছুটে এসে তুলে ধরলো ছেলেটাকে। আন্দির দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, 'এখনও বলছি—পালা এখন এখান থেকে আন্দি। মোর ঘরে চল। ভোর হোক।'

'যাবো!' দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে আন্দি বললে, 'কোথায় যাবো মোর ব্যাটাদের ভিটে ছেড়ে? ওদের মতো জন্ম দিইনি মোরা এ চরের!'—

মাগন কাকুতি করে বললে, 'এখনকার মতো শুধু সরে যা এখান থেকে—আবার কি অঘটন ঘটে যাবে একটা। হাই ত্থাখ শালা ছ্যাঁচড় হারাধন ঘোরাঘুরি করছে।'—

অদূরে একটা ঝুপি জঙ্গলের আড়ালে দেখা গেল ডোরাকাটা সার্ট হারাধনকে—যে সাক্ষ্য দিয়েছিল আন্দির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে বলে। তাকে দেখে চোখ জ্বলে উঠলো আন্দির।

'এসে তাড়াক মোকে গিধ্‌ধোড়ের বাচ্চারা।' বিড় বিড় করে বলল আবার আন্দি, 'মোর মরদের ভিটে, মোর ব্যাটার ভিটে!'—

'হ্যাঁ হ্যাঁ—এ তোর ব্যাটারই ভিটে।' মাগন-ওর একটা হাত চেপে ধরে বললে, 'এ চরের চাষীরা তা সবই জানে। তারা বলেছে—তোর ব্যাটার জমিই তারা চষে আবাদ করবে। এই পোড়া ভিটেয় আবার ঘর তুলে দেবে। কেউ তাড়াতে পারবে না তোর ব্যাটাদের। ও হাজার লেখা হোক কাগজে কলমে। সবাই বসে আছে মোর দাওয়ায়—চল নিজে শুধোবি। এখন চল তুই এখেন থেকে—হাতে ধরে বলছি তোর—সরে চল।—'

অন্ধকার থেকে আবার একটা ঢিল এসে পড়লো এবার আন্দির গায়ে। চেঁচিয়ে উঠলো এবার ঘুমন্ত কচি ছেলেটা।

মাগন একটা হাত চেপে ধরলো আন্দির, 'চল আন্দি—সরে পালা।'—

'না।'—

শ্রীসুশীল জানা

হঠাৎ ফেটে-পড়া একটা সবল কণ্ঠ নিস্তরঙ্গ মরা অন্ধকারকে যেন আলোড়িত কম্পিত ক'রে তোলে মুহূর্তে।

তিনটে ছেলেকে ঘিরে তেমনি অটল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো আন্দি—নড়লো না এক পা। নিভন্ত আগুনের রক্তিমাভাই যেন বাঘিনী মেয়েটার সর্বাঙ্গে জ্বলছে—জ্বলছে তার প্রেমে, তার মাতৃত্বে, তার অবিচল অধিকারে। তার সামনে আর সব তুচ্ছ ঝাপ্‌সা অন্ধকার হয়ে গেছে চার পাশে।

॥ —ঘরের ঠিকানা ॥

'ক'টা লাও আসবে বাবু?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কৈলাস।

'দশটা।' জবাব এল আড়তের চালা ঘর থেকে।

সবুজ শাড়ী পরা কামিনটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি কি?'

আবার জবাব এল বিরক্তি ভরে, 'বললাম তো, সাত নৌকো বালি আর তিন নৌকো টালি।'

অমনি সবুজ আর লাল শাড়ী পরা দুটি কামিন একসঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে সরু গলায় গেয়ে উঠল,

ওই আসে গো ওই আসে লা'য়ে ভরা টালি
ঘরে আমার ছাঁ ঘুমায়
মিন্‌সে পড়ে শুঁড়িখানায়
বেলা না যেতে আমি লাও করব খালি ॥

মেয়ে ছিল জনা পাঁচেক, পুরুষ ছিল পনর জন। পুরুষদের ভেতর থেকে কয়েকজন হাত-তালি দিয়ে উঠল বাহবা বাহবা বলে। মেয়েরা হেসে উঠল সব খিল্ খিল্ করে।

হঠাৎ প্রৌঢ় ভোলা দাঁড়িয়ে উঠে, এক হাত কোমরে আর এক হাত কানে দিয়ে জোর গলায় উঠল গেয়ে,

মিছে কথা ক'স্‌নি লো বউ, মিছে কথা ক'সনি।
কাল সন্‌ঝেয় এ পোড়া চোখে শুঁড়িখানা দেখিনি ॥
দিনে খেটে, ছাঁ নিয়ে তুই' মোর পাশে রাত কাটালি!
কুড়ে বউ ও কুড়ে বউ, কাজ দেখে তুই মিছে দোষে দুষলি ॥

মেয়ে পুরুষের মিলিত গলার একটা হাসি ও হুল্লোড়ের ঢেউ বয়ে যায়। মুহূর্তে যেন জমকে ওঠে সকালবেলার গঙ্গার ধার।

সূর্য উঠেছে খানিকক্ষণ আগে। ভাঁটা পড়া গঙ্গার লাল জলে লেগেছে বৈশাখী রোদের ধার। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথা চক্‌চক্ করে রোদে। ভাটায় জল নেমে পলি পড়ছে ধারেধারে। কাঁকড়ার বাচ্চা কুড়োচ্ছে খাবার জন্য কতকগুলো হা-ভাতে ছেলে।

ওপারে চটকল দেখা যায় একটা। এপারেও চটকল উত্তরে দক্ষিণে। মাঝ-

খানে আড়ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বালি ও টালির ভাঙা টুকরো ছড়ানো উঁচু পাড়। দু তিনটে ছোট বড় স্থাড়া স্থাড়া গাছ। গাছের গায় ও অবশিষ্ট পাতাগুলো ধূলোয় ভরা। জায়গাটা উঁচু নীচু, তাই লরী দুটো খানিকটা ঘুরে পেছনের মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে। লরী দুটো এসেছে মাল তুলে নিয়ে যেতে।

আর নৌকা থেকে মাল খালাস করার জন্য এসেছে এই মানুষগুলো। এরা দিনমজুর কিন্তু অনিশ্চিত এদের দিনের দিন মজুরি পাওয়া। কেন না, এসব আড়তে কখনো একসঙ্গে দু'তিন দিনের কাজ থাকে না। মাল আনা আর দেওয়ার একটি কেন্দ্র মাত্র। তাই এরা ফেরে রোজ কাজের সন্ধানে, আড়তে, ইঁট-পোড়ানো কলে, বাড়ীঘর-তৈরী কণ্টাক্টরের ফার্মে, কাঠ সুরকির গোলায়। কাছে কখনো, কখনো দূরে! ওদের রোজ-মজুরের নির্দিষ্ট মহল্লায় কোন কোন সময় আপনা থেকে ডাক আসে।

কিন্তু যেদিনটা ওরা কাজ পায় না, সেদিনটা ওদের অভিশপ্ত। এ ছন্নছাড়া আয়ের মত জীবনও ছন্নছাড়া। কম হোক, বেশী হোক, কোন বাঁধা আয় নেই অথচ বাঁধা আছে পেট। তবে এ জীবনে পেটটাকেও গোঁজামিল দিতে শিখেছে ওরা। ঘরও নেই, বারও নেই, জীবনের রঙ্গ অঙ্গ সবটাই এখানে। এখানটায় ফাঁক গেলে সব আঁধার। আঁধারের সব কুরূপ না ওৎ পেতে আছে ওদের চারধারে। তাই হাতে যেদিন কাজ থাকে, সেদিনে ওরা মূর্তিমান আনন্দ। বন্ধনহীন মন, তোলপাড় হৃদয়। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ নয়, যতক্ষণ কাজ, ততক্ষণ আশ।

হৈ হৈ হৈ, ঐ আসে গো ঐ।

কি কি কি? গোরা সায়েবের ঝি।

আগের গানের প্রসঙ্গ পাল্‌টে জোয়ান মদন গেয়ে উঠল চেঁচিয়ে কানে আঙুল দিয়ে,

গোরার বেটির মেজাজ চড়া, কাজের হদিস বড় কড়া

বউলো বউ, কাজে হাত লাগা—

সুরের শেষ টান দিয়ে সে একটু বিরক্তিভরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মেয়েদের দিকে। এর পরে মেয়েদের সুর ধরার কথা।

কিন্তু দেখা গেল মেয়েরা নারাজ। টিপে টিপে হেসে তারা মাথা নাড়ল।

মুখ ফিরিয়ে বসল কেউ নিরুৎসাহে গা এলিয়ে। পথে আসতে কুড়িয়ে পাওয়া, খোঁপায় গোঁজা কৃষ্ণচূড়া ঢেকে দিল ঘোমটা তুলে। যেন গানের তালে ফাঁক দিতে গিয়ে সুর থেমে গেছে। সেই ফাঁকে ভাটা ঠেলে জোয়ার এসে পড়ল গঙ্গার বুকে। এল নিঃশব্দে চোরাবানের তলে তলে। শুধু হাওয়া আসে যেন কোত্থেকে ধেয়ে। আসে চটকলের জেটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে, ক্রেইনের মাথায় লাল ন্যাকড়ার ফালি উড়িয়ে, এপারে ওপারে আগুনের মত কৃষ্ণচূড়ার মাথা দুলিয়ে।

হা-ভাতে ছেলেগুলো মহা উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জোয়ারের জলে। ষ্টীম লঞ্চ একটা টেনে নিয়ে চলেছে বিরাট গাধাবোট দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

লরীর ড্রাইভার কানাই এসে দাঁড়াল দলটার সামনে। সে এদের পরিচিত গুণী বন্ধু। অতবড় একটা গাড়ীকে যে খুটনাট মেশিন নেড়ে বোঁ বোঁ ক'রে চালিয়ে নিয়ে যায়, গায়ে পরে সাহেবী কুর্তা, ফোঁকে সিগারেট, তাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে তারা গৌরবান্বিত।

বুড়ো গোবর তার ঝুলে পড়া গোঁফের ফাঁকে হেসে বলল, 'বোসে পড় ওস্তাদ।'

মেয়েদের দিকে একবার চোরাচোখে কটাক্ষ করে কানাই বলল, 'গানই থেমে গেল তো, আর বসব কি সর্দার!'

গোবর সর্দার নয়, কিন্তু সম্মানে প্রায় তাই। অনেক বয়স ও বহু ঝড়ে ঝাপটায় তার ভাঙ্গাচোরা মুখটায় মোটা গোঁফের মধ্যে লুকনো তিক্ত অথচ উদার হাসির ধারে একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে আছে। বয়সের চেয়েও শক্ত মোটা গলায় বলল সে, 'ওস্তাদ, দুনিয়াতে কিছুর থেমে থাকবার যো নেই।'

'যো নেই তো থামলে কেন?' কানাই আবার কটাক্ষ করল মেয়েদের দিকে।

'মুখে থেমেছে, মনে থামেনি। শুধোও ওদের।' বলে সে নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'কিরে শ্যামা, গান থেমে গেছে?'

সবুজ-শাড়ী-পরা শ্যামা তেমনি মুখ টিপে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ, না।

কিন্তু মদন তা মানবে কেন। সে নিজের পাছায় চাপড় মেরে বলল, 'আমি বলছি থেমে গেছে। নইলে গলা কেন দিচ্ছে না।'

'আরে জানলে তো।' ভোলা বলল মুখ বাঁকিয়ে, 'মাগীরা আবার গাইতে জানে কবে?'

আর একজন বলল, 'আর শালা আমরাই গাই, ওদের বাদ দে।'

গাইয়ে মরদের দলটা বসল একজোট হয়ে।

অমনি কামিনী বুড়ি দাঁড়িয়ে উঠে খেঁকিয়ে উঠল, 'মাগীরা গাইতে জানে না, জানিস্ তোরা মরদরা। ব্যাতো মদ গ্যাজাখেকো হেঁড়ে গলায়, আহা কি বাহার।' বলে কোমরে হাত দিয়ে মাজা দুলিয়ে ভেংচে উঠল।

হৈ হৈ হৈ তোদের মরণ আসে ঐ।

একটা রোল পড়ে গেল দমফাটা হাসির। মেয়েদের ঢলে-পড়া হাসি যেন বুক জালিয়ে দিল গাইয়েদের। মনে হয়, আধা-ল্যাংটো খালি-গা মানুষগুলো যেন এক মহাখুসীর মজলিশ্ বসিয়েছে গঙ্গার ধারে।

আড়তের বাবু গঙ্গামুখো হ'য়ে গদীতে বসে হরিনামের মালা জপছিলেন। জপের মাঝে গণ্ডগোল হওয়ায়, দাঁতহীন মাড়ি খিঁচিয়ে উঠলেন, 'জানোয়ারের দল।'—

আড়তের বাঁধা কুলিটা বসেছিল দরজার কাছে, বেগড়ানো মুখে। সে কুলি বটে, কিন্তু বাঁধা কাজের মানুষ। সেই আভিজাত্য-বোধেই দিনমজুরগুলোর কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে বসেছে। বাবুর গালাগালটা শুনে সেও ঠোঁট উল্টে বলল, শালা লুচ্চা লাফাঙ্গার দল।

কামিনা তখনো বসেনি। সে গাইয়ের দিকে ঝুঁকে বলল, 'এত জানিস্ তো, আগের গীতটা ছেড়ে কেন দিলিরে?'

ও! তাও তো বটে। আগের গানটা যে থেমে গেছে মেয়েদের জবাবের মুখে এসে! আসলে ভোলা বা মদন আগের গানটার সব জানে না।

গোবর চেঁচিয়ে উঠল, 'তবে সেইটেই সুরু করে দেও, আসর নেতিয়ে গেল।'

মুহূর্তে শ্যামার গলার সঙ্গে লালশাড়ীর গলা মিশে সুরের ঢেউ তুলল।

মিছে কথা ক'য়োনি, কাজের ভয় করিনি,
তেমন বাপের ঝি আমি লই হে।
চোখে বালি, মাথায় টালি, সারাদিনে হাড় কালি
তুমি যে নেশায় ভোম্, গাছতলায় শুয়ে হে।

হঠাৎ একমুহূর্তের বিরতিতে সবাই স্থির হয়ে গেল, থেমে গেল তালে তালে মাথা ঝাঁকানো ও হাততালি।

শ্যামা একটা বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, হায়!···হায়!··· আর লালশাড়ী সরু গলায় টেনে টেনে যেন বহু দূর থেকে গেয়ে উঠল,

খেটে খুটে শরীল অবশ, তবু তোমায় তুলি ঘাড়ে,
বলগো সব জনে জনে, একলা মেয়ে, কেমনে যাই ঘরে।

বিবাদ ভুলে গেছে গাইয়ে দল। মনে হয় এখানে সকলের বুকই বুঝি দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠেছে অভাগী কামিন বউয়ের বিলাপে।

কার গোঙ্গানো গলার স্বর ভেসে এল, 'আমরা বেইমান!'

এবার উঠল সেরা গাইয়ে কৈলাস। তাকে সবাই বলে সাধু। আসলে সে বাউল-বৈরাগী। তার নেই ঘরে বউ ছেলে, তার ডেরা ঘরে ঘরে। দিন-মজুরের জীবনের আড়ালে তার মনের অনেকখানিই গেরুয়া রংএ ছোপানো।

আর এ গেরুয়া রংএরই ছোপ খানিক খানিক দাগ ধরিয়ে দিয়েছে ওই চোখ-ধাঁধানো লাল শাড়ীতে ঢাকা মনের মধ্যে। লাল শাড়ীর ঘর খালি, ভরা বয়সে এ জীবনের ভারের ভয়ে পলাতক তার সোয়ামী। আছে শুধু শ্বাশুড়ি ওই কামিনী বুড়ি। কিন্তু তার শ্বাশুড়ি, 'সবার বেলায় সডো গড়ো, বউয়ের বেলায় বড় দড়ো।' তাই বজ্র আঁটুনির ফস্‌কা গেরোর মত গেরুযার ছোপ তার মনের অতলে। কি যেন খোঁজে তার বিবাগী মন।···কৈলাসকে দাঁড়াতে দেখে হাসির ঝিলিক ফোটে তার কাজল চোখে, হাজার কথা ঠোঁটের কোণে। এইটুকুই কামিনী বুড়ি টের পেলে আর রক্ষে নেই। তবু কৈলাস এক অপূর্ব ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখিয়ে গেয়ে উঠল,

> মোরে ধিক ধিক ধিক, মন যে আমার বশ মানে না,
> আমার ভাঙ্গা ঘর, খালি পেট, তবু যে যাই শুঁড়িখানা।
> আমার ছাঁয়ের শুকনো মুখ, বউয়ের আমার শুকনো বুক,
> আমি দেশ হ'তে দেশান্তরে, আড়ত গোলায় খুঁজি সুখ,
> আর যাবনি আর যাবনি, মোরে দে বাঁধা কাজের ঠিকেনা।

কৈলাসের গানের রেশ শেষ হবার আগেই, ফুঁপিয়ে কান্নার ভঙ্গিতে দ্রুত তালে আবার গেয়ে উঠল, শ্যামা ও লাল শাড়ী,

> বাবু সাহেব, সাহেব গো, পেট ভরেনি,
> কাজ করিয়ে প'সা দেও, ক্ষুধা মরেনি।
> দেখ আমার শুকনো বুক, ছাঁয়ের তেষ মেটেনি,
> বয়স কালের শরীলে মোর রং লাগেনি।

বৈশাখের খর হাওয়ায় সে গানের সুর ভেসে যায় মাঠ ভেঙ্গে সহরে গাঁয়ে, গঙ্গার ছল্ ছল্ তালে ঢেউয়ে ঢেউয়ে এপারে ওপারে। এ গানেরই সুরে তালে দোলে আড়তের ন্যাড়া আর দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছ, দোলে মাথা আকাশের।

গাইয়ে দলের আর আফশোষ্‌ নেই। নেংটি-পরা খালি-গা রং বেরংএর মানুষগুলো শূন্যদৃষ্টিতে বসে থাকে চুপচাপ। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন স্তূপাকার করা রয়েছে কতকগুলো বেটপ মাল। গানের গুঞ্জন এখন তাদের হৃদয়ের ধিকি ধিকি তালে। এ তো শুধু গান নয়, ঘরে বাইরে তাদের মাথা-কোটার কাহিনী।

কামিনী বুড়ি কি যেন বিড় বিড় করে গঙ্গার দূর বুকে তাকিয়ে। বুঝি দীর্ঘদিনের ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি তোলপাড় করে মনে। তার সদা-সতর্ক চোখ দেখতে ভুলে যায়, কেমন করে তার বউ ঘাম মোছার আড়ে এক নজরে তাকিয়ে থাকে কৈলাসের দিকে।

কৈলাসও তাকিয়ে থাকে, কিন্তু সে চোখে নেই প্রেমের বিহ্বলতা, আছে কিসের অনুসন্ধিৎসা। কেন না, সে যে বলে, ভিত্‌ নেই তার ঘর, নোনা ইঁটে আবার পলেস্তারা। দূ—র শালা! অমন ঘর চায় না কৈলেস, যত ছ্যাঁচড়া জীবনের পাপ। ওটা ভেঙ্গে ফেল্‌। বুঝি সেই ভেঙ্গে ফেলারই হদিস খোঁজে সে লাল শাড়ীর চোখে। খেদ কেমন করে কাটবে শরীলে রং না লাগার।

গোবরের ভাঙ্গাচোরা মুখটা কালো মাটির ড্যালার মত থস্‌থসে হয়ে ওঠে। বলে কানাই ড্রাইভারকে, 'ওস্তাদ, এখন যেন জীবনটা হয়েছে পোকা-খেগো ছিঁটে বেড়া। জীবনভর পরের হাতের চাকার মত আমরা গড়িয়ে চলি, যেন তোমার হাতের মেসিন। চলালে চলি, তেল না দিলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করি।'

কানাই তার নিজের অভিজ্ঞতায় চ্যাপ্টা-মুখে হেসে বলে, 'বিগড়ে যাও।'

'বিগড়ে যাব?'

'হ্যাঁ। দেখ না, মেসিন বেগড়ালে তার পায়ের তলায় শু'য়ে তেল মাখি। তেমনি বিগড়ে যাও।'

এক মুহূর্ত কানাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ফিস্‌ ফিস্‌ করে ওঠে গোবর, 'ঠিক, শালা, বিগড়ে যাব, আমরা বিগড়ে যাব।...'

আড়তের বাবু জপের মালাটি কপালে ছুঁইয়ে ভরে রাখেন ক্যাশ বাক্সে। বলেন, 'হারামজাদাদের চেঁচানিতে একটু ঠাকুরের নাম করার জো নেই।'

বাঁধা কুলিটা বলে আত্মসন্তুষ্ট গলায়, 'শালারা ঈশ্বরের জঞ্জাল।'

ইতিমধ্যে আবার কে গান সুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু করল না। তালে যেন ভাঙন ধরে গেছে। এর মধ্যেই সূর্য কখন লাটিমের মত পাক খেয়ে উঠে এসেছে মাথার উপর। তেতে উঠেছে ছড়ানো বালি আর টালি-ভাঙ্গা টুকরো।

সকলেই তারা ভ্রূ কুঁচকে তাকায় গঙ্গার উত্তর বাঁকে। না, এখনো দেখা দেয়নি দশ মাল্লাই নৌকোর চ্যাটালো গলুই, কানে আসেনি দশ বৈঠার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ, দেহাতি মাঝির দাঁড় টানার গান।

সকলেই তারা পরস্পারের মুখের দিকে তাকায়। কখন আসবে, কখন? এখানে তারা কেউই একক নয়। সকলের একই ভাবনা, একই দুশ্চিন্তা, একই কথা।

সে যেন তাদের মনপবনের নাও। না এলে যে সব ফাঁকি। পেট ফাঁকি, গান ফাঁকি, ফাঁকি এ দিনটাই তাদের জীবনের গুন্‌তিতে।

কখন বেজে গেছে চটকলগুলোর দুপুরের ভেঁা। এখন আর কোথাও পাওয়া যাবে না রোজের সন্ধান। আর আড়তের নৌকো না এলে, মাল খালাস না করলে কেউ তাদের হাতে তুলে দেবে না একটি পয়সা।

কৈলাস হাঁকে, 'হেই বাবু, মাল আসবে কখন?'

জবাব আসে খিঁচনো স্বরে, 'আমি কি মালের সঙ্গে আছি?'

বাঁধা কুলিটা বলে গম্ভীর গলায়, 'যখন আসবে, তখন দেখতেই পাবে।'

শ্যামা বলে তিক্ত হেসে, 'মাইরী?'

কুলিটা খ্যাঁক করে উঠতে গিয়ে চুপ মেরে যায়। আর সবাই হেসে ওঠে, কিন্তু খাপছাড়া হাসি। আর হাসি আসে না। কাজ নেই, হাত খালি, শুধু মাথা গুঁজে বসে থাকা। এ জীবনেরই একটা মস্ত বিরোধ, যেন আগুনকে চাপা দিয়ে রাখা।

কিন্তু দিন-মজুরির এই দস্তুর। কাজ নেই তো, নেই পয়সা। না মুখ চেয়ে বসে থাক তো, ভাগো। কোথায় যাবে? সবখানেই তো কেবলি ভাগো ভাগো ভাগো!—

আড়তের বাবু মুড়ির বস্তা খুলে কিছু মুড়ি ঢেলে দেন বাঁধা কুলিটার কোঁচড়ে। এ সময়ে বসে-থাকা মানুষগুলোরও মুড়ি খাওয়ার কথা, দেওয়ার কথা দু' আনা হিসেবে। পয়সাটা কাটান যাবে ওদের মজুরি থেকে। কিন্তু কাজ নেই, মজুরিও নেই, উশুল হবে কোত্থেকে?

মুড়ির বস্তা বন্ধ করে, চালা ঘরে তালা মেরে আড়তদার পথ ধরেন ঘরের।

কুলিটা আড়চোখে এদের দিকে দেখে আর মুড়ি চিবোয়।

এ মানুষগুলো চুপচাপ দেখে, আর ঢোক গেলে। সকলেই পরস্পরকে ফাঁকি দিয়ে ওই মুড়ি খাওয়ার দিকেই দেখতে চায়।

কৈলাসের চোখ পড়ে লাল শাড়ীর চোখে। চট্ করে মুখ ফিরিয়ে নেয় উভয়ে। কামিনী বক্ বক্ করে শ্যামার সঙ্গে, 'তিশ বছর আগে এট্টা বাঁধা কাজ পেয়েছেলম জান্লি। মিন্সে ত্যাখন বেঁচে। সোহাগ ক'রে বললে, যাস্নি।... পুরুষ মানষের সোহাগ।'

হারিয়ে যায় কামিনীর গলা জোয়ারের কল্কল্ শব্দে।

হঠাৎ দেখা যায়, তারা সকলেই এ জীবনটার উপর বিরাগে নিজেদের মধ্যে গুল্তানি শুরু করে দিয়েছে।

কেউ বলে, 'একবার আমি এট্টা কাজ পেয়েছেলম, একনাগাড়ি তিন মাসের।'

কেউ বলে, 'আমার এক বছরও হয়েছে। কলকেতায় এট্টা বিড্লিন্ বানিয়েছেলম্।'

আর একজন বলে, 'আরে আমাকে তো শালা এখনো ওপরেশর বাবু এট্টা বাঁধা কাজের জন্য ডাকে।'

'আর তুই থালি যাস্ না।' অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলে কৈলাস।

কেউ কেউ নীরবে হাসে।

কিন্তু ভেঙ্গে যাচ্ছে সুর, কেটে যাচ্ছে তাল। কথাও আর ভাল লাগে না।

বুড়ো গোবর তার মোটা গলায় বলে আফ্শোষের সুরে, 'ওস্তাদ, তোমার মত কাজ জানলে'...বলতে বলতে হঠাৎ তার গলা হারিয়ে যায়। গোঁফ ধরে টানে আর ভাবে! আবার বলে, 'অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ফুরসৎ পেলম না, এখনো না।'

কানাই বলে, 'জানলেই বা কি হত? লাইসেনটা পকেটে ফেলে মোটর-ওয়ালাদের দোরে দোরে ঘুরতে। কাজ কোথায়, কাজ নেই।'

'কাজ নেই!' যেন বাঘাকুত্তার মত গড়্গড়্ ক'রে ওঠে গোবর, অস্থির হয়ে ওঠে হঠাৎ। 'ওস্তাদ, এ পেটে উপোসের মেলা দাগ আছে, কিন্তু হাতে একদিনেরও একটা আরামের দাগ পাবে না। কাজ না থাকলেই মানুষ পাগলা হ'য়ে যায়।...'

কাজ নেই। ..বাতাস তার পালে ঢিলে দেয়। বৈশাখী সূর্য জ্বলে গন্গন্ ক'রে মাথার উপর। আগুন গলে গলে পড়ে গায়ে, মুখে। গা জ্বলে, ঘাম ঝরে ঝল্সে-যাওয়া রসানির মত।

আশে পাশে ছায়া নেই কোথাও। মানুষগুলো গণ্ডূষভরে পান করে জোয়ারের ঘোলা জল, ছিটা দেয় চোখে মুখে। কিন্তু প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। কেউ কেউ মাথার গামছা মুখে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ন্যাড়া গাছগুলো যেন মরাকাঠের খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে। দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে চাওয়া যায় না। যেন ঝলসানো আগুন। ঘোমটা-খসা খোঁপায় কৃষ্ণচূড়া শুকিয়ে বিবর্ণ। যেন কামিনদের মুখ।

টাবুটুবু গঙ্গার তীব্র জোয়ারের স্রোত নিঃশব্দ ভরাট। উত্তরের বাঁকে যেন ঝিলিমিলি করে মরীচিকা। বাঁকের পাক-খাওয়া জলে উজান ঠেলে আসে না কোন নৌকা।

লালসাড়ী রোদে জলে দপ্দপ, জ্বলে পেট। বুঝি প্রাণটাও।

মনে মনে বলে কৈলাস, চাস্নি···এদিকে চাস্নি।···তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে ঠোঁট বেঁকিয়ে।—'ভিত্ নেই···ভিত্ নেই।··'

মদন বলে, 'কি বকছ?'

'বল্ছি, সারাদিন বসে গেলম, তো, প'সা কেন দেবে না?'

'তাই দস্তুর।'

'কেন দস্তুর?'

মদন আবার বলে, 'ওটা আইন।'

হঠাৎ কেমন খেপে উঠতে থাকে কৈলাস।—'শালার আইনের আমি ই'য়ে করি।'

'যতই কর, হবে না কিছু।'

'করালেই হয়।'

মদনও কেমন খচে যায়। বলে, 'আইনটা তোর বাপের কি না?'

'বাপ তুললি তো বলি, তবে বাপেরই আইন হবে। তোরাই তো'—

'ফের? মেলা ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ করবি তো'—প্রায় ঘুষি পাকায় মদন।

ঠিক এ সময়েই আড়তদারের ছোট ভাই অর্থাৎ ছোটবাবু আসেন রিক্সা থেকে নেমে ছাতা মাথায় দিয়ে। এসে বলেন, 'তিন মাইল দূরে বাঁকাতলায় মালের নৌকো আটকে রয়েছে, জোয়ার কিনা, তাই আসতে পারছে না।'

যাক্, তা হলে আসছে!···সবাই অমনি আবার উঠে বসে।

কয়েকজন বলে, 'তবে আমরাই কেন না গুন্ টেনে নাও লিয়ে আসি।'

ছোটবাবু বলেন, 'সে তোদের ইচ্ছে।' অর্থাৎ বিনা মজুরিতে আপত্তি কি।

অমনি তারা সবাই ছোটে মেয়েরা বাদে।

মাইল খানেক গিয়ে দেখা গেল আড়তদারবাবু আসছেন রিক্সায় ক'রে। জিজ্ঞেস করেন, 'যাচ্ছিস্ কোথা সব?'

'বাঁকাতলায় নাকি মাল নিয়ে লাও ভেঁড়িয়ে আছে? বললে ছোটবাবু?'

বাবু মাড়ি বের করে ফোঁস করে হেসে উঠলেন।—'আরে ধু-স্, ভায়া বুঝি তাই বলল? আমি ওকে বললুম যে, বাঁকাতলার আড়তে কোন খবর আসেনি।...সে কখন আসবে তার ঠিক কি—'

মুহূর্তে মুখগুলি যেন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। আবার তারা রোদ মাথায় ক'রে ফিরে আসে গঙ্গার ধারে।

এসে ব'সে পড়ে তপ্ত বালুর উপর। হাঁপায়। এখন আর মানুষগুলো রং বেরং নয়, গঙ্গার পাড়ে যেন কতকগুলো কালো কালো শকুন বসে আছে।

কাজ নেই!...গরমজলের কেটলির ঢাকার মত যেন ফুটতে থাকে কথাটা সবার মাথার মধ্যে। কাজ নেই!...তাদের জীবনের দিন গুন্‌তিতে একটা বিরাট শূন্য, ফাঁকা।

সূর্য ঢলে গেছে, ছুটির ভোঁ বেজে গেছে চটকলগুলোতে। কলরব ক'রে ফিরে চলেছে খেয়া নৌকায়, ছুটি পাওয়া মানুষেরা। ফিরে চলেছে স্টীম লঞ্চ গাধাবোটকে খালাস দিয়ে। লঞ্চের ছাদে, পশ্চিম মুখে বসে নামাজ পড়ে সারেঙ্ সাহেব।

ভাটা পড়েছে, জল নেমেছে, আবার পড়েছে পলি।

'হেই বাবু, লাও আসবেনি?' বারবার জিজ্ঞেস করে সবাই।

'জানিনে।' একই জবাব।

সন্ধ্যা নামে প্রায়।

হঠাৎ মদন খেঁকিয়ে ওঠে। 'এই কৈলেশ শালার জন্যেই তো এতখানি ছোটা?'

কৈলাশও চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমার বাবার জন্যে।'

ওদিকে চেঁচিয়ে ওঠে কামিনী বুড়ি, হঠাৎ গালাগাল পাড়তে আরম্ভ করে বউকে। গলা শোনা যায় লাল শাড়ীরও। শ্যামার ঝগড়া লেগেছে তার মরদ গণেশের সঙ্গে।

আস্তে আস্তে দেখা গেল, মানুষগুলো পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে।

তাদের মহল্লার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রেই তা বেড়ে উঠতে থাকে।

কোথায় তাদের সেই সকাল, সেই গান ও গল্প।

বুড়ো গোবর এ্যাসিডের গন্ধ পাওয়া সাপের মত সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে। সে চীৎকার ক'রে ওঠে, 'এই গোঁয়ারগুলান্, চুপো চুপো তাড়াতাড়ি।'

কে চুপ করে। চকিতে দেখা গেল, মানুষগুলো পরস্পর মারামারি শুরু ক'রে দিয়েছে। কে কাকে মারছে, তার ঠিক নেই। সবগুলোতে মিলে একটা দলা পাকিয়ে গিয়েছে মানুষের। শোনা যাচ্ছে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন, চীৎকার কান্না।

একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন আচমকা মাটি ফুঁড়ে ধ্বসিয়ে ফেলছে দুনিয়াটাকে। মাটি কাঁপছে থর্থর্ করে। ক্রুদ্ধ হুঙ্কার যেন ফেঁড়ে ফেলবে আকাশটাকে। কেউ উলঙ্গ হয়ে গেছে, কয়েকজনের পায়ের তলায় পড়ে গেছে কেউ।··· কেন এই মারামারি, তারা নিজেরাই যেন জানে না।

আড়তদার বাবুরা দুই ভাই কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি ক্যাশবাক্সে চাবি বন্ধ করে প্রায় কান্নাভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'রামদাস্, লাঠি পাক্ড়ো।'

রামদাস্ অর্থাৎ সেই বাঁধা কুলী। সে তখন ঘরের পেছন দিয়ে নেমে গেছে গঙ্গার নাবিতে, কালো আঁধারে, আর মনে মনে বল্ছে, 'আরে বাপ্‌রে, শালারা আমার জান নিকেশ ক'রে দিতে পারে।'

হঠাৎ সমস্ত গোলমালকে ছাপিয়ে তীব্র মোটা গলায় গোবর হাঁক দিল, 'লাও আসছে, লাও। জোয়ান, তৈয়ার হো!···'

মুহূর্তে যেন যাদুমন্ত্রে থেমে গেল সমস্ত গোলমাল, মারামারি, হাতাহাতি। সকলে ফিরে তাকাল উত্তরের বাঁকের দিকে, নিঃশব্দে।

পুবে উঠেছে আধখানা চাঁদ, ভাঁটার জলে তার ঝিলিমিলিতে দেখা যায় অদূরেই কতকগুলো বিরাট বড় বড় নৌকো গঙ্গার বুকে ছায়া ফেলে এগিয়ে আসছে। মোটা মাস্তুল উঠেছে আকাশে।···

সেই নৌকো থেকে ভেসে এল একটা স্বর, হো-ই-ই···

এখান থেকে হাঁকল গোবর, হা-ই-ই···

আসছে আসছে তাদের মন-পবনের নাও। সাঁঝ বেলায় এসেছে সকাল। কারুর দাঁত ভাঙ্গা, ঠোঁট কাটা, চোখ ফোলা, নখের ক্ষত। কারুর হাতে কার ছিঁড়ে নেওয়া এক মুঠো চুল কিম্বা পরিধেয় কাপড়ের টুক্‌রো।

অকস্মাৎ ভাটার ছল্ ছল্ তালে তাল দিয়ে কে গেয়ে উঠল সরু গলায়,

ওই আসে গো, ওই আসে ল'ায়ে ভরা টালি,

মাঝি এস তাড়াতাড়ি,

আর যে ভাই রইতে নারি

আঁধার নামে গাঁয়ে ঘরে, লাও করব খালি।

গান গাইছে লাল সাড়ী। সুর তুলেছে আবার, তাল লেগেছে আবার, শরীরের পেশীতে পেশীতে।

এগিয়ে আসে গোবর, 'কামিনী বুড়ি, তুই এখন চোখে দেখতে পাবিনে, ঘরে যা। শ্যামা তুই পালা, ঘরে তোর ছেলে রয়েছে। ভোলা তুইও যা, তোর চোট বেশী।'

তারা বলল, 'আমরা খাব কি ?'

'তোদের মজুরিটা আমরা গায়ে খেটে তুলে দেব।'

সবাই বলে উঠল, 'রাজী আছি।'

যেন এ মানুষগুলো কিছুক্ষণ আগের সেই হিংস্রপ্রাণীগুলো নয়।

কামিনী বুড়ি বলে গেল, 'বউ হুসিয়ার'।···

তারপর এক অদ্ভুত সাড়া পড়ে যায় কাজের। নৌকা লাগে পাড়ে। সুরু হয় মাল তোলা। গানে, কাজের উন্মাদনায়, হাঁকে ডাকে মুখরিত গঙ্গার ধার। পাঁচ নৌকা খালাস হলেই একদিনের রোজ পাবে কুড়ি জন।

কোন্‌খান্ দিয়ে সময় কেটে যায়, কেউ টেরও পায় না। জুড়ি বেছে নিয়ে সব মাল তুলে দেয় লরীতে। একটা যায়, আর একটা আসে।

ঝুড়ি কোদাল জমা দিয়ে, রোজের পয়সা নেওয়া হলে লাল শাড়ী সকলের চোখের আড়ালে কৈলাসের হাত ধরে টেনে নেমে গেল গঙ্গার ঢালু পাড়ের নীচে। বলে রুদ্ধ গলায়, 'সারা মুখ রক্তারক্তি। এসো ধুয়ে দি।'

কৈলাস বলে অদ্ভুত হেসে, 'রক্ত তো তোর মুখেও, ধুয়ে আর তা কত তুল্‌বি।'—

কিন্তু, কেন···'কেন ?' ফুঁপিয়ে উঠল লালশাড়ী।

আবার জোয়ার আসায় দক্ষিণ হাওয়ার ঝাপ্‌টায় ভেসে গেল তার গলা।

তখন অনেকেই নেমে এসেছে গঙ্গার কিনারে।

। মরশুমের একদিন ।

বছর আষ্টেক হোলো দিল্লীতে আমি চাকরি করছি। কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। কোনো কোনো বছরে কলকাতায় এক আধবার আসি, ঘুরে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে আবার ফিরে চলে যাই। নৈলে, ইদানীং আর আসা হয়ে ওঠে না।

বছর তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে শোভনা আমাকে চিঠি লিখেছিল—ছোড়দাদা, তুমি নিশ্চয় শুনেছ আজ ছ'মাস হ'তে চললো আমার কপাল ভেঙেছে। ছেলেটাকে নিয়ে কিছু দিন শ্বশুর বাড়ীতে ছিলুম, কিন্তু সেখানেও আর থাকা চললো না। তোমার ভগ্নিপতি এক আধশো টাকা যা রেখে গিয়েছিলেন, তাও খরচ হয়ে গেল। আর দিন চলে না। তুমি আমার মামাতো ভাই হলেও তোমাকে চিরদিন সহোদর দাদার মতন দেখে এসেছি। ছেলেটাকে যেমন ক'রে হোক মানুষ ক'রে তুলতে না পারলে আমার আর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথাও থাকবে না। এদিকে যুদ্ধের জন্য সব জিনিসের দাম ভীষণ বেড়ে গেছে। নুটু পাস ক'রে চাকরি খুঁজছে, এখনো কোথাও কিছু সুবিধে হয় নি। মা ভেবে আকুল। ইস্কুলের মাইনে দিতে না পারায় হারুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাবার কোম্পানীর কাগজ ভেঙে সব খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি যদি এ অবস্থায় দয়া ক'রে মাসে মাসে দশটি টাকা দাও, তাহ'লে অনেকটা সাহায্য হতে পারে। ইতি—

দিল্লীতে আমার এই চাকরির খোঁজ প্রথম পিসেমশাই আমাকে দেন, সুতরাং শোভনার চিঠি পেয়ে স্বর্গত পিসেমশায়ের প্রতি আমার সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাটা হৃদয়াবেগের সঙ্গে ঘুলিয়ে উঠলো। সেই দিনই আমি পঁচিশটি টাকা পাঠিয়ে দিলুম এবং শোভনাকে জানালুম, তোর ছেলে যতদিন না উপার্জনক্ষম হয়, ততদিন প্রতি মাসে আমি তোর নামে পনেরো টাকা পাঠাবো।

সেই থেকে শোভনা, পিসিমা, নুটু, হারু—সকলের সঙ্গেই আমার চিঠিপত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পূজোর সময় এবং নতুন বছরের আরম্ভেও আমি কিছু কিছু টাকা তাদের দিতুম। তিন বছর এই ভাবেই চলে এসেছে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের কি-প্রকার অবস্থা দাঁড়িয়েছে, অথবা শোভনারা কি ভাবে তাদের সংসার চালাচ্ছে, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ-

খবর আমি নিইনি, দরকারও হয়নি। মাঝখানে বোমার ভয়ে যখন কলকাতা থেকে বহু লোক মফঃস্বলের দিকে এখানে ওখানে পালিয়েছিল, সেই সময় শোভনার চিঠিতে কেবল জানতে পেরেছিলুম, ফরিদপুরে জিনিসপত্রের দর খুব বেড়ে গেছে। অনেক লোক এসেছে—ইত্যাদি। কিন্তু টাকা আমি নিয়মিত পাঠাই, নিয়মিতই প্রাপ্তি স্বীকার এবং চিঠিপত্রও আসে। যা হোক এক রকম ক'রে শোভনাদের দিন কাটছে।

কিন্তু প্রায় ছ'মাস আগে মাসিক পনেরো টাকা পাঠাবার পর দিনকয়েক বাদে টাকাটা দিল্লীতে ফেরৎ এলো। জানতে পারলুম ফরিদপুরের ঠিকানায় পিসিমারা কেউ নেই। কোথায় তা'রা গেছে, কোথায় আছে, কিছুই জানা যায়নি। চিঠি দিলুম, তার উত্তর পাওয়া গেল না। আর কিছুকাল পরে আবার মনি-অর্ডারে টাকা পাঠালুম, কিন্তু সে টাকাও যথাসময়ে ফেরৎ এলো। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে গিয়েছিলুম। ভাবলুম, টাকার দরকার হ'লে তারা নিজেরাই লিখবে, আমার ঠিকানা ত' আর তাদের অজানা নয়।

কিন্তু আজ প্রায় তিন বছর পরে হঠাৎ কলকাতায় যাবার সুযোগ হোলো এই মাত্র সেদিন। আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সাহেব যাচ্ছেন কলকাতায় তদ্বির-তদন্তের কাজে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। ভাবলুম, এই একটা সুযোগ। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে কোনো একটা শনিবারে যাবো ফরিদপুরে, সোমবারটা নেবো ছুটি —দিন দুয়েকের মধ্যে দেখাশোনা করে ফিরবো। একটা কৌতূহল আমার প্রবল ছিল, যাদের বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কোনো সংস্থান হবার কোন আশ' নেই, সেই দরিদ্র পিসিমা আর শোভনা পনেরো টাকা মাসোহারার প্রতি এমন উদাসীন হোলো কেন? শুনেছিলুম, ফরিদপুর টাউনে ইতিমধ্যে কলেরা দেখা দিয়েছিল, তবে কি তাদের একজনও বেঁচে নেই? মনে কতকটা দুর্ভাবনা ছিল বৈ কি।

সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এলুম এবং এসে উঠলুম পাঁচগুণ খরচ দিয়ে এক হোটেলে। এসে দেখছি এই বিরাট মহানগর একদিকে হয়ে উঠেছে কাঙ্গালী-প্রধান ও আর একদিকে চলছে যুদ্ধ-সাফল্যের প্রবল আয়োজন। ফলে, যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা হয়ে উঠেছে বহু টাকার মালিক, আর যারা গরীব গৃহস্থ ছিল, তা'রা হয়ে এসেছে সর্বস্বান্ত। দেশের সবাই বলছে, দুর্ভিক্ষ; গবর্ণমেণ্ট বলছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয়, খাদ্যাভাব। দুটোর মধ্যে তফাৎ কতটুকু সে আলোচনা

আপাতত স্থগিত রেখে সপ্তাহখানেক ধরে আমার কর্তব্যস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম। এর মধ্যে আর কোনোদিকে মন দিতে পারিনি। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ছোট পিসির মেজ ছেলে টুনুর সঙ্গে একদিন শেয়ালদার বাজারের কাছে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। একটা ফুলকাটা চটের থলেতে সের পাঁচেক চাল আর বাঁ-হাতে ডাঁটাশাক নিয়ে সে বিকেলের দিকে পথ পেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখা হতেই সে থমকে দাঁড়ালো। বললুম, কিরে টুনু?

চমকে সে ওঠেনি, কিছুতেই বোধ হয় সে আর চমকায় না। কেবল তার অবসন্ন চোখ দুটো তুলে সে শান্তকণ্ঠে বললে, কবে এলে ছোড়দা?

তার হাত ধরে বললুম, তোদের খবর কি রে?

খবর?—ব'লে সে পথের দিকে তাকালো। কসাইখানার মিলিটারি মৃত্যু-পথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ; যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন। মুখ ফিরিয়ে বললে, খবর আর কি? কিছু না।

হাসিমুখে বললুম, এ কি তোর চেহারা হয়েছে রে? পঁচিশ বছর বয়স হয়নি, এরই মধ্যে যে বুড়ো হয়ে গেলি?

আমার মুখের দিকে চেয়ে টুনু বললে, বাংলা দেশে থাকলে তুমিও হতে ছোড়দা—

কথাটায় অভিমান ছিল, ঈর্ষ্যা ছিল, হতাশা ছিল। বললুম, চাল কিনলি বুঝি?

টুনু বললে, না, আফিস থেকে পাই কন্‌ট্রোলের দামে। চারজন লোক, কিন্তু সপ্তাহে ছ'সেরের বেশী পাইনে। এই ত' যাবো, গেলে রান্না হবে। তোমার খবর ভালো, দেখতেই ত' পাচ্ছি। বেশ আছো।—আচ্ছা, চলি, যুদ্ধ থামবার পর যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।

বললুম, শোভনাদের খবর কিছু জানিস? তারা কি ফরিদপুরে নেই?

না—ব'লে একটু থেমে টুনু পুনরায় বললে, তাদের খবর আমার মুখ দিয়ে শুনতে চেয়োনা ছোড়দা!

কেন রে? তারা থাকে কোথায়?

বৌবাজারে, তিনশো তেরোর এফ্ নম্বরে। হ্যাঁ, যেতে পারো বৈ কি একবার। আসি তা হ'লে—এই বলে টুনু আবার চললো নির্বোধ ও ভারবাহী পশুর মতো ক্লান্ত পায়ে।

টুনুর চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে যেরকম নিরুৎসাহ লক্ষ্য করলুম, তাতে শোভনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার রুচি চলে যায়। কলকাতায় এসে তারা যদি শহরতলীর আনাচে কানাচে কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো তাহ'লে একটা কথা ছিল। কিন্তু বৌবাজার অঞ্চলের বাসাভাড়াও ত' কম নয়। একটা কথা আমার প্রথমেই মনে হলো, নুটু হয়ত ভালো চাকরি পেয়েছে। আজকাল অন্ন দুর্লভ, চাকরি দুর্লভ নয়। যারা চিরনির্বোধ ছিল, তারা হঠাৎ চতুর হয়ে উঠলো এই সম্প্রতি। একশো টাকার বেশী মাসিক মাইনে পাবার কল্পনা যাদের চিরজীবনেও ছিল না, তারা যুদ্ধ সরবরাহের কন্ট্রাক্টে সহসা হয়ে উঠলো লক্ষপতি এবং দুর্ভিক্ষকালে চাউলের জুয়াখেলায় কেউ কেউ হোলো সহস্রপতি। হয়ত নুটুর মতো বালকও এই যুদ্ধকালীন জুয়ায় ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। এ যুদ্ধে কী না সম্ভব ?

ওদের খবর নেবো কি নেবোনা এই তোলাপাড়ায় আর কাজের চাপে কয়েকটা দিন আরো কেটে গেল। হঠাৎ আফিসের সাহেব জানালেন, আগামী-কাল আমাদের দিল্লী রওনা হতে হবে। এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

আমারও এখানে থাকতে আর মন টিঁকছিল না। আমার হোটেলের নীচে সমস্ত রাত ধরে শত শত কাঙ্গালীর কান্না শুনে বিনিদ্র দুঃস্বপ্নে এই ক'টা দিন কোনমতে কাটিয়েছি—আর পারিনে। দুর্গন্ধে কলকাতা ভরা। তবু এখান থেকে যাবার আগে একবারটী পিসিমাদের খবর না নিয়ে যাওয়ার ভাবনায় মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। বিশেষ ক'রে যাবার আগের দিনটা ছুটি পেলুম জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। একটা সুযোগও পাওয়া গেল।

বৌবাজারের ঠিকানা খুজে বা'র করতে আমার বিলম্ব হল না। মনে করেছিলাম তারা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, হঠাৎ গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা চমক দেবো। কিন্তু বাড়ীটা দেখেই আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম। সামনে একটা গেঞ্জি বোনার ঘর, তার পাশে লোহার কারখানা, এদিকে মনিহারি দোকান, ভিতরে ভূষিমালের আড়ৎ। নীচেকার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, নীচের তলাটায় কতকগুলি লোক শোণদড়ির জাল বুনছে ক্ষিপ্রহস্তে। উপর তলাটায় লক্ষ্য ক'রে দেখি, বহু লোকজন। ওটা যে মেসবাসা, তা বুঝতে বিলম্ব হলো না। একবার সন্দেহক্রমে বাড়ীর নম্বরটা মিলিয়ে দেখলুম। না, ভুল আমার হয়নি—টুনুর দেওয়া এই নম্বরই ঠিক।

এদিক ওদিকে দুচারজনকে ধরে জিজ্ঞেস পড়া করতে গিয়ে যখন একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছি, দেখি সেই সময়ে বছর বারো তেরো বয়সের একটি মেয়ে সকৌতুকে উপরতলাকার সিঁড়ি বেয়ে মেসের দিকে যাচ্ছে এবং তাকে দেখে চার পাঁচটি লোক উপর থেকে নানারঙ্গে হাতছানি দিচ্ছে। আমি তাকে দেখেই চিনলুম, সে পিসিমার মেয়ে। তৎক্ষণাৎ ডাকলুম, মিনু?

মিনু ফিরে তাকালো। বললুম, চিনতে পারিস আমাকে?

না।

তোর মা কোথায়?

ভেতরে।

বললুম, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ দেখি? এ যে একেবারে গোলকধাঁধাঁ! আয় নেমে আয়।

মিনু নেমে এলো। বললে, কে আপনি?

পোড়ারমুখি! ব'লে তা'র হাত ধরলুম,—চল্ ভেতরে, তোর মা'র কাছে গিয়ে বল্‌ব, আমি কে? মুখপুড়ি, আমাকে একেবারে ভুলেছিস?

আমাকে দেখে উপরতলাকার লোকগুলি একটু স'রে দাঁড়ালো। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলুম, আমার হাতের মধ্যে মিনুর ছোট্ট হাতখানা অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উঠেছে। উপরে উঠতে গিয়ে সে বাধা পেয়েছে, এটা তা'র ভালো লাগেনি। তা'র দিকে একবার চেয়ে আমি নিজেই তার হাতখানা ছেড়ে দিলুম। মিনু তখন বললে, ওই যে, চৌবাচ্ছার পাশে গলির ভেতর দিয়ে সোজা চ'লে যান, ওদিকে সবাই আছে।

এই ব'লে সে উপরে উঠে গেল। চোখে মুখে তা'র কেমন যেন বন্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। এই সেদিনকার মিনু—পরণে একখানা পাৎলা সস্তা ডুরে, চেহারায় দারিদ্র্যের রুক্ষ শীর্ণতা—কি এরই মধ্যে তারুণ্যের চিহ্ন এসেছে তা'র সর্বাঙ্গে। তা'র অজ্ঞান চপলতার প্রতি ভীত চক্ষে তাকিয়ে আমি একটা বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে ভিতর দিকে পা বাড়ালুম।

বিস্ময়-চমক দেবার উৎসাহ আমার আর ছিল না। সরু একটা আনাগোনার পথ পেরিয়ে আমি ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, পিসিমা?

কে?—ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এলো এবং তখনই একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো। বললে, কা'কে চান্?

অপরিচিত স্ত্রীলোক। রং কালো, নাকে নাকছাবি, মুখে পানের দাগ, পরণে নীল কাঁচের চুড়ি। এই প্রকার স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৌবাজারেই বেশী। বললুম, তুমি কে?—এই ব'লে অগ্রসর হলুম।

স্ত্রীলোকটির বললে, আমি এখানকার ভাড়াটে।

এমন সময় একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। দেখেই চিনলুম, সে হারু। হাসিমুখে বললুম, কি হারু, চিনতে পারিস? তোর মা কোথায়।

সে আমাকে চিনলো কিনা জানিনে, কিন্তু সহাস্যে বললে, ভেতরে আসুন। মা রাঁধছে।

অগ্রসর হয়ে বললুম, তোর দিদি কোথায়?

দিদি এখুনি আসবে, বাইরে গেছে। আসুন না আপনি?

বেলা বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এ বাড়ির বাসিপাট এখনো শেষ হয়নি। দারিদ্র্যের সঙ্গে অসভ্যতা আর অশিক্ষা মিলে ঘর দুয়ারের কেমন ইতর চেহারা দাঁড়ায়, এর আগে এমন ক'রে আর আমার চোখে পড়েনি। ছায়ামলিন দরিদ্র ঘর-দুখানার ভিজা দুর্গন্ধ নাকে এলো,—এ পাশে নর্দমা, ও পাশে কুৎসিত কলতলা। এক ধারে ঝাঁটা, ভাঙা হাঁড়ি, কয়লা আর পোড়া কাঠকুটোর ভিড়! ছেঁড়া চটের থলে টাঙিয়ে পায়খানা ও কলতলার মাঝখানে একটা আবরু রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। পিসিমাদের মতো শুদ্ধাচারিণী মহিলারা কেমন ক'রে এই নরককুণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন, এ আমার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য। একটা বিশ্রী অস্বস্তি যেন আমার ভিতর থেকে ঠেলে উপরে উঠে এলো।

রান্নার জায়গায় এসে পিসিমাকে পেলাম। সহসা সবিস্ময়ে দেখলাম, তিনি চটাওঠা একটা কলাইয়ের বাটি মুখের কাছে নিয়ে চা পান করছেন। আমাকে দেখে বললেন, একি, নলিনাক্ষ যে? কবে এলে?

কিন্তু আমি নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম তাঁর চা খাওয়া দেখে। পিসিমা হিন্দু ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা, স্নান আহ্নিক পূজা গঙ্গাস্নান, দান ধ্যান —এই সব নিয়ে চিরদিন তাঁকে একটা বড় সংসারের প্রতিপালিকার আসনে দেখে এসেছি। সদ্যস্নাতা গরদের থান-পরা পিসিমাকে পূজা-অর্চনার পরিবেশের মধ্যে দেখে কতদিন মনে মনে প্রণাম ক'রে এসেছি। কিন্তু তিন বছরে তাঁর একি পরিবর্তন? আমিষ রান্নাঘরে ব'সে ভাঙা কলাইয়ের বাটিতে চা খাচ্ছেন তিনি?

বললুম, পিসিমা, প্রণাম করবো ; পা ছুঁতে দেবেন ?

পা বাড়িয়ে দিয়ে পিসিমা বললেন, কলকাতায় আমরা ক মাস হোলো এসেছি, তোমাকে খবর দেওয়া হয়নি বটে। আর বাবা, আজকাল কে কা'র খবর রাখে বলো। চারিদিকে হাহাকার উঠেছে !

আমি একটু থতিয়ে বললুম, পিসিমা—আপনাদের মাসোহারার টাকা আমি নিয়মিতই পাঠাচ্ছিলুম···কিন্তু আজ ছ'মাস হ'তে চললো আপনাদের কোনো খোঁজ খবর নেই !

খবর আর আমরা কাউকে দিইনি, নলিনাক্ষ !

পিসিমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ঔদাসীন্য আর অবহেলায় ভরা। একদিন আমি তাঁর অতি স্নেহের পাত্র ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি যে আমার এখানে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে খুশী হননি, এ তাঁর মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারি।

হ্যাঁগা, দিদি—? বলতে বলতে সেই আগেকার স্ত্রীলোকটি হাসিমুখে চাতালের ধারে এসে দাঁড়ালো। পিসিমা মুখ তুললেন। সে পুনবায় বললে, তুমি বাজারে যাবে গা? বাজারে আজ এই এত বড় বড় টাট্‌কা-তপসে মাছ এসেছে—একেবারে ধড়ফড় করছে !

তা'র লালাসিক্ত রসনার দিকে তাকিয়ে পিসিমার মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে এলো। তিনি বললেন, তুমি এখন যাও, বিনোদবালা।

এমন উৎসাহজনক সংবাদে ঔৎসুক্য না দেখে ম্লানমুখে বিনোদবালা সেখান থেকে স'রে গেল। পিসিমা বললেন, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে, নলিনাক্ষ ?

বিশেষ কিছু না !—ব'লে আমি হাসলুম—আজকের দিনটা আপনাদের এখানে থাকবো ব'লেই আমি এসেছিলুম, পিসিমা।

তা বেশ ত', বেশ ত'—তবে কি জানো বাবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট কিনা—বলতে বলতে বলতে পিসিমা চা খেয়ে বাটি সরিয়ে দিলেন। আমার থাকার কথায় তাঁর দিক থেকে কিছুমাত্র আনন্দ অথবা উৎসাহ দেখা গেল না।

বললুম, শোভনা কোথায়, পিসিমা ?

সে আসছে এখুনি, বোধহয় ও-বাড়ি গেছে।

ঈষৎ অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে আমি বললুম, সে কি আজকাল একলা বাসা থেকে বেরোয় ?

পিসিমা বললেন, না, তেমন কই ? তবে তেলটা, নুনটা, মধ্যে মাঝে দোকান থেকে আনে বৈকি। বিনোদবালা যায় সঙ্গে।

পিসিমা তাঁর কথায় দায়িত্ব কিছু নিলেন না, কেমন একটা মনোবিকারে আমার মাথা হেঁট হয়ে এলো। বললুম, শোভনার ছেলেটি কোথায় ? কত বড়টি হয়েছে।

পিসিমা বললেন, তা'র খুড়ো-জ্যাটা আমাদের কাছে ছেলেটাকে রাখলো না, নলিনাক্ষ। তাদের ছেলে তা'রা নিয়ে গেছে।

সে কি পিসিমা, অতটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে ? শোভনা পারবে থাকতে ?

তা পারবে না কেন বলো ? এক টাকায় দু'সের দুধও পাওয়া যায় না, ছেলেকে খাওয়াবে কি ? নিজেদেরই হাঁড়ি চড়ে না কতদিন ! অসুখ হ'লে ওষুধ নেই। শাড়ীর জোড়া বারো চোদ্দ টাকা। চা'ল পাওয়া যায় না বাজারে। আর কতদিন চোখ বুজে সহ্য করবো, নলিনাক্ষ ? ভিক্ষে কি করিনি ? করেছি। রাত্তিরে বেরিয়ে মান খুইয়ে হাত পেতেছি।—বলতে বলতে পিসিমা নিঃশ্বাস ফেললেন। পুনরায় বললেন, কই, কেউ আমাদের চা'ল ডালের খবর নেয়নি, নলিনাক্ষ !

অনেকটা যেন আর্তকণ্ঠে বললুম, পিসিমা, টুনুদেরও এই অবস্থা। সবাই মরতে বসেছে আজ, তাই কেউ কা'রো খবর নিতে পারে না। টুনুর কাছেই আপনাদের ঠিকানা পেলুম।

পিসিমা এতক্ষণ বসে ছিলেন, অতটা লক্ষ্য করিনি। তিনি এবার উঠে দাঁড়াতেই তাঁর ছিন্নভিন্ন কাপড়খানার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, এ বাড়ির ঠিকানা তুমি আর কাউকে দিয়ো না, বাবা।

এমন সময় মীনু এসে দরজার কাছে চঞ্চল হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললে, মা, মা শুনছ ? এই নাও একটা আধুলি · হরিশবাবু দিল—

মীনুর মাথার চুল এলোমেলো, পরণের কাপড়খানা আলুথালু। মুখখানা রাঙা, গলার আওয়াজটা উত্তেজনায় কাঁপছে। অত্যন্ত অধীরভাবে পুনরায় সে বললে যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।

পিসিমা অলক্ষ্যে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে

বললেন, বেরো—বেরো হারামজাদি এখান থেকে। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো তোর।

মীনু যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল। মায়ের মেজাজ দেখে মুখের কাছ থেকে স'রে গিয়ে সে অনুযোগ ক'রে কেবল বললে, তুমি ত' বলেছিলে!

হারু ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ফের মিছে কথা বলছিস, মীনু? এখন তোকে কে যেতে বলেছিল? মা তোকে রাত্তিরে যেতে বলেছিল না?

পিসিমা ব্যস্তভাবে বললেন, নলিনাক্ষ, তুমি বড্ড হঠাৎ এসে পড়েছ, বাবা। এখন ভারি আতান্তর, তুমি ঘরে গিয়ে বসো গে।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে এসে তক্তার মলিন বিছানাটার ওপর বসলুম। গলার ভিতর থেকে কি যেন একটা বারম্বার ঠেলে উঠছিল, সেটার প্রকৃত স্বরূপটা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারবো না। আমি এই পরিবারে মানুষ, আমি এদেরই একজন, এই আত্মীয়-পরিবারেই আমার জন্ম। অথচ আজ মনে হচ্ছে এখানে আমি নবাগত, অপরিচিত ও অনাহূত একটা লোক। যারা আমার পিসিমা ছিল, ভগ্নী ছিল, যাদের চিরদিন আপনার জন ব'লে জেনে এসেছি—এরা তা'রা নয়, এরা বৌবাজারের বিনোদবালাদের সহবাসী, এরা সেই আগেকার সম্ভ্রান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি!

মনে ছিল না জানালাটা খোলা। বৌবাজারের পথের একটা অংশ এখান থেকে চোখে পড়ে। যেখানে অসংখ্য যানবাহনের জটলা—ট্রাম, বাস, মোটর, গরুর গাড়ি আর মিলিটারী লরির চাকার আঁচড়ানির মধ্যে শোনা যাচ্ছে অগণ্য মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের আর্তরব। জঞ্জালের বালতি ঘিরে ব'সে গেছে কাঙালীরা, পরিত্যক্ত শিশুর কঙ্কাল গোঙাচ্ছে মৃত্যুর আশায়, স্ত্রীলোকদের অনাবৃত মাতৃবক্ষ অন্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের মতো পথের নালার ধারে প'ড়ে রয়েছে।

জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এদিকে মুখ ফিরাবো, এমন সময় শুনি হারু আর মীনুর কান্না—পিসিমা একখানা কাঠের চেলা নিয়ে তাদের হঠাৎ প্রহার করতে আরম্ভ করেছেন। উঠে গিয়ে বলবার ইচ্ছা হোলো, তাদের কোনো অপরাধ নেই—নিরপরাধকে অপরাধী ক'রে তোলার জন্য দিকে দিকে যেসব ষড়যন্ত্রের কারখানা তৈরী করা হয়েছে, ওরা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু উঠে বাইরে যাবার আগেই, বাইরে শোনা গেল কলকণ্ঠের সম্মিলিত খলখলে হাসি। সেই হাসি নিকটতর হয়ে এলো।

ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখি, বিনোদবালার সঙ্গে শোভনা। আমি তা'কে ডাকতেই সে যেন সহসা আঁৎকে উঠলো। দরজার কাছে এসে শোভনা শিউরে উঠে বললে, একি, ছোড়দাদা? তুমি ঠিকানা পেলে কেমন করে?

বললুম, এমনি এলুম সন্ধান ক'রে। কেমন আছিস তোরা শুনি।

নিজের চেহারা এতক্ষণে শোভনার নিজেরই চোখে পড়লো। জড়সড় হয়ে বললে, আমি আশা করিনি তুমি আমাদের ঠিকানা খুঁজে পাবে।

বললুম, কিন্তু আমাকে দেখে কই একটুও খুশী হলিনে ত?

শোভনা চুপ ক'রে রইলো। পুনরায় বললুম, এতদিন বাদে তোদের সঙ্গে দেখা। কত দেশ বেড়ালুম, দিল্লীতে কেমন ছিলুম—এইসব গল্প করার জন্যেই এলুম রে। তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলি, থাকতে পারবি?

না পারলে চলবে কেন ছোড়দা?

এদিক ওদিক চেয়ে আমি বললুম, কিন্তু এ-বাড়িটা তেমন ভালো নয়, তোরা এখানে আছিস কেন শোভা?

এখানে আমাদের ভাড়া লাগে না।

সবিস্ময়ে বললুম, ভাড়া লাগে না? অমন দয়ালু কে রে?

শোভনা বললে, যাঁর বাড়ি সে ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছেন।

আজকালকার বাজারে এমন দয়া দুর্লভ!

শোভনা বললে, তাঁর কেউ নেই, একলা থাকেন কিনা তাই—

বোধ হয় বিনোদবালা আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে শোভনা সরে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার সে যখন এসে দাঁড়ালো, দেখি পাতলা জালের মতন শাড়ীখানা ছেড়ে শোভনা একখানা সরু পাড় ধুতি প'রে এসেছে।

বললুম, শোভনা, তোরা ঠিকানা বদলালি, আমাকে চিঠি দিতে পারতিস!

ঠিকানা ইচ্ছে ক'রে দিইনি ছোড়দা!

কিন্তু মাসোহারার টাকাটা নেওয়া বন্ধ করলি কেন রে?

একটু থতিয়ে শোভনা বললে, ছেলের জন্যেই নিতুম তোমার কাছে হাত পেতে। কিন্তু ছেলে ত' নেই, ছেলে আমার নয়, তাই নেওয়া বন্ধ করেছি!

প্রশ্ন করলুম, তোদের চলছে কেমন ক'রে?

শোভনা বললে, তুমি আজ এসেছ, আজই চ'লে যাবে—তুমি সে কথা শুনতে চাও কেন ছোড়দা ?

চুপ ক'রে গেলুম। একথা শোনবার অধিকার আমার নেই, খুঁচিয়ে জানবারও দরকার নেই। বললাম, হুটু কোথায় ?

সে লোহার কারখানায় চাকরি করে, টাকা পঁচিশেক পায়। সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু চাল-ডাল আনে। আজকাল আবার নেশা করতে শিখেছে, সবদিন বাড়িও আসে না।

বললুম, সে কি, হুটু অমন চমৎকার ছেলে, সে এমন হয়েছে ? হারুর পড়াশুনোও ত' বন্ধ। ও কি করে এখন ?

শোভনা নত মুখে বললে, এই রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে হারুর কাজ জুটেছিল, কিন্তু সেদিন কতকগুলো খাবার চুরি যাওয়ায় ওর কাজ গেছে। এখন ব'সেই থাকে।

স্বভাবতই এবার প্রশ্নটা এসে দাঁড়ালো শোভনার ওপর। কিন্তু আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। কথা ঘুরিয়ে বললুম, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগেনি, শোভা। মীনুটা এখন যাই হোক একটু বড় হয়েছে, ওকে যখন তখন বাইরে যেতে দেওয়া ভালো নয়। বাড়িটায় নানা রকম লোক থাকে, বুঝিস ত।

বাইরে জুতোর মসমস শব্দ পাওয়া গেল। চেয়ে দেখলুম, আধ ময়লা জামাকাপড় পরা একটি লোক এক ঠোঙা খাবার হাতে নিয়ে ভিতরে এল। মাথায় অল্প টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ—লোকটির বয়স বেশী নয়। চাতালের ওপর এসে দাঁড়িয়ে বললে, কই, বিনোদ কোথা গেলে ? এক ঘটি জল দাও আমার ঘরে। আরে কপাল, খাবারের ঠোঙা হাতে দেখলে আর রক্ষে নেই। নেড়ি কুকুরের মতন পেছনে পেছনে আসে মেয়ে পুরুষগুলো কেঁদে কেঁদে। ছোঁ মেরেই নেয় বুঝি হাত থেকে। পচা আমের খোসা নর্দমা থেকে তুলে চুষছে, দেখে এলুম গো। এই যে, এনেছ জলের ঘটি, দাও। এ-দুর্ভিক্ষে চারটি অবস্থা দেখলুম, বুঝলে বিনোদ ? আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে, যদি দুটি চাল পাওয়া যায়। তারপর হোলো ভাঙা কলাইয়ের থাল, যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে। তারপর হাতে নিল হাঁড়ি, যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়। আর এখন, কেবল কান্না,—কোথাও কিছু পায় না! আরে পাবে কোত্থেকে—

গেরস্থরা যে ভাত গুলে ফ্যান খাচ্ছে গো। যাই, দু'খানা কচুরি চিবিয়ে প'ড়ে থাকি।—বলতে বলতে লোকটি ভিতর দিকে চ'লে গেল।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে শোভনা বললে, উনি ছিলেন এখানকার কোন্ ইস্কুলের মাস্টার। এখন চাকরি নেই। রান্নাঘরের পাশে ওই চালাটায় থাকেন।

একলা থাকেন, না সপরিপারে?

না। ওঁর সবাই ছিল, যখন উপার্জন ছিল। তারপর বড় মেয়েটি কোথায় চলে যায়, স্ত্রী তা'র জন্যে আত্মহত্যা করেন। ছেলে দুটি আছে মামার বাড়ী। ছোড়দা, বলতে পারো আর কত দিন এমনি ক'রে বাঁচতে হবে? এ যুদ্ধ কি কোন দিন থামবে না?

উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত, সান্ত্বনা দেবারও কিছু ছিল না। চেয়ে দেখলুম শোভনার দিকে। চোখের নীচে তার কালো কালো দাগ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও বিবর্ণ, সরু সরু হাত দুখানা শির-ওঠা, রক্তহীন ও স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্বাঙ্গে, যেন দেশজোড়া এই দুর্ভিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখেচোখে সে মেখে রয়েছে। তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মদ্রোহিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম। সেদিনকার শান্ত ও চরিত্রবতী শোভনা—আমার ছোট বোন—আজ যেন অসন্তুষ্ট অগ্নিশিখার মতো লক্‌লকে হয়ে উঠেছে। আমার কোন সান্ত্বনা, কোন উপদেশ শোনবার জন্য সে আর প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমার অপরিতৃপ্ত কৌতূহল আমাকে কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে দিল না। এক সময়ে বললুম, শোভা, এটা ত' মানিস, সামনে আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধ্বংসের চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টি*কে থাকতেই হবে। যেমন করেই হোক নিজেদের মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে—

মান-সম্ভ্রম?—শোভনা যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো—কোথায় মান-সম্ভ্রম, ছোড়দা? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুম সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক্ হয়ে গেলুম! কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড়? কোন্ মিথ্যাবাদী রটিয়েছে, আমাদের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না? ছোড়দা, তুমি কি বলতে চাও, যদি তিল তিল করে না খেয়ে মরি, যদি পোড়া পেটের জ্বালায় ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আত্মহত্যা করি, যদি তোমার মা-বোনের উপবাসী

বাসি মড়া ঘর থেকে মুদ্দোফরাসে টেনে বা'র করে, সেদিন কি তোমাদেরই মান-সম্ভ্রম বাঁচবে ? যারা আমাদের বাঁচতে দিলে না, যারা মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমাদের মারলে, যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে-চুষে খেলে তাদের কি মান-সম্ভ্রম পৃথিবীর ভদ্রসমাজে কোথাও বাড়লো ? যাও, খোঁজ নাও, ছোড়দা, ঘরে-ঘরে গিয়ে। কাঙ্গালীদের কথা ছাড়ো, গেরস্থ বাড়ীতে ঢুকে দেখে এসো। কত মায়ের বত্রিশ নাড়ী জলে-পুড়ে গেল দুটি ভাতের জন্যে, কত দিদিমা-পিসিমা-খুড়িমা-বোন-বৌদিদিরা আড়ালে বসে চোখের জল ফেলছে একখানি কাপড়ের জন্যে। অন্ধকারে গামছা আর ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে কত মেয়ে-পুরুষের দিন কাটছে, জানো ? বাসি আমানি নুন গুলে খেয়ে কত লাজুক মেয়ে প্রাণধারণ করছে, শুনেছ ? মান-সম্ভ্রম নিজের কাছেই কি রইলো কিছু, ছোড়দা ?

সপ্রতিভ লজ্জাবতী নিরীহ শোভনাকে এতকাল দেখে এসেছি। তার এই মুখর উত্তেজনায় আমার যেন মাথা হেঁট হয়ে এলো। আমি বললুম, কিন্তু কন্‌ট্রোলের দোকানে অল্প দামে চাল-কাপড় এসব পাওয়া যাচ্ছে—তোমরা তার কোনো সুবিধে পাও না ?

শোভনা আমার মুখের দিকে একবার তাকালো। দেখতে দেখতে তার গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো একপ্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এলো। শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেটে উঠলো। শোভনা হা হা হা ক'রে হাসতে লাগলো। সে-হাসি বীভৎস, উন্মত্ত, নির্লজ্জ এবং অপমানজনকও বটে। আমার নির্বোধ কৌতূহল শুদ্ধ হয়ে গেল।

পিসিমার কাছে মার খেয়ে মীনু ও হারু এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। হঠাৎ তাদের দিকে চেয়ে শোভনা চেঁচিয়ে বললে, কেন, কাঁদছিস কেন, শুনি ? দূর হয়ে যা সামনে থেকে—

বিনোদবালা যেন কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, দিদি, মাসি মেরেছে ওদের। ও-বাড়ীর হরিশবাবুর কাছ থেকে মীনু পয়সা এনেছিল কিনা—হারু কি যেন ব'লে ফেলেছিল তাই—

শোভনার মাথায় বোধ হয় আগুন ধ'রে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, মা ? কেন তুমি ওদের মারলে শুনি ?

পিসিমা কলতলার পাশ থেকে বললেন, মারবো না ? কলঙ্কের কথা নিয়ে দুজনে বলাবলি করছিল, তাই বেদম মেরেছি। বেশ করেছি।

কিন্তু ওদের মেয়ে কলঙ্ক ঘোচাতে তুমি পারবে ?

পিসিমা চীৎকার ক'রে উঠলেন, ভারি লম্বা লম্বা কথা হয়েছে তোর, শোভা। এত গায়ের জ্বালা তোর কিসের লা ? দিনরাত কেন তোর এত ফোঁসফোঁসানি ? কপাল পোড়ালি তুই, মান খোয়ালি, সে কি আমার দোষ ? পেটের ছেলে-মেয়েকে আমি মারবো, খুন করবো, যা খুশি তাই করবো—তুই বলবার কে ?

শোভনা গর্জন ক'রে বললে, পেটের মেয়েরা যে তোমার পেটে অন্ন যোগাচ্ছে, তার জন্যে লজ্জা নেই তোমার ? মেরে মেরে মীনুটার গায়ে দাগ করলে—তোমার কী আক্কেল ? একেই ত' ওর ওই চেহারা, এর পর ঘর-খরচ চলবে কোত্থেকে ? লজ্জা নেই তোমার ?

তবে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো, শোভা—এই বলে পিসিমা এগিয়ে এলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, নলিনাক্ষ আছে তাই চুপ করে ছিলুম। বলি, ফরিদপুরের বাড়িতে ব'সে বিনোদবালার ঠিকানা কে জোগাড় ক'রেছিল ? গাড়িভাড়া কা'র কাছে নিয়েছিলি তুই ?

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে শোভনা বললে, তাহলে আমিও বলি ? মাস্টারকে কে এনে ঢুকিয়েছিল এই বাসায় ? হরিশ-যোগেনদের কাছে কে পাঠিয়েছিল মীনুকে ? আমাকে কেরাণীবাগানের বাসায় কে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল ? উত্তর দাও ? জবাব দাও ? হোটেলের পাঁউরুটি আর হাড়ের টুকরো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি হারুকে ? ন্টু বাড়ি আসা ছাড়লো কার জন্যে ?

মুখ সামলে কথা বলিস, শোভা ?

এমন সময়ে বিনোদবালা মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ঝগড়া মিটাবার জন্য। মারমুখী মা ও মেয়ের এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বললুম, পিসিমা, আপনি স্নান করতে যান। শোভা, তুই চুপ কর্, ভাই। এরকম অবস্থার জন্যে কা'র দোষ দিবি বল্ ? তোর, আমার, পিসিমার, হারু-মীনুর,—এমন কি ওই বিনোদবালা, মাস্টারমশাই, হরিশের দলেরও কোন দোষ নেই ! কিন্তু অপরাধ যাদের, তা'রা আমাদের নাগালের বাইরে, শোভা ! যাকগে, আমি এখন যাই, আবার এক সময়ে আসবো।

শোভনা কেঁদে বললে, আর তুমি এসো না ছোড়দা !

আমি একবার হাসবার চেষ্টা করলুম। বললুম, পাগল কোথাকার !

পিসিমা বললেন, এত গোলমালে তোমার কিছু খাওয়া হোলো না বাবা নলিনাক্ষ। কিছু মনে ক'রো না।

বিনোদবালা বললে, চলো, ঢের হয়েছে! এবার নেয়ে-খেয়ে তৈরী হও দিকি? গলাবাজি করলে ত' আর পেট ভরবে না। পেটটা যাতে ভরে তার চেষ্টা করো। আমি কি আগে জানতুম তোমরা ভদ্দরলোকের ঘর, তাহলে এমন ঝকমারি কাজে হাত দিতুম না!

অপমানিত মুখে পলকের জন্য বিনোদবালার দিকে চোখ তুলে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গলোকের কদর্য-কলুষ রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালুম রাজপথের উপর দিগন্ত-জোড়া মুমূর্ষুর আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভালো, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকলেও কেমন একটা দয়াহীন সকরুণ ঔদাসীন্যে এদের এড়ানো চলে। কিন্তু যেখানে চিত্ত-দারিদ্র্যের অশুচিতা, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসীর মর্মান্তিক অন্তর্দাহ, যেখানে কেবল নিরুপায় দুর্নীতির গুহার মধ্যে ব'সে উৎপীড়িত মানবাত্মা অবমাননার অন্ন লেহন করছে, সেই সংহত বীভৎসতার চেহারা দেখলে আতঙ্কে গলা বুজে আসে।

কিন্তু এরা কে? সেই ফরিদপুরের ছোট বাড়িটিতে ফুলের চারা আর শাকসব্জী দিয়ে ঘেরা ঘরকন্নার মধ্যে আচারশীলা মাতৃরূপিণী পিসিমা, লাজুক একটি সদ্য-ফোটা ফুলের মত কুমারী ভগ্নী শোভনা, চাঁপার কলির মত নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হারু, নুটু, মীনু—এরা কি সেই তা'রা? কেন একটি সুখী পরিবার ধীরে ধীরে এমন সমাজ-নীতিভ্রষ্ট হোলো? কেন তাদের মৃত্যুর আগে তাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটলো এমন ক'রে? কোন্ দয়াহীন দস্যুতা এর জন্যে দায়ী?

এই কয়মাসের মাসোহারার টাকাটা আমি অনায়াসে খরচ করতে পারি বৈকি। অন্তত দিল্লী যাবার আগে ওদের এই অবস্থায় রেখে চুপ ক'রে চলে যেতে পারিনে। সুতরাং অপরাহ্ণকালটা নানা দোকানে ঘুরে-ঘুরে কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা গেল। শতকরা দশগুণ বেশী দামে চাল এবং পাঁচগুণ বেশী দামে আর সব খাবার জিনিসপত্র এখান ওখান থেকে কিনতে লাগলুম। কিনতে কিনতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেটা মাত্র এই বিগত শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ, টিপ

টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। স্বল্পালোক কলকাতার পথঘাট পেরিয়ে একখানা গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে চললুম আবার শোভনাদের ওখানে। নিজের বদান্যতায় কোনো গৌরব বোধ করছিনে, বরং সমস্ত খাদ্যসামগ্রীগুলোকে ঘৃণ্য মনে হচ্ছে। খাদ্য আজ জীবনের সকল প্রশ্নকে ছাপিয়ে উঠেছে বলেই হয়ত খাদ্যের প্রতি এত ঘৃণা এসেছে। এসব পদার্থ আগে ছিল ভদ্রজীবনের নীচের তলাকার লুকানো আশ্রয়, সেটার কোনো আভিজাত্য ছিল না—আজ সেটা যেন মাথার ওপর চ'ড়ে বসে আপন জাতিচ্যুতির আক্রোশটা সকলের ওপর মিটিয়ে নিচ্ছে!

তবু দুর্গম পথঘাট পেরিয়ে সেগুলো নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম বৌবাজারের বাড়ির দরজায়। বহু পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ব্যয় ক'রে দু-তিনজন লোকের সাহায্যে সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলুম সেই সরু আনাগোনার পথের এক ধারে। মাস তিনেকের মত খাদ্যসম্ভার কিনে এনেছিলুম। জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করলুম।

ভিতর দিকে কোথায় যেন একটা কেরোসিনের ল্যাম্প্ জ্বলছিল, তারই একটা আভা এসে পড়েছিল আমার গায়ে। কলতলার ওপাশ থেকে শোনা গেল, নারী-কণ্ঠের সঙ্গে ইস্কুল-মাস্টারের কথালাপের আওয়াজ জড়ানো। তা ছাড়া নীচের তলাটা নিঃসাড়—মৃত্যুপুরীর মতো।

আমি কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গেলুম। ডাকলুম, মীনু? হারু?

কোনো সাড়া নেই। যে ঘরখানায় দুপুরবেলায় আমি বসেছিলুম, সে ঘরখানা ভিতর থেকে বন্ধ। বুঝতে পারা গেল, ক্লান্ত হয়ে পিসিমারা সবাই ঘুমিয়েছে। আবার আমি ডাকলুম, মীনু, ও হারু?

বোধ করি বাইরের থেকে আমার গলার আওয়াজটা ঠিক বোধগম্য হয়নি, ঘরের ভিতর থেকে শোভনা সাড়া দিয়ে বললে, দিনরাত এত আনাগোনা কেন গা তোমার? মীনু ও-বাড়িতে গেছে, আজ তাকে পাবে না, যাও। হতভাগা, চামার!

আমি বললুম, শোভা, আমি রে, আর কেউ নয়, আমি—ছোড়দা। দরজাটা খোল দেখি?

ছোড়দা?—শোভনা তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে ব'সে পড়লো। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললে, ছোড়দা, পেটের জ্বালায় আমরা

নরককুণ্ডে নেমে এসেছি! তুমি আমাকে মাপ করো, তোমার গলা আমি চিনতে পারিনি।

শোভনার হাত ধ'রে আমি তুললম। বললুম, কাঁদিসনে, চুপ কর্। তোরা ত' একা নয় ভাই, লক্ষ লক্ষ পরিবার এমনি করে মরতে বসেছে। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না, এমনি করেই এই অবস্থাকে পেরিয়ে যেতে হবে, শোভা। শোন্, কালকেই আমি দিল্লী যাবো, তাই তাড়াতাড়িতে তোদের জন্যে চারটি চাল-ডাল কিনে আনলুম—ওগুলো তুলে রাখ্।

চাল-ডাল এনেছ? দুর্বল শরীরের উত্তেজনায় শোভনা যেন শিউরে উঠলো। যেন ভাবী ক্ষুধাতৃপ্তির কল্পনায় কেমন একটা বিকৃত উগ্র ও অসহ্য উল্লাস তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কাঁপতে লাগলো। রুদ্ধশ্বাসে সে বললে, তুমি বাঁচালে—তুমি বাঁচালে, ছোড়দা! তোমার দেনা আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবো না!—এই ব'লে আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে আমার চিরদিনকার আদরের ভগ্নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বললাম, ওর সঙ্গে নতুন জামা-কাপড়ের একটা পুঁটলি রয়েছে, ওটা আগে তুলে রাখ্, শোভা।

শোভনা আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা নিয়ে এসে খাদ্যসামগ্রীর কাছে দাঁড়িয়ে একবার সব দেখলো। তারপর অসীম তৃপ্তির সঙ্গে কাপড়ের বস্তাটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চৌকীর নীচে রেখে এলো। বললে, ছোড়দা, মনে আছে, কোরা জামা-কাপড় পরে লোকের সামনে এসে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে কী লজ্জার কথা ছিল? দোকান থেকে চাল-ডাল এলে লুকিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতুম—পাছে কেউ ভাবে, চাল কেনার আগে আমাদের বুঝি খাবার কিছু ছিল না! মনে আছে ছোড়দা?

হেসে বললাম, সব মনে আছে রে।

শোভনা করুণকণ্ঠে বললে, তুমি বলতে পারো ছোড়দা, এ দুর্ভিক্ষ কবে শেষ হবে? সবাই যে বলছে, নতুন ধান উঠলে আমাদের আর উপোস করতে হবে না?

তার আর্তকণ্ঠ শুনে আমি চুপ করে রইলুম। কারণ, সরকারী চাকর হলেও ভিতরের খবর আমার কিছুই জানা ছিল না। শোভনা পুনরায় বললে, ফরিদপুরের সেই মস্ত মাঠ তোমার মনে আছে, ছোড়দা? ভাবো ত, সেই মাঠে

আমনের সোনার শীষ পেকেছে, হাওয়ায় তারা ঢেউ খেলছে আনন্দে, মাঠে মাঠে চাষার দল গান গেয়ে কাটছে সেই ধান,—সেই লক্ষ্মীকে ভারে ভারে তারা ঘরে তুলে আনছে! মনে পড়ে?

শোভনার স্বপ্নময় দুটি চোখ হয়ত সেই সোনার বাঙলার মাঠে মাঠে একবার ঘুরে এলো, কিন্তু আমি কেরোসিন ডিবের আলোয় এই নরককুণ্ড ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। কেবল নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, মনে পড়ে বৈকি!

কিন্তু এ কি শুনছি ছোড়দা? শোভনা আমার মুখের দিকে আবার ফিরে তাকালো। সভয়ে চক্ষু তুলে সে পুনরায় বললে, গোছা গোছা কাগজ বিলিয়ে আবার নাকি ওরা শুষে নিয়ে যাবে সেই আমাদের ভাঙা বুকের রক্ত? নবান্নর পর আবার নাকি ভরে যাবে আমাদের ঘর কাঙালীর কান্নায়? বলতে পারো, তুমি?

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, সহসা বাইরে কা'র পায়ের শব্দ পেয়ে শোভনা সচকিত আতঙ্কে অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালো। তারপর কম্পিত অধীরকণ্ঠে সে বললে, ছোড়দা, এবার তুমি যাও, তোমার অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় ন'টা—আমার মনে ছিল না, নিশ্চয় ন'টা বেজেছে। এবার তুমি যাও, ছোড়দা!

এগুলো তুলে রাখ্‌ আগে সবাই মিলে?

রাখবো, ঠিক রাখবো—একটি একটি চাল-ডালের দানা গুনে গুনে রাখবো —কিন্তু এবার তুমি যাও, ছোড়দা। আলো ধরছি···তুমি যাও, একটুও দেরী ক'রো না···লক্ষ্মীটি ছোড়দা···

শোভনা চঞ্চল অস্থির উদ্দাম হয়ে এসে আমাকে যখন একপ্রকার টেনে নিয়ে যাবে, সেই সময় একটি লোক চাল-ডালের বস্তার ওপর হোঁচট খেয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। একেবারে গায়ের উপর এসে প'ড়ে বললে, ওঃ, নতুন লোক দেখছি। চাল-ডাল এনে একেবারে নগদ কারবার।

লোকটার পরণে একটা খাকি সার্ট, সর্বাঙ্গে কেমন একটা নেশার দুর্গন্ধ। আমি বললুম, কে তুমি?

আমি কারখানার ভূত, স্যার।—এই ব'লে হঠাৎ শোভনার একটা হাত ধরে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে বললে, এসো, কথা আছে।

কথা কিচ্ছু নেই, ছাড়ো। ব'লে শোভনা তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

বটে!—লোকটি ভুরু বাঁকিয়ে বললে, আগাম একটা টাকা দিইনি কাল?

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা বললে, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে?

বাঃ—বেরিয়ে যাবো ব'লে বুঝি এলুম দেড় মাইল হেঁটে? বেশ কথা বলে পাগ্‌লি!

চীৎকার ক'রে শোভনা বললে, বেরোও বলছি শিগগির? চলে যাও—দূর হয়ে যাও ঘর থেকে—

লোকটা বোধ হয় তক্তাখানার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। হেসে বললে, আজ বুঝি আবার খেয়াল উঠলো?

শোভনা আর্তনাদ ক'রে উঠলো—ছোড়দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছ তুমি? এ অপমানের কি কোনো প্রতিকার নেই?······দাঁড়াও, আজ খুন করবো—বঁটিখানা ·····

বলতে বলতে ছুটে সে বেরুলো—রান্নাঘরের দিকে চললো। লোকটা এবার উঠে বাইরে এলো। বললে, মশাই, এই নিয়ে মেয়েটা আমাকে অনেকবারই খুন করতে এলো, বুঝলেন? আসলে মেয়েটা মন্দ নয়, কিন্তু ভারি খেয়ালী! তবে কি জানেন স্যার, আমরা হচ্ছি 'এসেন্‌সিয়াল্‌ সার্ভিসের' লোক, যুদ্ধের কারখানায় লোহা-লক্কড় নিয়ে কাজ করি—মেয়েমানুষের মেজাজ-টেজাজ অত বুঝিনে! এসব জানে ওই 'আই-ই' মার্কা লোকগুলো, ওরা নানারকম ভাঁড়ামি করতে পারে!

এমন সময় উন্মাদিনীর মতন একখানা বঁটি হাতে নিয়ে শোভনা ছুটে বেরিয়ে এলো। পিসিমা ধড়মড়িয়ে এলেন, হারু ছুটে এলো। লোকটি শান্তকণ্ঠে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর খুন করতে হবে না, দেখছি আজ খেয়ালের ভূত চেপেছে ঘাড়ে। আচ্ছা—এই যাচ্ছি স'রে।

বিনোদবালা আর পিসিমা দৌড়ে এসে ধ'রে ফেললেন শোভনাকে।

লোকটি পুনরায় নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললে, বেশ, সেই ভালো। বিনোদের ঘরে রইলুম এ-রাত্তিরটার মতন। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে আমাকে নিশ্চয় ডেকে ঘরে নিয়ো, নৈলে কিছুতেই আমার ঘুম হবে না, বলে রাখলুম।—আচ্ছা, বেশ, কাল না হয় আড়াই সের চাল'ই দেওয়া যাবে। আয় বিনোদ, তোর ঘরে যাই। বলতে বলতে বিনোদের হাতখানা টেনে নিয়ে সেই কদাকার লোকটা ইস্কুল-মাস্টারের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

শোভনা সহসা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললে, কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি ব'লে যাও। তুমি ব'লে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে, আমাদের মৃত্যুর আর কতদিন বাকি ?

আস্তে আস্তে আমি পা ছাড়িয়ে নিলুম। শোভনার হৃৎপিণ্ড থেকে আবার রক্ত উঠে এলো। বললে, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যদি কেউ মানুষ থাকে, তাদের ব'লো এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি···

শোভনা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক। আমি অসাড় ও অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলুম। অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু অন্ধকার, অনন্ত অন্ধকার। কেবল মনে হোলো, অঙ্গারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাশ্রান্ত কাঙ্গালীরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে-ঘাটে নালা-নর্দমায় শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে !

। অঙ্গার ।

কেবল কেশবের নয়, এ রকম অবস্থা আরও অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু-তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে থান কয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।

বছর খানেক আগেও কেশব ভাল ছেলে খুঁজেছে নগদ গহনা জামা-কাপড় আর তৈজসপত্র সমেত শৈলকে দান করার জন্য। মেয়েকে যথাশাস্ত্র, যথাধর্ম, যথারীতি দান করতে সে সবস্বান্ত হতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সর্বস্ব খুব বেশি না হওয়ায় যেমন-তেমন চলনসই গ্রহীতাও জোটে নি। শৈলর রূপও আবার এদিকে চলনসই। অথচ বেশ সে বাড়ন্ত মেয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে কখন নিজের, স্ত্রীর, অন্য কয়েকটি ছেলে-মেয়ের এবং ঐ শৈলর পেটের অন্ন—এক পেটা, আধ পেটা, সিকি পেটা অন্ন—জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, ভাল করে বুঝবার অবকাশও কেশব পায়নি। বড় ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল, ছেলেটা চাকরি করত স্কুলে তেতাল্লিশ টাকার মাস্টারি। ছেলেটা মরেছে এক বিশেষ ধরণের বিস্ময়কর ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যে একশো ছয় ডিগ্রিতে ওঠে আর ভরিখানেক সোনার দামে যতটুকু গা-ফোঁড়া ওষুধ মেলে তা যথেষ্ট না হওয়ায় পাঁচ দিনের মধ্যে জোয়ান একটা ছেলে মরে যায় এমন ম্যালেরিয়ার গুণটাই শুধু কেশবের শোনা ছিল।

আর একটা মেয়েও কেশবের মরেছে, সাধারণ ম্যালেরিয়ায়। এ ম্যালেরিয়া কেশবের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া শত্রু। এর অস্ত্র কুইনিনের সঙ্গেও তার পরিচয় অনেক দিনের। হরি হরি, মেয়েটার যখন এমনি কুইনিন গেলার ক্ষমতা ছিল না, জলে গুলে কুইনিন দিতে গিয়ে ময়দার আঠা তৈরি হয়ে গেল।

সদয় ডাক্তার বলল, "পাগল, ও খুব ভাল কুইনিন। নতুন ধরণের কুইনিন—খুবই এফেক্‌টিভ। নইলে দাম বেশি নিই কথনো আপনার কাছে?

মেয়েটা মরে যাওয়ার পর সদয় ডাক্তার রাগ করেছিল। হাকিমের রায় দেওয়ার মতো শাসনভরা নিন্দার সুরে বলেছিল, "আপনারাই মারলেন ওকে। কুইনিন? শুধু কুইনিনে কখনো জ্বর সারে? পথ্য চাই না? পথ্য না দিয়ে মারলেন মেয়েটাকে, শুধু পথ্য না দিয়ে।"

শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোট বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও শৈলর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সেজন্য কেশবের মনে কোন আপসোস নেই। সে বরং ভাবে সে মেয়েটা মরে বেঁচেছে।

শৈলকে কিনল কালাচাঁদ।

কালাচাঁদের মুখ বড় মিষ্টি। বড়ই মধুর ও পবিত্র তার কথা। মুখখানা তার ফরসা ও ফ্যাকাসে। ছোট ছোট চোখে স্তিমিত নিস্তেজ নিষ্কাম দৃষ্টি। রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্যন্ত ধামিক বিভীষণ বরাবর যে দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতে মেয়েদের দেখে থাকে। এটুকু ছাড়া অবশ্য বিভীষণের সঙ্গে কালাচাঁদের তুলনা চলে না। বছর পাঁচেক আগে কালাচাঁদের দাদা কিভাবে মারা যায়। দাদার দু'নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটীকে স্নেহ করা দূরে থাক কালাচাঁদ তাকে জোর-জবরদস্তি করে একটা বাড়ীর বাড়ীউলি করে দিয়েছিল। সেটি কালাচাঁদের পারিবারিক বাড়ী নয়, অনেক তফাতে ভিন্ন একটি ভাড়াটে বাড়ী। সে বাড়ীতে তখন দশ বারটি মেয়ে বাস করত।

তার পাশের বাড়ীটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়েছে। দু'বাড়ীতে তখন মেয়ের সংখ্যা সতের-আঠার। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ীর কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। উদর রীতিমতো মোটা। ধপধপে আধা-হাতা সেমিজের উপর ধপধপে থান পরলে তাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দেবীর মতো দেখায়।

দুর্ভিক্ষে শহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফঃস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ ওদিক ঘুরছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কি আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায়? তা ছাড়া, উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভাল খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না প্রতি সন্ধ্যায় রূপ সৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম প্রথম কিছু দিন অন্যে তৈরি করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখভুলান রূপসৃষ্টির স্থূল রঙিন কুলেপ কায়দা।

প্রায়-কীর্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আফসোস করে কালাচাঁদ, বলে 'আহা চুক চুক! আপনার অদেষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায়!'

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নেমে আসবে কালাচাঁদ তা আশা করে না, কিন্তু চোখ দু'টি একটু ছল ছল পর্যন্ত করল না! দেখে সে একটু আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কি যেন হয়েছে দেশশুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটু সাড়াও জাগায় না। আগে হলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্তী ছেলেমেয়েদের শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, চোখ মুছতে মুছতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত, ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করত সমবেদনাকে জাগিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে। আজ ওসব যেন তার চুলোয় গিয়েছে।

শহরের আস্তানা থেকে অনেক গাঁয়ে কালাচাঁদ আসা-যাওয়া করেছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখেছে। কিন্তু গাঁয়ে বসে দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হতে দেখেনি; নিজে ঘা খায়নি। সে কেন কেশবের নির্বিকার ভাবের মানে বুঝতে পারবে!

কালাচাঁদ কিছু চাল-ডাল মাছ-তরকারি এনেছিল—একবেলার মতো। এরা অবশ্য দুবেলা তিন-বেলা চালিয়ে দেবে। তা দিক। সে শুধু জিভে একটু স্বাদ দিয়ে পেট একটু শান্ত করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে চায়, পাগল করে দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়ীও এনেছে। কাপড়খানা পরে তার সামনে এসেছে শৈলর মা। শৈলর সেমিজটা প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে এক সময়।

'শৈলিকে নিয়ে যাবে? চিকিচ্ছে করাবে?'

'আজ্ঞে হাঁ'

'বড় কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।'

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কাণাঘুষা কেশবের কানেও এসেছিল। সে চাপা আর্তকণ্ঠে বলে, 'তোমার বাড়িতে রাখবে শৈলিকে, বাড়ীতে রাখবে তোমার?'

'বাড়ীতে নয় তো কোথা রাখবো চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব রাজি হয়ে বলে, 'একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল

শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোট বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও শৈলর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সেজন্য কেশবের মনে কোন আপসোস নেই। সে বরং ভাবে সে মেয়েটা মরে বেঁচেছে।

শৈলকে কিনল কালাচাঁদ।

কালাচাঁদের মুখ বড় মিষ্টি। বড়ই মধুর ও পবিত্র তার কথা। মুখখানা তার ফরসা ও ফ্যাকাসে। ছোট ছোট চোখে স্তিমিত নিস্তেজ নিষ্কাম দৃষ্টি। রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্যন্ত ধার্মিক বিভীষণ বরাবর যে দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতে মেয়েদের দেখে থাকে। এটুকু ছাড়া অবশ্য বিভীষণের সঙ্গে কালাচাঁদের তুলনা চলে না। বছর পাঁচেক আগে কালাচাঁদের দাদা কিভাবে মারা যায়। দাদার দু'নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটাকে স্নেহ করা দূরে থাক কালাচাঁদ তাকে জোর-জবরদস্তি করে একটা বাড়ীর বাড়ীউলি করে দিয়েছিল। সেটি কালাচাঁদের পারিবারিক বাড়ী নয়, অনেক তফাতে ভিন্ন একটি ভাড়াটে বাড়ী। সে বাড়ীতে তখন দশ বারটি মেয়ে বাস করত।

তার পাশের বাড়ীটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়েছে। দু'বাড়ীতে তখন মেয়ের সংখ্যা সতের-আঠার। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ীর কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। উদর রীতিমতো মোটা। ধপধপে আধা-হাতা সেমিজের উপর ধপধপে থান পরলে তাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দেবীর মতো দেখায়।

দুর্ভিক্ষে শহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফঃস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ ওদিক ঘুরছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কি আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায়? তা ছাড়া, উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভাল খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না প্রতি সন্ধ্যায় রূপ সৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম প্রথম কিছু দিন অঙ্গে তৈরি করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখভুলান রূপসৃষ্টির স্থূল রঙিন ফুলেল কায়দা।

প্রায়-কীর্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আফসোস করে কালাচাঁদ, বলে 'আহা চুক চুক! আপনার অদেষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায়!'

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নেমে আসবে কালাচাঁদ তা আশা করে না, কিন্তু চোখ দু'টি একটু ছল ছল পর্যন্ত করল না! দেখে সে একটু আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কি যেন হয়েছে দেশশুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটু সাড়াও জাগায় না। আগে হলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্তী ছেলেমেয়েদের শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, চোখ মুছতে মুছতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত, ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করত সমবেদনাকে জাগিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে। আজ ওসব যেন তার চুলোয় গিয়েছে।

শহরের আস্তানা থেকে অনেক গাঁয়ে কালাচাঁদ আসা-যাওয়া করেছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখেছে। কিন্তু গাঁয়ে বসে দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হতে দেখেনি; নিজে ঘা খায়নি। সে কেন কেশবের নির্বিকার ভাবের মানে বুঝতে পারবে!

কালাচাঁদ কিছু চাল-ডাল মাছ-তরকারি এনেছিল—একবেলার মতো। এরা অবশ্য দুবেলা তিন-বেলা চালিয়ে দেবে। তা দিক। সে শুধু জিভে একটু স্বাদ দিয়ে পেট একটু শান্ত করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে চায়, পাগল করে দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়ীও এনেছে। কাপড়খানা পরে তার সামনে এসেছে শৈলর মা। শৈলর সেমিজটা প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে এক সময়।

'শৈলিকে নিয়ে যাবে? চিকিচ্ছে করাবে?'

'আজ্ঞে হাঁ'

'বড় কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।'

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কাণাঘুষা কেশবের কানেও এসেছিল। সে চাপা আর্তকণ্ঠে বলে, 'তোমার বাড়িতে রাখবে শৈলিকে, বাড়ীতে রাখবে তোমার?'

'বাড়ীতে নয় তো কোথা রাখবো চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব রাজি হয়ে বলে, 'একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল

করুন বাবা, একটু ভেবে দেখি।' কালাচাঁদ খুশী হয়ে বলে, 'বুধবার আসব। একটু বেশি রাতেই আসব, গাড়ীতে সব নিয়ে আসব। কার মনে কি আছে বলা তো যায় না চক্কোত্তি মশায়, আপনি বরং বলবেন যে, শৈল মামাবাড়ী গেছে।' কেশব চোখ বুজে বলে, 'কেউ জানতে চাইবে না বাবা। কারো অত জানবার গরজ আর নেই। যদি বা জানে শৈলি নেই, ধরে নেবে মরে গেছে।'

শৈলকে দেখা যাচ্ছিল। এত রোগা যে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে। মনের গহন অন্ধকারে শৈশবের ভয় নড়াচাড়া করে ওঠায় কালাচাঁদ একটু শিহরে ওঠে। সারা দেশটায় বড় সস্তা আর সহজ হয়ে গিয়েছে মানুষের মরণ।

নিরুপায়, তবু ভাবতে হয়। ভাববার ক্ষমতা নেই; তবু ভাবতে হয়। উদরের ভোঁতা বেদনা কুয়াশার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে, কী করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে! ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিম ঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রি হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দু'জন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারেনি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশও তার পরিবারের ঝড়তি-পড়তি মানুষ ক'টাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

তাছাড়া ওরা কেউ বামুন নয়। ঠিক কেশবের মতো ভদ্রও নয়। শূদ্রজাতীয় সাধারণ গেরস্ত মানুষ, ওরা যা পেরেছে কেশবের কি তা পারা উচিত? বুকটা ধড়ফড় করে কেশবের। তার মৃতদেহের নাড়ী সচল হয়। তালাধরা কানে শঙ্খঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি-ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পচা মড়ার স্মৃতিভ্রষ্ট নাকে ফুলচন্দনের গন্ধ লাগে। বন্ধ করা চোখের সামনে এলো-মেলো উল্টাপাল্টাভাবে ভেসে আসে ছানলাতলা, যজ্ঞাগ্নি, দানসামগ্রী, চেলিপড়া শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা। মনে পড়তে থাকে সে শৈলর বাপ!

কচুশাক দিয়ে ফ্যানভাত দু'টি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখে সারি সারি কলাপাতা দেওয়ার জন্য আল্‌গা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কড়াইভরা অন্নব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মতো টেনে নিয়ে দ্রুত উপে যায়। কে কার বাপ, সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলর মা বিনায়, কাঁদে না। ঝিমায় আর গুনগুনানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায়; তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী! মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর!

শৈলর রসকস শুকিয়ে গিয়েছে। মনে তার দুঃখবেদনা, মান অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নেই। কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে। প্যাঁচড়া চুলকিয়ে সুখ পায় না; রক্ত বার করলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেট-মোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠে দুপুরে মেঘলা করে, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখেভাতে কেশব চক্রবর্তীর বাড়ীশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ সানাইওলা, তার সঙ্গী, তার ছেলে-মেয়ে আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের বিয়ে পৈতে মুখেভাতে চিরকাল সানাই বাজিয়ে এসেছে। তার অবর্তমানে সদয়কে সানাইওয়ালা আনতে হয়েছে সদর থেকে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ রেখে কোনমতে বাড়ী এসে কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলিয়ে পড়ল। পেট ভরে খেলে যে মানুষের এরকম দম আটকে মরণদশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পেল প্রথম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমনিভাবে অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে রইল, যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমাচ্ছে। পথে একবার এবং বাড়ীতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হল অনেকটা স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সে-ই কাছে বসে তার পেটে খালি হাত মালিশ করে দিতে লাগল। বাড়ীতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমতে রাত হয়ে গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায় টনটন করছে। কালাচাঁদ এল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ার খানিক তফাতে নির্জনে গাড়ী রেখে সে একজন লোক সঙ্গে করে এসেছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হচ্ছিল অনেক দূরে সদয় ডাক্তারের বাড়ীতে যেন তখনো অস্পষ্ট সুরে সানাই বাজছে।

কেশব কেঁদে বললে, 'ও বাবা কালাচাঁদ।'

'আজ্ঞে' ?

'এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব, আমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ?'

'এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না? বলুন তবে কী করব। মালপত্র গাড়ীতে আছে। তিন বস্তা চাল—'

কেশব চুপ করে থাকে। টর্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখে নেয়। চোখ দেখে নেয়। চোখ-ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর মতো কেশবের জলভরা চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করে কালাচাঁদ বলে, 'চটপট করাই ভাল। এই কাপড়-জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই, চক্কোত্তি মশায় ?'

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয়, না, বারণ করে অস্পষ্ট বুঝা যায় না। শৈলর মা আর একটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেয়. 'মালগুলো সব আন্‌গে যা বস্তি ওদের নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়ীতে বসে থাকে।'

মেঝে লক্ষ্য করে কালাচাঁদ টর্চটা জ্বেলে রাখে। অন্ধকারে তার গা ছম্ ছম্ করছিল। বিচ্ছুরিত আলোয় ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় স্তব্ধতার থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হয়ে বসেছে, তার হাতে শৈলর জন্য আনা রঙিন শাড়ী, সায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শৈল।

'একটা তবে অনুমতি কর বাবা।'

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

'বলুন।'

'শৈলিকে তুমি বিয়ে করে নিয়ে যাও।'

'বিয়ে? আপনি পাগল নাকি ?'

শৈলর হাতে জামা-কাপড় দিয়ে কেশব গিয়ে কালাচাঁদের হাত ধরে। মিনতি করে বলে যে বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য।

'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সপে দেব। তারপর

ওকে নিয়ে তুমি যা খুশী কোরো, সে তোমার ধম্মো। আমার ধম্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।'

দুজন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য এসে পড়েছিল। গাঁ উজাড় হয়ে যাক, তবু বেশি লোক সঙ্গে না করে মাঝ রাত্রে গাঁয়ের একটা মেয়েকে নিতে আসবার মতো বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পেয়ে তাকে কেটে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ।

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে সে বলল, 'যা করবার করুন চটপট্।'

কালাচাঁদের কাছ থেকেই দেশলাই চেয়ে নিয়ে কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটা জ্বালল। ঘরের বাইরে জ্যোৎস্নায় গিয়ে শৈল নতুন ও রঙিন সায়া ব্লাউজ শাড়ী পরে এল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যাদানের প্রক্রিয়ার সমস্তক্ষণ শৈলর বার বার মনে হতে লাগল প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করলে বাপের পেট-ব্যথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমে যেত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পেত না পেটের ব্যথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলর হাত একত্র করে কেশব বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে করতে তাগিদ দেয়, 'শীগগির করুন।' ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানত না। ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে ঐ সব ইয়াকি-ফাজলামি তার ভাল লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হয়ে পড়তে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুলপাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফঃস্বলে পুঞ্জীভূত মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করে দিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গালি দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়োর এ পাগলামিতে রাজি না হওয়াই উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবে যাওয়ামাত্র কালাচাঁদ হাত টেনে নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

কালাচাঁদের গা-ও ঘেমে গিয়েছিল। রুমালে মুখ মুছে শক্ত করে শৈলর হাত ধরে টানতে টানতে সে বার হয়ে গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না।

দোকানীর কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোন পক্ষই বিদায় নেয় না বলে অবশ্য নয়, কালাচাঁদের ভাল লাগছিল না। শৈলও থ ব'নে গিয়েছিল।

শিউলি-জবা গাছের মাঝ দিয়ে বাড়ীর সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে এ-ভাবটা শৈলর কেটে গেল। সেইখানে প্রথম হাত টেনে প্রথমবার সে বলল, 'আমি যাব না।'

আরও কয়েকবার হাতটানা ও যাব না বলার পর জোরে কেঁদে উঠবার উপক্রম করায় তারই শাড়ীর আঁচলটা তার মুখে গুঁজে দিয়ে কালাচাঁদ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য হাল্কা রোগা শরীরে জোর এল অদ্ভুত রকমের। পরস্পর কয়েকবার রোমাঞ্চ আসার সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়ে সে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতে লাগল। মুখে গোঁজা আঁচল খসে খসে পড়লেও দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। তখন হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হয়ে গেল।

সব শুনে কালাচাঁদের মন্দোদরী গোসা করে বলল 'কী দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামায়? আর কি মেয়ে নেই পিথিমিতে?'

'কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।'

'ঝোঁক চেপে গেল! মাইরি? ওই একটা বোঁচানাকী কালো হাড়গিলেকে দেখে ঝোঁক চেপে গেল!'

'দুত্তোরি, সে ঝোঁক নাকি?'

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেক-কাল নমস্কার করেছে, আগা-মাথাহীন উদ্ভট সে জিনিস। শৈলর জন্য কালাচাঁদের মাথা-ব্যথা, আদরযত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হয়ে আসতে লাগল। সাদা থান ও সেমিজ পরা ভদ্রঘরের দেবীর মতো যে মন্দোদরী, তার চোখে দেখা দিল কুটিল কালো চাউনি।

শৈলকে দেখতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হাল্কা দামী ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেল।

শৈলর চেহারাটা তখন অনেকটা ফিরেছে।

'ওকে বাড়ী নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

'কেন?'

'মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে-করা বৌ। ঠাকুরের

সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ী নিয়ে যাই, এক কোণে পড়ে থাকবে দাসী-চাকরাণীর মতো।'

দু'জনে প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেল। বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত কলহ। কালাচাঁদ রাগ করে একটা মদের বোতল হাতে করে শৈলর ঘরে গিয়ে ভিতর থেকে খিল বন্ধ করে দিল।

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ী। স্ত্রীর সঙ্গে বাকি দিনটা বোঝাপড়া করে সন্ধ্যার পর গাড়ী নিয়ে শৈলকে আনতে গেল।

বাড়ীতে ঢুকতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'শৈলির ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।

'লোক আছে! আমার বিয়ে-করা-স্ত্রীর ঘরে—'

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুনতে আরম্ভ করল। গোনা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'লোকটা কে?'

'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।'

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করে সে আবার বলল, 'খেয়াল চেপেছে; ও আবার বেশী টাকা কি? গেঁয়ো কুমারী খুঁজেছিল।'

। শ্রেষ্ঠ গল্প ।

'যাই বাবু, আদাব।' কাঠের ছে দিচ্ছিল মোবারক, ঘাসের উপর ফেলে-রাখা জামাটা কাঁধের উপর তুলে নিল হঠাৎ।

'চললি এখুনি?'

'হাঁ, বাবু। বাড়ি যেতে-যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। লাশ-কাটা ঘর, চিতাখোলা, সব পথে পড়ে। বাবাজান বলে দিয়েছে আন্ধর না নামতেই যেন বাড়ি ফিরি। রাস্তাটা ভাল নয়।'

মোবারক উমেদার-পিওন। অল্প বয়স। দাঁড়িগোঁফের রেখা পড়েনি এখনো।

সেই মোবারকের অনেকদিনের আগেকার পুরানো কথাটা মনে পড়ল হঠাৎ, নালতাকুড়ের পথে এসে। বেড়াতে-বেড়াতে কতদূর চলে এসেছি খেয়াল করিনি। এব'র ফেরবার পথ ঠাহর করতে গিয়ে দেখি আঁধার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। জ্যালজেলে দিনের আলোর পর হঠাৎ আঁধারের ঠাসবুনন।

কেমন ভয় করতে লাগল। আজ হাটবার নয়, পথে জনমানুষ নেই। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে।

সামনেই চিতাখোলা। লাশ-কাটার ঘর। গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। দু'ধারে লটা ঘাস। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠতে লাগলুম।

বিশাল, বলিষ্ঠ একটা পাহাড়ে-গাছ ডাল-পালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছের থেকে নাকি ভূত নামে, হেঁটে বেড়ায়। মোলাকাৎ করে। কথা কয়।

হাতে টর্চ আছে। তাতে যেন বিশেষ ভরসা হল না। মনে হল, অন্য অস্ত্র কিছু নিয়ে এলে হত পকেটে।

ভাবছি এমনি, সামনেই তাকিয়ে দেখি ভূত। স্পষ্ট ভূত গাছ থেকে নেমে এসেছে কিনা কে জানে, কিন্তু দস্তুরমত হাঁটছে সমুখ দিয়ে। কিন্তু যেন হাঁটতে পারছে না। ঢ্যাঙা, লিকলিকে হাত-পা। আর, আগাগোড়া কালো, একরঙা। ঠাহর করতেই মনে হল, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আতঙ্কে গায়ের রক্ত শাদা হয়ে গেল।

টিপলুম টর্চ। আলোর সাড়া পেয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে ততখানি যেন শক্তি নেই। গাছ থেকে নেমে এসেছে একথা ভাবা যায় না। যেন নিজেই ভড়কে গেছে। হাঁটু মুড়ে পথের পাশে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল হঠাৎ।

এ নগ্নতাটা আতঙ্কের নয়, হাহাকারের। মৃত্যুর নয়, সর্বাপহরণের।

স্বচক্ষে ভূত দেখবার সুযোগ ছাড়া হবে না। যখন সে ভূত মিলিয়ে যায় না, গাছে ওঠে না, পথের পাশে বসে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

টর্চের আলোটা নিবিয়ে ফেললুম তাড়াতাড়ি। কেননা লোকটাকে চিনতে পেরেছি।

বুড়ো ছাদেম ফকির। অনুদয়ে গেয়ে-গরুর দুধ দুয়ে আমার বাড়িতে জোগান দিত। বলেছিল একদিন, 'কাপড় পাওয়া যাবে বাবু?'

বলেছিলুম, 'রেশন-কার্ড যাদের আছে তারা পাবে একখানা। বাড়ি প্রতি একখানা। আছে তোমার রেশন-কার্ড?'

'আছে।'

'কিন্তু তুমি তো মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে। আমরা এক গাঁট যা ধরেছি চোরাবাজারে, তা বিলোচ্ছি শহরের লোকদের।'

'আমাদের তবে কি হবে?'

অনেকক্ষণ ভেবে বলেছিলুম, 'সার্কেল-অফিসার সাহেবের কাছে গিয়ে খোঁজ কর।'

তারপর আর আসেনি ছাদেম। সেদিন কোমরের নিচে এক হাত অবধি একটা ন্যাকড়ার ঘের ছিল। সেই ফালিটা নিশ্চয়ই নেংটি হয়েছিল আস্তে-আস্তে। আজ একেবারে তন্তুহীন।

ওর পিছনে নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোক আছে। নইলে ও কাঁদে কেন? নইলে ওর লজ্জা কিসের?

কিন্তু ওখানে ও করছে কি?

দু'একটি লোক এসে জুটেছে। একজন কদমালি, আদালতের রাতের চৌকিদার। চলেছে শহরের দিকে। ভেবেছ, চোর-ছেঁচড় কাউকে ধরেছি বোধ হয়। কিন্তু চোর যদি বা কাঁদে, অমন কুঁকড়ি-সুকড়ি হয়ে কাঁদে কেন? কদমালি থমকে দাঁড়াল।

'জিগগেস করো তো, করছে কি ও ওখানে ?'

'আর কি জিগগেস করব !' কদমালি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। বলল, 'শ্মশানে কাপড় খুঁজতে বেরিয়েছে। যদি পায় ন্যাকড়ার ফালি, চটের টুকরো বা বালিশের খোল—'

বললুম, কেন বললুম কে জানে, 'আমার বাড়িতে যেয়ো কাল সকালে। কাপড় দেব একখানা।'

আমার রেশন-কার্ডের বনিয়াদে কাপড় জোগাড় করেছিলুম একখানা। খেলো, মোটা কাপড়, পাড়টা বাজে। যদিও সেটা আমার পরবার মত নয়, তবু সংগ্রহ করে রেখেছিলুম। চাকর-ঠাকুরের কাজে লাগবে সময় হলে। নিরবশেষ দান করব এমন সংকল্প ঘুণাক্ষরেও ছিল না। কিন্তু মৃত নয়, রুগ্ন নয়, স্বাভাবিক সুস্থ একটা মানুষ উলঙ্গ হয়ে থাকবে এর অসঙ্গতিটা মুহূর্তের জন্যে অস্থির করে তুলল। মানুষ দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু তার দারিদ্র্যের চিহ্ন যে ছিন্নবস্ত্র, তার নিদর্শনটুকুও সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না ?

কিন্তু কাল ও আমার বাড়ি যাবে কি করে কাপড় আনতে ? ও যে এখন সমস্ত সভ্যতা, সমস্ত গোঁজামিলের বাইরে।

কদমালিকে বললুম, 'ওর বাড়ি চেন ?'

'এই তো সামনে ওর বাড়ি।' খানিকটা জঙ্গুলে অন্ধকারের দিকে সে আঙুল তুলল।

পরদিন কদমালির হাতে নতুন একখানা কাপড় দিলুম। বললুম, 'খবরদার, ঠিকঠাক পৌঁছে দিও ছাদেম ফকিরকে। পাড় কিন্তু আমার মনে থাকবে।'

পাঁজিতে লেখে, শুভদিন দেখে নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। কত শুভদিন চলে গেছে পঞ্জিকার পৃষ্ঠায়, কিন্তু ছাদেমের হৃতবস্ত্র এল না নতুন হয়ে।

আজ নিশ্চয়ই ছাদেম ফকিরের মুখে হাসি দেখব। আজ নিশ্চয়ই রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে সে আমাকে সেলাম করবে।

সন্ধের মোহানার মুখে দিনের হাল হেলতে-না-হেলতেই বেরিয়ে পড়লুম লালতাকুড়ের পথে। চলে এলুম শ্মশান পেরিয়ে।

কোন জায়গায় ছাদেম ফকিরের বাড়ি আন্দাজ করে দাঁড়ালুম কাছাকাছি। কাছেই ছোটখাট একটা ভিড়। ফিসির-ফিসির কথা।

কেউ কতক্ষণ দাঁড়ায়, দেখে, তারপর চলে যায়।

দেখলুম কদমালি আছে কিনা। কদমালি এখনো বেরোয়নি লণ্ঠন হাতে করে, তার রাত-পাহারায়। যারা জটলা করছে তাদের কাউকে চিনিনা।

এগিয়ে গিয়ে শুধোলুম, 'কি ব্যাপার?'

'ঐ দেখুন।'

তখনো গাছপালা একেবারে ঝাপসা হয়ে আসেনি। দেখলুম একটা সাধারণ আম গাছ। তারই একটা ডালে কি-একটা ঝুলছে। সন্দেহ কি, আমাদের ছাদেম ফকির।

তেমনি নিঃস্ব, তেমনি নগ্ন, তেমনি নিরবকাশ।

কয়েকজনকে সঙ্গে করে এগোলুম গাছের নিচে। সন্দেহ কি ছাদেম ফকিরের গলায় আমারই দেয়া সেই নব বস্ত্র। গলা ঘিরে দেখা যাচ্ছে সেই তীক্ষ্ণ লাল পাড়।

এরি জন্যে কি কাপড়ের দরকার হয়েছিল ছাদেমের?

বললুম, 'বাড়ি কোনটা ওর?'

জঙ্গলের মধ্যে একখানা শুধু ভাঙা কুঁড়েঘর সেখানে। সবাই বললে, 'ঐ তো।'

মাৎবর-মতন একজনকে ডেকে জিগগেস করলুম, 'ওর বাড়ির লোকেরা জানে?'

'কেউ নেই বাড়িতে। কাউকে দেখতে পেলুম না—'

'কতক্ষণ থেকেই তো ঝুলছে।' বললে আরেকজন।

সত্যি, একটা টুঁ শব্দ নেই কোথাও। কেউ একটা কান্নার আঁচড় কাটছে না। আশ্চর্য! তবে কাল কি ছাদেম কেঁদেছিল নিজে মরতে পারছে না বলে?

নতুন দক্ষিণের বাতাসে বোল-ধরা ডালগুলো কাঁপছে মৃদু-মৃদু।

মনে হল, আমাকে সে সেলাম করছে। যেন বলছে, আমার তুমি মান বাঁচালে বাবু। উলঙ্গতা আর দেখতে হলনা নিজেকে।

লণ্ঠন হাতে এল কদমালি।

ঠেসে খানিকক্ষণ গালাগালি করল ছাদেমকে। নতুন বস্ত্রের এই পরিণাম? আত্মহত্যাই যদি করবি, তবে একগাছা দড়ি জোগাড় করতে পারলিনে? ঠাট করে নতুন কাপড় গলায় জড়াতে গেলি? এরি জন্যে তোকে কাপড় এনে দিয়েছিলাম?

ভাবলুম, এ কি তার প্রতিশোধ, না, প্রতারণা ?

লণ্ঠন নিয়ে কদমালিও খুঁজে এল তার কুঁড়ে ঘর। আনাচ-কানাচ। গলি-ঘুঁজি। ঝোপ-ঝাড়। জঙ্গলের মধ্যে সাপের খসখসানি। ঝরা পাতার শব্দ।

শুকনো ও শূন্য ঘর। মাছুর পেতে কেউ শোয়নি, শিকে থেকে নামায়নি হাঁড়িকুঁড়ি। জল বা আগুনের রেখা পড়েনি কোথাও। শুধু ছাড়া-গরুটা ঘাস চিবুচ্ছে আর বাছুরটা ঘোরাঘুরি করছে।

একা লোকের পক্ষে এই বিতৃষ্ণাটা অবান্তর নয় ?

'কে ছিল এই লোকটার ?'

কেউ বলতে পারে না।

যদি বা কেউ ছিল, গত দুর্ভিক্ষে সাবাড় হয়ে গেছে, কেউ কেউ মন্তব্য করলে। ভাতের দুর্ভিক্ষে।

কাপড়ের দুর্ভিক্ষেও যে লোক মরে এই দেখলুম প্রথম।

কিন্তু কাপড়ের বেলায় দুর্ভিক্ষ কোথায় ছাদেম ফকিরের ? তাকে তো জোগাড় করে দিয়েছিলুম একখানা। তা কোমরে না রেখে গলায় জড়ালে কেন ? কোন দু'খে ?

শেষ পর্যন্ত দুঃখ না হয়ে রাগ হতে লাগল।

বললুম, 'থানায় খবর গেছে ?'

'এত্তেলা নিয়ে গেছে দফাদার।'

'আর, কেউ যখন নেই, পঞ্চায়েতকে ডেকে অঞ্জুমানে খবর দাও। কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করাও।'

সকালবেলাটা শহরের মধ্যে হাঁটি। রবিবার দেখে গেলুম নালতাকুড়ের পথে। সেই যেখানে ছাদেম ফকিরের বাড়ি। সেই আম গাছ। স্পষ্ট দিনের আলোতে নিতে হবে তার অবস্থানের জ্যামিতিটা। আয়ত্তে আনতে হবে তার অনুভবের পরিমণ্ডল।

হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলুম। বেশ মুক্ত কণ্ঠের কান্না। আর আশ্চর্য, নারীকণ্ঠের।

কে কাঁদছে ? এগোলুম কুঁড়েঘরের দিকে।

'ছাদেম ফকিরের পরিবার আর তাঁর পুতের বৌ। পুত মরেছে এবার বসন্তে।' কে একজন বললে সহানুভূতির স্বরে।

'কেন, কাঁদছে কেন?' যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছি, প্রশ্নটা এমনি খাপছাড়া শোনাল।

ছাদেম ফকির গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। পুলিশের হাঙ্গামার পর লাশ এই নিয়ে গেছে কবরখোলায়।

কাল ছিল কোথায় এরা সমস্ত দিনে-রাতে? ছাদেম ফকিরের পরিবার আর পুতের বৌ? মরে গিয়েছিল নাকি? মুছে গিয়েছিল নাকি? লুকিয়ে ছিল নাকি জঙ্গলে?

পর্দানশিন হলেও শোকের প্রাবল্যে এখন আর সেই আবরু নেই। কিংবা, এখনই হয়তো আবরু আছে। লোকের সামনে করতে পারছে শোকের দুরন্ত দুঃসাহস।

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, হেলে-পড়া চালের নিচে দাবার উপরে ছাদেমের পরিবার আর তার পুতের বৌ গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে জিগির দিয়ে কাঁদছে। যেন সদ্য-সদ্য কাঁদবার ছাড়পত্র পেয়েছে তারা। পেয়েছে আত্মঘোষণার স্বাধীনতা।

তাদের পরনে, সন্দেহ কি আমারই দেয়া সেই লাল-পাড় ধুতির দুই ছিন্ন অংশ। ফালা দেবার আগে খুলে নিয়েছে ছাদেমের গলা থেকে, লাশ থানায় চালান দেবার আগে। সেই কাপড়ে সসম্মান তিন অংশ বোধ হয় হতে পারত না। আর, আগেই শাশুড়িতে-বৌয়ে ভাগ করে নিলে ছাদেম ফকির মরত কি করে?

॥ কাঠ-খড়-কেরোসিন ॥

দরজায় বারকয়েক টোকা দিল মন্মথ, তবু খুলল না। নাম ধরে ডাকল, সাবিত্রী।

ভেতর থেকে সাবধানগলা সাড়া এলো ; কে।

আমি।

দরজা খুলে গেল। সাবিত্রী বলল, এত দেরি হ'ল তোমার। আমি তখন থেকে ভয়ে মরি। চুপচাপ তক্তপোষে পা তুলে বসে আছি। জিনিসপত্তর কিচ্ছু গোছগাছ হয়নি কিন্তু।

গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে মন্মথ বললে, কী করি, দু'দুটো টিউসনি ছিল যে। একটু পাখা করবে ?

খালি-গা, হাঁটু অবধি কাপড় তুলে মন্মথ পাঁচ মিনিট হাওয়া খেল কিন্তু সাবিত্রী তখন কিছু বলল না। বলল অনেক পরে, একেবারে শুতে এসে।

আজ দুপুরের কথাটা। বিকেলের দিকে গলির ঠিক মুখটাতে ট্যাক্সির হর্ণ বেজেছিল। মিনিটখানেক পরে একজোড়া মশমশ জুতো এসে থেমেছিল ওদের দোরগোড়ায়। তারপর দরজায় টোকা। কাছে পিঠে কেউ নেই, নতুন বাসা, চেনা নেই, জানা নেই, ভয়ে কাঠশরীর সাবিত্রী, ছিটকিনি তো ছিলই, তার ওপর খিল তুলে দিয়েছিল। ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল, ফিসফিস সুরে একজন বললে, ওদিকে নয়, ইদিকে। চোখের মাথা খেয়েছ ?

মশমশ জুতো বললে, তাই নাকি মাইরি, ভুল হয়ে যায়। তুমি তৈরি ?

রেডি।

তা হলে ষ্টেডি—গো।

মশমশ জুতো মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে, পিছনে পিছনে খুটখুট। বোধ হয় হাই-হীল। একটু পরে গলির মুখ থেকে ট্যাক্সি ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ এলো।

মন্মথ শুনল সব, বলল, নতুন জায়গা, তাই সবতাতেই অস্বস্তি হচ্ছে। একটু চেনা-জানা হোক, তখন আর এত ভয় পাবে না।

প্রথম থেকেই সাবিত্রীর পছন্দ হয়নি। না বাসা, না গলি। আলাদা বাসার জন্যে মন্মথকে পেড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু সে কি এমনি। বাপের বাড়ি বেহালায়,

সেখানে তবু মাটির ছোঁয়া ছিল। নারকেলগাছের ছাতাধরা ছোট্ট একটু ছাত ছিল। কিন্তু আহিরিটোলার এই গলিতে আছে শুধু পীচ আর পাথর।

অবাড়ন্ত শরীর মেয়েদের বয়েসের মত ; এ বাড়িতে বেলা যেন বাড়ে না। সারারাত ভ্যাপসা গরমের পর একেবারে শেষ রাতে গলিত গ্যাস-আলো ক্লান্ত চোখ বোঁজে, সেই সঙ্গে মানুষও। কিন্তু ক'মিনিট। একটু পরেই সদর রাস্তায় সাড়া জাগে, গঙ্গাযাত্রীদের নিয়ে প্রথম ঢঙ্ ঢঙ ট্রাম বেরুল। চৌবাচ্চায় ঝির ঝির শব্দ ; জলের কলটা ষাটনম্বর আলেকজাণ্ডার সুতোর একগাছি দাঁতে চেপে আছে।

তারপর থেকে সব বাঁধা টাইমে। বাবুরা বাজারে বেরিয়েছেন, এখন তবে সাড়ে সাতটা। কুচো চিংড়ি আর পুঁইশাকে থলে ভর্তি করে ফিরছেন : আটটা। কলতলায় মগ হাতে ঠেলাঠেলি, নাচুঁই-পানি স্নান : সাড়ে আট। নমোনমো খাওয়া : নটা। বেকাব থেকে তুলে নেওয়া মিঠে এক খিলি পান, রাস্তার দড়ি থেকে ধরান আয়েসী একটা কাঁচি—সারাদিনের বরাদ্দ ছুটির মধ্যে একটি—সাড়ে নটা, দৌড়-দৌড় দৌড়।

তারপর থেকেই গলিটা যেন ঝিমোতে শুরু করে। কোন সাড়া নেই, কচিৎ একটি কাকের কা-কা, কাচৎ সারাদুপুর রোদে টোটো-হয়রান ফিরিওয়ালা এ-গলিতে খদ্দের না হোক, ছায়া খোঁজে।

সাড়া জাগে শুধু একবার, সেই শেষবেলায়, গলির মোড়ে ট্যাক্সির হর্ণে। পাশের ঘরের দরজায় তিনটে টোকার ইশারা, মশমশ জুতোর পিছে পিছে মিলিযে যায় হাই-হীল।

আলাপ হতে হতে ছদিন কাটলো।

জানালায় আয়না রেখে সাবিত্রী কপালে বড়ো করে সিঁদুরের টিপ পরছিল, ছায়া দেখে ফিরে তাকাল। বলল, আসুন। আপনি তো ও-ঘরে থাকেন ?

চৌকাঠের ওপর ইতস্তত দু'টি পা। সাবিত্রী দু'টি উঁচু গোড়ালি পলকে দেখে নিল।

জুতা পায়ে ঢুকবনা ভাই। বেরুচ্ছি। দু'দিন থেকেই দেখছি আপনারা নতুন এসেছেন। তা ফুরসুৎই পাইনা যে এসে পরিচয় করব। দরজা সব সময়ে তো বন্ধই দেখি। আজ খোলা দেখে এলুম।

আসুন, আসুন না ভেতরে। সাবিত্রী আবার বলল। জুতো খোলার দরকার নেই, উনি তো দু'বেলাই ঢুকছেন।

মেয়েমানুষ। আমি এখানে থাকব কী করে বলো তো। তুমি তো বেরিয়ে যাও সারাদিনের মতো! একটু থেমে বলল, সেদিন বলছিল মামাতো দাদা, আজ বলেছে জ্যাঠতুতো ভাই। মামাতো ভায়েরা রাতারাতি জ্যাঠতুতো ভাই হলে আসল সম্পর্কটা কী হয়, মুখ্যু হলেও সেটুকু বুঝতে পারি।

মন্মথ ফের মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। বলল, তুমি বেশি মেশামেশি কোরোনা। নিজে ঠিক থাকলেই হল। তোমাকে চিনি তো, খারাপ কিছু তোমার কাছে ঘেঁষতে প্যরবেনা।

ওর চারিত্রতেজের ওপর স্বামীর অটুট শ্রদ্ধা আছে জেনে সাবিত্রীর বুক ভরে গেল।

দুপুরে মন্মথ অফিসে বেরুচ্ছে, সাবিত্রী বলল, আজ কিন্তু বাসার খোঁজ আনা চাই।

মন্মথ বলল, আচ্ছা।

ফিরতে ফিরতে মন্মথর রাত আটটা বেজে গেল। দরজার ছিটকিনি খুলে দিয়েই সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, পেলে খোঁজ।

কিসের?

বাসার।

জামা খুলে মন্মথ হুকে টাঙিয়ে রাখল, জবাব দিলনা।

ভাত বেড়ে দিয়ে সাবিত্রী বলল, কাল যদি নতুন বাসার খোঁজ না কর, তবে আমি মাথা খুঁড়ে কুরুক্ষেত্র করব বলে রাখলুম।

বিরক্ত গলায় মন্মথ বলল, বাসার খোঁজ পাওয়া কি অত সহজ নাকি।

তাই বলে খুঁজবেনা তুমি।

ডালের বাটিতে সুড়ুৎ চুমুক দিয়ে মন্মথ বলল, খুঁজব খুঁজব। অত ব্যস্ত হলে কি চলে।

হাতাটা ঠং-করে মেঝেয় ফেলে দিয়ে সাবিত্রী তিক্ত গলায় বলল, আমাকে একটা বেশ্যাবাড়িতে এনে তোলার সময় মনে ছিলনা?

মন্মথর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বলল, তোমাকে বেশ্যাবাড়ি এনে তুলেছি আমি?

সাবিত্রীর চোখ দু'টো তখনো জ্বলছে। রুদ্ধস্বরে বলল, বেশ্যা ছাড়া কী।

দিনরাত রঙ মাখে, সঙ সাজে, ও কী-জাতের মেয়েমানুষ আমার জানতে বাকি নেই। তুমি যদি বন্দোবস্ত না করো, আমিই করব। কালই বেহালায় চলে যাবো।

ভাতের থালায় জল ঢেলে দিয়ে মন্মথ বলল, তাই যাও। তবু যদি সেখানে কী সুখ আমার জানতে বাকি থাকত। বাপ নেই, মা ছেলেবৌয়ের কাছে চোর হয়ে আছে। ভাইয়ের ছেলের কাঁথাবদলানো থেকে ভাজের কাপড়কাচা অবধি সব কাজ করতে হয়নি সেখানে? ছ'বেলা হেঁসেল-ঠেলা, আর ঠেস-দেওয়া কথা শোনা। ছ'খানা শোবার ঘর পর্যন্ত নেই। শনিবার শনিবার আমি যেতাম, শুতে দিত চিলে কুঠিতে, বুড়ি মা বারান্দায় ঠাণ্ডায় শুয়ে শুয়ে কাশত। তখন তুমি কেঁদে কেঁদে ইনিয়ে বিনিয়ে বলোনি আমাকে আলাদা বাসা করতে? বলোনি, এখান থেকে যেমন করে হোক আমাকে নিয়ে চলো। তোমার সঙ্গে না হয় গাছতলাতে থাকব, সেও সুখ? ও-কথাগুলো কি থিয়েটারে শিখে এসে মুখস্থ বলেছিলে?

একটা মাদুর নিয়ে সাবিত্রী আলাদা শুতে যাচ্ছিল। মন্মথ বলল, খাবেনা তুমি?

উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ ঢেকে সাবিত্রী চাপাকান্নাভাঙা গলায় বলল, আজ আমাকে বাপের বাড়ির খোঁটা দিলে তুমি। আমি জলটুকু ছোঁবনা।

ছোঁবেনা?

না।

থাকো তবে। একটা বালিশ নিয়ে মন্মথ বাইরের রকে শুতে গেল।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল, সারা গা ব্যথাব্যথা। ঘরে এসে আয়নায় দেখল চোখ ছ'টি লাল। সাবিত্রীর ইতিমধ্যে স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। এক পেয়ালা চা এনে মন্মথর সমুখে রেখে যাচ্ছিল, মন্মথ ডাকল, শোন।

ভিজে চুল খোলা, তখনো সিঁদুর পরেনি, সাবিত্রীর কপাল প্রাকসকাল আকাশের মতো স্নিগ্ধ, নিষ্প্রভশুভ্র। বালিশে মুখ লুকিয়ে সারারাতকাঁদা চোখ ছটিতে করুণ ক্লান্তি। মন্মথ অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কোন কথা বলতে পারলনা। সাবিত্রী মাটির দিকে অপলক চেয়ে আছে। মন্মথ অনেকক্ষণ পরে ডাকল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী চোখ তুলে তাকালো। পাতা ছটি কেঁপে উঠল একবার, একটু

ভিজল, ঠোঁট দুটি থরথর হ'ল। উঠে গিয়ে মন্মথ সামনে দাঁড়াল সাবিত্রীর, একখানা হাত কাঁধের ওপর রাখল। সরে যেতে চাইল সাবিত্রী, হাতখানা সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু সরতে গিয়েও সরতে পারলনা, আরো বেশি করে ধরা পড়ল, চলনামা মুখ ডুবিয়ে দিল মন্মথর বুকে।

পরক্ষণেই হাসিকান্না মুখখানা তুলে বলল, একি, তোমার গা এত গরম।

মন্মথ সামান্য হাসল।

সাবিত্রী বলল, কাল আবার রাগ করে বাইরে শোয়া হয়েছিল। আজ অফিসে যেতে পাবেনা তুমি।

মন্মথ বলল, ও কিছুনা। অফিসে যেতেই হবে। তুমি বাসাবাসা করে পাগল হয়ে আছ, তাই তোমাকে বলিনি। আমাদের অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। এ-সময়ে সবাই ভয়ে ভয়ে আছে। গরহাজির হলে গোলমাল হতে পারে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সরে গেল সাবিত্রী। সশঙ্ক স্বরে বলল, তোমারও চাকরি যাবে নাকি।

যেতে তো পারেই। আমদানী-রপ্তানীর ওপর আমাদের অফিস, মাল আসছেনা নিয়মিত বিদেশ থেকে। পাকিস্তানেও চালান যাচ্ছেনা।

একটু চুপ করে থেকে মন্মথ আবার বলল, দু'দিন একটু চুপ করে থাকো। চাকরির ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক। এর মধ্যে আর নতুনবাসার হাঙ্গামা করে কাজ নেই। একটু নিচুগলায় মন্মথ বলল, আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি। নিজেদের নিজেরা সন্দেহ করে যেন ছোট না করি। আমাকে তুমি চেন, আমিও জানি তুমি কী। আমাদের দু'জনের কাছে দু'জনের দাম থাকলেই হল।

বাজারের থলি হাতে মন্মথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, সাবিত্রী ডাকল, এই, শোন।

মন্মথ ফিরে তাকাল। সাবিত্রী বলল, গেঞ্জিটা ছেড়ে দিয়ে যাও, ওটা পরে আর বাইরে যায় না। লোকে বলবে কী।

সিঁদুরে চোখের জলে বুকের কাছটাতে মাখামাখি। মন্মথ একটু হেসে গেঞ্জিটা খুলে দিল।

একটু পরেই মল্লিকা এসে দাঁড়াল দরজায়। মিটি মিটি হেসে বলল, কাল রাত্তিরে বুঝি কর্তাগিন্নীতে ঝগড়া হয়েছিল ?

সাবিত্রী লজ্জিত গলায় বলল, কই, নাতো।

ইস, আবার লুকোনো হচ্ছে।

আপনি কী করে জানলেন।

হাত গুনতে জানি যে। ঘরে খড়ি পেতেছিলাম। না ভাই, খড়ি নয়, আড়ি। কাল আড়ি পেতেছিলাম তোমাদের দরজায়! সাবিত্রী তবু বিশ্বাস করছেনা দেখে মল্লিকা বলল, কাল তোমার কর্তাকে বকে ঘুমোতে দেখলাম কিনা, তাই। শেষ শো'তে থিয়েটার দেখেছি কাল, ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। দেখছ না চোখ দু'টো ফোলাফোলা, ভালো ঘুম হয়নি কিনা তাই। একটু থেমে মল্লিকা বলল, কাল তোমরাও তো ঘুমোওনি। চোর এলে কিন্তু মুসকিলে পড়ত ভাই। বলে মল্লিকা হাসল।

কিন্তু সাবিত্রী হাসল না। সেই লজ্জাটুকু ঢাকতে মল্লিকাকে একটু বেশি করে হাসতে হল।

এড়াতে চাইলেও সব সময় এড়ানো যায়না। এক বাসায় থাকতে গেলে দু'চারবার মুখোমুখি হতেই হয়, মিষ্টি হেসে মিষ্টি হাসির শোধও দিতে হয়। বিশেষ, মল্লিকা যেদিন একবাটি মাংস নিয়ে রান্নাঘরের সমুখে এসে দাঁড়ালো, সেদিন আর সাবিত্রী না বলতে পারলো না। একটুখানি চেখে বলল, চমৎকার হয়েছে মল্লিকাদি।

মল্লিকা বলল, বুনো পাখি। শশাঙ্করা বাইরে গিয়েছিল, শিকার করে এনেছে। ভারি চমৎকার স্বাদ না?

শশাঙ্কই যে মল্লিকার সেই জ্যাঠতুতো কিম্বা মামাতো ভাই, সাবিত্রী জানত। চুপ করে রইল, কিছু বলল না।

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ কী রাঁধলে ভাই? কী মাছ, দেখি।

সেদিন বাজার থেকে মাছ আসেনি, কিন্তু মাথা কাটা গেলেও সাবিত্রী সে-কথা স্বীকার করতে পারবেনা। বলল, দেরিতে বাজার এসেছে, এ-বেলা বেশি কিছু হয়নি মল্লিকাদি। অল্প চারটি খেয়েই আফিসে গেছেন। ও-বেলার জন্যে রেখে দিয়েছি বাঁধাকপি আর মাছের মুড়ো।

চলে যেতে যেতে মল্লিকা বলল, ও-বেলা আমার এক বাটি চাই কিন্তু।

মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল সাবিত্রীর মুখ। তখন থেকে কেবলি প্রার্থনা করেছে,

হে ঠাকুর, আজ যেন উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরেন, কিন্তু মন্মথ ফিরল সাতটা বাজিয়ে।

ঘরে ঢুকেই মন্মথ জামাটা ছাড়তে যাচ্ছিল; সাবিত্রী সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, খুলোনা। তোমাকে এখুনি বাজার যেতে হবে।

বিস্মিত বিরক্তগলায় মন্মথ বলিল, কেন।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো সাবিত্রী। সন্তর্পণ গলায় বলল, একটা বাঁধা কপি আনবে, আর একটা মাছের মুড়ো।

মন্মথ বিদ্রূপ করে বলল, হঠাৎ এত সখ যে। এত খাবার সাধ—পোয়াতি হলে নাকি আবার?

সাবিত্রী বলল, চুপ চুপ, আস্তে। সাধ নয় গো মান। আমার মান বাঁচাতে পার একমাত্র তুমি। তারপর সাবিত্রী ফিস ফিস করে সব কথা বলল। শুনে কঠিন হয়ে গেল মন্মথর মুখ। কী ফ্যাসাদ বাধিয়ে আছ বলো তো। মাসের শেষ, হাতে পয়সা নেই, শেষ রেশনটা বাদ দেবো কিনা ভাবছি;—তার ওপর এসব কী পাগলামি। তোমাকে বার বার বলিনি, আমরা দু'জনকে নিয়ে দু'জন, কারুর কাছে ছোট হবোনা, তাই বলে ছোট কাজও করবনা কখনোও, কেন কেন তুমি পাল্লা দিতে চাও অন্যের সঙ্গে।

মন্মথর হাত দু'খানা চেপে ধরল সাবিত্রী। ধরা গলায় বলল, আর করবনা। কিন্তু আজকের মতো আমাকে বাঁচাতেই হবে। না-হয় কোন হোটেল থেকে এক বাটি কিনে নিয়ে এসো। কম খরচে হবে।

হাত ছাড়িয়ে মন্মথ তীক্ষ্ণস্বরে বলল; পাগলামি করোনা। আমি এখন যাই হোটেলে হোটেলে খোঁজ নিইগে কোথায় বাঁধাকপি দিয়ে মাছের মুড়ো রাঁধা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত, মন্মথ কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটিতে বাঁধাকপির ঘণ্ট জোগার করে আনলও। অনেক রাতে, শুতে এসে সাবিত্রী বলল; হোটেলের রান্না, মল্লিকাদি কিচ্ছু টের পায়নি কিন্তু! খুব সুখ্যাতি করছিল।

সেদিন দুপুর থেকেই মল্লিকার ঘর সাজানোর ঘটা দেখে সাবিত্রী অবাক হয়ে গেল। যেখানে যত ঝুল ছিল, সব সাফ করেছে মল্লিকা, বালতি বালতি জল ঢেলে মেঝে ধুয়েছে। খাটটা ছিল ঘরের মাঝখানে, সেটাকে টেনে এনেছে এক কোণে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করেছে আয়নার কাঁচ। ফুলদানীতে টাটকা তাজা ফুল, জাজিমের ওপর ধবধবে চাদর।

কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে গায়ে মুখে মাথায় সাবান মেখেছে মল্লিকা, বারান্দায় সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা। সাবিত্রী সারাক্ষণ উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখেছে মল্লিকার কাজ। বলল, আজ যে এত ঘটা, মল্লিকাদি?

মল্লিকা মুচকি হাসল। বলল, জানোনা? আজ যে আমাকে দেখতে আসবে ভাই। তা কেউ তো নেই, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করছি।

সাবিত্রী বলল, ঠাট্টা!

কেন আমাকে বুঝি দেখতে আসতে পারে না? আমার বিয়ের বয়স কি একেবারেই গিয়েছে ভাই? দেখতো কেমন টান টান চামড়া, ধবধবে রঙ, মল্লিকা সামনে হাত দু'খানা প্রসারিত করে ধরল।

অপ্রতিভ সাবিত্রী বলল, তা কেন, তা কেন। সত্যি করে বলুন না, মল্লিকাদি কে আসবে আজ।

আমার ক'জন বন্ধু। নেমন্তন্ন করেছি আজ। এখুনি এসে পড়বে ওরা।

তারপর কতক্ষণ ধরে যে মল্লিকা আয়নার সমুখে বসে বসে, প্রসাধন করল। সাবান দেওয়া চুল ফাঁপিয়ে দিল খোঁপাবাঁধার এক নিপুণ কৌশলে। একটু রঙ, একটু পাউডার ক্রীম মিশিয়ে তৈরি করল অপরূপ ত্বকপ্রলেপ; ভ্রূরেখাকে দীর্ঘায়ত করল তুলিকায়। হারমোনিয়মের নিখুঁৎ সাজানো রীডের মতো দাঁতের পাঁতি বার করে যখন হাসল, সাবিত্রী মুগ্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে বলল, আপনার বন্ধুরা এসে পড়বেন। আমি এখন যাই মল্লিকাদি।

মল্লিকা বলল, আহা, ব'সনা।

তখনও ঘর সাজানো একটু বাকি ছিল, মল্লিকা এটা-ওটা এখানে সেখানে সরাতে লাগল; টুলের ওপর বসে মেয়েকে দুধ দিতে দিতে সাবিত্রী দেখতে থাকল নির্নিমেষে।

ঠিক সেই সময়ে বারান্দায় মশমশ জুতোর শব্দ শোনা গেল, আর এক সঙ্গে অনেক জোড়া। পালাবে কি, দরজা তো মোটে একটা। মাথার কাপড় সামলাতে গিয়ে গায়ের কাপড় আল্‌গা হয়ে পড়ল, পায়ের দিকে তাকাতে গিয়ে নজরে পড়ল গোড়ালির ওপরেও খানিকটা জায়গায় উপযুক্ত প্রচ্ছদ নেই।

খুকিকে একরকম জোর করেই দুধ ছাড়াল সাবিত্রী, মেঝের শুইয়ে দিল, ব্লাউজের বোতামগুলো পটপট করে বন্ধ করল কোনক্রমে। খুকিকে কোলে নিয়ে দৌড়তে যাবে, চৌকাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে শশাঙ্ক, একেবারে মুখোমুখি।

না-জানি আজ একটা গোটা আতরের শিশিই, ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর রুমালে শশাঙ্ক উজার করে এসেছে, গন্ধে সাবিত্রীর গা-বমিবমি অনুভূতি এলো। চৌকাঠ ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল শশাঙ্ক, সেই ফাঁকটুকু দিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও সাবিত্রীর মনে হ'ল ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল বুঝি। অসম্বৃত গিলেআস্তিন আদ্দির জামাটা বুঝি সেঁটেই রইল আঁচলে, হীরে-ঠিকরানো আঙুলের শর বিঁধে রইল পিঠে, ঠিক যেখানটায় ব্লাউজটা ফেঁসে গেছে।

তা ছাড়া ঘরে এসেও সাবিত্রী ভুলতে পারল না শশাঙ্কর চাউনি। কী আতুর, আচ্ছন্ন চোখে চেয়ে ছিল লোকটা। পাতের পাশে বসে-থাকা বেড়ালটা যে-আগ্রহে বাটির গা চেটে চেটে খায়, চুষে চুষে খায় মাছের কাঁটা, তেমনি। সাবিত্রী সারা শরীর ভরে শিহরণ অনুভব করল।

শনিবার, মন্মথ সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ফিরল। ঘরে পা দিয়েই একরকম চেঁচিয়ে উঠল, কী হচ্ছে, কী হচ্ছে ও-ঘরে।

সাবিত্রী বলল, একটু আস্তে কথা বলতে পারোনা? গান। মল্লিকাদি গান গাইছে। ও-ঘরে আজ কত লোক এসেছে জান।

ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল মন্মথর মুখ। জানালা দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিতে দিতে বলল, ছি-ছি-ছি। ওরা বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু করলে দেখছি।

খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে সাবিত্রী বলল, ঘুঙুরও বাজছেনা?

মন্মথ তখন ভেন্টিলেটর দুটোও বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছে। বলল, ওসব শুনে কাজ নেই।

এক একবার গান থামে, সাবিত্রী বলে, এই বুঝি ওদের আসর ভাঙলো। কিন্তু ভাঙে না। একটা শেষ হতেই এক পশলা হাততালির তারিফ শোনা যায়, পরক্ষণেই হারমোনিয়মটায় নতুন সুর ককিয়ে ওঠে।

মন্মথ বলল, কী কেলেঙ্কারি। এই তবে পেশা তোমার মল্লিকাদির। এতদিনে পরিষ্কার বোঝা গেল। ছি-ছি পেটে খাবার জন্যে কত ছোট কাজই না করে মানুষ। বলতে বলতে মন্মথর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; আমাদের কিন্তু গর্ব আছে সাবিত্রী, উপোস করে শরীর শুকিয়ে মরলেও ভেতরের মানুষটাকে নীচু করিনি। কালই বাড়িওয়ালাকে বলব আমি। একটা বিহিত করতে হবে।

সাবিত্রী ভেবেছিল মল্লিকা পরদিন মুখ দেখাতে পারবেনা ওর কাছে আশ্চর্য, পরদিন কলতলায় মল্লিকাই সেধে কথা বলল।

এমন বেহায়া মেয়ে, বলল, কাল কেমন গান শুনলে ভাই।

সাবিত্রী কোন জবাব দিল না।

মল্লিকা বলল, উঃ, কী ধকল গেছে কাল। থামতেই চায় না। একটা শেষ হতে আরেকটার ফরমাস করে।

সাবিত্রী বাঁকাগলায় বলল, কাল যারা দেখতে এসেছিল, তাদের আপনাকে পছন্দ হয়েছে মল্লিকাদি?

কুলকুচির জল সশব্দে দূরে ছিটিয়ে সশব্দে হেসে উঠল মল্লিকা। ওমা, তুমি এখনো ঠাট্টার কথাটা মনে রেখেছ? আমাকে দেখতে তো আসেনি। শীগগিরই আমরা একটা গীতিনাট্য অভিনয় করব কিনা, কাল আমার ঘরে তার মহলা হ'ল। আসছে পূর্ণিমায় শো। নাট্যপীঠ থিয়েটারও ভাড়া নেওয়া হয়েছে, জান?

সাবিত্রী নীরবে কাপড় কাচতে লাগল। মল্লিকা হঠাৎ কাছে ঘেঁষে এলো। সাবিত্রীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থেকো ভাই। কাল শশাঙ্ক তোমাকে একেবারে পষ্ট সামনাসামনি দেখেছে। কী বলব, ওর মাথা ঘুরে গেছে একেবারে। ওরা এবারে যে ফিলিমটা তুলছে, তাতে নাকি ছোট্ট একটি মায়ের পাট আছে। খুকিকে তুমি দুধ দিচ্ছিলে না—ঠিক অমনি একটা পোজ ওদের চাই।

সাহস পেয়ে আরো কত কী বলত মল্লিকা ঠিক নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সাবিত্রী দুমদাম পা ফেলে উঠে গেল। মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, তুমি মরো মল্লিকাদি।

রবিবার বাড়িওলার কাছে যাই-যাই করেও মন্মথ আলসেমি করে সারাদিন বাসায় কাটিয়ে দিল। সোমবার অফিসফেরৎ যাবার কথা ছিল, সেদিন বেলা তিনটের সময়ই সটান চলে এলো বাড়ি। কোনদিকে না চেয়ে সোজা ঘরে গিয়ে তক্তপোষে শুয়ে পড়ল।

মেঝেয় আঁচল পেতে শুয়েছিল সাবিত্রী, ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, একি, এত শীগগির ফিরলে আজ? তাহলে আজ সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

কঠিন চোখে তাকাল মন্মথ। বলল, হ্যাঁ। সেইটেই বাকি আছে সিনেমা দেখারই সময় আমাদের।

ভয় পেয়ে আরো কাছে ঘেঁষে এলো সাবিত্রী। মন্মথর কপালে উদ্বিগ্ন করতল রাখল; ভিজে হাত গরম ঠেকল, কিন্তু নিশ্চিত বোঝা গেলনা, তখন গাল কাৎ করে রাখল মন্মথর কপালে। বলল, জ্বর হয়নি তো।

পাশ ফিরে সরে গেল মন্মথ। বিষণ্ণ ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল, জবাব আমার কপালে লেখা নেই, সাবিত্রী, জামার বুক-পকেটে আছে। উঠে গিয়ে দেখ।

আফিসের ছাপমারা লেপাফা দেখে সাবিত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। খাম না খুলেই বলল, এ কী, ছাঁটাই?

মন্মথ এ প্রশ্নের জবাব দিল কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে।

মল্লিকা উঁকি দিয়ে বলল, ওমা খুকিকে এখুনি ভাত দিয়েছ, ভাই? বয়স কত ওর—দাঁত উঠেছে?

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলল, উঠেছে দিদি, ওপরনীচ মিলিয়ে ছ'টা। ভীষণ পেটের অসুখ যে ওর, তাই ভাবছি আজ দুধ দিয়ে কাজ নেই।

মল্লিকা মুখ টিপে হাসল: কলকাতার দুধ তো সিকিটাই জলমেশানো, পাথর-ভর্তি চালের চেয়ে সেটা পেটের পক্ষে ভালই হত সাবিত্রী।

মুখ-টেপার রকম দেখে সাবিত্রীর সারাশরীর জ্বলে গেল। মনে মনে বলল, বেশ্যা হারামজাদি।

সন্ধ্যার পর নিজেই একটা দরখাস্তর মুসাবিদা করছিল মন্মথ, আপনমনে হাসছিল। সাবিত্রী পাশে এসে বসল। মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, হাসছ যে। আজ কোথাও কোন আশা পেয়েছ?

মন্মথ বলল, জব্দ করেছি সেই কথাই ভাবছি।

সাবিত্রী উৎসুক চোখে চেয়ে আছে দেখে মন্মথ গল্পটা বলল: আরে না-কামানো গাল আর খালি পা দেখে ব্যাটা তো কথাই বলতে চায় না। বলে বেয়ারার কাজ নেই বাপু, অন্যত্র দেখ। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বললুম, বেয়ারার কাজ চাইনে স্যার, ক্লারিকাল। আমি সাত বছর সিমসন জোসেফের বাড়ি ক্লার্কের কাজ করছি। আমার চেহারা আগাগোড়া দেখে নিয়ে—চোখ নয় তো শালার, যেন বুরুশ—বড়বাবু বললে, তুমি! বললুম, ভদ্রলোক স্যার, দস্তুরমতো আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট। জ্যাঠামশায় মারা গেছেন স্যার, তাই…। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভঙ্গি বদলে গেল বেটার। বললে, অশৌচ কেটে

যাক, একটা দরখাস্ত নিয়ে আসবেন। দেখি ছোটসাহেবকে বলে কিছু করতে পারি কিনা। মন্মথ হো-হো করে হাসতে লাগল।

নিয়ে যাও তবে দরখাস্ত? সাবিত্রী বলল।

আর সেইখানেই তো মুশকিল। দরখাস্ত তো কালই নিয়ে যেতে পারি। না হয় দু'আনা খরচ করে দাড়ি কামিয়ে বললাম, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল ল্যাঠা। কিন্তু পা দু'খানা মুড়ি কী দিয়ে।

অনামিকা থেকে নিঃশব্দে বিয়ের আংটিটা খুলে সাবিত্রী মন্মথের হাতে দিল। মন্মথ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল, কালই একজোড়া জুতো কিনবে তুমি।

সাবিত্রী চায়না; না ঘেঁষতে, না মিশতে, তবু কি কমলি মল্লিকা ছাড়ে। মন্মথ বেরিয়েছে টের পেয়েছে কি এ-ঘরে এসে বসবে। বিব্রত, বেআব্রু করবে সাবিত্রীকে একটার পর একটা রঞ্জনরশ্মি প্রশ্নে।

গায়ে যে বড়ো একটাও জামা রাখনি সাবিত্রী?

কুণ্ঠিত সাবিত্রী আরো জড়োসড়ো হয়ে বসতে চেষ্টা করে বলে, বড় গরম যে মল্লিকাদি?

গরম? হাসালে ভাই তুমি আমাকে। চারদিন থেকে সমানে বিষ্টি, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া, আমরা রাত্তিরে চাদর গায়ে দিচ্ছি, তবু তোমার গরম গেলনা। অবাক করলে ভাই। এ-গরম তোমার বয়সের।

মল্লিকার গলাটা টিপে ধরলে, নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে বুঝি রাগ যেত সাবিত্রীর। কিন্তু উপায় নেই। মুখ ফুটে কাউকে বলা যাবেনা কিছু। গোপন ঘায়ের মতো লুকিয়ে রাখতে হবে এই দুঃখ; এই অনটন, যা অনশনের সোদর। কিন্তু পুঁজেরক্তে ছেঁড়া কাপড়খানাও যে মাখামাখি হয়ে গেল, সাবিত্রী লুকোবে কী।

মল্লিকা বলল, আজ দুপুরে একটু বেরুবো। ঘরখানার ওপর একটু নজর রেখো। সেই কথাই তোমাকে বলতে এলুম।

কোথায় যাবে, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করেনি, মল্লিকা নিজেই বলল।

রেসে যাবো ভাই। শশাঙ্করা খুব ধরেছে। সারাদিনের ধকল, শরীরে কি এত সয়! দম নিয়ে ফের বলল, তা শশাঙ্ক বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। জিতিয়ে

দেবে কিন্তু তোমাকে ঠিক। পাঁচ টাকায় পাঁচশো। সেই যে ম্যাজিক আছে না, ধুলোমুঠো সোনা হয়ে যায়? এ তাই।

পাঁচ টাকায় পাঁচশো, মল্লিকাদি?

ওই কথার কথা। তা তেমন তেমন ঘোড়া মিললে হয় বৈকি। আর তিন টোটের খেল মেলাতে পারলে তো কথাই নেই,—রাতারাতি বড় মানুষ।

সাবিত্রীর চোখ দু'টো জ্বলছিল। মল্লিকা বলল, অবাক হয়ে চেয়ে আছ যে!

সাবিত্রী শুকনো গলায় বলল, এমনি।

কিন্তু মল্লিকা বেরিয়ে যেতেই সাবিত্রী চালের হাঁড়িতে হাত দিল। বেরুল টিনের একটা কৌটা, সেই কৌটোর মধ্যে ন্যাকড়ার একটা পুঁটলি। গিঁট খুলতে ছড়িয়ে পড়ল পয়সা, সব শুদ্ধ সওয়া পাঁচ আনা। মন্মথর চাকরি হলে কালিঘাটে পূজো দেবো বলে কবে যেন সাবিত্রী আলাদা করে রেখেছিল।

মল্লিকার তখনো সাজগোজ সারা হয়নি, সাবিত্রী গিয়ে দাঁড়াল। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে, মল্লিকা তখন কণ্ঠায়, ঘাড়ে, কনুই অবধি পাউডার মাখছে। ফিরে তাকিয়ে বলল, কী ভাই।

সাবিত্রী অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারলনা। তারপর সঙ্কোচ জয় করে নীচু গলায় বলল, কম পয়সায় রেস খেলা যায় না, মল্লিকাদি?

মল্লিকার চোখে মুখে কৌতুক ছড়িয়ে পড়ল বলল, কত কম পয়সা, ভাই?

এই ধরো,—স'পাঁচ আনা?

স'পাঁচ আনা কেন,—পাঁচ আনাতেই চলবে। আমার চেনা বুকি আছে কত; তুমি খেলবে?

কুণ্ঠিত, কাঁপা হাতে সাবিত্রী মল্লিকার হাতে পাঁচ আনা গুজে দিল। মল্লিকা বলল, ঘোড়া?

সাবিত্রী বলল, ওসব আমি বুঝিনে, তোমার যা ভাল মনে হয়, ক'র, মল্লিকাদি।

সেই পাঁচ আনা সুদে-আসলে ফিরে এল কিন্তু। মল্লিকা বলল, তোমার ভাগ্য ভাল সাবিত্রী আমরা এলোমেলো খেলে ফতুর, কিন্তু তোমার নামে যেটা ধরলুম, সেটাই বাজি নিলে। তবে পেমেণ্ট ভাল হয়নি, নামী ঘোড়া কিনা। পাঁচ আনায় পেয়েছে আট আনা।

আমার এই ভাল মল্লিকাদি, সাবিত্রী আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে।

চায়ের সঙ্গে ফুলুরি বেগুনী দেখে মন্মথ অবাক হ'ল। পয়সা পেলে কোথায় তুমি?

যেন কতই রহস্য, সাবিত্রী এমন ভঙ্গিতে হাসল।

চাকরির দরখাস্ত লিখে লিখে আর জবাব না পেয়ে পেয়ে মেজাজ আজকাল সর্বদাই তিরিক্ষি মন্মথর, স্ত্রীর কাছেও জবাব না পেয়ে চটে গেল, রোজগার করেছ নাকি?

তবু হাসল সাবিত্রী। —যদি বলি তাই।

ঠাট্টাকটু গলায় মন্মথ বলল, আশ্চর্য হবোনা, জলজ্যান্ত আদর্শ যখন পাশেই রয়েছে।

কথার ধরণে সব উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছিল সাবিত্রীর, তবু মন্মথকে সব কথা খুলে বলতেই হল।

অন্ধকার হয়ে গেল মন্মথর মুখ। গম্ভীর স্বরে বলল, এও তো এক হিসেবে তোমার রোজগারই। ছি-ছি। তোমাকে বলিনি সাবিত্রী, ও-সবে কাজ নেই। না খেয়ে থাকবো সেও স্বীকার, তবু তোমার উপার্জন খেতে চাইনে।

কার্তিক মাসের গোড়াতে সাবিত্রী বাপের বাড়ি গেল। ইচ্ছে ছিলনা, শুধু মন্মথর পেড়াপীড়িতে। সাবিত্রী বারবার বলেছে, আমার কিছু ক্ষতি হবেনা দেখো। তা ছাড়া, আমাদের এখন এই দুঃসময় চলেছে। কার কাছে তোমাকে রেখে যাবো।

মন্মথ বলেছে, সে-ভাবনা ভাবতে হবেনা তোমাকে। এ-অবস্থায় এত খাটুনি সহ্য হবেনা, তার ওপর পেট ভরে দুবেলা খেতেও পাওনা। শেষ পর্যন্ত একটা বিপদ বাধাবে? আর, কদিনের জন্যেই বা। তোমার হিসেব মত তো আর সাড়ে পাঁচ মাস?

কিন্তু ঠিক পঁচিশ দিনের মাথায় সাবিত্রী ফিরে এলো, ফ্যাকাশে, শাদা কাঠি। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে, পেট চুপসে ছুঁয়েছে পিঠ।

মল্লিকা বলে, ছেলে কোলে করে আসবে ভেবেছিলাম, তা এ কী চেহারা নিয়ে এলে, ভাই?

সাবিত্রী বলল, ও-শত্তুর না এসেছে ভালই হয়েছে মল্লিকাদি। এলে খাওয়াতাম কী।

কী হয়েছিল রে।

কিচ্ছুনা। শরীরটা এখান থেকেই খারাপ নিয়ে গিয়েছিলাম তো। রোজই ঘুষঘুষে জ্বর হত। ওখানে গিয়ে কলতলায় মাথা ঘুরল একদিন,—ব্যস।

শরীরটা দু'দিন একটু সেরে এলেই পারতে।

সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ দিনকতক ঘোরাঘুরি করছে। ব্যবসা করছে বলে। বাপের বাড়ি যাবার আগেই সাবিত্রী শুনে গিয়েছিল এক বন্ধুর প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে মন্মথ, কাজ দিলে কমিশন। লক্ষ্মীর কৌটো কুড়িয়ে কাচিয়ে বেরিয়েছিল পাঁচ টাকা, খুদ বিক্রী করে আরো দেড়। একটা ট্রামের মান্থলি কিনেছিল মন্মথ।

একদিন দুপুরে মন্মথ খেয়ে দেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ছে দেখে সাবিত্রী বলল, কী গো, আজ কাজে যাবেনা?

মন্মথ হাই তুলে বলল, দুর, দুর। শুধু ঘোরাঘুরি, শরীরটাই মাটি।

কাজ দিতে পারনি তোমার বন্ধুর প্রেসে?

দিয়েছি তো। মন্মথ খাটের নিচে রাখা লেটার-হেডের স্তূপ দেখিয়ে দিল, ওগুলো দেখতে পাওনি? চক্রবর্ত্তী এণ্ড দত্ত,—অর্ডার-সাপ্লায়ার্স।

কোন কোম্পানী?

কোম্পানী আমি নিজেই। দত্ত নামটা দিয়েছিলাম মনগড়া। শুধু একটা নাম কেমন ন্যাড়ান্যাড়া শোনায় বলে। ওগুলো কাল সের দরে বেচে দিও।

আরেকটা কাজের কথা অনেক দূর এগিয়েও হলনা। কোন একটা ফার্মের ট্রেড রিপ্রেসেণ্টেটিভ। কলকাতার বাইরে যেতে হবে মাঝে মাঝে। একশো টাকা মাইনে, রাহা খরচা, উপরন্তু বিক্রীর ওপর দু' পারসেণ্ট কমিশন। সে-অফিসের মাঝারি একজন কেরাণীকে পান খেতে কিছু হাতে গুঁজেও দিয়ে এসেছিল। নির্দিষ্ট দিনে দেখা করতে গেল মন্মথ। ফিরে আসতে সাবিত্রী বলল, হল?

না। মন্মথ বলল, জোচ্চোর শালা জোচ্চোর—পাঁচশো টাকা জমা রাখতে চায়। আরে তোদের মাল নিয়ে কি সরে পড়তাম আমি? এটুকু বিশ্বাস করতে পারিস না?

মন্মথ বলতে বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যেন সাবিত্রীই জামিনের টাকা চেয়েছে। যেন সাবিত্রীই ওকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

অন্য লোক নিয়েছে ওরা ?

আরে সেই কথাই তো বলছি। যাকে নিয়েছে সে আবার আমার চেনা, প্রভাস গাঙ্গুলী। সেদিন বিয়ে করেছে কিনা, নগদ নিয়েছিল ছ' হাজার, বলামাত্তর পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল।

কোন কারণ নেই, তবু সাবিত্রী মাথা নীচু করল। ওর বাবা শুদ্ধমাত্র শাঁখা সিঁদুরে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন, সেই আফশোষই মন্মথ করছে না তো এতদিন পরে, কোলে একটা আসবার পরে, এমন কি আরও একটা নষ্ট হয়ে যাবার পরে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়, কিন্তু শাক ঢাকবে কী দিয়ে। আর মল্লিকা এমন সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে যে লুকোবার উপায় নেই।

মল্লিকা বললে, এত শীগগির আজ খেতে বসেছ ভাই ?

পাতে শুধু কলমী শাক সেদ্ধ, আর কয়েকদানা মাত্র ভাত। অন্যদিন হলে সাবিত্রী তাড়াতাড়ি জল ঢেলে দিত থালায়। কিম্বা বলত, আজ তোমার ভগ্নিপতির তাড়াতাড়ি কাজ ছিল দিদি, বাজারটাও করে দিয়ে যেতে পারেনি; তা, আমারও শরীর ভাল নেই, দু'টো দাঁতে কাটছি শুধু।

নিজের ঘরে গিয়ে ছোট একটা বাটিতে মাছের ঝোল নিয়ে ফিরে এল মল্লিকা। একটু চেকে দেখবে ভাই, নুন দিয়েছি কিনা বুঝতে পাচ্ছি না।

অত্যন্ত সহজ ছল, অন্যদিন হলে অপমান বোধ করত, মল্লিকাকে ফিরিয়ে দিত, কিন্তু আজ কী হ'ল সাবিত্রীর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। কত ভুল না করে মানুষ, কত অকারণে একে অপরকে ঠেলে রাখতে চায় দূরে। পাশের ঘরের এই মেয়েটিকে কেন বরাবর অপছন্দ করে এসেছে সাবিত্রী ? ওর কাছে আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে বলে ? অকস্মাৎ সাবিত্রীর মনে হ'ল সেও তো মল্লিকার কাছে কম কথা লুকোয়নি। মল্লিকা গোপন করতে চেয়েছে ওর কলঙ্কের কুলো, সাবিত্রী ওর অভাবের ফুটো কলসী। এতদিন পরে সাবিত্রী প্রথম অনুভব করল একই পৈঠায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

বুক ঠেলে খানিকটা লবণাক্ত কান্না ছাপিয়ে পড়ল সাবিত্রীর চোখে। সেদিন সাবিত্রী একটা অসমসাহসিক কাজ করল।

তেমন কিছু রোদ নেই তবু চোখ দুটো গরম, কান ঝাঁঝাঁ করছে। অনভ্যস্ত পায়ে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে শাড়ি। ধারকরা স্যাণ্ডালটার স্ট্র্যাপ যেন চামড়া কষে ধরেছে।

একা পথ চলার অভ্যাস নেই, ভয় ছিল ঠিক চিনতে পারবে কিনা। মল্লিকা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, বিশেষ অসুবিধা হ'ল না।

ঘড়িতে দেখল তখনো সিনেমা শুরু হতে মিনিট পনেরো দেরি। ধপ করে একটা কৌচে বসে পড়ল সাবিত্রী। মল্লিকার দেওয়া গন্ধ রুমালে মুখের ঘাম মুছল।

কিছুই লুকোয়নি আজ মল্লিকার কাছে। মন্মথর চাকরি না থাকার কথা; অভাবের কথা; উপোস দেওয়ার কথা। সব অহংকার, অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বলেছে, তোমার পায়ে পড়ি মল্লিকাদি, যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে দাও। নিজের জন্যে ভাবিনা। কিন্তু চোখের ওপর মেয়েটা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, সহ্য হয় না।

কী-কাজ করবে তুমি?

তাই-তো, কী কাজ। না-জানি ভাল লেখাপড়া, না সেলাই। টীচার হতে পারবে না, নার্স না, দর্জি না। কথাবার্তায় তুখোর নয় যে টেলিফোনে কাজ নেবে। অসীম প্রয়াসে সংকোচ জয় করে সাবিত্রী বলেছে, আচ্ছা সেদিন যে কাজটার কথা বলেছিলে সেটা হয় না? সেই যে সিনেমায়, ছোট্ট একটা পার্ট, মায়ের? শশাঙ্কবাবুকে একবারটী বলে দেখনা মল্লিকাদি।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল মল্লিকা। দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি বললেও হবে; কিন্তু তার চেয়েও একটা সহজ উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুমি রাজি হবে ভাই।

রাজি? হাসতে গিয়েও চোখ দু'টো আবার ভারি হয়ে এল সাবিত্রীর। ভিখিরির আবার বাছবিচার। আমার কিছুতেই ভয় নেই মল্লিকাদি। তুমি বল।

মল্লিকা বলল। সাবিত্রী এত যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তবু প্রথমটা কোন কথা বলতে পারল না। মল্লিকা জোর দিয়ে বলল, অন্যায় কিছু করতে বলছি না

তো, শুধু পাশে গিয়ে বসবে। আমার নামে টিকিট তো কেনাই আছে। আমি জোর করে বলছি সাবিত্রী, আমি বললে যা হত, এতে তার চেয়ে দশগুণ ফল হবে। নিজের কাজ নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হয় ভাই।

কী সম্মোহন ছিল মল্লিকার অকম্প স্বরে, অপলক চোখে, সাবিত্রীর অন্তস্তল অবধি কেঁপে উঠল। কূয়োর গভীর তলদেশে নির্জীব একটা কণ্ঠ যেন ভেসে উঠল : বেশ আমি রাজি, মল্লিকাদি। টিকিটখানা দাও।

তারপর চলে এসেছে এই ছায়ালোক বায়োস্কোপে। মন্মথ বেরিয়ে গেছে। তার অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত করেনি।

আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক পাশে এসে বসল। গদি-আসনে সারা শরীর কেঁপে উঠল সাবিত্রীর, জড়োসড়ো হয়ে বসল। বিস্মিত শশাঙ্কই প্রথম কথা বলল, আপনি ?

মল্লিকাদির শরীর খারাপ। আসতে পারলেন না। টিকিটটা নষ্ট হবে, তাই আমাকে—

অন্ধকার ঘরে পর্দার ওপরে ততক্ষণ ছবির নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। কী কথা বলছে ওরা, প্রেক্ষাগৃহে কখনো তুমুল হাসি, কখনো স্তব্ধতা। সেদিকে তো চোখ নেই সাবিত্রীর, সেদিকে কান নেই। গলা শুকনো, দেহ আড়ষ্ট, চোখে জ্বালা। এই বুঝি নিরালোকতার সুযোগে এগিয়ে এলো একখানি রোমশ হাতের ছোবল। এই বুঝি ওর কোমর জড়িয়ে ধরল একটি দুঃসাহসী লালসা। যতবার শশাঙ্ক নড়েচড়ে বসল, ততবার ভয়ে অন্যদিকে সরে গেল সাবিত্রী, কতবার যে পাশের হাতলে অন্যমনস্ক হাত রাখল, কতবার যে তুলে নিল, হিসেব নেই। একবার খসখস করে উঠল, মনে হ'ল শশাঙ্কর বাঁহাত কী যেন খুঁজছে এদিকে। প্রাণপণ প্রয়াসে শরীরটাকে শক্ত করল সাবিত্রী, মনটাকে প্রস্তুত করল, এমন সময় ফশ্ করে আলো জ্বলে উটল। আড়চোখে চেয়ে সাবিত্রী দেখল শশাঙ্ক একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বাঁ ধারের পকেটে এতক্ষণ দেশলাইয়ের বাক্স খুঁজছিল।

বুকের ভেতর থেকে রুমাল বার করে সাবিত্রী সন্তর্পণে কপালের ঘাম মুছল।

বিরতির আলো জ্বলতে উঠে গেল শশাঙ্ক, একটু পরে দু'টো আইসক্রীম নিয়ে ফিরে এল। একটা সাবিত্রীর হাতে দিয়ে বলল, কেমন লাগছে।

ঘাড় কাৎ করে সাবিত্রী অস্ফুটস্বরে কী বলল, নিজেই শুনতে পেল না।

বুঝতে পারছেন? প্রোগ্রাম কিনে দেবো একটা?

সাবিত্রী বলল, না।

কী অসুখ হয়েছে মল্লিকার।

থতমত খেয়ে সাবিত্রী বলল, বেশি কিছু না। এই—এই মাথাধরা আর কী।

আবার আলো নিবল। আবার সেই ছাইছাই ফিকে অন্ধকার, পর্দায় মুখর ছবির অবিরাম গতি, সেই দমবন্ধ ভয়, ঘামঘাম অস্বস্তি। কিছু বুঝল না সাবিত্রী, বুঝতে চাইল না, পাল্লা করে হাতলে হাত রাখল, তুলে নিল, সরে বসল, সরে এলও, বারবার একটা অগ্রসর পুরুষ হাতের স্পর্শ কল্পনা করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধ্বক ধ্বক শব্দ শুনল।

শেষ বারের মত আলো জ্বলতে সব লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রচালিতের মত সাবিত্রী অনুসরণ করল শশাঙ্ককে, বাইরে আসতে পাঁচমিনিটের বেশি লাগল।

শশাঙ্ক বলল, কিছু খাবেন?

না-বলতে গিয়েও সাবিত্রী কিছু বলতে পারল না, ওর কথা বলার ক্ষমতাই লোপ পেয়েছে। পর্দা ঠেলে একটা ছোট কামরায় বসল দু'জনে। শশাঙ্ক বলল, কী আনতে বলব।

অস্বচ্ছন্দ শুকনো গলায় সাবিত্রী কোনমতে বলল, এক গ্লাস জল।

শুধু জল? তা কি হয়। শশাঙ্ক কিছু খাবারও ফরমাস করল।

যতক্ষণ সিনেমার মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সাবিত্রী লক্ষ্য করেছে, ভয় করেছে শশাঙ্কের হাত দু'খানাকে; এবারে খাবারের টেবিলের তলা দিয়ে ওর পা দু'খানার দিকে নজর পড়ল। মিহিগিলে কোঁচাটা শুঁড়ের মতো লম্বা হয়ে একজোড়া চকচকে কালো নিউ-কাটের গন্ধ শুঁকছে। সেই মশ্‌মশ্‌ জুতো। সাবিত্রী কাঁপল, পা দু'খানার নিম্নতম প্রান্ত অবধি শাড়িতে ঢেকেও স্বস্তি হলনা, টেনে নিল চেয়ারের নিচে। তবু যেন চোখ বুঁজে অনুভব করল আরেক জোড়া পা নিঃশব্দে, গুটিগুটি এগিয়ে এসেছে; নতুন স্যাণ্ডালের ফিতেয় পায়ের পাতার যেখানটা কেটে গিয়ে জ্বালা করছে, তার ওপর সাবিত্রী যেন বারবার কঠিন একজোড়া নিউ-কাটের চাপ অনুভব করল।

শশাঙ্ক বলল, আপনার বুঝি সিনেমা দেখার বিশেষ অভ্যাস নেই?

এতক্ষণে সাবিত্রী সম্বিৎ ফিরে পেল। হঠাৎ মনে পড়ল, আসল কাজই বাকি রয়ে গেছে। যে জন্যে এত আয়োজন করে আসা, সেই কথাটাই বলা হয়নি শশাঙ্ককে।

বলল, না। আপনারা—আপনি তো খুব দেখেন, না?

আমি? আমাকে তো দেখতেই হয়। আমি সিনেমায় কাজ করি জানেন না?

ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। চায়ের পেয়ালায় শশাঙ্ক চুমুক দিচ্ছে আস্তে আস্তে। একটু পরেই বিল নিয়ে এসে দাঁড়াবে বয়। যা বলবার আছে সাবিত্রীর, এই বেলা।

তবু কি সোজাসুজি বলতে পারল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করল স্টুডিও সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক খবর। কেমন করে তোলা হয় ছবি, কথা গাঁথা হয় কি-করে। তারপর শুনতে চাইল, কী-কী ছবি উঠছে এখন।

শশাঙ্ক বলল, একখানা মোটে। তাও কাজ এগোচ্ছেনা। বাজার খারাপ। বারবার মার খেয়ে এ-ব্যবসা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে সবাই।

নিজে থেকে শশাঙ্ক প্রস্তাব করবে, সে আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! বিল চুকিয়ে দিতে শশাঙ্ক পাঁচ টাকার একখানা নোট দিয়েছে, খুচরো পয়সা এখুনি ফেরৎ নিয়ে আসবে বয়। আর সময় নেই।

মরীয়া হয়ে সাবিত্রী বলল, মল্লিকাদি বলছিলেন,—আপনাদের ছবিতে নাকি —নাকি একটা পা-পার্ট খালি আছে। লোক খুঁজছেন আপনারা।

স্মিতচোখ দু'টির ওপরে শশাঙ্কর ভ্রূজোড়া সন্নিহিত হয়ে এল: মল্লিকা বলেছে আপনাকে? কবে?

কিছুদিন আগে। জলে নেমে আর শীত নেই সাবিত্রীর। মাথা নীচু করে বলে যেতে লাগল আমাদের বড় অভাব শশাঙ্কবাবু। তাই ভাবছিলাম, আমি যদি···আমাকে যদি—

সিগারেট বার করে দেশলাইয়ের বাক্সে সজোরে বারবার ঠুকল শশাঙ্ক। বলল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, সাবিত্রী দেবী। মল্লিকাকে যখন বলেছিলাম তখন স্বাভাবিক ভাবে মায়ের পার্ট করতে পারে এমন একজনকে খুঁজছিলাম আমরা। তা কাজচালানো গোছের একজনকে দিয়েই সেরেছি। সে-বই তো তোলা হয়ে গেছে, এখন মুক্তিপ্রতীক্ষায় আছে।

সাবিত্রী বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু শেষ বাজি ধরার মত সুরে বলল, আপনাদের নতুন ছবিতে কোন পার্ট খালি নেই ?

আছে। কিন্তু মায়ের পার্ট তো নেই। একটি হিরোয়িন খুঁজছি আমরা। কিন্তু,—সাবিত্রীর মাথা থেকে পা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক বলল, কিন্তু, ক্ষমা করবেন সাবিত্রী দেবী, সে পার্ট আপনাকে দিয়ে বোধ হয় হবে না।

শশাঙ্কর চোখে নিজের চেহারার ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেল সাবিত্রী। লজ্জার জোয়ারে সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হল মুখে, পরমুহূর্তের ভাঁটায় আবার সব শুকিয়ে কাগজ সাদা হয়ে গেল। চুল উঠে যাওয়া প্রশস্ত কপাল, কালো রেখার পরিখার আড়ালে বসে-যাওয়া দু'টি নিষ্প্রভ চোখ, গালের উঁচু হাড়, প্রকট কণ্ঠাস্থি, শিরাবেরুনো লিকলিকে হাত, সমতল বুকের কবরে দু'টি বোঁটায় স্তনের এপিটাফ ; এ-চেহারা হিরোয়িনের সাজেনা, এ-কথা শশাঙ্ক চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে খেয়াল হ'ল, এই আশ্চর্য।

শশাঙ্ক বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এবার কিছু করতে পারলাম না। তবে আপনার কথা আমার মনে থাকবে। পরের ছবিতে যদি সুবিধে হয়, খবর দেবো।

একটা গাড়িও করে দিতে চেয়েছিল শশাঙ্ক, সাবিত্রী নেয়নি। দ্রুত পায়ে ফিরে আসতে আসতে দোকানের ঘড়িতে সময় দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, খুকি হয়ত উঠে খুব কান্নাকাটি করছে। মন্মথ নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে অনেকক্ষণ, সাবিত্রীকে না দেখে মুখ ওর কালো হয়ে গেছে। আজ আর রক্ষা নেই। মনশ্চক্ষে সাবিত্রী দেখতে পেল, দাঁতে ঠোঁট চেপে মন্মথ ঘরময় পায়চারি করছে, দু'হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ। সাবিত্রীকে দেখে কী করবে মন্মথ ? মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে ? বার করে দেবে গলাধাক্কা দিয়ে ? ওর হুকুম না নিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ানোর অপরাধের জন্তে চেঁচামেচি, কেলেঙ্কারি করবে ?

ঝোঁকের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল যখন, তখন এ-সব সম্ভাবনার কথা একবারো মনে হয়নি! সর্বনাশ হতে হলে মেয়েমানুষের কত মতিচ্ছন্নই না হয়।

দরজা খোলাই ছিল। খুকিকে বুকের উপর শুইয়ে মন্মথ ছড়া শুনিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সাবিত্রী কাপড় ছাড়ল, তখনো বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে।

সিনেমা ভাঙল ?

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ হাসি মুখে বলল, আরে, জানি জানি। এসে দেখি তোমার মল্লিকাদি খুকিকে লবেঞ্চুস্ বিস্কুট দিয়ে ঠাণ্ডা করছে। ওর কাছেই শুনলাম।

পরম প্রশান্ত মন্মথর মুখ, কী নিরুত্তাপ কণ্ঠ। পায়ের নথ দিয়ে মেঝে ঘষতে লাগল সাবিত্রী। এর চেয়ে মন্মথ সোজাসুজি ধমক দিলনা কেন, এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপের চেয়ে আঙুল দিয়ে গলা টিপে ধরলেও ভাল ছিল।

মন্মথ বলল, ভাল, ভাল। জুজু-বুড়ি হয়ে না থেকে নিজের পথ নিজে দেখছ, খুব ভালো। নীচু সুরে বলল, তা সুবিধে হল কিছু। শশাঙ্ক কিছু বলল ?

কী বলবে ?

এই ধরো কাজের কথা। কত রকম জানাশোনা ওদের, তোমাকে একটা কাজ তো জুটিয়ে দিতে পারত ? তা তুমিও কিছু বললে না ?

না।

হঠাৎ সোজা হয়ে মন্মথ বিছানায় উঠে বসল। কঠিন গলায় বলল, তবে গিয়েছিলে কেন। নিজের দরকারের কথা ভাল করে না বললে লোকে বুঝবে কেন ?

অত ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলার আমার অভ্যাস নেই।

মন্মথর বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। —অভ্যাস নেই! নেকি! কচি খুকি! নাক টিপলে দুধ গলে না ? কিসে নিজের ভাল হয়, তাও বোঝনা ?

শান্তস্বরে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, কিসে ?

সে কথার জবাব না দিয়ে মন্মথ বলল, শশাঙ্ক তোমাকে বাড়ীতেও পৌঁছে দিয়ে যেতে চাইল না ?

চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি।

চে-য়ে-ছি-ল। রা-জি হ-ই-নি। সাবিত্রীর কথাটারই প্রতিধ্বনি করে মন্মথ মুখ ভেংচে উঠল ; রাজি হওনি কেন ?

হলেই কি মান থাকত তোমার।

মান ধুয়ে জল খাও, পেট ভরবে। তীব্রস্বরে মন্মথ বলল, কী ক্ষতি হত তোমার শশাঙ্ক যদি গাড়ী করে বাড়ি পৌঁছে দিত ?

পলক পড়ছেনা, মনি দুটো জ্বলছে মন্মথর। সেই অগ্নিদৃষ্টির সঙ্গে চোখ

মেলাতে গিয়ে সাবিত্রী চমকে উঠল। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে মন্মথ ঠাট্টা করছেনা, সত্যিই বুঝি সে চেয়েছিল সাবিত্রী শশাঙ্কর সঙ্গে এক মোটরে আসুক।

একটু ছোঁয়াছুঁয়ির ঘুষ দিয়ে কাজ হাঁসিল হোক।

মন্মথ বলে যেতে লাগল, ওরা আমুদে লোক, একটু ফুর্তি চায়। খুশি হলে উপকারও করে। শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি করে সব মাটি করলে ?

ছুটে গিয়ে সাবিত্রী হাত চাপা দিল মন্মথর মুখে, তোমার পায়ে পড়ি, চুপ করো। বলে আর অপেক্ষা করলনা, টলতে টলতে পাশের ঘরে এসে মল্লিকার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। মল্লিকা পাশে এসে বসল তাড়াতাড়ি। কী হয়েছে সাবিত্রী, অমন করছ কেন।

জবাব শোনা গেল না। উপস্থিত কান্না রোধের প্রাণপণ প্রয়াসে সাবিত্রীর কণ্ঠ বিকৃত হয়ে গেছে। ওর পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মল্লিকা বলল, কী হয়েছে ভাই, আমাকে খুলে বল। সিনেমায় না জানিয়ে গিয়েছিলে বলে খুব বুঝি বকেছেন মন্মথবাবু ?

মাথা নেড়ে সাবিত্রী জানাল, না।

তবে ? কানের কাছে মুখ নামিয়ে মল্লিকা ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, তবে বুঝি সিনেমার হলে শশাঙ্ক বেশি বাড়াবাড়ি কিছু করেছে ?

বালিশে মুখ ডুবিয়ে সাবিত্রী তেমনি মাথা নাড়ল, তাও না।

তবে ?

এ তবেরও জবাব পেলনা। ফুপিয়ে ফুপিয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী। কী করে বোঝাবে কোথায় কাঁটা। এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার। মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনদিন বলা যাবেনা, কত বড় দু'টো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।

। —শ্রেষ্ঠ গল্প ।

সিড়িতে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে অতকথা হয় না। তাছাড়া সুধাংশুরও তাড়া ছিল। বললে পরে দেখা করবো। তুই তো এইখানেই চাকরি করিস?

পুরনো বন্ধুকে যতক্ষণ মুখোমুখি পাওয়া যায়। দিব্যেন্দু সাগ্রহে বললে হ্যাঁ, এই সিড়ি দিয়ে উঠে দোতলার ডানদিকের প্রথম ঘরটার পরে মিষ্টার মুখার্জি বললে চাপরাসী দেখিয়ে দেবে, নয়তো শিবলিঙ্গম-এর পি-এ বললে যে কেউ বলে দেবে আমি অপেক্ষা করবো। আসিস্ কিন্তু।

সুধাংশু ঘাড় নাড়লে। শুধু এই অফিসে নয়, এখানে বড় চাকরি করে দিব্যেন্দু? মিষ্টার মুখার্জি! পি-এ! আগে জানলে কাজ হতো। সুধাংশুর মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। দরখাস্ত করবার সময় যদি ঘুণাক্ষরে জানতো তাহলে আজ ইণ্টারভিউ-এ এ ধুকপুকুনি থাকতো না। দিব্যেন্দুর সহযোগিতায় শিবলিঙ্গমের লোক হয়ে যেত।—চাকরি ঠেকায় কে? এক ধমকে ডিরেক্টর অব পার্সোনেলের চক্ষুস্থির!

এমনি না হলে মনকে বোঝানো চলতো কিন্তু এখন না হ'লে আর বোঝানো যাবে না। দিব্যেন্দু যেখানে অমন চাকরি পায় সেখানে সে এই সামান্য চাকরিটা না পেলে লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকবে না। আর জানাজানি হয়ে গেলে লজ্জা আরো বাড়বে।

ওপরে উঠতে উঠতে সুধাংশু মনে মনে বললে, না, আর দেখা সাক্ষাৎ নয়—যে যেমন আছে তেমনি থাক্,—যেমন চুপিসারে এসেছে তেমনি চুপিসারে চলে যাবে ইণ্টারভিউ-এর পর। আর যদি কোনদিন দেখা যায় দিব্যেন্দুর সঙ্গে বলবে সময় পায়নি। ফুরিয়ে যাবে!

এণ্ডারসন হাউসের সিড়ি আর ফুরায় না। সুধাংশুর পা জড়িয়ে আসে। নিশ্চিত করে তার মনে হয়, আজ ইণ্টারভিউ-এ সে ফেল করবে নির্ঘাৎ। এখন থেকেই বুক টিপ টিপ করতে আরম্ভ করেছে। দিব্যেন্দুটা সব মাটি করে দিলে। মাঝখানে শনির দৃষ্টি দিয়ে গেল। সে জানতে চায়নি—ওর অত-কথা জানাবার দরকার ছিল কি? যত চাল।

তবু মনটাকে সুধাংশু কিছুতে স্থির করতে পারে না। প্রতি পদক্ষেপে অস্থির হয়ে ওঠে আপশোসে: তার বাল্যবন্ধু দিব্যেন্দু এখানে বড় চাকরি করে,

এত খবর নিলে আর ওটুকু খবর সংগ্রহ করতে পারলে না! চাকরিটা হাতের কাছে এসে ফসকে যাবে শেষ পর্যন্ত! হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে সুধাংশুর!

বলব নাকি একবার দিব্যেন্দুর কাছে? বলে আসবো এখানে আসার উদ্দেশ্যটা? শেষ মুহূর্তে ইনফ্লুয়েন্স করবে? শিবলিঙ্গমের মুখের কথা বা কলমের আঁচড় একটা: টেক হিম! ব্যাস্!

না, সুধাংশুর কোথায় যেন বাঁধে। দিব্যেন্দুকে ধরে চাকরি তার মনঃপুত নয়।

যে ভাবে হচ্ছে হোক। বাল্যবন্ধু যৌবনে প্রতিদ্বন্দ্বী—ঠিক কি, তার কথায় অমনি সে শিবলিঙ্গমকে নড়াবে। মনে মনে কৌতুক বোধ করবে নিশ্চয়। থাক্‌গে। বিনা সুপারিশে যদ্দূর হয়। নিজের চেষ্টায় যতখানি সম্ভব! ....

বন্ধুকে দিব্যেন্দু যথোচিত সম্মান করে নিজের ঘরে বসালে। হাত বাড়িয়ে সিগারেট দিলে। ঠাণ্ডা পানীয়ের অর্ডার দিলে।

এখন মনে হচ্ছে, তখন দিব্যেন্দুকে বললে হ'তো এ্যাণ্ডারসন হাউসে আসার উদ্দেশ্যটা। তারপর ও যদি কিছু করতো—

ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে সুধাংশু বললে, তুই কতদিন এখানে চাকরি করছিস্?

এখানে চাকরির কথাটা যেন বিশেষ লজ্জার—লুকিয়ে নেশা করার মত, দিব্যেন্দু চাপা দেবার মত বললে, তা হ'লো পাঁচ ছ' বছর।

দিব্যেন্দু হেসে বললে, আর বলিস্ কেন!

সুধাংশু গম্ভীর হ'য়ে গেল। বন্ধুর হাসিতে যোগ দিতে পারলে না। হয়তো তার বলবার কিছু নেই।

দিব্যেন্দু জিগ্যেস করলে, তারপর কেমন আছিস্? বহুকাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই, সেই কবে কলেজে সব পড়েছিলুম মনে আছে!

মনে আছে বলেই বোধ হয় এত আশ্চর্য বোধ করছে সুধাংশু আজ। সেই দিব্যেন্দু আর এই দিব্যেন্দু ভিন্ন মানুষ। দশ-বার বছরে সম্পূর্ণ বদলে গেছে, একটা চিরকেলে পেটরোগা ছেলের হঠাৎ স্বাস্থ্য ফেরার মত—বিশ্বাসই হয় না। দৈব, টোটকা-টুটকির ফল আর কি!

সুধাংশু বললে, সেইখানেই আছিস্ তো? কালীঘাট!

দিব্যেন্দু যেন আহত হ'লো। বললে, কালীঘাট, তবে সেখানটা নয়, অন্য বাড়ী।

সুধাংশুর মনে পড়লো, প্রকারান্তরে ওর খোলার বস্তির উল্লেখ করা উচিত হয়নি। অবস্থান্তরে বাসান্তর নিশ্চয়ই ঘটেছে। ধুতির বদলে প্যাণ্ট!

দিব্যেন্দু বললে, আয় না একদিন আমার ওখানে। গল্প হ'বে।

সুধাংশু অন্যমনস্কভাবে বললে, যাব।

আগ্রহ দেখিয়ে দিব্যেন্দু বললে, সত্যি আসবি? কবে? না, ভুলে যাবি!

আশ্বাস দিয়ে সুধাংশু বললে, না ভুলবো কেন। তবে কি জানিস এখন যে-যার ধান্দায় ব্যস্ত, সময় পায় না।

দিব্যেন্দু হয়তো বিশ্বাস করলে না, তাই চুপ করে রইল। পুরনো বন্ধুদের আর কাছে না-পাওয়ার কারণ বোধ হয় এ নয়।

সুধাংশু বললে, আর কারো সঙ্গে তোর দেখা হয়?

দিব্যেন্দু হতাশার সুরে বললে, হ'বে না কেন! কিন্তু ফিরে আর কেউ ওমুখো হয় না। দরকার ছাড়া আর কে নড়ে বেড়ায় বল্! দুটো মনের কথা বলবার লোক পাই না। ভাবি, আফিস না থাকলে বাঁচতুম কি করে!

সুধাংশু বন্ধুর মনোবেদনাটা বোঝে, বলে, দেখিস আমি ঠিক যাব। তখন—

দিব্যেন্দু পরখ করতে বললে, বেশ, আজই চল। আর ঘণ্টাখানেক পরে একসঙ্গে যাব। কেমন?

সুধাংশু তাড়াতাড়ি বললে, আজ নয়, আর একদিন নিশ্চয়ই যাব। আজ একটু—

দিব্যেন্দু অবিশ্বাসের সুরে বললে, ঐ হ'লো! শেষ পর্যন্ত আর হ'বে না। আমার জানা আছে।

সুধাংশু বন্ধুকে উৎসাহিত করতে বললে, তোর ওখানে সে-আড্ডা আছে তো? গান-বাজনা?

তৃতীয় ব্যক্তির মত দিব্যেন্দু বললে, হুঁ, গান-বাজনা! আসলে দেখতে পাবি!

হেসে সুধাংশু জিগ্যেস করলে, কি দেখবো? ও-পাঠ তুলে দিয়েছিস না কি?

আর এক দফা সিগারেট ধরিয়ে হাতের মুঠোয় আগুনটা বন্ধুর মুখের কাছে এগিয়ে আলগোছা ধরে' দিব্যেন্দু বললে, রেয়াজ নেই বহুকাল। আর কাকে নিয়ে হ'বে ওসব!

সুধাংশু বললে, কেন তোর বোন তো দিব্যি গাইতো।

দিব্যেন্দু আবার অন্যমনস্কের মত সিগারেটটায় দীর্ঘ টান দিলে। এদিক ওদিক আগুনের ফুলকি ছুটলো।

সুধাংশু জিজ্ঞেস করলে, সুনীতি গান ছেড়ে দিয়েছে না কি! তখনই তো কত মেডেল-কাপ পেয়েছিল। ক্লাসিক্যালে নাম করেছিল, অল্ বেঙ্গল।

দিব্যেন্দু জবাব না দিয়ে সিগারেট পুড়িয়ে হাসতে লাগল।

রহস্য ভেদ করতে সুধাংশু আবার প্রশ্ন করে, সুনীতির বিয়ে হ'য়ে গেছে বুঝি! তাই বল।

চাপরাশী ঘরে ঢুকে কি একটা কাগজ হাতে দিলে। দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়াল। বললে, বস্, সাহেবের ঘর থেকে আসচি।

সুধাংশু মনে মনে অপ্রস্তুত বোধ করলে একটু আগে অবান্তর প্রশ্নের জন্যে। দশবছর পরেও সুনীতি তেমনি অপ্রতিহতকণ্ঠে দাদার বন্ধুদের সামনে গান গাইবে? নিলাজ সুরচর্চ্চা করবে? মাথা খারাপ না হ'লে কেউ এ প্রশ্ন করতে পারে! পনের ষোল বছর মেয়ের পক্ষে যা গুণ পঁচিশ ছাব্বিশ বছরে তা তো দোষে দাঁড়ায়!

কিন্তু বড় ভাল গান গাইতো সুনীতি। গান-বাজনায় দিব্যেন্দুদের বাড়ীর আবহাওয়াটাও বড় লোভনীয় ছিল। সুখসামাধা কত গান যে সুনীতি গাইতো, বড় মিষ্টি গলা আর দরদ ছিল সে গানের। সুধাংশুর মত যারা গানের 'গ' বোঝে না তারাও গান-পাগলা হ'য়ে যেত। খোলার চালের আকাশ অনুরাগে কাঁপতো। কোনদিনই মনে হ'তো না সুধাংশুদের—বস্তির একটা এঁদোপড়া ঘরে তারা অবসর কাটাচ্ছে। দিব্যেন্দু মাথা নেড়ে নেড়ে তবলা বাজাতো, সুনীতি সামনে বসে অপ্রতিভ কণ্ঠে গান গাইতো, আর দিব্যেন্দুর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এদিক ওদিক বসে থাকতো চুপ করে। মাঝে মাঝে দিব্যেন্দুর মাকে দরজার সামনে দেখা যেত। দরিদ্রের স্বর্গ অপূর্ব মনে হ'তো। সুধাংশুর মত অনেকে বলতো দিব্যেন্দুকে—বোনকে কোনদিন গান ছাড়াস্নি—খুব করে গান শেখা।

তা দিব্যেন্দু সাধ্যমত বোনকে গান শিখিয়েছিল। দশ বছর আগে অনেক মেডেল কাপ, সার্টিফিকেট যোগাড় করেছে সুনীতি। ক' বছর দিব্যেন্দুর বোনের নামও শোনা গিয়েছিল। গীত-রসিকদের মুখে-মুখে। মেয়েটি ভাল গায়। তারপর আর কোন খোঁজখবর রাখেনি সুধাংশু।

ছি ছি, বড় অসভ্যতা হ'য়ে গেল, দিব্যেন্দু নিশ্চয়ই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে।

ফিরে এসে দিব্যেন্দু বললে, কি বলছিলি ? গান ?

সুধাংশু বন্ধুর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে। অন্যমনস্কভাবে দিব্যেন্দু বললে, আসিস্ শোনাব।

সুধাংশু বিস্ময় প্রকাশ করলে, সুনীতি এখনো গান গায়। বিয়ে হয়নি ?

দিব্যেন্দু ফাইল পড়তে পড়তে বললে, গায় না, বললে গায়। তোর সামনে গাইবে।

সুধাংশু সাহস ক'রে আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না। দিব্যেন্দুর কথার সুরটা যেন কেমন-কেমন। বোনের সম্বন্ধে আশানুরূপ ফল পায়নি সে। সুধাংশুর মনে কেমন খট্‌কা লাগে, এত বয়েস পর্যন্ত সুনীতির বিয়ে হয়নি ? দিব্যেন্দু তো মন্দ রোজগারপাতি করে না।

সুধাংশু বললে, তুই বিয়ে করেচিস ?

দিব্যেন্দু জবাব দিলে, না, তুই ?

সুধাংশু বললে, করে !

দিব্যেন্দু জিগ্যেস করলে, ছেলে-পুলে ?

পাঁচটি।

শিউরে উঠে দিব্যেন্দু বললে, করেচিস কি ? অ্যাঁ।

আর-র ! অপ্রতিভ বোধ হয় সুধাংশুকে।

দিব্যেন্দু রহস্য ক'রে বলে, ম্যানেজ করিস কি করে। যা রোজগার করি আনতে আনতেই ফুরিয়ে যায় ;

সুধাংশু বললে, গরীবরা যে ক'রে ম্যানেজ করে—এখানকার জল ওখানে, ওখানকার জল এখানে আর কি !

খোঁচাটা দিব্যেন্দু বুঝলে, নিজেকে সংশোধন করে নিলে, না, তা নয়। আজকাল একার চালানই দায়, তায়—সত্যি বলচিস তোর পাঁচটা ছেলে-মেয়ে ? যাঃ !

সুধাংশু হাসলে। সত্যি না তো মিথ্যে, আমার ছেলেপুলের ভার তো আর পাঁচজনে নেবে না ! মিথ্যে বলে লাভ ?

অনেকে রগড় করে' বলে কি না ! দিব্যেন্দু হাসতে লাগল। তোকে দেখে। কিন্তু মনেই হয় না। বরং আগের চেয়ে তোর চেহারটা ভালই হ'য়েচে।

সুধাংশু সঙ্গে সঙ্গে বললে, না হ'লে পাঁচটি সন্তানের পিতা বলে মানাবে কেন। Father's personality !

দিব্যেন্দু মুখে একরকম শব্দ করলে বন্ধুর কথায় কৌতুক অনুভব করে।

সুধাংশু জিগ্যেস করলে, তুই বিয়ে করবি না ? নাকি confirmed ?

দিব্যেন্দু অন্যমনস্কের মত বললে, বোনটার একটা ব্যবস্থা করি আগে। সত্যি কথা বলতে কি যত দেখছি তোদের ঐ বিয়ের ওপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। যত সব—

ইংরেজী গালটা দিব্যেন্দু স্পষ্ট উচ্চারণ করলে না। তবে বোনের বিয়ের ব্যাপারে সংসারটাকে সে চিনে নিয়েছে বোঝা গেল।

সুধাংশু বললে, সুনীতি তো দেখতে ভাল। এতদিনে বিয়ে হলো না, আশ্চর্য ! তুই ঠিকমত চেষ্টা করিস্‌নি, না হ'লে—

দিব্যেন্দু বাধা দিলে, চেষ্টা করিনি মানে ! তা বলে তো আর জেনেশুনে একটা worthless-এর হাতে বোনকে তুলে দিতে পারি না। যে নিজের দর বোঝে না, সে আমার বোনের সেন্টিমেণ্ট বুঝবে কি করে' ! বাংলা দেশে একটা ছেলেরও শিরদাঁড়া নেই, বিয়ে করবে !

দিব্যেন্দু হয়তো বলতে পারে ও কথা। শিরদাঁড়া না থাকলে তার মত কেউ নিজের চেষ্টায় এতটা উন্নতি করতে পারে না। এই অফিসের কর্তার পি-এ। তার ওপর আরো হয়তো কত কি !

সুধাংশু আমতা আমতা করলে, বোনের বিয়েতে কত খরচা করতে চাস !

খোলাম কুচি গোনার মত দিব্যেন্দু বললে, পাঁচ দশ, বিশ হাজার Anything for a right groom !

সুধাংশুর চক্ষুস্থির, বলে কি দিব্যেন্দু ! মনে হ'লো ধরাটাকে সরার মত ধরে' ফেলে দু'পায়ে থেঁৎলে কুচি-কুচি করে' ভেঙ্গে দিব্যেন্দু সবাইকে ডেকে বলছে, চলে আ-ও কে কত চাও-ও !

এর পর আর কথা চলে না, বা বোনের বিয়ের জন্যে যে দিব্যেন্দুর কোন চাড় নেই একথা বলা যায় না। দশ-বিশ হাজার টাকা যে খরচ করবে সে পাত্র বাজিয়ে নেবে বই কি ! হলেই বা বোন।

মনে মনে সুধাংশু ঈর্ষান্বিত হয়। তুলনায় সে আর কি করতে পেরেছে এক চাকরির পর চাকরি বদল করা ছাড়া। দিব্যেন্দু শুধু ভাল চাকরিই করেনি,

বোনের বিয়ের জন্য দস্তুরমত টাকা জমিয়েছে এই ক'বছরে। দিব্যেন্দুর বাবা এই সেদিনও কালীঘাটের যাত্রী ধরতেন আর ডালার কমিশনে সংসার চালাতেন। টুইশানি করে' দিব্যেন্দু নিজের পড়ার খরচ চালাতো।

সুধাংশু মুখে বললে, আমি দেখবো সুনীতির জন্যে পাত্র।

দিব্যেন্দু খুব বাধিত হলো বলে মনে হ'লো না। এমন একটা ভাব করলে যেন জুতো মেরে বোনের পাত্র যোগাড় করবার ইচ্ছে তার।

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে দিব্যেন্দু একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলে আধুনিক বাঙালী হিন্দু সমাজের অবনতির সম্বন্ধে। মাথার টিকি থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পচ ধরেছে—ছেলের বাপ, আত্মীয়-স্বজনেরা সব অন্ত্যজ, ছোটলোক। তার বোনের বিয়ে না হোক, এ সমাজের আর আশা নেই।

এত কথায় দিব্যেন্দুর রাগের ঠিক কারণটা সুধাংশু ধরতে পারে না। অপছন্দ করার মেয়ে নয় সুনীতি, তার ওপর ভাই-এর টাকা দেবার ক্ষমতা আছে, অথচ এতদিন বিয়ে হয়নি। রহস্যের মত মনে হয় সুধাংশুর।

কে জানে এর জন্যে দিব্যেন্দুর টাকার গরম দায়ী কি না। হয়তো উৎসুক পাত্রপক্ষের সামনে অমনি গরম-গরম বক্তৃতাও করে। কুটুম্বিতা করতে পাত্রপক্ষ স্বভাবতই ভয় পায়।

এমনি একটা যোগ্য ভায়ের অভিভাবকত্বে পড়ে সুনীতির অবস্থাটা কি রকম হ'য়েছে ভেবে সুধাংশু বিশেষ খুশী হ'তে পারে না। চোখে না দেখলেও সুদীর্ঘ কুমারী জীবনের অপ্রকাশ্য বেদনার একটা রূপ সুধাংশুর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরমুখাপেক্ষী সুখের, পুলক-আনন্দের, আশা-দ্বন্দ্বের ব্যর্থতা! হয়তো সুনীতির মুখে সেকথা লেখা হয়ে গেছে এতদিন।

দিব্যেন্দু বললে, সুনীতিকে আমি বলি—এই নে টাকা, চলে যা থিয়েটার, খেলার মাঠ যেখানে খুসী তোর। ট্যাক্সি-ফিটন তোর যাতে খুসী। বিয়ে না হ'লে কি জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে? No......Never!

যুক্তি দিয়ে হয়তো কথাটা গ্রাহ্য সুধাংশুর মন স্বীকার করুক বা না-করুক।

সুধাংশু মুখে বললে, তা বটে। বিয়ে ছাড়া কি মেয়েদের কাজ নেই!

দিব্যেন্দু বোধ হয় উৎসাহিত বোধ করলে, বলি পড়া-শোনা করতে। তাতেও ডিসট্রাকসন হ'বে। কি বই চাই, যা চাইবে হাতের কাছে পাবে! বোনের জন্যে করতে কিছু বাকি রাখিনি।

সুধাংশু বিশ্বাস করে। ভাইএর কর্তব্য দিব্যেন্দু করছে। বলবার কি থাকতে পারে ভেবে পায় না। নেহাৎ নিন্দুক না হলে কোন দোষ ধরতে পারবে না।

হঠাৎ দিব্যেন্দু এমন নীরব হ'য়ে যায় যে সুধাংশু অস্বস্তি বোধ করে। মনে করে প্রসঙ্গটা না তোলাই ভাল ছিল। ওদের সুখদুঃখ ওদের থাকাই ভাল, ওদের জীবন ওরা যেভাবে পারুক যাপন করুক। সুধাংশুর এ কৌতূহল বোধ হয় অমার্জনীয়।

কথা ঘুরতে সুধাংশু বললে, তা হ'লে ভালই আছিস বল। চাকরিটা খুব বাগিয়েছিস!

দিব্যেন্দু হাসলে: কোন মানে হয় না। আজ দু'বছর ধরে বস্ স্তোক দিচ্ছে—মিস্টার মুখার্জি তোমার একটা ব্যবস্থা করবো! পাঁচশো টাকায় পচে মরতে হবে শেষ পর্যন্ত!

সুধাংশু বিস্ময়ে হতবাক, তার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম বাঙালী ছেলের পাঁচশো টাকায় পচে মরার খবর শুনলে। না, নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই।

জানা-শোনা কেউ এখানে আসতে চাইলে তাই বলি কেন আসবে, এ আবার একটা জায়গা!—ওর চেয়ে আমেরিক্যান গুড্‌স্ ফিরি করা ঢের ভাল। রটন্!

ভাগ্যিস সুধাংশু এতক্ষণে তার এখানে আসার হেতুটা প্রকাশ করেনি। শুনলে দিব্যেন্দু না জানি কি বলতো মুখের ওপর—ইণ্টারভিউ পাওয়ার চেয়েও তা পরিতাপের হ'তো। মানে মানে চেপে গেছে ভালই করেছে সে।

ভয়ে ভয়ে সুধাংশু বন্ধুর কাছে বিদায় নিলে: আজ উঠি। শিগগীর একদিন যাবো তোর ওখানে। ঐতো তেল কলটার ওপর দোতলা বাড়ী? ঠিক আছে।

দিব্যেন্দু মাথা নেড়ে সিগারেটের টিনটা বন্ধুর সামনে এগিয়ে ধরলে।...

দিন দুয়েক পরে একদিন সন্ধ্যেবেলায় সুধাংশু সত্যি সত্যি দিব্যেন্দুর বাড়ী এল। রাস্তা থেকে সোজা ওপরে উঠে এসে কড়া নাড়লে। একটা কৌতুককরতায় দোরের সামনে অপেক্ষা করলে—দরজা খুলে যে-কেউ দেখবে সে-ই অবাক হবে, এতদিন পরে সুধাংশুকে পথ ভুলে এদিকে আসতে দেখে। এ বাড়ীর সিঁড়ির ঘুলঘুলি জানালা দিয়ে নীচে খোলার চালের বস্তিটা এখনো হয়তো চেষ্টা করলে দেখা যায়। একটু ওলোট-পালট হয়েছে দৃশ্যটার—আগে ঐ খোলার চালের বস্তি থেকে চোখ তুলে এদিকে তাকাতে হতো, (নতুন বাড়ীটা

দক্ষিণটা হাত করে নিয়েছে) এখন তলার দিকে নজর দিলে তবে বস্তিটা দেখা যায়। গা-ছড়া গলিটা পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে, গ্যাসপোস্টটা নেড়া-নেড়া।

সুধাংশু বার কয়েক রুমালে মুখ মুছে নিলে। ওপরে সিঁড়ি পথটা বড় নির্জন, এখন তাকে এভাবে দেখলে যে-কেউ সন্দেহ করতে পারে। নীচে তেলচিটে শব্দটা বন্ধ হয়ে অস্বস্তিটা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সুধাংশু কড়ায় ঝাঁকানি দিলে।

দিব্যেন্দুই দরজা খুললে। আরে, তুই! আয়, আয়!

ঢুকেই বসবার ঘর। দিব্যেন্দু চাল মারেনি। দেখে-শুনে সুধাংশুর বিশ্বাস হয় দিব্যেন্দুর সুসময়ের কথা। আলমারী-ভর্তি চকচকে নতুন বই, টেবিলে ফুলপাতা কাটা কভার, ফুলদানিতে শুকনো রজনীগন্ধা। চিনেমাটির এ্যাশট্রে!

এদিক ওদিক চেয়ে সুধাংশু বললে, কত ভাড়া দিস্?

অন্দরের দিকে পর্দাটা ফেলে দিয়ে এসে দিব্যেন্দু বললে, আশি টাকা! প্লাস পাঁচশো টাকা সেলামী!

সুধাংশু বিস্ময় প্রকাশ করলে, ইস্-স্! কখানা ঘর?

ওন্‌লি থ্রি! একেবারে চোর, গলাকাটা! বাড়ীঘর আছে নাকি তোর সন্ধানে?

সুধাংশু অক্ষমতার হাসি হাসলে নিঃশব্দে। একটা অবাস্তব কথা অসংখ্য মুখে শুনে শুনে ঘোড়ার ডিমের মত অবিশ্বাস্য।

দিব্যেন্দু বললে একটা প্রবলেম! ক' বছর কত লোককে যে বলেছি তার ঠিক নাই। দেখিস্ যদি পাস।

সুধাংশু মাথা নাড়লে। বললে, দক্ষিণটা বেশ খোলা।

দিব্যেন্দু বললে, বস্তিটার জন্যে। ভাগ্যিস্ মাথা তোলেনি!

তোরই সুবিধা! টাকার কিছুটা তবু উসুল হয়। সুধাংশু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাইলে।

দিব্যেন্দু কি বুঝলো কে জানে, বললে, তা যা বলেচিস্। পাখার দরকার হয় না।

সুধাংশু শ্লেষ করলে, একটা খরচ তো বে'চেচে!

দিব্যেন্দু চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কাটে। দেখে মনে হয় না, উভয়ে উভয়ের সান্নিধ্যে বিশেষ সুখী হয়েছে। অনভিপ্রেত না হ'লেও আগ্রহশীল নয় এই সাক্ষাৎকার। ডেকে-এনে অপমান করার মত

মনে হয় সুধাংশুর। কথা কইবার যদি কিছু নাই থাকে তা হ'লে বাড়িতে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলি কেন? আশ্চর্য লাগে দিব্যেন্দুর ব্যবহারটা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর সুধাংশু বললে, আজ উঠি।

দিব্যেন্দু কেমন যেন এক ধরণের গম্ভীর হ'য়ে বসে আছে। হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। সুধাংশু আবার বললে, আজ চললুম। একদিন আমার ওখানে আসিস্!

হঠাৎ যেন দিব্যেন্দুর খেয়াল হ'য়েছে, সুপ্তোত্থিতের মত বললে, এরি মধ্যে! চা খাবি না?

সুধাংশু বললে, না থাক, আর একদিন খাওয়া যাবে। দেখে তো গেলুম বাসা!

দিব্যেন্দু জেদ করলে, না, বস, চা আনাচ্ছি। বলেই চট করে পর্দা ঠেলে ওঘরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপডিস্ হাতে করে বেরিয়ে এসে ত্রুটি-স্বীকারের ভঙ্গিতে বললে, এক মিনিট।

ঘর থেকে দিব্যেন্দু বেরিয়ে গেল। আগাগোড়া ব্যাপারটা সুধাংশুর রহস্যের মত মনে হ'লো। হঠাৎ কাপডিস্ হাতে করে দিব্যেন্দু গেল কোথায়? সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তবে কি নীচের দোকান থেকে বন্ধুর জন্যে চা আনতে গেল? বাড়িতে অতিথির জন্যে চা হয় না সময়-অসময়ে? আশ্চর্য! দিব্যেন্দুর মা তো আছেন? সুনীতিও তো আছে! এককাপ চা করে-দেবার সৌজন্য বোধ করে না।

একলা-একলা বসে থেকে সুধাংশুর অদ্ভুত মনে হয় এদের অবস্থান্তর। নীচ থেকে ওপরে উঠে মানুষগুলো এলোমেলো হ'য়ে গেছে—বাসা বদলে আসবাবপত্র তছরূপ হওয়ার মত। গোটা জিনিষ ভেঙে যাওয়ার মত।

সুনীতিও ভুলে গেল? আজ না হয় দেখা নেই, কিন্তু এককালে তো কত ঘনিষ্ঠতা ছিল? এক পরিবারের লোকের মত সুধাংশু কত মেলামেশা করেছে। ওদের সুখদুঃখের স্পন্দন সাগ্রহে, সমবেদনার সঙ্গে অনুভব করেছে? এমনও দিন গেছে যখন একসঙ্গে বসে শাকান্ন হাসিমুখে খেয়েছে। ঘরের লোকের মত সুধাংশুকে দিব্যেন্দুর পরিবারের সকলে মনে করতো।

আজ তাই এভাবে বাইরের লোকের মত বসে থাকতে সুধাংশুর অভিমান হয়। ব্যবহারটা ঠিক উপেক্ষা কি না বুঝতে পারে না। এতদিন পরে সামনে

আসতে সুনীতির যদিও লজ্জা হয়, দিব্যেন্দুর মারও কি সঙ্কোচ হবে ? নিশ্চয়ই আজকাল নিজেদের ভিন্ন জগতের জীব বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। ছেলের পয়সায় মার মাথা ঘুরে গেছে।

সুধাংশুর ভাল লাগে না এভাবে চোরের মত অপেক্ষা করতে, একবার ভাবলে, চুপি চুপি স'রে পড়ে। উঠলোও সুধাংশু। দোরের চৌকাঠে পা দিতেই হঠাৎ বিকট একটা শব্দ পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত অসাড় করে' দিলে। সুধাংশুর গা বমি-বমি করে' উঠলো। টলতে টলতে চেয়ারে এসে বসলে। ভেতরের দিকে পর্দাটা নিঃসাড়—গলায় দড়ির মত ঝুলছে। গোঁ গোঁ করে' শব্দটা এখনো হ'চ্ছে—সুধাংশুর মনে হ'চ্ছে তার মাথার ওপর কে যেন তুরপুন বসিয়ে দিয়েছে। নীচের তলায় ইলেক্‌ট্রিকের ঘানিটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। সরিষা-নিঃসৃত খাঁটি তৈলের কল—বেরিবেরি হয় না, দি মডেল ঘানি !

তবু সুধাংশু দু-তিনটে সম্বন্ধ নিয়ে গিয়েছিল সুনীতির জন্যে। নাম-ঠিকানা পরিচয় রেখে এসেছিল দিব্যেন্দুর কাছে। বয়স্থা মেয়ের উপযুক্ত ঘর-বর। আশ্চর্য কোনোটাই দিব্যেন্দুর পছন্দ হয়নি। সেই এক কথা, রটন্‌! এ সম্বন্ধের আশা নেই। ছেলের বিয়েতে বাপের দালালি অসহ্য! বিয়ে না ব্যবসা! আরো অনেক টিটকিরি দিব্যেন্দু করেছিল।

সুধাংশু ঠিক বুঝতে পারে না দিব্যেন্দুর মনোগত ভাবটা কি, বোনের বিয়ে দেবে, না, সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করবে ? কি চায় ও ? পাগল না উন্মুক ?

বিরক্ত হ'য়ে সুধাংশু হাল ছেড়ে দিলে। উপযাচক হ'য়ে বক্তৃতা শুনে লাভ কি ? আর দিব্যেন্দুর যখন গা নেই তখন তারই বা এত আগ্রহ কেন ! ওর বোনকে নিয়ে ও যা খুশী করুক, কার কি ! যথেষ্ট বন্ধুকৃত্য হয়েছে !

সুধাংশু আর কোন খোঁজ-খবর নেয়নি। একটা সাময়িক ঘটনা বলে যেন ব্যাপারটা ভুলে গেছে। অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মত এ-ও এক অভিজ্ঞতা ! মন্দ কি !

কিন্তু এ্যাণ্ডারসন হাউসের কথা সুধাংশু ভোলেনি। ইণ্টারভিউ-এর ফলাফল এখনো জানতে পারেনি।

সেদিন যদ্দুর মনে হয়েছিল, বোর্ড ইম্প্রেসড হয়েছিল। চাকরিটা তার হ'লেও হ'তে পারে।

দেখতে দেখতে তিন চার মাস কেটেও গেছে। একদিন সুধাংশু ব্যাপারটা

যথা লাভ হিসেবে সুধাংশু নিঃশব্দে খাবারগুলো গলাধঃকরণ করতে লাগল। আর ঘুষ হ'লেই বা তার আপত্তির কি, সে তো কোন লেখাপড়া করে দিচ্ছে না যে, সুনীতির মনোমত পাত্র সে যোগাড় করে দেবে!

আজ দিব্যেন্দুকে সুধাংশুর অন্যরকম মনে হ'চ্ছে। নিজের কাজের জন্যে সে যেন কিছুটা অপ্রতিভ, দ্বিধাগ্রস্ত বন্ধুর সামনে!

আপ্যায়নের পর কিছুক্ষণ বসে, সুধাংশু উঠে দাঁড়াল, চল্‌লুম।

দিব্যেন্দু সিগারেট দিয়ে বললে, আর একদিন আয় না আমার ওখানে, তোকে সব বলবো।

হঠাৎ দিব্যেন্দুর ভাবান্তরটা সুধাংশুর বোধগম্য হয় না। কি এমন অপরাধ করেছে যে, বুঝিয়ে বলবার দরকার করবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুধাংশু মুখে বললে, আসব। সন্ধ্যে বেলায় থাকিস তো?

বন্ধুকে এগিয়ে দিতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে দিব্যেন্দু বললে, অফিস ছাড়া সব সময়।

সিঁড়ির মাথায় এসে দিব্যেন্দু দাঁড়ালে। কি যেন এতক্ষণ সে বলতে ভুলে গিয়েছিল, হঠাৎ বললে, বড্ড খরচ বেড়েচে ভাই, আর পারি না!······এখানেও আর কোন আশা নেই, চেয়ারম্যান বদলী হ'য়ে যাচ্ছে!

সুধাংশুর বিশেষ আগ্রহ নেই এ খবরে। দু' ধাপ সে নেমে এল। মিছি-মিছি সময় নষ্ট।

দিব্যেন্দু বন্ধুকে শুনিয়ে বললে, কত টাকা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে-এ দিতে হয় জানিস?

সুধাংশুর জানবার কথা নয়। তবু জানবার জন্যে নামতে নামতে থমকে দাঁড়াল।

বড় আতান্তরে পড়েছে দিব্যেন্দু, বললে, একশ' টাকা······ · বিয়ে করেচি, ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে তো!

সুধাংশু আর দাঁড়ালে না, তর তর করে নেমে গেল। স্বার্থপরের একশেষ! সুধাংশুর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, বোনের ভবিষ্যতের ভাবনাটা আগে ভাব, হামবাক্ কোথাকার!

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে দিব্যেন্দু বললে, আস্‌ছিস্ তো!

বিনিয়োগ

কর্মব্যস্ত অফিস-চত্বরে শব্দটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল—নিম্নগামী সোপান-শ্রেণীর মুখ-গোঁজ! হঠাৎ দিব্যেন্দুর পা দুটো যেন কেঁপে উঠলো থর থর ক'রে—তিনতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লে বোধ হয় বাঁচা যাবে না। মাঝপথেই দম আটকে যাবে।......

বন্ধুর বউ দেখতে কি, সুনীতির একটা সম্বন্ধ নিয়ে সেদিন সুধাংশু আবার দিব্যেন্দুর বাসায় এল। অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে সে খানিকক্ষণ। কড়া নাড়ার আগে ইতস্ততঃ করলে কিছুক্ষণ। দিব্যেন্দুর বাড়ীতে এখন নতুন মানুষ এসেছে। আপনা থেকেই কিছুটা সঙ্কোচ আসে।

আস্তে আস্তে বার দুই কড়াটা নাড়লে সুধাংশু আলগোছে—কেউ যদি শুনতে পেয়ে খুলে দেয় তো ভালই, নচেৎ নিজের আগমন-বার্তাটা সশব্দে বিঘোষিত করবার তার তেমন ইচ্ছে নেই। অপেক্ষা করতে পারে সে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ।

কিন্তু মিনিট পাঁচেকেও ওদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সিঁড়ির অন্ধকারে ভূতের মত অপেক্ষা করে' লাভ নেই—সুধাংশু জোরে জোরে কড়ায় ঝাঁকনি দিলে।

দরজা খুলতে সুধাংশু সঙ্কোচে পাশে সরে দাঁড়াল। সামনে নারী-মূর্তি, নীরব। একটা অপ্রস্তুত ভাব উভয়ের মাঝখানে থমথমে। সুধাংশু বললে, দিব্যেন্দু আছে?

সুনীতি অস্ফুটে বললে, আসুন!

আহ্বানকারিণীকে সুধাংশু হয়তো চিনতে পেরেছে, হয়তো চিনতে পারেনি। কণ্ঠস্বরে হৃদয়ের হৃদ্যতায় কেমন যেন সে থতমত খেয়ে গেছে।

দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে সুনীতি সপ্রতিভ কণ্ঠে বললে, আসুন, ভেতরে আসুন! দাঁড়িয়ে কেন?

সুধাংশু এতক্ষণে যেন সপ্রতিভ হলো: দাদা নেই?

সুনীতি মাথা নাড়লে। দিব্যেন্দু বাড়ী নেই।

সুধাংশু বললে, বলো আমি এসেছিলাম।

সুনীতি জিগ্যেস করলে, বসবেন না? হয়তো দাদা এক্ষুনি ফিরতে পারে। আসুন না!

কি মনে হ'লো সুধাংশুর, বললে, চল বসি।

ভেতরে ঢুকে সুধাংশু স্পষ্ট দেখলে সুনীতিকে। মুখাবয়বের জন্যই কেবল চেনা যায়। বয়সের স্বাভাবিক সৌন্দর্যটা কেমন যেন ম্লান হ'য়ে গেছে—অনেকদিনের ফোটাফুল বৃন্তচ্যুত না-হওয়ার মত। বিষণ্ণ কুসুমের মত।

সুধাংশু জিগ্যেস করলে, ভাল আছ ?

ম্লান হেসে সুনীতি বললে, হ্যাঁ। আপনি ভাল ?

উত্তর দিয়ে আর কিছু হয়তো জিগ্যেস করা যাবে না, সুধাংশু চুপ করে রইল। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয় তার ?

সুনীতিরও কি কিছু মনে হচ্ছে দাদার বন্ধুর সামনে ? সঙ্কোচ ছাড়া নিজেকে নিয়ে কোন লজ্জা ?

তবু এই নীরবতায় একটা হৃদ্যতার, আত্মীয়তার ভাব-বিনিময় যেন হয় উভয়ের মধ্যে, মাঝে মাঝে চোখ তুলে সুধাংশু সুনীতির আপাদমস্তক লক্ষ্য করে। সুনীতি অপরাধীর মত প্রতীক্ষা করে।

সুধাংশু জিগ্যেস করলে, দাদা কোথায় গেছে ?

সুনীতি উত্তরটার জন্যে যেন নিজের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য বোধ করলে। মুহূর্তের জন্যে হলেও সুধাংশুর দৃষ্টি এড়াল না। ভ্রু-কুঞ্চনে কি ফুটেছে ?

সুধাংশু আবার জিগ্যেস করলে, ফিরবে তো !

একটা নিষিদ্ধ কথা যেন অপরিচিত কারো সামনে প্রকাশ করা হচ্ছে, সুনীতির কণ্ঠ বোধ হয় কাঁপলো : দাদার শ্বশুর-বাড়ী থেকে গাড়ি এসেছিল বৌদিকে নিয়ে ......হয়তো কোথাও—

প্রকম্পিত কণ্ঠ অসহায় দৃষ্টিতে বড় অসহায় মনে হ'লো। সুধাংশু সুনীতির মুখের দিকে তাকাতে পারলে না।

সুধাংশু অন্য কথা পাড়লে, মা কোথায় ?

মা মন্দিরে গেছেন। সুনীতির গলা কাঁপছে।

তুমি তা হলে একলা আছ ! সুধাংশু সুনীতির সাহসের তারিফ করে যেন।

একলাই তো থাকি ! হাসতে চেষ্টা করে সুনীতি বললে।

ঘরোয়া হ'তে সুধাংশু জিগ্যেস করলে, আজকাল গানটান গাও না ?

হঠাৎ হাসি মিলিয়ে গেল, সুনীতি বললে, শুনবে কে ?

কেন, নিজে !

সব জিনিস কি নিজের জন্যে হয় ?

প্রশ্নটায় যেন কিছু অভিযোগ আছে, সুধাংশু চেয়ে দেখলে সুনীতির চোখদুটো কেমন নিষ্প্রভ।

তা হয় না, তা বলে ছাড়তে হ'বে! বেশ তো গাইতে!

সুনীতি নিরুত্তর। মনে হ'চ্ছে দাদার বন্ধুর এই অহেতুক আগ্রহে সে কৌতুক অনুভব করছে। এসব আলাপের কোন লাভ নেই। হয়তো দুঃখ বাড়ে কারো।

পর্দাতে ছবি-আঁটার মত স্থির, নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সুনীতি। সুধাংশুর কথাও ফুরিয়ে গেছে। অনেক কথা জিগ্যেস করবার ছিল, সব যেন গোলমাল হ'য়ে গেল, সুযোগমত বলাও হলো না কিছু। কি জানি কেন সুধাংশুর মনে হলো, দিব্যেন্দুর অবর্তমানে কুশল প্রশ্ন ছাড়া আর কোন প্রশ্ন করাই অশোভন। উপযাচক উপচিকীর্ষার কোন মূল্য নেই। পক্ষান্তরে অপরাধ বাড়ায়। সুধাংশু উঠে দাঁড়াল। বললে, আজ চল্‌লুম।

সুনীতিরও বোধহয় কিছু বলবার নেই। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে সদর দরজাটা বন্ধ করবার জন্যে।

সুধাংশু পিছন ফিরলে।

আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে সুনীতি যেন নিজেকে শুনিয়ে অস্ফুটে বললে, কেন মিথ্যে আপনারা চেষ্টা করচেন—আমি ভালই আছি!

ফিরে সুধাংশু দাঁড়াল, এটা নিষেধ না উপরোধ দিব্যেন্দুর বোনের ভাল থাকার জন্যে? এ কথা বলার মানে কি!

কিন্তু সুধাংশু মুখ ফুটে কিছু জিগ্যেস করতে পারলে না। ওপরে অন্ধকারে আধভেজান দরজার ফাঁকে দুটো সজল চোখ স্পষ্ট দেখা গেল মুহূর্তের জন্যে। কে জানে সুনীতি কি বলতে চাইলে, কি বোঝাতে চাইলে? তার সুদীর্ঘ কুমারী-জীবনে প্রকৃত কোন দুঃখ বোধ হয়। সুধাংশুর মাথা-ব্যথার কোন মানে হয় না।......

হঠাৎ একদিন ছ'মাস পরে সুধাংশুর ইণ্টারভিউ-এর জবাব এল। সুধাংশুকে চাকরি দেবার জন্যে স্মরণ করেছে। খুসী হ'লেও আর যেন চাকরিটার ওপর তেমন লোভ নেই সুধাংশুর। এতদিন না হ'য়ে যখন চলেছে, একেবারে না হলে যেন ক্ষতি ছিল না। তার ওপর দিব্যেন্দুর অফিস, এবার দু'বেলা হাম্‌বাক্‌টার লম্বা লম্বা কথা শুনতে হবে।

চাকরিটা গ্রহণ করা সম্বন্ধে সুধাংশু অনেক ভাবলে, শেষ পর্যন্ত নেওয়াই ঠিক করলে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে না ঠেলাই ভাল। বলা কি যায় একদিন দিব্যেন্দুর মত সে উচ্চপদে আসীন হ'তে পারে। শিক্ষাদীক্ষা তার কম কি!

নতুন অফিসের হাল-চাল জানবার জন্যে সুধাংশু সোজা দিব্যেন্দুর ঘরে উপস্থিত হ'লো। কিন্তু দরজা ঠেলেই সুধাংশু পিছিয়ে এল। দিব্যেন্দুর জায়গায় অন্য একজন।

শব্দ পেয়ে চোখ তুলে দিব্যেন্দুর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিটি বললেন, কাকে চাই?

সুধাংশু অপ্রস্তুতের মত আমতা আমতা করলে, মিস্টার মুখার্জি—

ও, বলে' ভদ্রলোক বেল টিপলেন। চাপরাশী আসতে বললেন, এঁকে ডি-পি'র ঘরে নিয়ে যাও।

মানে? সুধাংশু ইতস্তত করলে। ভদ্রলোক বললেন, যান ওর সঙ্গে মিস্টার মুখার্জির কাছে নিয়ে যাবে।

চাপরাশী বললে, আইয়ে!

বেরিয়ে সুধাংশু ঢোক গিলে চাপরাশীকে জিগ্যেস করলে, ডি-পি কোন হ্যায়?

সুধাংশুর এতবড় অজ্ঞতায় চাপরাশী মুচকি হাসলে। বললে বড় সাব আছেন, ডিরেক্টার সাহেব!

এতক্ষণে দিব্যেন্দুর নতুন পদের সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারে—ডিরেক্টর অফ পারশোনেল! দিব্যেন্দু করেছে কি?—পাঁচশো থেকে একেবারে বারশো! বাহাদুর।

সুধাংশুর পা আর ওঠে না। স্পষ্ট চোখের ওপর সে দেখতে পায় দিব্যেন্দু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছে, এ সমাজের কোন পদার্থ নেই—বোনের একটা যোগ্য পাত্র পেলুম না! সব রট্‌ন্!

এখানে চাকরি করার চেয়ে মানে মানে সরে পড়াই যেন ভাল। ঐ দিব্যেন্দু এ অফিসের কর্তা, নিয়োগ-বদলীর দণ্ডমুণ্ড।

বড় সাহেবের দরজার সামনে এসে সুধাংশু দাঁড়াল, বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত একটা সন্দেহ তার মাথায় খেলে গেল—দিব্যেন্দুর এই পদোন্নতিতে নারী-রূপ-রস-সুরের কোন পরোক্ষ হাত নেই তো? মিস্টার শিবলিঙ্গম্ কি দিব্যেন্দুকে এমনি এমনি সুনজরে দেখেছিল? কিসের বিনিময়ে এ সমৃদ্ধি দিব্যেন্দুর? সেদিন সুনীতির

সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এর যেন আভাস সুধাংশু পেয়েছিল! 'আপনারা মিথ্যে চেষ্টা করছেন, আমি ভালই আছি'—মানে কি?

সুধাংশুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সরীসৃপ-স্পর্শের অনুভূতি শির-শির করে ওঠে।

ডিরেক্টর সাহেবের কামরার দরজায় একটা পাল্লা ফাঁক করে ধরে চাপরাশীটা তখনো অপেক্ষা করে।

ঠিক এই মুহূর্তে বন্ধুকে সম্বর্ধনা করা উচিত হবে কিনা ভেবে ঠিক না করতে পেরেই বোধ হয় সুধাংশু পা-পা পিছিয়ে যায়। ভয়ে।

॥ 'শারদীয় দেশ ১৩৫৯' ॥

কতকগুলি লোক ছিল। খরস্রোতা কোন নদীর কাছের গ্রামে ছিল বাস। এখন সে দেশ পাকিস্তান হয়েছে।

গরীব পৃথিবীর দিনমজুর। মাথার ঘাম পায়ে পড়ে চাষবাসের সময়ে।

কেটে গেল অনেক দিন। একটু একটু করে সরে আসতে লাগল তারা মাটী থেকে। চাষের জন্য আলাদা লোক রাখল, ভাগে জমি দিয়ে দিল। বড় ছেলে সহরে গেল, ওকালতি করে নাগরিক হ'তে। কোন কোন মেয়ে বিবাহান্তে গেল শ্বশুরালয়ে ওই শহরেই।

তবু, ছিল প্রত্যক্ষ যোগ পৃথিবীর সঙ্গে। কাদামাখা মেটে আলু, মূলো, পেঁয়াজ আসত উঠোনে। রবিশস্য কলাই, ছোলা, অড়রে ভাড়ার ভরে উঠত। রোদে মেলে দেওয়া ধান পাহারা দিতে কেউ বসত লাঠি হাতে।

তারপরে, ধীরে ধীরে মেটে আলুর বদলে এল নাইনিতাল। ডাল হয়ে তবে রবিশস্য ভাড়ারে ঠাঁই পেত। চালের রূপ ধরত সোনার ধান। পিঠে-দোলাই-এর বদলে ফ্ল্যানেলের পুরা-হাতা জামা। সাজিমাটি দিয়ে তারা চুল পরিষ্কার ছেড়ে দিলে—কিনে নিল বিদেশী সুরভিত সাবান। দেশী জোলার মোটা সূতোর ডুরে হাহাকার করে পথ ছেড়ে দিল লতাপাতা পাড়ের মিহি কলের শাড়ীকে।

এসব পুরাণো কথা। গ্রামের স্বয়ং-সম্পূর্ণ উৎপত্তির দিন চলেই গেছে। গান্ধীজী পারেন নি ফিরিয়ে আনতে। তখন ক্ষেতের ধানের মুড়ি উঠোনের মাচার শসা দিয়ে খেতে খেতে কৃষক সৌখিন হয়ে উঠত। ছোট ছেলে ছুটত কাটারি হাতে বেড়ার বাগানে। ছুটি পেঁয়াজ খুঁড়ে নিয়ে আসত; ছিঁড়ে দিত একটী লঙ্কা গাছ থেকে। 'রাজভোগ ভেসে যেত।' পাঠশালার পড়ুয়া ফিরে জলযোগ সারত গাছের বাতাবি পেড়ে নিয়ে। ডোবা ছেঁকে উঠত মাছ—পট্‌পট্ করে বেগুন তুলে মাটীর উনুনে রান্না চাপাত গৃহিনী। উনুনে জ্বলত বাড়ীর শুকনো মরা গাছগুলো।

জোলা বুনত মোটা ধুতি শাড়ী গামছা। শুধু তিন রকম। তা-ও অনেকে চরকা, তকলীকাটা হাতের সূতো নাটাই জড়িয়ে পৌছে দিত। কুমার গড়ত মাটির হাঁড়ি, কুঁড়ি, পূজোর থালি, ঘট। কামার দা-কোদাল-খন্তা লাঙ্গলের

কাল বানাত। নাপিত ছিল এক ঘর। পূজারী ব্রাহ্মণ এক ঘর। আর কি চাই? জন্ম-নিরোধ ছিল না। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ের মেলা। গরু আছে, ছাগল আছে। দুধ দুইয়ে নিলেই হ'ল। হাঁস আছে, ডিম দেয়।

কবিরাজ ছিলেন। তবু ঘরে ঘরে উঠানের এককোণে ছোটখাটো ওষধির চাষ করা হত। দরকার মত তুলে নিলেই হয়। গাঁদালের পাতা দিয়ে পেটের অসুখ সারাত, মনসার পাতা দিয়ে চোখ-ওঠা, ভাঁটির ডাঁটার বড়ি কৃমিতে, তুলসী-পাতার রস মধু দিয়ে মেড়ে ছোটদের সর্দি জ্বর সারানো হ'ত। সর্বরোগের ওষধি ওখানেই উৎপন্ন হ'ত। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের রূপ।

এসেছিল সৌন্দর্যবোধ পরে। গান্ধীজী বাংলার শিল্পীমনকে বোঝেন নি। তিনি পরিচ্ছন্ন সুস্থ জীবনাদর্শ তুলে ধরেছিলেন। সৌন্দর্যের বিশেষ স্থান রাখেন নি। কিন্তু, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম উৎপত্তির পরে উৎপন্ন দ্রব্যে শিল্পের রেখাপাত করে তন্ময় হয়ে যেত। জোলা পাড়ে গেঁথে দিল আকাশের চাঁদ, বনের ময়ূর। কুমোর হাঁড়ির উপর নক্সা আঁকল, ঘটে রংচিত্তির করল। কামার বাঁট চাইল ছুতোরের কাছে খোদাই কাজের। পূজোর ফুলের পাশে পাশে মাথা তুলে দাঁড়াল, যারা দেব-দেউলে পাংক্তেয় নয়—পাতাবাহার, দুটো একটা বিদেশী মৌসুমী। আলপনার চালের গুঁড়োর ওপরে জেলে দিল হাজাক্ আলোর ফোয়ারা লুটিয়ে। গুন্ গুন্ করে মেয়েরা গান গাইত—কলে শোনা রেকর্ড। চাঁদের নীল-সাদা জালিকাটা আকাশে চেয়ে নূতন কিছু আবিষ্কার করতে লাগল ছেলেমেয়েরা। ব্রত-উপবাসের সময় হ'ল সংক্ষেপ; খোঁপায় মেয়েরা গেঁথে নিল ফুলের হার। শাপলার অম্বল রেঁধে খাওয়ার পরেও পদ্মফুল পিতলের ঘটিতে সাজানো হ'ত।

ক্রমবিকাশ হ'ল গ্রামের সৌন্দর্য ও রোমাঞ্চের পথে। গ্রামীন শিল্প যা ছিল, তার ওপরে আধুনিকত্ব আরোপিত হতে লাগল। ধীরে ধীরে এল আধুনিক সভ্যতার ছায়া। আদি যুগের সাধারণ শিল্প-সৌন্দর্যের পরে নির্বোধ মধ্যযুগ এসেছিল। তারও 'পরের কথা।

মানুষ সময় কাটাতে লাগল ক্ষেতখামার থেকে দূরে। রক্ষিতা রাখার প্রথা উঠে গেল। বহু-বিবাহ হেয় হল। যৌনজীবনে এল প্রকাণ্ড বন্ধন। আড়ালের ব্যভিচার বন্ধ করা গেল না। নারীহরণ, নারীনির্যাতন আরম্ভ হ'ল। তখনও হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা সুরু হয়নি।

গ্রামে জীবনের ক্রমবিবর্তন নিয়ে থিসীস্ লেখা যায়। অবসাদগ্রস্ত আধুনিক ঔপন্যাসিকের প্রথায় পল্লীজীবনকে গরিমার শীর্ষে রেখে, দেশের মাটি, দেশের জলকে বন্দনা করা যায় উচ্চৈঃস্বরে। নগরজীবন কিছু নয়, নাগরিক ঘৃণ্য, হেয়। বর্তমান সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখী—ফিরে চল গ্রামে। আহা উহু, গ্রামের কি সারল্য, কি স্বাস্থ্য, কি শোভা! আর আমরা সভ্যতার কারখানায়, ইঁটের খাঁচায় অধঃপাতে যাচ্ছি। সহরের সব ব্যস্ত, পল্লীর সব ভাল।

কিন্তু, মন্দ নিয়েই সুখী আছি। বদলাতে চাই না। ভেজাল খাদ্য জঠরে, বদ্ধ ঘরে টি, বি—এর দুঃস্বপ্ন—তাও সহ্য হবে। আমরা যা পেয়েছি, পল্লী কখনও পেয়েছিল? আমরা জেনেছি। জ্ঞান যে সবচেয়ে বড় সম্পদ।

জ্ঞান-ভাণ্ডার আজ খোলা আমাদের কাছে। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার নগরে বসে, মুদ্রনযন্ত্রের আবিষ্কারে বিজ্ঞানের যশোগান গাইছি। ছাপার অক্ষরে ঝুঁকে বুকের কাছে পাচ্ছি—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মাণীকে। মানুষের সম্পর্কে যা জানবার জানছি আমরা। পল্লী ছিল অজ্ঞান। 'Ignorance is bliss' যারা বলে বলুক—আমি বলব না কখন।

নাইবা খেলাম ক্ষেতের রাঙাচালার ভাত, ঘরের সরবাঁটা ঘি দিয়ে। নাইবা দুধে কবজী ডুবিয়ে মর্তমানের মাথা চিবোলাম। মাছের কাঁটা পাতের শেষে জমা করে বিড়ালের ঈর্ষা নাই বা বর্ধন করলাম। ছুটে চলে আসছি বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, প্লেনে। আবহাওয়া আমার পায়ের দাস। রেডিও খুলে বসছি—জগতের শেষ প্রান্ত থেকে স্বর ভেসে আসে আমার কাছে। পৃথিবীর যে কোন কোণের সংবাদ ছাপাপৃষ্ঠার ভাঁজে ভাঁজে টেবলে পড়ে থাকে। খাওয়াই কি সব? আমি জেনেছি। আমি চলেছি।

মাটীর মায়ায় গৃহবদ্ধ জীবন—কেয়া ঝোঁপের তলায় অন্ধকার, পানাপুকুরের জলে বুদবুদ-বিস্তার, বাতাসে শেফালীগন্ধ। চাই না আরাম আলস্যের বিলম্বিত, শিথিল জীবন। গতি যদি লেগেছে—গতিই থাক।

আর চাই না—সহস্র জীবনেও চাই না পল্লীদুহিতা হয়ে জন্ম নিতে। সেখানে সমাজ এক হাতে লেখে পুরুষের জন্য অনুশাসন—অন্য হাতে নারীর জন্য। প্রতিবাদ করেনি কেউ কখন। প্রতিবাদ করবার কথা মনেও আসেনি। নারী যতক্ষণ জননীর প্রৌঢ়ত্বে না পা দিয়েছে, কি মূল্য সে পেয়েছে? 'বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ' কাব্যগুঞ্জনেই ভাল শোনায়।

ময়নামতীর কড়চা

আজ নগরীর প্রান্তে বসে যদি কারুর লেখনী মুখর হয়ে ওঠে প্রতিবাদে, যদি কেউ বাংলার মেয়ের অনেক দিনের অনেক গোপন দুঃখকে ভাষা দিতে চায়, তাহলে কি হবে? জানি মেয়েরাও তার প্রচেষ্টা সমর্থন করবে না। অথচ, যে কোন স্বভাবধারার জাগরণ হবে এই শহরের বুক থেকেই। সে জাগৃতি তারপর ছড়িয়ে যাবে পল্লী গ্রামের বুকে।

আজ সত্যই বুঝে দেখার দিন এসেছে। মূল্য—আরোপের মানদণ্ড গেছে বদলে। মেয়েরা দুঃখে নেই। কোন দিনও ছিল না। তারা বুঝে দেখেনি যে মানুষ হিসাবেই তারা মূল্যবান, মেয়ে হিসাবে নয়।

প্রবন্ধ রচনা ছেড়ে দিয়ে যাই আখ্যানে। সেইদিন, এখনও সে দিনের জের চলেছে। অসূর্যম্পশ্যা যদি করস্পৃষ্টা হয়, কি হবে গতি তার? পুরুষ বহুকামী, বহুতে তৃপ্তি। সে তো পতিত হয় না। নৈতিক শুচিবাই শুধু মেয়ের জন্য, সে তো অভ্যস্ত তাতে। স্খলনের চিন্তা প্রকাশ্যে জাগে না তার মনে কিন্তু অনিচ্ছাকৃত অপরাধেরও তো মার্জনা নেই। রক্ষক যদি রক্ষা করতে না পারে, দোষ কার? কার অপরাধ?

কতকগুলি লোক ছিল, না? তাদেরই কন্যা ময়নামতী। বিবাহ স্থির হয়েছে পার্শ্ববর্তী গ্রাম্যকুমারের সঙ্গে। শ্রীমান পড়াশুনা সাঙ্গ করেননি।

রূপসী ময়না। অনেকের চোখ তার উপরে। মা-বাপ তার যখন তখন বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দু'খানি গ্রামের মধ্যে নিবিড় বন। ডাকাতি হ'ত অনবরত। ময়নার বড়দা সহরে চাকরি করেন। তার বৌ, ছেলে সেখানে। ময়নার ছোট ভাই সেখানে থেকে পড়ে। গ্রামের বাড়ীর চাষবাস থেকে দেখাশোনা করেন ময়নার বাবা। মা থাকেন গৃহদেবতা নারায়ণ ও বৃদ্ধ শাশুড়ীকে নিয়ে। ময়নার জ্যাঠামশায় সহরের উকীল।

এখনও আসে ক্ষেতের ফসল। গাই দুধ দেয়। কেটে যায় দিন। সৌন্দর্য-বোধের পরে গ্রামীন সভ্যতায়—এসেছে সৌখিনতা। দশ-আনা ছয়-আনা চুল ছাঁটাই, হেজলীন, পাউডার, সিগারেট, পাজামা। উচ্ছৃঙ্খলতা ছুটে বেড়াচ্ছে ফণী-মনসার বেড়ার গায়ে গায়ে, বিলের ঢেউতে ঢেউতে।

বিবাহ স্থির হওয়ায় ময়নামতী কিঞ্চিৎ ভাবনা হয়েছে। ধরা যেন সরা তার। পরিস্ফুট তনুদেহে ভিজে কাপড় টেনে একা একা পদ্মফুল-পাতানো সই মেনকার পুকুর থেকে বাড়ী ফেরে স্নানের শেষে, গা-ধোওয়ার শেষে। বেশ

খানিকটা দূরে পুকুরটা। বাড়ীর পুকুর মজে গেছে। জ্যাঠামশায় বাড়ী এসে কাটাবেন।

আগে নিষেধ ছিল। এক মাস পরে যার বিয়ে হয়ে যাবে পরের ঘরে, তাকে আর কত সামলানো চলে? শিথিল হয়ে এল বাড়ীর নিয়ম। চোখের কটাক্ষে যার বিদ্যুৎ, যার বাহু-আন্দোলনে ফুল ফোটে, তাকে লোভী দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখাই ভালো ছিল।

কেতকীর বেড়ায় কাঁটা। ভিজে কাপড়ের জল বিন্দু বিন্দু ফেলে সগর্বে মাটী শিউরে হাঁটে ময়না। অষ্টাদশ যৌবনের গর্বে গর্বিতা সুন্দরী। কেতকীর ফুলের পাশে কাঁটা। দুটি চোখ চেয়ে দেখে অনিমেষ। চোখে চোখে ধরা পড়লে রক্ত-অধরে ময়নার তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে ওঠে। দেখে নিক না—আর কত দিন।

সাদাৎ আলি, গ্রামের তালুকদার। বাবা ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারেন নি; ছেলে বয়ে গিয়েছিল। এ গ্রামের হাড়ী, ডোম, চাঁড়াল বন্ধু হয়েছে ওর। অনেক দিন আগের কথা।

সন্ধ্যা করে ফেলত ময়না ফিরতে। একদিন অপহৃত হয়ে গেল। সাদাৎ আলির পাল্কী নিয়ে গেল মুখবাঁধা ময়নাকে! পরের কয়েকটা দিন কাটল অনুসন্ধানে।

ফিরে এল ময়না দীর্ঘদিন পরে। কাল হয়ে রং, মুখচোখ বসে গেছে। মজা পুকুরের ধারে বসে কাঁদছিল। সাদাৎ আলি তাকে উপভোগ করেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিন্তু বশ করতে পারে নি। গাঁয়ের মেয়েকে আর কিছু করতে ইচ্ছা হয়নি। তাকে ছেড়ে দিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে সাদাৎ আলি সম্প্রতি পলাতক। হয়তো কিছুদিন পরে আসবে। টাকার জোরে মাঝের পাড়ার পরীবানুকে ঘরে আনবে। ভবিষ্যতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে যাবে হয়তো সাদাৎ আলি।

এধারে ময়না শয্যাশায়ী। উপভুক্তা নারী আর এঁটো হাঁড়ি। কবিরাজ ঔষধ দেয়। পুরোহিত শুদ্ধির বিধান দিলেন। কিন্তু ঘরে নিলে না কেউ। মামলা-পুলিশের কেলেঙ্কারী বাড়ানো হ'ল না।

যুদ্ধের আগের দিন তখন। নৈতিক অধঃপতনকে উপার্জন হিসাবে ব্যবহারের

প্রথা তখনও আসে নি। দুর্ভিক্ষ, রক্তপাত মানুষের নীতিবোধকে চূর্ণ করে দিয়ে যেতে পারে নি। পাইকারী ভাবে 'বিলিতি ব্যারাম' সিফিলিস আক্রমণ করেনি অজ্ঞান বাংলাবাসীগণকে। মুসলমান ধর্মের অঙ্গ হিসাবে নারীহরণ চালায় নি। কোন কোন ধর্মিআকে ফিরে নিয়ে সমাজ একটুও এগিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি।

আধুনিক যুগের পূর্বাহ্ন। তাতে পল্লীগ্রাম। সুতরাং—

শীতের সকাল। ময়নার মা পা টিপেটিপে ভেজানো দালান ঘরের দরজা ঠেলে স্বামীর খাটে এলেন। ছেঁড়া চটে পা মুড়ে শুতেই ময়নার বাবা খেঁকিয়ে উঠলেন, "বলি কোন চুলোয় গিয়েছিলে এত ভোরে ?" ময়নার মা অপরাধীভাবে বল্লেন, "একটু দেখে এলাম।"

"দেখে এলাম। ওর সঙ্গে শোওয়া বসা হচ্ছে জানলে পতিত হতে হবে না ?"

"শোওয়া-বসা আবার কি ? পেটের মেয়ে। এখন ওর এমন ভয় হয়েছে যে একা রাখা চলে না।"

"চলে না তো থাকো যেয়ে। বড় কর্মভোগ হয়েছে আমার।"

শীতার্ত ময়নার বাবা স্ত্রীর কাল-কর্কশ দেহযষ্টি লেপের মধ্যে টেনে নিয়ে গরম হতে চেষ্টা করলেন। ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। আছাড় খেয়েছিলেন ময়নার মা শেষ সন্তান জন্মাবার পরে পুকুরঘাটে। তাই রক্ষে। নইলে হয়তো ঘরদোর ভরে যেত।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। পাড়া গাঁর দারুণ শীতে লোকে ভোরে সাধারণত ওঠে না। উপযুক্ত বসনাদি কারুর নেই। তবু, পুজোর ফুলতোলা, শাশুড়ীর দ্বাদশীর—যোগাড় দেওয়া আছে। সারারাত ময়নার কাছে কাটানোর ফল স্বামীর দাবী নিরুত্তরে সহ্য করতে হবে। সারারাত ময়নার মায়ের ঘুম হয়নি। মেয়ের দুঃখে সারা রাত কেঁদেছেন তিনি।

হঠাৎ আজ ময়নার মা কেঁদে বল্লেন, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি। কাল থেকে আমি অন্য ঘরে শোব। চোখের ওপরে অত বড় মেয়ের এই দশা। এখন জোড়াখাটে শোওয়া সাজে না। আমার মাথা কাটা যায়।"

খস্‌খস্ করে শুকনো পাতার উপর দিয়ে শেয়াল ছুটে গেল। ঘরের থেকে মেয়েকে বার করে না দিলেও ধর্মাত্মা বাবা ময়নাকে ঘরে নেননি। তাই ঢেঁকিশালের কাছাকাছি টিন দিয়ে ঘর তুলে দিয়েছেন। মাটির দেওয়াল।

ভবিষ্যতে গঞ্জের হাট থেকে টিন কিনে ছনের চাল টিনের করা হ'বে, মাটির বদলে সিমেণ্ট। ময়নার বাবা স্নেহশূন্য নন। ময়না নিজে রেঁধে খায়। যেদিন পারে না, সেদিন মা-ই ঘর থেকে রেঁধে—চৌকাটের বাইরে থেকে ধরে দেন। লোক-চক্ষে ময়না পিত্রালয়ে গৃহীত হয়নি। কোথায় বা যাবে? তাই দয়ালু পিতা উঠোনে ঘর তুলে আলাদা রেখে পিতার কর্তব্য সমাপন করেছেন।

আবার ময়না না অপহৃতা হয়, তারও পাকাপাকি ব্যবস্থা করা আছে। বাগদী চাকর। লাঠি হাতে পাহারা দেয়। ভুঁইমালীর বিধবা বৌ কাছে শোয়। ময়নার অনাদর হচ্ছে কে বল্লে? কিন্তু গহন রাত্রে যখন দীর্ঘ ছায়া পড়ে বাড়ার উঠানে, পেছনে আম-কাঁঠালের বাগানে শুকনো পাতা—চকিত করে শেয়াল পালায় ছুটে; তেঁতুলের ঝিরঝিরে পাতায় শিরশিরানি ছাপিয়ে প্যাচার 'তুই খুলি, না মুই খুলি,' শোনা যায়; তখন ঘুমন্ত ভুঁইমালী বৌএর নাকডাকানী ময়নাকে আশ্বাস দিতে পারে না। মনে হয়, ছুটে আসছে অনেক লোক—এক সাদাৎ আলি যেন হাজার হয়েছে। হাজার হাজার সাদাৎ আলি ছুটে আসছে হাজার দিক থেকে। হাজার হাজার মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাজার সাদাৎ আলি। দিকে দিকে উঠেছে ক্রন্দনরোল। ধর্ষিতার করুণ আর্তনাদ। মায়ের চোখের জল ঝরে পড়ছে - ঘাসের ডগায় ডগায় শিশির কেঁদে উঠেছে পল্লীদুহিতার ব্যথায়। আবার মুখ বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের উলুখাড়ার বনে, নদীর তীরে, কাশের ঝোপে, ভাড়া ঘরের সুখশয্যায়। শুধু প্রয়োজনে ব্যবহৃত দেব-দেউলের পূজোর পাত্রে প্রতিদিনের পান্তাভাত খাওয়া। নিষ্ঠুর আসক্তির পীড়নে নিষ্ঠুরতম অনুষ্ঠান। জগতের ইতিহাসে চিরকলঙ্কময় অধ্যায় একটি।

চাপাঘুমন্ত গলায় কেঁদে ওঠে ময়না। কই, পিতার—দা শত্যশয়ন তো তার কান্নায় ব্যাহত হচ্ছে না? তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—দেশের বুক থেকে, ভবিষ্যতের গৃহ থেকে অটুট অন্ধকারের রাজত্বে। কই, এখনও তো ঘরে ঘরে অর্গলবদ্ধ? আছে তো তরুণ, ময়নার দেশেও আছে। কোথায় তারা? তাদের ঘুম কি ভাঙছে না?

ভুঁইমালী—বৌ জেগে ওঠে, সান্ত্বনা দেয়, "ভয় কি ঠাকরুন? আমি তো এহানে শুইয়া আছি। ঘুমের মধ্যে ডরায়া উঠলেন কেন?"

কোন কোনদিন এ সান্ত্বনায় হয় না। ময়নার মাকে দরজা ঠেলে ডেকে আনতে হয়। আজ রাত্রে যা হয়েছিল। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ময়না

চাপা কান্নার বেগে অস্থির হয়ে উঠেছিল। দু'তিন মাস হয়ে গেছে ঘটনাটা। তবু আতঙ্কে মনের মধ্যে ময়নার পুনরুক্তি হচ্ছে ব্যাপারটি। শান্ত করতে তাকে না পেরে রাত্রি এক প্রহরের সময় ভুঁইমালী বৌ দরজা ঠেলে ময়নার মাকে ডেকে এনেছিল। তার পরের ইতিহাস আমরা দেখেছি।

ভোরের রোদ পাতাগাছে, পেঁপে গাছে পাতার জালে উঁকি দিয়ে উঠোনে লুটিয়ে পড়ল। ভুঁইমালী বৌ গোবর জলের ছড়া দিয়ে উঠোন ঝাঁট দিয়ে বাড়ী চলে গেল। কাক-ডাকার ভোর নয়। উঠোনে শালিক নেমে এসেছে। এক পাশে চালের গুঁড়ো রোদে দেওয়া হয়েছে। যতই না দুঃখ থাক কেন, পৌষের পিঠে ধর্মেরি অঙ্গ।

ময়নার মা ক্লিষ্ট দেহ টেনে নিয়ে রোজকার কাজে লাগলেন। শাশুড়ীর দ্বাদশীর ফল কেটে হামানদিস্তায় ছেঁচে রাখলেন। গাছের নারকোল কুড়িয়ে তুলে দিলেন। নারকেলের শক্ত, মিছরির পানা সাজিয়ে শাশুড়িকে ডাক দিলেন, "মা উঠে আসুন। জল মুখে দিন।"

সকালের সোনার রোদ মলিন করে শাশুড়ী ডুকরে উঠলেন, "আমাকে ডেকো না মা। কোন্ মুখে জল খাব? চোখের ওপর নাত্নী আমার এমনি হয়ে আছে? ও যে রাজরানী হ'ত। কোথায় এই অগ্রাণে বিয়ের বাজনা বাজবে আমার ঘরে, তা না এই হ'ল! আমি মরলাম না কেন?"

বৃদ্ধা প্রাত্যহিক বিলাপ করেন এইভাবে প্রতি কথায়। আজ সকালের দিকটায় কে যেন কালি ছিটিয়ে দিল। কে যেন সারা বাড়ীর নীরব সমস্যাকে চোখের সামনে তুলে ধরল। কাজের মধ্যে ভুলে থাকার কি উপায় আছে?

ময়না সমাজে পরিত্যক্ত হ'লেও সমাজের কৌতূহল ছিল প্রচুর। নানা ছল নিয়ে পাড়ার লোকেরা আসত দেখতে। রাত্রি কাটত ময়নার আতঙ্কে, দিনে হ'ত লজ্জা। পাড়া-প্রতিবেশী, যারা কোনদিন আসে না, তারাও আসত একবার দ্রষ্টব্য দেখতে। যেখানে সিনেমা নেই, সেখানে এমন নির্দোষ আমোদ কি ছাড়া যায়?

পুরোহিতের বিধবা বোন আসেন কাপাসতুলো নেবার অছিলায়। জমিদার দুহিতা রাজুবালা আসে একহাত চুড়ি বালা বাজিয়ে অপরাহ্নে গুরু আহার ও দীর্ঘ দিবা-নিদ্রার পরে। রাজুবালা পালটিঘরের বাধায় পড়েছিল অবশেষে

গরীব বাড়ী। তাই পোষায় নি ঘরকরা। পিত্রালয়ে স্থায়ী বাসিন্দা সে। ভাইদের গৃহশিক্ষক প্রণয়ী তার।

ময়না আগে যেত জমিদার-বাড়ী। ঘর দেখেছে। প্রকাণ্ড খাটে শীতল পাটী বিছানো, বালিশের ধারে বেলফুল। রাত্রি গভীর হ'লে ঘুমন্তপুরী পার হয়ে শিক্ষক আসেন মনিবকন্যার শয়নশিথানে। প্রকাশ্য না হ'লেও জানে সবাই। একে জমিদার-দুহিতা, তায় সিঁথেয় সিঁদুর। বৎসরান্তে দুর্গাপুজা, জামাইষষ্ঠীতে স্বামী আসে। রাজুবালা তখন সোনা ছেড়ে জড়োয়া ঝকমকিয়ে বেড়ায় গাধাকান্ত স্বামীকে নিয়ে। শিক্ষক নিশ্বাস ফেলে সরে থাকেন কয়দিন। কে কি বলে রাজুকে? সাধ্য কার? প্রমাণ কি?

গ্রামের দুই ধারে দুই সুর। ব্যভিচার এসেছে। গোপনে রইলে দোষ নেই। প্রকাশ্য ঘটনা হ'লেই শাস্তি। সরল যে নীতিবোধ ছিল, সে হয়েছে শুধু লোক-দেখানো উপরের শোভা। নূতন নীতিবোধকে পিছিয়ে-থাকা গ্রাম গ্রহণ করতে পারেনি, অথচ চোরাস্রোত বালি তলে তলে ক্ষয় করে আসছে। জগা-খিচুড়ি এই আবহাওয়ায় ময়নামতীর দশাটা কি হল ভাবলেই বোঝা যাবে।

সেদিন কিন্তু আকাশে জমে উঠলো কালো-কালো মেঘ—ক্রীড়ারত হস্তিযুথের মত। নারিকেল সুপারির শান্ত-নীল দোলা দিয়ে ঝড়ের বাতাস বয়ে গেল আরক্ত আকাশের বুক ঘেঁষে। দীঘির জলে দোলা লেগে হাজার পদ্ম কথা কয়ে উঠল—সোনালী মউমাছির মধুমত্ত ডানার স্বর্ণচূর্ণ ছড়িয়ে গেল কেতকীর পায়ের তলায়। রৌদ্রতপ্ত খড়ের গাদা ভিজিয়ে নামল প্রবল বর্ষা। ঝড়ের পায়ের নীচে লুণ্ঠিতা ধরিত্রী—মুখ তুলে তাকাচ্ছে ঘাসের ফুল। পাতার ছিন্নদলে বৃষ্টির উল্লাস, ঝরা ফুলে ঝড়ের প্রতাপ। সারা গ্রামটী অন্ধকার করে এল মেঘ, এল ঝড়, এল বৃষ্টি। আর্তনাদ করে উঠল আম-কাঁঠালের বাগিচা। অনেক সহনশীলা বিদীর্ণা মাটি কেঁপে উঠলেন। এল যুদ্ধ, এল দুভিক্ষ।

কেটে যাক না দীর্ঘ দিন—অনেক বৎসর। যুদ্ধে ভয়ে ভীত শহর এল গ্রামে। গ্রামে লাগল শহুরে আমেজ। কিছু দূরে সৈন্যের ছাউনী, নীল-আকাশে এরোপ্লেন। কাঁচা পয়সার বিষ ফেনা হয়ে ভাসতে লাগল ওই পদ্মদীঘির জলে, কেতকী-বেড়ার কাঁটায়। দুর্ভিক্ষ এল। গ্রাম শহরের দরজায় ভিক্ষা চেয়ে মরল। বঙ্গ বিভাগ হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হ'ল। পাইকারী শুদ্ধির বিধান পাওয়া গেল। ময়নামতী ছিল এতদিন সমাজের একটি কঠিন সমস্যা—বক্র

সমস্যা। সমস্ত কিছুই ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছিল ওর উপস্থিতিতে। দশ বারো বছরের মধ্যেই ময়নার সমস্যার গুরুত্ব চলে গেল। যুদ্ধোত্তর জগতে পরিস্থিতিটা সহজ হয়ে গেল। কিন্তু—

রুদ্রেন সবে ডাকের বাক্স খুলেছে। দোতালার জানালা থেকে সরু একটী মেয়ে-গলায় শোনা গেল,—"এই, এই!"

রুদ্রেন মুখ তুলে তাকাল না। গায়ের ওপরে পিঁপড়ে হেঁটে গেলে যেমন অবহেলাভরে লোক ফিরে চায় না, তেমনি ক্রমাগত ডাক শুনেও রুদ্রেন উপরে চেয়ে ডাকের লোক দেখল না। চিঠিপত্র খুলে এনে মায়ের কাছে ধরে দিল। সরু তীক্ষ্ণ গলা সমানে ডেকে যাচ্ছে তখনও—"এই, শোন না।"

মা বিকেলবেলা ভিতরের বারান্দায় প্রতিবেশিনীর সঙ্গে পরচর্চা করছিলেন। নবাগতাকে চারিপাশের চরিত্র সম্পর্কে জানানো রুদ্রেনের মা অবশ্য কর্তব্য মনে করেন। হাঁপানী-ধরা গলার, "এই, এই," ডাক সেখানে পৌঁছে গেল।

নবাগতা সচকিতা—"কে ডাকে?"

অপ্রতিভা রুদ্রেনের মা বললেন, "আমার এক ননদ। মাথা একটু খারাপ মত হয়ে গেছে। তাই বিয়ে হয়নি। এখানেই থাকে।"

সরু গলাচেরা চীৎকার শোনা গেল, "ও খোকা, চিঠিগুলো দেখিয়ে নিয়ে যা-না।"

নবাগতা বল্লেন, "যাও না রুদ্রেন, পিসী ডাকছেন।"

রুদ্রেন মাথা নেড়ে তাচ্ছিল্যে বলল, "সব সময় উনি অমনি করেন।"

চলে গেল সে খেলুড়ীর দলে বাড়ীর বাইরে। গলাও থেমে গেল।

নবাগতা একটু বিমনা হয়ে পড়লেন। মুখরোচক পরনিন্দাও যেন বিরস বোধ হ'ল। রুদ্রেনের মা লক্ষ্য করে ব্যঙ্গচ্ছলে জবাবদিহি করলেন, "ও সর্বদা ডাকাডাকি করে। ওর বিশ্বাস ওর নামে চিঠি আসবে; ওর সঙ্গে দেখা করতে লোক আসবে। তা, কেউ তো আসে না। ও তো পাড়াগাঁয়ে ছিল। এখানে কে চিনবে? পাকিস্তান হওয়াতে দেশের বাড়ীঘর বেচে এখানে সবাই এসে-ছিলেন চলে। শ্বশুর শাশুড়ী মারা গেছেন। সম্পত্তি রেখে গেছেন আধা-পাগলা মেয়েকে। দেওর তো বিদেশে চাকুরি নিয়ে দায় এড়িয়েছে। যত জ্বালা আমারি ঘাড়ে।"

মোটা ঘাড়ের ওপরে চওড়া পাটিহারটা টেনে দিয়ে রুদ্রেনের মা বোধ হয় ঘাড়ের জ্বালা কমালেন।

নবাগতা কৌতূহলী হলেন—"চলুন না ; দেখি আসি আপনার ননদকে।"

"বেশ তো চলুন না। লোক দেখলে ও খুশীই হয়।"

দোতালায় উঠে এলেন দু'জনে। একফালি ঘর—বাক্স বললেই ঠিক বলা হয়। তক্তপোশের শয্যায় বসে আছে একটী শীর্ণ দুর্বল মূর্তি। চোখ দুটো জ্বলছে রোখা মুখে। বৌদির সঙ্গে নবাগতাকে দেখে ভয় পেল—"ও কে, বৌদি?"

"ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ঠাকুরঝি।"

মুহূর্তে সে খুশী হয়ে উঠল, ময়লা বিছানা ঝেড়ে বলল, "বসুন না। দেখেছ বিছানাটা কি ময়লা হয়ে গেছে। চাকর-বাকর আমার কথা শোনে না। তুমি একটু বলে দেবে, বৌদি, পরিষ্কার করতে?"

বিছানার দিকে না চেয়েই ঔদাস্যভরে বৌদি বল্লেন, "আচ্ছা।"

কিছুক্ষণ দিব্যি স্বাভাবিক কথাবার্তা চলল। বাজার দর, আবহাওয়া ইত্যাদি। নবাগতার মনে হ'ল এমন সুস্থ মানুষের মস্তিষ্ক-বিকৃতির দোষ দেওয়া হয় কেন?

সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "দেশ কোথায় আপনার? কলকাতারি লোক নাকি?"

"না ভাই, চাকরির জন্য এখানে থাকা। দেশ আমার পাকিস্তান।"

"কোথায়, কোথায়?" লাল হয়ে উঠল মুখ ওর, চোখ-জ্বলা দেখা গেল। বৌদি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "কোথায় আবার? ও কথা থাক। শোন ঠাকুরঝি, পিয়ন আজ তোমার নামে চিঠি আনবে বলেছে।"

বৃথা চেষ্টা। ততক্ষণে দেহ তার থরথর করে কাঁপছে। উঠে দাঁড়িয়ে ভীতা নবাগতার হাত হাড়সার আঙুলে চেপে ধরে প্রশ্ন করল সে, "তাহলে আপনি কি তাদের চেনেন?"

"কাদের আমি চিনব?"

"কেন, আপনি জানেন না। সবাই যে জানে। আপনাকে যারা নিয়েছিল?" কাতর কণ্ঠে কেঁদে উঠল সে—কেঁপেয়ে উঠে—বিছানার উপরে লুটিয়ে পড়ল। কে যেন অতর্কিতে আঘাতে ভেঙ্গে দিয়েছে ওকে।

এই ময়নার ইতিহাস অকথিত। নারীহরণ চলতি হ'বার মহাযজ্ঞের অনেক পূর্ব জীবনে বিয়োগান্ত নাটিকা অভিনীত হয়ে গেছে ময়নামতীর। তাইতো

ট্র্যাজেডি। পরে যা প্রচলিত হয়ে লঘুত্বে পর্যবসিত হল, পূর্বের গুরুত্বের ভার— তাই চাপল, ময়নার মাথায়। বেদনা-পাণ্ডুর জীবনে মার্টার হবার গরিমাটুকুও ছিল না ময়নার। ও হয়েছিল অবশ্যম্ভাবী ঘটনার পুরোধামাত্র। ওর ইতিহাস লিখিত হ'বার বহু পূর্বে ওর ঘটনা ঘটে গেল। তখন নেতারা বিচলিত হয়ে পল্লীগ্রামে ছুটে যান নি। প্রেসের রিপোর্টার হানা দেয় নি! সর্বতোশুদ্ধির বিধান দিয়ে পণ্ডিতমশাই আত্মপ্রসাদ লাভ করে উঠতে পারেন নি। বড় ইতিহাসে যুক্ত হয়ে ছোট ঘটনার মূল্য ভিন্নরূপ নিতে পারলে কই তখন?

শুধু ময়নার দুঃখ ইতিহাসের আড়ালে, সর্বংসহা মাটির বুকে একবারে গেঁথে গেল পল্লীদুহিতার চিরন্তন দুঃখ, বাংলার মেয়ের জীবনের মাথুরপালা। চাই না ফিরে যেতে ওখানে। শহরে অনেক কিছু গোপন রাখা চলে। শহরে অনেক কিছু জানতে পারে না জনতার ভিড়ে। শহর অনেক জেনে চুপ করে থাকে নীরব ক্ষমায়। শহরে পল্লীসমাজ নেই।

কিন্তু সেই সমাজ যখন বিধান দিয়েছিল, তখন সমস্যা চলে গেল সমাজ থেকে— কিন্তু একজনের জীবন তো সমস্যা হয়েই রইল। ঘটনাটা ক্ষণস্থায়ী, পরিণাম দীর্ঘ।

দয়ার চাল কাঁড়া-আকাঁড়া বাছা চলে না। ভিক্ষার রুটী জিহ্বায় তিক্ত লাগে। মা-বাবা নেই। স্বামী-পুত্র হল না। তবু তো প্রয়োজন জীবন ধারণের, আহার্যের। ক্রমেই শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে ময়নার। একবার ডাক্তার দেখানো হয়েছিল অবশ্য। ডাক্তার রায় দিয়েছিলেন যে, মনের মধ্যে চাপা দুঃখ ও ভয় এমনি স্বাস্থ্যহানি করছে। মন প্রফুল্ল রাখা, বায়ু-পরিবর্তন হ'লে সারতে পারে। কে করে ব্যবস্থা? মধ্যবিত্ত ঘরের চিরকুমারী। তার মা-বাবা নেই! তার জন্য কার মাথাব্যথা! একটা টনিক এল শুধু। পরে তাও না।

বড়দা ছেলেমেয়ে নিয়ে অর্থাভাবে বিব্রত। উদয়-অস্ত পরিশ্রম। কঠোর হয়ে গেছে মন। সন্দিগ্ধ হয়েছে চিত্ত পারিবারিক দুর্ঘটনায়। সহোদরা অপহৃত হবার পরেই—তাঁর মনে এসেছে নানা কমপ্লেক্স। বড় মেয়ে মালতী বি-এ পড়ে। চেষ্টা চলেছে বিবাহের। ছেলেমেয়ে আধুনিক। পিতার দৃষ্টির বাইরে একটা মনোমত গোপন জীবন কাটায় তারা। ধরা পড়লে রক্ষা থাকে না।

তবু ময়নার খাওয়া-পরার কষ্ট ছিল না। বঞ্চিতা হতভাগিনীর জন্য হয়তো সহোদরের মনের কোণে একটু স্নেহ ছিল। কিন্তু, খাওয়া-পরা ছাড়া যে মানুষের আরও অনেক কিছু দরকার হয়।

শ্রীবাণী রায়

একা-একা দুর্বহ জীবন। কোণের ঘরে পড়ে থাকে। কর্মব্যস্ত বৌদি ঘরের পাশ দিয়ে যাতায়াত করলেও ননদের ঘরে ঢোকেন না। অসুখ করলে দেখাশোনা করতেই হয় অবশ্য। তবে, অসুখ তো লেগেই আছে। চুপচাপ ময়লা বিছানায় শুয়ে কত কি ভাবে ময়না। আকাশের তারা গোনে। অহরহ এককালে কেঁদে কেঁদে চোখের মাথা খেয়েছে ও। মাথা ধরে থাকে, দুর্বলতা বলে চোখে চশমা ওঠে নি। দিনে একটু পডতে পারে। ছেঁড়াখোঁড়া মাসিক হাতে পড়ে বই কি। রাত্রে পড়াশোনা চলে না। তাছাড়া জ্ঞানার্জনের স্পৃহাও নেই ময়নার। সুতরাং একাকীত্ব তার বড় ভয়ানক। বড় ভয়ানক।

সে একাকীত্ব রাত্রির প্রহরে বক্ষে শ্বাসরোধ করে বসে। ঘুম হয় না তার আজ পনরো বছর ভাল। সারা কাল রাত্রি কালো মুখোসে মুখ ঢাকে। ময়না চমকে ওঠে। বহু পুরাতন কাহিনী ফিরে আসে মনে। চীৎকার করে কোনদিন কেঁদেও ওঠে। কিন্তু স্নেহপ্রবণা কোন মাতা আর তার ঘরের দরজা ঠেলে অপরাধী চোরের মত কাছে এসে বসেন না। রাত্রির মত নিঃসঙ্গ ময়না। রাত্রির শত অন্ধকার জীবনে।

সকালে চাকর ঘরে চা রুটি রেখে যায়। ঠাণ্ডা বিস্বাদ চা। সারাদিন কাটে ঘরে। শুধু স্নান করে খেতে নীচে যায় একবার। রাত্রে অর্ধেক দিন ক্ষিধে হয় না। এজমালী রান্না মুখে রোচে না। উপোসে কাটায় রাত ময়না। কদাচিৎ ভালমন্দ জোটে।

লোকের চোখের আড়ালে অস্তিত্ব যার, তার সম্বন্ধে মনোযোগী কেউ হয় না। সে কাউকে বেগ দেয় না, কিছু চায় না। তার নত্ব-ব্যঞ্জক উপস্থিতি তো সকলে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েছে। কেউ ভেবে দেখে নি, ময়নার একটু ভাল লাগবে কিসে।

ছোট ভাই বিদেশ থেকে টাকা পাঠাত কখন। সে টাকায় ময়না নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বিস্কুটের টিন, লজেন্সের শিশি কিনে আনত। যখন ক্ষিধে পেত খেত টুকটাক করে। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন।

প্রাণ-স্রোতে ভাসমান বাড়ী। বড়দার অনেক ছেলে মেয়ে, নানা বয়সের। দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি করে বাড়ীখানা মাথায় তুলে রাখে। আত্মীয়স্বজন, দাদার শ্বশুরবাড়ী· প্রতিবেশী। আনাগোনায়—মুখরিত বাড়ীখানা। ময়না কিন্তু নিঃশব্দ।

বড় ইচ্ছা করে বাচ্চাদের সঙ্গে মেশে সে। কাছে এনে আদর করে। বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে একটুক্ষণ। কিন্তু আসে না তারা। ময়নার গলা ক্ষীণ হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ-সরু গলায় বাচ্চাদের ডাকাডাকি করে ময়না। মুখ তুলে দেখেও না তারা, নিজেদের পথে চলে যায়। কখনও বা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়। মা বা বড়বোন কোন নির্দেশ দেন না তাদের। অত্যন্ত অবজ্ঞেয় মানুষ পিসী। যাবার জায়গা নেই কোথাও। স্বাভাবিকত্ব সর্বদা থাকে না। রুগ্না-ধর্ষিতা। লজ্জার কথা এমন পিসী থাকায়।

তবে খাবার-পত্র দিয়ে লোভ দেখালে তবুও আসে বাচ্চারা। ক্ষীণ গলা তুলে ময়নামতী ডাকে—কেঁপে ওঠে স্বর—"বুবুল, এই মণি! লজেন্স দেব, আয় না একটু।"

সব সময় থাকে না এসব। বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলে জানালার শিক ধরে ময়না নীচে চেয়ে থাকে, "এই এই," বলে ডাকে। ফল হয় না।

মালতীর যমজ ভাই সুদেব দোতলার বারান্দায় মাঝে মাঝে গানের আসর বসাত। ময়না আস্তে একধারে যেত বসতে। অস্বস্তি বোধ করলেও আধ-পাগলা পিসীকে উপেক্ষা করা চলে। কয়েকটা দিন কেটে গেল বেশ।

বাড়ীতে ময়নার প্রতি তা বলে কোন অত্যাচার নেই, আছে অবহেলা। যদি কখনও বেশী কান্নাকাটি বা চীৎকার করে ফেলত, তা' হলে এক বড়দা এসে ধমক দিতেন। অন্য কেউ কিছু বলত না। তাদের কলহ, ক্রোধ ছিল না। থাকলে হয়তো নিরবচ্ছিন্ন ঔদাস্যের চেয়ে ভাল হ'ত।

আজও ময়না সান্ধ্য-আসরের এক কোণে বসেছে। সুদেব ও মালতী মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। মাধবী মেজ, সে গান গাইতে গাইতে ভ্রূকুটী করল।

বাইরের মাসতুতো, জ্যেঠতুতো এসেছে কেউ কেউ। চা চলছে। বুবুল বলে উঠল, "পিসীকে দিলে না, দিদি?"

মালতী এক কাপ চা সামনে নামিয়ে রাখল। ময়না এক চুমুকে শেষ করে শান্তি পেল। মাথাধরায় এ সময়ে এক কাপ চা পেলে তো ভালই লাগে। পাড়াগেঁয়ে মানুষ—তেমন চা-পানে অভ্যস্ত নয়।

আকাশে আজ শ্রাবণ পূর্ণিমার রাত। ঝুলনের চাঁদ মেঘের দোলনায় দুলছে, দুলছে অগণিত তারা, চাঁদের আভা ম্লান। আজ রাত নয় একা কাটাবার।

জ্যেঠতুতো ভাই একজন বন্ধু এনেছে। কর্তা তেতালায় অফিসের ক্লান্তি নিয়ে বিশ্রাম করছেন। বাইরের কেউ এসেছে এ খবর রাখেন না।

সুদর্শন তরুণ। কোঁকড়া চুলে ঢাকা মাথা। গলায় গানের সুর। মালতীর সঙ্গে নিবিড় হয়ে গল্প করছে। মাধবী গাইছে—

"ও কেন গেল চলে
কথাটি নাহি বলে,
মলিনমুখী, আঁখি ভরিয়া নীরে ?"

হয়তো মোনা ময়নামতীর মনে পড়ে গেল অমলকে—অতীত অগ্রহায়ণে যার গৃহলক্ষ্মী হ'ত সে। আজ এমনি উৎসব-প্রাঙ্গণে উপেক্ষিতা তা'হলে হ'ত উৎসবের কেন্দ্র। লাল শাঁখার পাশে সুগোল হাতে ঝল্‌সে উঠত কঙ্কণ, চুড়, বালা। শরীর ঘিরে জ্বলত তারাঘেরা নীলাম্বরী ঢাকাই। কালমেঘ চুলে লাল বিদ্যুৎ সিন্দুরবিন্দু। এমনি ছেলেমেয়ে তারই থাকত—থাকত সঙ্গী, নিজের ঘর।

গান শেষ হ'তে সুদেব বলে উঠল, "কি দারুণ চাঁদ উঠেছে আজ।"

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কাঁপা গলায় বেজে উঠল, "চাঁদ উঠেছে কেন ? চাঁদ আমার শত্রুর। আমার সর্বনাশ করতে উঠেছে।"

স্তব্ধ হয়ে গেল আসর। পিসী বহুদিন তো শান্ত ছিলেন। আবার আজ আতর্কিত পাগলামী সুরু হয়ে গেল। এতগুলি লোকজন এসেছে! কি করা যায় ?

মালতী ছুটে এসে হাত ধরল, "চলুন পিসী. ঘরে দিয়ে আসি।"

"না, না,"—হাত ছিনিয়ে নিল ময়না, "ঘরে যাব না। ঘরে আমাকে একা রেখে সবাই ফুতি করবে, না ? একা একা আমার ভয় করে। সারা জগৎ যে আমার শত্রুর। তবে আসবে, চিঠি আসবে। আমাকে খবর দেবে সে! মজা করে চলে যাব আমি। দেখা করে নিয়ে যেতে লোক আসবে।"

মালতী কাঁদকাঁদ হয়ে ধাক্কা দিতে লাগল, "পিসী, চুপ করুন। ঘরে চলুন।"

ইতিমধ্যে রুদ্রেন ওপর থেকে পিতাকে সুপ্তিভঙ্গ করে ডেকে এনেছে।

গানের আসর দেখেই কর্তার গা জ্বলে গেল। তায়, বোনের এমন কেলেঙ্কারী! রুক্ষভাবে ধমক দিলেন, "ঘরে যা, ময়না।"

"না, আমি যাব না কিছুতে।"

কে যেন হেসে উঠেই থেমে গেল। বড়দা ময়নার হাত চেপে অতি রূঢ়ভাবে টেনে নিয়ে চললেন—"এখানে ছোটদের মধ্যে বুড়োধাড়ি আড্ডা না দিলে

চলে না? ঘর দিয়েছি। খাও, দাও, ঘুমোও। না, কালোমুখ লোকের সামনে বা'র না করলে চলে না, না? এই আমার হুকুম, আজ থেকে তুই ঘর থেকে বেরোবি না।"

ময়নার হাতে দু'গাছা সোনার চুড়ির পাশে কাঁচের চুড়ি ছিল। বড়দার হাতের চাপে ভেঙে গেল। মাংসে গেঁথে গেল টুকরো।

"উঃ, আঃ," করে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল ময়না। শান্ত হয়ে গেল সে। শুধু চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে।

"উঃ-আঃ করলেই ছাড়ব কিনা! যত ভোগ হয়েছে আমার কর্মের। ওধারে ছকুবাবুরা গাওনা-বাজনা করবেন আড্ডাখানা খুলে। এধারে এই পাগল। সারাদিনের খাটুনি খেটেও শান্তি নেই।"

সজোরে গলা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বড়দা ময়নাকে ঠেলে তার খুপরীতে ফেলে সজোরে দরজার ছিট্‌কানি দিলেন।

রুদ্রমূর্তি পিতার ভয়ে সবাই সরে যাচ্ছিল। নূতন লোক দেখে কর্তা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "ইনি কে? আগে তো দেখিনি।"

সুদেব কম্পিত স্বরে বলল, "ননীদার বন্ধু।"

"ননীর বন্ধু? তা, আমার অন্দরে কেন? মালতী, তেতালায় এক্ষুণি চলে এস।" কর্তা শেষ ঘা হেনে চলে গেলেন।

অলক্ষিতে যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন, তা'হলে হয়তো সেদিন তাঁর নিষ্কম্প শুষ্ক চোখের অক্ষিপল্লবের একটুকু প্রান্ত সজল হয়ে উঠেছিল, বন্ধ ঘরের অন্ধকারে নিরপরাধিনীর শাস্তি দেখে। কিন্তু, না, হয়তো ও মরুচোখে করুণার শ্রাবণ এখনও ঘনায়নি। তা'হলে তো আমরা বাঁচতাম। আমরা বেঁচে যেতাম।

ময়নার কাটা হাতের জন্য একটু জ্বর হল। অনুতপ্ত বড়দা আয়োডিন প্রয়োগে তাকে—নিরাময় করে তুললেন। অফিস-ফেরৎ এক শিশি হরলিক্স কিনে আনলেন।

কিন্তু, বদলে গেল ময়নামতী। তার সমস্ত প্রতিরোধ যেন ভেঙে পড়ল। আগে ক্ষীণস্বরে বাচ্চাদের ডাকাডাকি করত। বাইরের জগৎ তাকে ত্যাগ করলেও গায়ের জোরে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ রাখতে চাইত সে। অনিচ্ছুক চাকরকে ডেকে ঘরের ময়লা সাফ করাত। বিকেলে চুল আঁচড়াত। সব গেল তার। পাগলামিও দেখা দিল না আর। হয়তো বড়দার অমন

ব্যবহারে চমকে গিয়েছিল। হয়তো বা সেদিন বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ভয় পেয়েছিল। চুপ করে গেল ময়না।

দিনরাত ময়না ছোট বিছানাটিতে শুয়ে পড়ে থাকত। ঠাকুর খাবার সময়ে দরজায় উঁকি দিয়ে তাগিদ দিত, "ও পিসীমা, উঠে চান করে খেয়ে নিন। হেঁসেল আগলে থাকি কতক্ষণ?"

উঠে যা পারে খেয়ে আবার ছড়ানো শয্যার অযত্নের মধ্যে শুয়ে পড়ত ময়না। রাত্রে খাবার সাধও চলে গেল তার। বৌদি বার্লি করে বা সাবু রেঁধে পাঠাতেন। একদিন ঘরে ঢুকেও পরীক্ষা করে দেখলেন যে জ্বর হয়নি। ছেলেপিলের বাড়ী, সাবধান হ'তে হয় তো। পাগলামির নূতন লক্ষণ ময়নার নিশ্চেষ্টতা ভেবে সকলে নিশ্চিন্ত রইল। ধীরে ধীরে ময়নার শরীর বিছানায় মিশে যেতে লাগল।

মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রে বড নির্মম—তার আগমনে নয়, অদর্শনে। চল্লিশের নীচে বয়স ময়নার। মৃত্যুর পায়ের পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে। কিন্তু, এখানে মমতার রূপ মাত্র। মৃত্যুকে নির্মম কেউ বলতে পারত না।

আধো আলো, আধো অন্ধকারে ময়না মলিন বিছানায় শুয়ে আছে। বাক্সের মত ঘরে একটি মাত্র দরজা, জানলা। অমাবস্যার আকাশে কত তারা গুণে দেখবার চেষ্টা হয়তো করছিল ময়না। চোখের কোণ দিয়ে জল ঝরে পড়ছিল ছিন্ন বালিশে। দেখার লোক নেই কেউ। বিকেলের চা খেয়েছে। রুটি পড়ে আছে অনাদরে। রোগীর রুচিমত আহার যোগায় কে? তার মা নেই, বাবা নেই। অনাথা, গলগ্রহ চিরকুমারী।

একটা তীব্র কলহ শোনা গেল। মালতীর বাবা ক্ষেপে যেয়ে এর মধ্যে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন দোজবরের সঙ্গে। হয়তো তাই নিয়ে কলহ।

ময়নাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি কিছু। ছিন্ন বিছানায় জীর্ণ শরীর নিয়ে তবু উঠে বসল সে।

মালতী ছুটে এল। অন্ধকার ঘরে দরজা ভেজিয়ে চির-অনাদৃতা পিসীর গা ঘেঁসে দুর্গন্ধ শয্যায় বসে বলল, "চুপ করে থাকুন, পিসী। এ ঘরে লুকোলে বাবা খুঁজে পাবে না।"

ময়না থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল। শীতে সারা দেহে ঘাম ঝরছে—"কি হ'ল? কি হয়েছে? তোকেও কি চুরি করে নিতে এসেছে?"

তার ঘরে সৌখিন ভাইঝি মালতী? কি ব্যাপার?

মালতী বিরক্ত হয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "জ্বালা হয়েছে! শুনুন, সত্যি কথাই বলি। বাবা সামনের মাসে বুড়োর সঙ্গে গেঁথে দিচ্ছেন আমাকে। কিন্তু আমি বিয়ে করব সেই ছেলেটিকে, যে ঝুলনের দিন দোতলায় এসেছিল। আমি চিঠি লিখেছিলাম ওকে। রুদ্রেন নিয়ে যাচ্ছিল, বাবা ছিনিয়ে নিয়েছেন। রুদ্রেন পালিয়ে গেছে মাসীর বাড়ী। বাঁ-হাতে লেখা চিঠি আমার। তবু, বাবা তাড়া করেছেন।"

বিলুপ্তপ্রায় বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে ময়না ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিল। সুপ্তির সমুদ্রে ডুবে ছিল ময়নামতী। দেহমন নিশ্চেষ্টতার পাথারে মগ্ন ছিল। দীর্ঘ এতদিন পরে, অযুত-অযুত বৎসর পরে, তার কাছে আশ্রয় চায় কেউ। তার মত জঞ্জালেরও প্রয়োজন আছে জগতে। তাকে দিয়েও কাজ হ'তে পারে!

দরজা ঠেলে ক্রুদ্ধ বড়দা ঢুকলেন। খট্‌ করে জ্বলে উঠল আলো। "এখানে এসে ভাবছ খুঁজে পাব না? ময়না, ছেড়ে দে ওকে। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দি।"

ময়না অতিকষ্টে কাঁপুনী থামিয়ে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে?"

"হয়েছে আমার মুণ্ডু। তুমি যে বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছ। বিবিজী চিঠি লিখেছেন, রাত বারোটায় দেখা করতে ননীর সেই বন্ধুটাকে। আঁকাবাঁকা লেখা লিখে ভাবছে হাতের ছাপ লুকোবে। আরে, তুই ছাড়া এ চিঠি কে লিখবে? মাধবী তো মামার বাড়ী তিন দিন ধরে রয়েছে।"

"আমি লিখেছি ও চিঠি।"

"তুই লিখেছিস! ময়না?"

"হ্যাঁ, আমিই লিখেছি,"—স্বাভাবিক সুস্থ স্বর ময়নার—"ছেলেটিকে আমার ভাল লেগেছিল।"

জ্যেষ্ঠ অবাক হয়ে চাইলেন—শীর্ণা-বিগতযৌবনা চিরকুমারী। বিকৃত তার বুদ্ধিমানস। সে লিখবে প্রেমপত্র? এতই পাগলামি বেড়েছে?

মালতীর মুষ্টি শিথিল করে আস্তে বিছানায় এলিয়ে পড়ল ময়নামতী। উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তার কপোলে ফুটে উঠেছে লাল ঝুমকো

জবা, একদা যে জবার দেশে ছিল সে। চোখে তার আবার লেগেছে পদ্ম-দিঘীর স্বপ্ন। ভুলে-যাওয়া দূর দেশ তার।

মনে পড়ে গেল বড়দার। আশ্চর্য কি? প্রেমপত্র এখনও ময়না লিখতে পারে। মনে পড়ে গেল, একদিন গাঁয়ের সেরা সুন্দরী ছিল ময়না। সুদেব ডাক্তার ডাকতে ছুটে গেল। অবজ্ঞেয়া, বঞ্চিতা, চিরকুমারী তবু জীবনের শেষে একটা কাজ করে গেল। সেও কাজে লাগল অবশেষে।

না, রাজা গোপীচন্দ্রের মাতা রাণী ময়নামতীর রূপকথা নয়। প্রাচীন বাংলার ধর্মমঙ্গল নয়। সাধারণ পল্লীদুহিতা ময়নার কাহিনী। লিখছি আমি, সাধারণ ব্যক্তি।

রাখাল-মাষ্টারকে লইয়া গল্প লেখা চলে কি-না কে জানে!

রাখাল-মাষ্টার ইস্কুলের মাষ্টার নয়—পোষ্টমাষ্টার।

আমি গল্প লিখি এবং সেই-সব গল্প কাগজে ছাপা হয় শুনিয়া অবধি রাখাল-মাষ্টার আমায় কত দিন কতবার যে তাহাকে লইয়া একটা গল্প লিখিয়া দিতে বলিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

একটি একটি করিয়া সে তাহার জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনাই আমাকে বলিয়াছে; কিন্তু সেগুলিকে পরের পর সাজাইয়া কেমন করিয়া যে গল্পের আকারে লিখিয়া ফেলিব তাহা আমি আজও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

এই বলিয়া গল্পটি একবার আরম্ভ করিয়াছিলাম:

দেখিতে নাদুশ্-নুদুশ্, হ্যালা-ক্যাব্‌লা-গোছের চেহারা, চোখে নিকেলের ফ্রেম্-দেওয়া চশমা, মাথার চুলগুলি ছোট-ছোট করিয়া কাটা,—রাখালকে দেখিলে ঠিক পাগল বলিয়া মনে হয়।

এই পর্যন্ত শুনিয়াই ত' রাখাল-মাষ্টার চটিয়া আগুন।

বলিল, 'না তোকে লিখতে হবে না, তুই যা। মিছে কথা বানিয়ে বানিয়ে··· এম্‌নি করেই লিখিস্ তোরা তা আমি জানি।'

বলিয়া খানিকক্ষণ মুখ ভারি করিয়া বসিয়া থাকিয়া চশমার ফাঁকে একবার চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল, 'যা বাপু যা, তুই এখন বিরক্ত করিস নে। আমার হিসেব ভুল হয়ে যাবে। বেরো তুই এখান থেকে।'

বলি, 'চটো কেন মাষ্টার, শোনোই না শেষ পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ, খুব শুনেছি।' বলিয়া কলমটা মাষ্টার তাহার কানে গুঁজিয়া রাখিয়া সোজাসুজি আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'পাগল কাকে বলে জানিস? না—অমনি লিখে দিলেই হলো!'

হাসিয়া বলিলাম, 'পাগল ত লিখিনি। লিখেছি—পাগলের মত!'

'ওই একই কথা।' বলিয়া হাত নাড়িয়া আমাকে সে চুপ করাইয়া দিয়া বলিল, 'পাগল বলে কাকে জানিস? পাগল বলে—তোদের গাঁয়ের ওই নিবারণ মুখুজ্যেকে। চব্বিশ ঘণ্টা বৌ আর বৌ। সেদিন বললাম, বলি—ওহে নিবারণ,

বোসো, তামাক-টামাক খাও। ঘাড় নেড়ে বললে, না ভাই, উঠি। বেলা হয়ে গেছে,—বৌ বক্‌বে। ওই ওদের বলে পাগল। বুঝলি ?'

বলিয়া কান হইতে কলমটি আবার তাহার হাতে লইয়া নিশ্চিন্ত মনে মাষ্টার তাহার কাজ আরম্ভ করিতেছিল, হঠাৎ কি মনে হইল, আবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, 'মিছে কথা না লিখলে তোদের গল্প লেখা হয় না। তবে কাজ নেই বাপু লিখে, মিছে কথা আমি ভালবাসি না।'

* * * * *

সেই দিন হইতে কিছুই আর লিখি নাই।

ধানের মাঠের উপর দিয়া প্রায় ক্রোশ-খানেক পথ হাঁটিয়া প্রকাণ্ড একটা বন পার হইয়া গ্রামের শেষে, গুটিকয়েক আমগাছের তলায়, ছোট্ট সেই পোষ্টাপিসটিতে প্রায়ই আমাকে যাইতে হয়।

কোনোদিন হয়ত দেখি,—দরজায় খিল বন্ধ করিয়া পোষ্টাপিসের মেঝের উপর তালপাতার একটি চাটাই বিছাইয়া রাখাল মাষ্টার তাহার হিসাব লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে কাগজ ছড়ানো,—উড়িয়া যাইবার ভয়ে কোনটার উপর প্রকাণ্ড একটা মাটির ঢেলা, কোনোটার উপর আস্ত একখানা ইঁট, কোনোটা বা পায়ের নীচে চাপা দেওয়া, মুখে বিরক্তির ভাব ; ঝড-বাতাসের উদ্দেশে যাহা মুখে আসিতেছে তাই বলিয়া অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতেছে, আর আপন মনেই কাজ করিতেছে।

হাসি আর কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারি না। অবশেষে অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া বলি, 'ওহে মাষ্টার, দরজাটা একবার খুলবে না কি ?'

আর যায় কোথা !

ভিতর হইতে মাষ্টারের চীৎকার শোনা গেল,—'তা আবার খুলব না ! সময় নেই, অসময় নেই·· বেরো বলছি, পালা এখান থেকে, নইলে খুন করে ফেলব।'

বাস্—চুপ্।

কাগজের খুস্ খুস্ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবিলাম, আর-একবার ডাকি। কিন্তু ডাকিতে হইল না। জানলার কাছে খুট্ করিয়া শব্দ হইতেই তাকাইয়া দেখি, রাখাল-মাষ্টার কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চোখোচোখি হইবামাত্র বলিয়া উঠিল, 'সাড়ে তের আনা পয়সার গোলমাল।

বুঝলি? আসুক্ ব্যাটা পিওন, আমি তার চাকরির মাথাটি খেয়ে দিচ্চি—ছাখ্।'

অত-সব দেখিবার অবসর তখন আমার নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, অতখানা পথ আবার আমায় একা ফিরিয়া যাইতে হইবে। বলিলাম, 'দোরটা একবার খোলো মাষ্টার চিঠিপত্রগুলো দেখেই আমি চলে' যাব।'

কেন জানি না, হঠাৎ সে প্রসন্ন হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভিতরে ঢুকিলাম। সেদিনের ডাকের চিঠিপত্রগুলা ছিল একটা খাটিয়ার নীচে। রাখাল-মাষ্টার আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'দেখিস, যেন আর কারও চিঠি নিস্নে!'

অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইলাম। এমন কথা সে আমাকে কোনো দিন বলে না।

মাষ্টার বলিল, 'কত সব মজার মজার চিঠি থাকে তা জানিস? তুই ত' কোন্ ছার, খাম্-টাম্ খোলা-টোলা পেলে এক-একদিন আমিই দেখি! দেখে আবার বন্ধ করে' দিই!—শুন্‌বি তবে? একদিন একটা মেয়ে লিখেছে—'

বলিয়া সে শতচ্ছিন্ন দড়ির খাটিয়াটির উপর চাপিয়া বসিয়া হয় ত' কোনও মেয়ের চিঠির গল্প আরম্ভ করিতেছিল। আমার মাত্র দু'খানি চিঠি। হাতে লইয়া বলিলাম, 'থাক্। ও-গল্প তোমার আর-একদিন শুনব, আজ উঠি।'

'তা উঠবি বই-কি। নিজের কাজ সারা হয়ে গেছে ত'! যা।' বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই আমার ঘাড়ে ধরিয়া দরজাটা পার করিয়া দিয়া আবার ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

আর-একদিন অম্‌নি চিঠির খোঁজে ডাকঘরে গিয়াছি। দেখিলাম, দরজা বন্ধ। ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া সুরু হইয়াছে। তুমুল ঝগড়া!

কি লইয়া ঝগড়ার সূত্রপাত, বাহির হইতে কিছুই বুঝা গেল না।

রাখাল-মাষ্টার ক্রমাগত নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর স্ত্রী বলিতেছে,—'না তুমি সাধু নও, তুমি ভণ্ড, তুমি বদ্‌মাস্, তুমি শয়তান।'

অবশ্য মুখ দিয়া যে ভাষা তাহাদের অনর্গল বাহির হইতেছে তাহা শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়। দু'জনেই সমান। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। কেহই কম যান না।

নিতান্ত অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি। একবার ভাবিলাম, চলিয়া যাই, আবার ভাবিলাম, এতখানা পথ হাঁটিয়া আসিয়া 'ডাক' না দেখিয়াই বাড়ী ফিরিয়া গেলে

আফ্‌শোষের আর বাকি কিছু থাকিবে না। 'যা থাকে কপালে।' বলিয়া কাশিয়া গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া ডাকিলাম, 'মাষ্টার !'

উভয়েরই গলার আওয়াজ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। এত সহজে বন্ধ হইবে ভাবি নাই। দরজা খুলিয়া রাখাল-মাষ্টার মুখ বাড়াইয়া বলিল, 'ও, তুই! আয়, তোর আজ মেলা চিঠি।'

মাসের প্রথম। কয়েকখানা মাসিকপত্র আসিয়াছিল। হাতে লইয়া সেদিন আর দেরি না করিয়াই উঠিতেছিলাম। রাখাল-মাষ্টার বলিল, 'বোস্, কথা আছে।'

বাধ্য হইয়া বসিতে হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি কথা ?'

মাষ্টার বলিল, 'শুনেছিস ? ঝগড়া আমাদের ?'

বলিলাম, 'শুনেছি। কিন্তু বুঝ্‌তে কিছু পারি নি।'

মাষ্টার তিরস্কার করিতে লাগিলেন—'বুঝতে পারিস নি কি-রকম ? তুই-না গল্প লিখিস ?—এ ত' একটা কচি ছেলেতেও বুঝতে পারে।'

কি জবাব দিব বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মাষ্টার বলিল, 'শোন্ তবে। ও-হতভাগী যদি অম্‌নি করে ত' ওর মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেব না ত' কী করব ?'

অন্তরাল হইতে মাষ্টার-গিন্নির কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'হ্যাঁ, তা আবার দেবে না! আ মরি মরি, কি গুণের সোয়ামী গো !'

'ওই শোন্ !' বলিয়া আঙুল বাড়াইয়া মাষ্টার বলিল, 'গলার আওয়াজ শুনেছিস্ ? কাঠে যেন চোট মারছে।'

এবারেও গৃহিণী কি যেন বলিলেন, কিন্তু কথাটা ভাল বুঝা গেল না।

মাষ্টার তখন বলিতে লাগিলেন, 'শোন্ তবে আসল কথাটাই বলি। একদিন একটা খামের চিঠি—দেখলাম, মুখটা ভাল করে' আঁটা হয়নি। সরিয়ে রাখলাম। এই গাঁয়েরই চিঠি। নিতাই গাঙ্গুলী কয়লা-খাদে চাকরি করে। লিখেছে তার বৌএর কাছে। নিতাইএর বয়েস···এই তোদেরই বয়েসী হবে, ছোকরা বয়েস,—বৌটিও তেম্‌নি। ভাবলাম, পড়েই দেখি না কি লিখেছে।—আঃ! সে কি লেখা রে! হ্যাঁ, বিয়ে করা সাথক্! বৌকে যদি অম্‌নি চিঠিই না লিখতে পারলাম···আর ওই ত্থাখ্ আমার বাড়ীতে—'বলিয়া মাষ্টার আর-একবার তাহার গৃহিণীর উদ্দেশে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, 'ওকে চিঠি লিখব কি,—বিয়ে করা ইস্তক্

আজ পর্যন্ত মুখে আমার লাথি-ঝাঁটাই মারছে। যেমন প্যাঁচার মতন চেহারা, তেম্‌নি গুণ! বলে কি না, 'হতভাগা, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে না হ'লে আমি সুখী হতাম।' বলি তাই—'যা না বাপু, যেখানে খুশী তোর চলে যা, যাকে খুশী বিয়ে কর্‌গে যা, আমার হাড়টা জুড়োক্।' কিন্তু ক্ষেমতা নাই। হেঁ হেঁ! তখন বলে কি না—হ্যাঁ যাব! মেয়েমানুষের যাবার পথ যে নেই রে পোড়ারমুখো! আমি মরব। মরে' ভূত হ'য়ে এসে তোর ঘাড় মট্‌কাব দেখে 'নিস্।' এই ত' বাক্যি।—যাক, 'শোন্ তবে আসল কথাটাই শোন্!'

বলিয়া মাষ্টার একটা ঢোক্ গিলিয়া একবার এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া বলিল, 'নিতাইএর যেমন বুদ্ধি! দেখি, না, চিঠির ভেতর একখানা দশ টাকার নোট। বৌকে পাঠিয়েছে। ভাবলাম, নোটখানা দিই মেরে! ধরবার ছোঁবার ত' কিছু নেই। তখন আমার সংসারে যা কষ্ট রে, সে আর কি বলব! পঁচিশটি টাকা মাইনে। তাই থেকে বোনের তত্ত্ব পাঠালাম দশ টাকার,—বাকি পনেরটি টাকায় আব ক'দিন চলে! বাস্, নোট খানা সরিয়ে রেখে' খেতে গেলাম। খেতে বসে' ভাত আর রোচে না, হাত যেন মুখে আর উঠ্‌তেই চায় না। খালি-খালি ওই নোটটার কথাই মনে হয়। বলি,—না বাবা, এ অস্বস্তিতে কাজ নাই। আধ-খাওয়া করে' উঠে পড়লাম। বৌ বললে, 'ও কি গো! এ আবার কি ঢং!' বললাম, 'থামো।' বাস্! তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে নোটখানা আবার তেমনি খামের ভেতর পুরে' আটা দিয়ে এঁটে নিজেই হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নিতাই গাঙ্গুলীর দরজায় গিয়ে ডাকলাম—নিতাই এর বৌকে। বৌ ছেলে মানুষ, কিছুতেই আসতে চায় না। বললাম, 'এসে ওই দরজার পাশে দাঁড়াও মা, তাহ'লেই হবে। আমি পোষ্ট-মাষ্টার।' নিতাইএর বৌ ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়ালো! বললাম, 'এই নাও মা, তোমার চিঠি নাও। চিঠির ভেতর দশ-টাকার একটি নোট আছে।'—চিঠিখানি বৌ হাতে করে' নিলে। বললাম, 'নিতাইকে বারণ করে' দিও বৌমা, এমন করে' টাকা পাঠালে টাকা মারা যায়।' ঘাড় নেড়ে বৌ বললে, 'বেশ।'

বাবা! বাঁচলাম! এতক্ষণে নিশ্চিন্তি হ'য়ে বাসায় ফিরে' এসে বললাম, 'দাও, এবার ভাত দাও, খাব।' বৌ জিজ্ঞেস্ করলে, 'কি হয়েছে বল দেখি!' আগাগোড়া সব কথা বললাম বৌকে।—'বৌ বলে কি জানিস্?'

'কি বলে?' বলিয়া মাষ্টারের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

মাষ্টার হাসিল। বলিল, 'তবে আর তুই লেখক কিসের রে ?'

বলিয়াই মাষ্টার আবার আরম্ভ করিল, 'পোড়ারমুখী বলে কি না,—ওরে আমার কে রে!' সাধু স্থাওড়াগাছ! টাকা তুমি নিলে না কেন ?'

'বাস্! এই নিয়ে হ'লো ঝগড়া। বুঝলি এবার ?'

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ।'

মাষ্টার রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'ছাই বুঝলি। কিছুই বুঝিস্নি।—বুঝেও কি তুই ওকে নিয়ে আমাকে ঘর করতে বলিস্ ?'

হাসিয়া বলিলাম, 'কি বলব তা হ'লে ?'

'কি বলবি ?' বলিয়া মাষ্টার আমার মুখের পানে তাকাইয়া দাঁত কিস্‌মিস্ করিয়া বলিল, 'বলবি—খ্যাংরা মেরে' বাড়ী থেকে দূর করে দিতে।'

পোষ্টাপিস ও মাষ্টারের 'ফেমিলি কোয়ার্টারে' মাত্র একটি দেওয়ালের ব্যবধান। দেওয়ালের ও-পার হইতে শোনা গেল, 'হে ভগবান! হে ভগবান! এমন সোয়ামীর হাত থেকে আমায় নিষ্কৃতি দাও ভগবান! চিরজন্মের মত নিষ্কৃতি দাও—হে হরি, হে মধুসূদন!'—বলিয়া মট্ মট্ করিয়া আঙ্গুল মটকানোর শব্দ আর কান্না!

রাখাল-মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'চল্! এ আর চব্বিশঘণ্টা আমি কত শুনব ? চল্—তোকে খানিকটা এগিয়েই দিয়ে আসি। চল্।'

তখন সূর্যাস্ত হইতেছে। বাড়ী ফিরিতে হয় ত' রাত্রি হইবে।

বাহিরে আসিয়া দেখি, অস্ত-সূর্যের স্তিমিত রশ্মি মেঘে-মেঘে প্রতিফলিত হইয়া সারা আকাশটাকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে হরীতকী, শাল ও মহুয়ার বন। তখন ফাল্গুন মাস। সুচিক্কণ মসৃণ পত্র-ভারাবনত বৃক্ষশ্রেণী। শাল ও মহুয়া ফুলের গন্ধে-ভরা বাতাস। ঢেউ-খেলানো অসমতল ভূমিখণ্ডের উপর সুমুখে কয়েক-ঘর সাঁওতালের বস্তি। তাহারই পাশ দিয়া সঙ্কীর্ণ একটি পথ-রেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া বনে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

সেই পথ ধরিয়াই নীরবে চলিতেছিলাম। রাখাল-মাষ্টার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'হাঁ রে, লিখেছিস্ কিছু ?

'কি ?'

'বা-রে! ভুলে গেলি এরই মধ্যে ? সেই যে বলেছিলাম।'

হাসিয়া বলিলাম, 'তোমার গল্প ?'

মাষ্টার শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বলিলাম, 'না, তোমার গল্প আমি আর লিখব না।'

মাষ্টার সে কথায় কান দিল না। বলিল, 'কেন লিখবি না ? লিখ্‌বি লিখ্‌বি ! তবে সত্যি কথা লিখিস্ বাপু। এই ধর্—আমার বৌটার কথা লিখ্‌বি আগে। লিখবি যে, ওর মত খারাপ মেয়ে আর ছনিয়ায় নেই। মাগীটার কাছ থেকে পালাতে পারলে আমি বাঁচি। নিজের চোখেই ত সব দেখে এলি,—তোকে আর বেশি কি বলব।'

বলিলাম, 'আচ্ছা। তুমি এবার যাও, নইলে ফিরতে তোমার রাত হবে।'

'হোক না।' বলিয়া রাখাল-মাষ্টার আমার কাঁধে হাত দিয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'অন্ধকারে সাপে কামড়াবে ? কামড়াক না। বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই, মাইরি বলছি, বৌটার জ্বালায় এক একদিন মনে হয় আমি মরি।'

বলিয়াই সে ফিরিয়া যাইবার জন্য পিছন ফিরিল। বলিল, 'আসি তবে। লিখিস্ কিন্তু।'

* * * * *

সম্মতি দিয়া ত বাড়ী ফিরিলাম।

লিখিবার চেষ্টাও যে করি নাই তাহা নয়।

লিখিয়াছিলাম :

'পঁচিশটি টাকা মাত্র বেতন। রাখাল-মাষ্টারের পোষ্ট-মাষ্টারী করিবার কথা নয়! অদৃষ্টের বিড়ম্বনা !'

'বড়লোকের ছেলে নয়। ছেলে নিতান্ত গরীবের। তাও যদি বাবা বাঁচিয়া থাকিতেন !'

'শৈশবে পিতৃহীন মাতৃহীন বালক—মামার বাড়ীতেই মানুষ। মামা মস্ত বড়লোক। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাসদাসী, লোকজন,—তিন তিনটি মোটরকার। তাহারই একটিতে চড়িয়া প্রত্যহ বৈকালে রাখাল বেড়াইতে যায়। যেমন পোষাক, তার তেমনি চেহারা। লোকে দেখে আর বলে, 'ব্যাটার কপাল ভাল।'

'মামা বিবাহ দিলেন। গরীবের ঘরের অনাথা একটি মেয়ে।'

'মেয়ের অভিভাবিকা ছিলেন এক পিসি। মামা নিজে মেয়ে দেখিতে

গিয়াছিলেন।' মেয়ের পিসি বলিলেন, 'তাই ত' বাছা, ছেলেটির মা নেই বাপ নেই, তার ওপর মামার কাছে মানুষ · …'

মামা বলিয়াছিলেন, 'সেজন্য আপনি নিশ্চিন্তি থাকুন বেয়ান, মামা তার অর্ধেক সম্পত্তি ভাগনেকে দিয়ে যাবে।'

'হয় ত' দিতেন। কিন্তু এমনি রাখালের অদৃষ্ট যে, তিনি কিছু না দিয়াই মরিলেন।'

রাখাল— মেয়ের ছেলে, সুতরাং বলিবার কিছুই নাই।

কিছুদিন পরেই দেখা গেল সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। —নিরবলম্ব, নিঃসহায়, নিঃসম্বল রাখাল।

তাহার পর সে-সব অনেক কথা। বলিতে গেলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হয়।

পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক দুঃখ কষ্ট পাইয়া শেষে বহুদিন পরে রাখাল একটি চাকরি পায়—পোষ্টাপিসের পিওন। তাহার পর পিওন হইতে হয় পোষ্ট-মাষ্টার!

কিন্তু এই যে দুঃখ-দুর্ভোগ ইহাও হয় ত' সে নীরবে সহ্য করিতে পারিত—যদি সঙ্গিনীটি হইত তাহার মনের মতন।

'রাখাল বলে, 'সে দুঃখের কথা আর বোলো না ভাই, মেয়েটা আমাকে ভালবাসে না। ভালবাসলে এত ঝগড়াঝাটি, এত কথা-কাটাকাটি হয় না কখনও।'

এই পর্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

লেখা কাগজগুলা প্রায় প্রত্যহই সঙ্গে লইয়া যাইতাম। ভাবিতাম মেজাজ ভাল থাকিলে মাষ্টারকে একদিন পড়িয়া শোনাইব। কিন্তু পড়া আমার আর কোনদিনই হইয়া উঠিল না।

ভাল মেজাজে রাখাল-মাষ্টারকে পাওয়া বড় কঠিন।

যে-দিন যাইতাম, শুনিতাম, কেহ-না-কেহ তাহাকে বড় বিরক্ত করিয়া গেছে।

বিরক্ত করিবার লোকের অভাব নাই। কেহ একখানা পোষ্টকার্ড কিনিতে আসিলেও মাষ্টার তাহাকে দাঁত খিঁচাইয়া তাড়িয়া মারিতে ওঠে। অথচ পোষ্টাপিসে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসিবেই।

গ্রামে তাহার দুর্নামের একশেষ! সবাই বলে, 'এমন বদ-মেজাজী লোক বাবা

আমরা জীবনে কখনও দেখি নি। ওর নামে সবাই মিলে একটা দরখাস্ত না করলে আর উপায় নেই।'

কথাটা শুনিয়া বড় দুঃখ হইয়াছিল। মাষ্টারকে একদিন বলিয়াছিলাম, —'ছাখো মাষ্টার, পোষ্টাপিসের কাজে যে-সব লোকজন আসবে, তাদের সঙ্গে তুমি ওরকম-ধারা ব্যবহার কোরো না। এতে তোমার ক্ষতি হবে।'

'ক্ষতি? কি বললি,—ক্ষেতি?' বলিযা সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া জবাব দিয়াছিল, 'না। ক্ষেতি আমার কেউ করতে পারবে না তা তুই দেখে নিস্। অনেকে অনেক চেষ্টাই করেছিল কিন্তু পারে নি। উল্টে পিওন থেকে পোষ্ট-মাষ্টার! ভগবান আমার সহায় আছেন।'

এই বলিয়া মাষ্টার চোখ বুজিল। বলিল, 'ভগবান সহায় না থাকলে···ছাখ্, আমি যে কারও ক্ষেতি কোন দিন করিনি রে, আমার ক্ষেতি কেউ করবে না দেখিস্। ক্ষেতি যা কিছু আমার করবার, তা ওই উনি করেছেন।' বলিয়া সে তাহার অন্তঃপুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'চুপ! শুনতে পেলে কিছু বাকি রাখবে না।'

চুপ করিযাই ছিলাম।

মাষ্টার কিন্তু চুপ করে নাই। বলিতে লাগিল, 'গাঁয়ের লোক আমার বদনাম করে, না? তা ত' করবেই, বেটারা নিমকহারাম! আমি সাচ্চা মানুষ কি-না! ওই ছাখ—ওই রেজেষ্টারী চিঠিখানা ফেলে রেখেছি। কেন রেখেছি জানিস? ওই অবিনাশ-বেটার কাছে সেদিন আমি চাল কিনতে গেলাম, শুনলাম না কি ব্যাটা টাকায় দশ সের করে' চাল বেচছে। আমায় দেখে' বলে কি না, 'না ঠাকুর চাল আমি আর বিক্রি করব না। টাকায় দশ সের করে' ত' নয়—টাকায় আট সের।' অনেকক্ষণ চেঁচামেচির পর বললাম, তাই আট সেরই দে না রে বাপু, ঘরে যে গিন্নি আমার জল চড়িয়ে বসে আছে।' অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললে, 'না ঠাকুর, মিছে বকাবকি—আমি দেবো না।' আচ্ছা দাঁড়া রে ব্যাটা অবিনাশ, তোকে কি আমি একদিনও পাব না! বাস্, পেয়েছি। রেজেষ্ট্রী চিঠি একখানা এসেছে ব্যাটার নামে। আজ দু'দিন হলো—ওইখানেই পড়ে আছে। থাক্ ব্যাট ওইখানে পড়ে!'

বলিলাম, 'কিন্তু এ তোমার অন্যায়, মাষ্টার:'

'অন্যায় ?' বলিয়া মাষ্টার আমার মুখের পানে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া বলিল, 'তবে আর তুই লেখক কিসের রে ?'

কি আর বলিব। চুপ করিলাম।

কিন্তু রেজেষ্ট্রী চিঠি ফেলিয়া রাখা যে অন্যায়, সে কথা বোধ করি রাখাল-মাষ্টার ভুলিতে পারিল না; তাই সে আবার আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'অন্যায় কিসের শুনি? সে-যে অন্যায় করলে সেটা বুঝি অন্যায় হলো না? আমার অন্যায়টাই অন্যায় ?'

কি যে বলিব ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমার চিঠি কয়খানি লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, মাষ্টার ধরিয়া বসিল, 'ওসব চলবে না। তুই বলে যা!'

বলিলাম, 'চাল সে না দেওয়ায় তোমার ক্ষতি কিছু হয় নি কিন্তু এতে যদি তার ক্ষতি হয় ?'

মাষ্টার অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসে ক্ষতি হয় ?'

'চিঠিখানা ফেলে রাখায়।'

'তাও ত বটে।' বলিয়া মাষ্টার নীরবে বারকয়েক্ মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'ঠিক বলেছিস্। লেখক-মানুষ কি-না, বুদ্ধি-সুদ্ধি একটু আছে।'

উভয়েই চুপ।

মাষ্টার সহসা বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা!'

বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।—'হয়েছে তোর চিঠি নেওয়া ?'

ঘাড় নাড়িয়া আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

অবিনাশের চিঠিখানা হাতে লইয়া মাষ্টার বলিল, 'চল্ তবে নিজেই দিয়ে আসি। কাজ কি বাপু, রেজেষ্টি চিঠি, দরকারিও ত' হ'তে পারে! চল্।'

দু'জনে একসঙ্গে বাহির হইতেছিলাম, বাহিরে দরজার কাছে একজন হৃষ্টপুষ্ট লম্বা-চওড়া সাঁওতাল-ছোক্‌রা দাঁড়াইয়া আছে, মাথায় বাব্‌রি চুল, গলায় লাল কাঁটির মালা, হাতে একটা বিড়ালের বাচ্চার মত মেটে-রঙের মরা খরগোস। সাঁওতাল-ছোকরাটিকে দেখিবামাত্র রাখাল-মাষ্টারের মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। চৌকাঠের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, 'কে···মুংরা··· তুই আজও এসেছিস···?'

বলিয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে কামড়াইতে মাষ্টার কি যেন বলিতে লাগিল।

মুংরা বলিল, 'ধেৎ তেরি! রোজ রোজ পুইসা নাই, পুইসা নাই, আনতে তবে তুঁই বলিস কেনে?'

অনুমানে ব্যাপারটা কতকটা বুঝিলাম। মুংরাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দাম?

মুংরা দাম বলিবার আগেই মাষ্টার বলিয়া উঠিল, 'নিবি তুই? আহা খরগোসের মাংস—বুঝলি কি না—ভারি সুন্দর। আমার বৌ খুব ভালবাসে। দু'তিন মাস ধরে আমাকে বলছে, কিন্তু ছাই এমন দিনে মুংরা আসে যে আমার হাতে পয়সাই থাকে না। আরও দু'বার দুটো এনেছিল, তা ওই যে বললাম, এমন দিনে আসে হতভাগা·· ···! দাম? দাম আর বেশি কোথায়? দাম দু আনা।'

পকেট হইতে একটি দু'আনি বাহির করিয়া মুংরার হাতে দিয়া বলিলাম, 'দে, ওটা আমাকে দিয়ে যা।'

মুংরা অত্যন্ত খুশী হইয়া হাসিতে-হাসিতে দু' আনিটি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

'দাঁড়া তবে, দাঁড়া। বলিয়া মাষ্টার তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া লোহার একটি লম্বা ছুরি আনিয়া বলিল, 'বেশ করে' কেটে ওকে কুটে দিয়ে যা মুংরা, বাবু ছেলেমানুষ, কুটতে পারবে না—বুঝলি? সেই তোরা যেমন করে কুটিস্। যা—আগে ওই ছোট তালগাছটা থেকে একটা 'বাগ্ড়ো' কেটে আন্, তারপর তালের এই পাতা দিয়ে বাবুকে জিনিসটা বেশ ভাল করে বেঁধে দিবি, বুঝলি? বাবু হাতে করে ঝুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যাবে।'

সুমুখের ছোট তালের গাছ হইতে একটা 'বাগ্ড়ো' কাটিয়া আনিয়া মুংরা খরগোস কাটিতে বসিল।

মাষ্টারের রেজেষ্ট্রী চিঠি দিতে যাওয়া আর হইল না। বলিল, 'থাক পিওনের হাতে পাঠালেই চল্‌বে।' বলিয়া চৌকাঠের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, 'মামার বাড়ী যখন ছিলাম, বন্দুক নিয়ে প্রায়ই শিকার করতে যেতাম। যেতাম বটে, কিন্তু একটা পাখীও কোন দিন মারতে পারি নি। গুলি ছুঁড়তাম। ছোঁড়বার সময় মনে হতো—আহা, কেন মারব? বাস্, হাত যেতো কেঁপে, আর

শিকার যেতো ফস্‌কে'। একদিন একটা কুকুর মেরেছিলাম। মামার ছিল পায়রার সখ। বুঝলি ?'

বলিয়া মাষ্টার চোখ বুজিয়া চুপ করিল। বিগত দিনের সুখৈশ্বর্যের স্মৃতি বোধকরি তাহার মনে পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে চোখ চাহিয়া বলিল, 'বাড়ীতে অনেকগুলো পায়রা ছিল। নানান্ রকমের পায়রা। একদিন একটা পায়রাকে বুঝি বেড়ালে ধরেছিল। পায়রাটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতো, ভাল করে উড়তে পারত না। পাশের বাড়ীর সুরেশের পোষা কুকুরটা একদিন ঝপ্ করে এসে তার ঘাড়ে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে —দিলে পায়রাটাকে মেরে। আমার রাগ হয়ে গেল। জানিস ত 'আমার' রাগ! বাস্, তৎক্ষণাৎ বন্দুক বের করে চালালাম গুলি। দড়াম করে লাগলো গিয়ে কুকুরটার পেটে। কাঁই কাঁই করে সে কি তার কান্না! ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। আবার গুলি! বাস্! খতম! কুকুরটা ছটফট করতে করতে গোঁ গোঁ করে আমার চোখের সুমুখে মারা গেল। উঃ! সে কি দৃশ্য!'

বলিয়া মাষ্টার একবার শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিল, 'সেই যে বন্দুক ছেড়েছি, জীবনে আর কোনো দিন……'

এই বলিয়া সেই যে সে মুখ ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া রহিল, অনেকক্ষণ অবধি সে আর কথা কহিল না।

তাহার গল্পটা আমার পকেটে-পকেটেই ফিরিত। ভাবিলাম ইহাই উপযুক্ত সময়। বাহির করিয়া বলিলাম, 'গল্প তোমার খানিকটা আমি লিখেছি। শোনো।'

মুখের ঢাকা খুলিয়া মাষ্টার বলিল, 'পড়।'

পড়িলাম।

খানিকটা শুনিয়াই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'নাঃ, গল্প লিখতে তোরা জানিস্ না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন ?'

মাষ্টার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'না, দুঃখ তুই নিজে পাস্ নি কোনো দিন, দুঃখুর কথা তুই লিখবি কেমন করে ? আমি যদি লিখতে জানতাম ত' দেখিয়ে দিতাম কেমন করে' লিখতে হয়।—আচ্ছা পড়্। শুনি শেষ পর্যন্ত।'

শেষ পর্যন্ত শুনিয়া কি একটা কথা যেন সে বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নজর পড়িল—মুংরার দিকে। মাংস কুটিয়া সে তখন দু'জায়গায় ভাগ করিতেছে। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কি রে? দু'জায়গায় কেন?'

বলিলাম, 'আমি বলেছি। একটা তোমার, একটা আমার।'

'আমার?' বলিয়া সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'বললাম আমার কাছে পয়সা নেই···তুই আচ্ছা বোকা ত'! চারটে পয়সাই বা এখন আমি পাই কোথায়?'

বলিলাম, 'পয়সা তোমাকে দিতে হবে না।'

মাষ্টার সকরুণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইল, তাহার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'চারটে পয়সা খরচ করবার ক্ষমতাও আজ আমার নাই।' বলিতে বলিতে চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

বলিল, 'দাঁড়া, গিন্নিকে দেখিয়ে আনি।'

বলিয়া একটা ভাগ সে দু হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া ভিতরে গিয়ে হাঁকিতে লাগিল, 'গিন্নি! ও গিন্নি!'

সেই অবসরে আমার ভাগটা লইয়া আমি পলায়ন করিলাম।

যথাসম্ভব দ্রুতপদে অনেকখানি পথ চলিয়া আসিয়াছি, এমন সময়, পশ্চাতে ডাক শুনিয়া তাকাইয়া দেখি, রাখাল-মাষ্টার ছুটিতে-ছুটিতে আমার পিছু ধরিয়াছে।

সারাপথ ছুটিয়া আসিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল। বলিল, 'পালিয়ে এলি যে? আয়। তোকে একবার আসতে হবে।' বলিয়া সে আমার হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

বলিলাম, 'না, রাত হয়ে যাবে, আমি আর যাব না।'

মাষ্টার কিছুতেই ছাড়িবে না। বলিল, 'উঁহু, যেতেই হবে তোকে।'

ব্যাপার কিছু বুঝিলাম না। বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল।

হাতে ধরিয়া আমাকে পোষ্টপিসের ভিতর লইয়া গিয়া মাষ্টার হাঁকিল: 'ধরে এনেছি গিন্নি, ওগো ও শ্রীমতী, কোথায় গেলে?'

মাথায় একটুখানি ঘোমটা টানিয়া শ্রীমতী আসিয়া দাঁড়াইল।—এক-হাতে এক গ্লাস জল, আর একহাতে ছোট একটি পাথরের বাটিতে খানচারেক বাতাসা।

মাষ্টার বলিল, 'একটু জল।'

পাছে দুঃখ পায় বলিয়া বাতাসা-কয়টি চিবাইয়া জল খাইলাম।

মাষ্টার হাঁকিল, 'পান? পান কোথায়?' বলিয়াই সে নিজের ভুল শুধরাইয়া লইল। বলিল, 'ও, পান ত' নেই বাড়ীতে। পান আমরা দু'জনেই খাই না। আচ্ছা দাঁড়া, দেখি।'

বলিয়া কি যেন আনিবার জন্য মাষ্টার ভিতরে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল না, পিতলের একটি রেকাবির উপর চারটি কাটা সুপারি ও কতকগুলি মৌরি লইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিল। রেকাবি হইতে সুপারি লইতে গিয়া একবার চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—আয়ত দুইটি চক্ষু, ম্লান একটুখানি হাসি! গৌরবর্ণ কৃশাঙ্গী যুবতী,—দেখিলে সুন্দরী বলিয়া ভ্রম হয়। তবে সৌন্দর্য যে তাহার একদিন ছিল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। দুঃখে দারিদ্র্যে সে সৌন্দর্য আজ তাহার ম্লান হইয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম, গল্পে যে-জায়গায় তাহাকে কুৎসিত লিখিয়াছি সে জায়গাটা কাটিয়া দিব। বলিলাম, 'নমস্কার! আজ আসি।'

মাষ্টার-গৃহিণী হাসিয়া প্রতি-নমস্কার করিল না, কোনও কথা বলিল না, ম্লান একটু হাসিয়া মাত্র তাহার জবাব দিল।

এ মেয়ে যে কেমন করিয়া মাষ্টারের জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইয়া আসিলাম। মাষ্টারও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর আসিয়া মাষ্টার হাসিয়া আমার কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখলি?'

কি দেখিলাম সে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ।'

মাষ্টার বলিল, 'ত্যাখ্, আমার গল্পের ভেতর সেই যে এক জায়গায় লিখেছিস—ও আমাকে ভালবাসে না, ওটা কেটে দিস্।'

বলিলাম, 'নিশ্চয়ই।'

ভাবিলাম, গল্পটা আগাগোড়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া লিখিব।

॥ শৈলজানন্দের গল্প-সঞ্চয়ন ॥

ভরসা ছিল যে, স্কুলে যখন যাইতেছি, তখন আশ্রয় একটা নিশ্চয়ই পাইব, অন্ততঃ বোর্ডিং ত আছে। এ সময়ে মফঃস্বলে অনাহূত বহু লোকই বোর্ডিং-এ আসিয়া আশ্রয় লয়, সুতরাং সেটা এমন কিছু অশোভন ব্যাপার হইবে না। সেই সাহসেই, এই অজ পাঁড়াগাঁয়ে, বৈকালের ট্রেণে মালপত্র লইয়া আসিয়া হাজির হইয়াছিলাম। কিন্তু স্টেশনে নামিয়াই যে সংবাদ পাইলাম, তাহাতে সমস্ত আশা ভরসা এক মুহূর্তে বিলুপ্ত হইল। যাহাকে বলে, একেবারে বসিয়া পড়িলাম!

ছোট স্টেশন, যে সিগ্‌নালার সে-ই পোর্টার, আবার সে-ই মাস্টারের কোয়ার্টারে জল যোগায়। ট্রেণ হইতে মাল নামাইবার সময় কুলীর ভরসা করি নাই, নিজেই টানিয়া নামাইয়াছিলাম কিন্তু এখন আর কুলী ছাড়া উপায় নাই, অতগুলি মাল ত মাথায় করিয়া লইয়া যাওয়া যায় না! অসহায় ভাবে কুলী কুলী করিয়া ডাকিতে সেই অদ্বিতীয় পোর্টারটিই মাথায় গামছা জড়াইতে জড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই যে ট্রেণ ছাড়িয়া গেল, উহার পরে একেবারে রাত্রি দশটা নাগাদ আর একটা কী ট্রেণ আছে—সুতরাং এই দীর্ঘ সময় সবটাই ইহার অবসর। এমন সুসময়ে 'মাল'ওয়ালাবাবু নামিতে দেখিয়া সে বেশ একটু উৎফুল্ল হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কোথায় যাবে মশাই?

কহিলাম, এই এখানে, ইস্কুলে—

সে বাক্সর উপর বিছানাটা সাজাইতেছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ধুত্তোর বরাৎ! সাত দিন পরে ভাবনু মোট একটা হ'লো,…এখানে ইস্কুল কোথাগো? সে যে আজ সাত মাস নাই মশাই!

সে কি! ইস্কুল নেই? তার মানে?

সে হাত পা নাড়িয়া কহিল, একে ত ইস্কুলে ছেলে হ'ত না ব'লে মাস্টাররা মাইনেই পেত না, তার ওপর এ বছর জষ্টিমাসে ঝড়ে গেল চাল উড়ে। কে-বা সেরে দেয়, কে-বা কি করে! ভদ্দরলোক গেরামে কোথা—? সেই যে ইস্কুল উঠে গেল, সেই উঠেই গেল—একেবারে!

চোখে যেন অন্ধকার দেখিলাম। শীতের অপরাহ্ণ; ইহারই মধ্যে, সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে, রাঢ়ের পল্লীর দিগন্তবিস্তৃত মাঠে সন্ধ্যার আব্‌ছায়া ঘনাইয়া

আসিয়াছে। চারিদিকে শুধু মাঠ, বহুদূর-দূরে এক আধখানা কুটীর চোখে পড়ে মাত্র। স্টেশন হইতে সে ধূসর পথটি গ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাও জনহীন—যেন নিকটে কোথাও কোন জনবসতি নাই। হঠাৎ মনে হইল, একেবারে মৃত্যুপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছি!

অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করিলাম, তা হ'লে উপায়? এখানে ডাক-বাংলা আছে?

সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। মোল্লারপুরে আছে।

মোল্লারপুর যাবার গাড়ী আছে এখন?

সে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই জবাব দিল, না। সেই ভোর পাঁচটায়।

বাঃ! হতাশভাবে স্টেশনের দিকে চাহিলাম। মাস্টার ইতিমধ্যে চাবি দিয়া বাসায় চলিয়া গিয়াছে, আবার রাত্রি দশটার পূর্বে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে না। বাসাতে গিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেও ইচ্ছা হইল না—শুধু শুধু বেচারাকে বিব্রত করা।

অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, কি আর হবে, তবে ঐ টিকিট-ঘরের সামনের বেঞ্চিতেই মালগুলো তুলে রাখো—আজ ঐখানেই রাত কাটাতে হবে।

সে যেন শিহরিয়া উঠিল। কহিল, এই রাত্তিরে বাইরে, হিমে শুয়ে থাকবে মশাই!

তাছাড়া উপায়?

সে একটু নিঃশব্দে ভাবিয়া লইয়া কহিল, আচ্ছা আপনি ম্যাস্টারের বাড়ীতে যাও না কেন। হেট্ ম্যাস্টারের বাড়ী—

হেড্ মাস্টার? তিনি এখানেই থাকেন নাকি?

এখানে থাক'ব না ত কোথায় যাবে, ওর ঘর যে এখানে গো!

অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী একেবারে মালপত্র লইয়া হাজির হইতে যথেষ্টই সঙ্কোচে বাধিল কিন্তু এই দুর্দান্ত শীতে সারারাত মাঠে বসিয়া থাকিবার কথাটা চিন্তা করিয়া সে সঙ্কোচ দমন করিলাম। লোকটির মাথায় মালপত্র চাপাইয়া অগত্যা হেড মাস্টার মহাশয়ের বাড়ীর উদ্দেশেই যাত্রা করিলাম!

সেই মাঠের মধ্য দিয়া ধূলিময় পথ, গো-গাড়ীর চক্রে পিষ্ট মিহি মাটির মধ্যে পা বসিয়া যায়, জুতাপরা এখানে শুধু বাহুল্য নয়—বিড়ম্বনা। কোনমতে তাহারই

উপর দিয়া মিনিট কতক চলিয়া এক সময়ে ভগ্নপ্রায় একটা মাটির বাড়ীর সামনে উপস্থিত হইলাম। সামনে একটা চণ্ডীমণ্ডপের মত ঘর, তাহাতে আগড় টানিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, তাহারই মধ্য দিয়া ক্ষীণ একটি আলোর আভাস পাওয়া যাইতেছিল, বাকী সমস্ত বাড়ীটাই নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার।

সেদিকে চাহিয়া সহসা যেন বুকের মধ্যেটা কেমন হিম হইয়া আসিল, অপরিসীম দারিদ্র্য ও আশাহীনতার চিহ্ন যেন সর্বত্র সেই অন্ধকারেই নজরে পড়ে। এখানে আশ্রয় ভিক্ষা করিব কি ফিরিয়া যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় সঙ্গের লোকটিই কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব চড়াইয়া ডাকিল, ও ম্যাস্টার মশাই! একবার বাইরে এস গো! একটা ভদ্দর লোক এয়েছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগড় খুলিয়া গেল। একটি মধ্য-বয়সী শীর্ণ ভদ্রলোক একখানা ছোট কাপড় পরিয়া আলো হাতে বাহির হইয়া আসিলেন।

আমার কাছে ভদ্রলোক এসেছেন?

তাহার পর কাছে আসিয়া ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়াই বোধ করি বুঝিতে পারিলেন, ও, বইয়ের ব্যাপারে এসেছিলেন বুঝি?·· আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। ও বাবা কেষ্ট, মালগুলো একেবারে বাড়ীর ভেতর দিয়ে আয় বাবা—। আসুন, এই যে সাবধানে—

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং নিঃসঙ্কোচ আহ্বান। যেন কতকালের পরিচয়! সাবধানে দাওয়ার ভাঙ্গা সিঁড়িতে পথ দেখাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই চমকিয়া গেলাম। প্রায় সাত-আটটি ছাত্র বই খাতা লইয়া ঘরের মেঝেতে মাদুরে বসিয়া আছে, একমাত্র আলো মাস্টার মহাশয় বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই চুপ করিয়া বসিয়াছিল, আমিও তাহাদের অস্তিত্ব কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই—কিন্তু চমকিয়া উঠিলাম সে জন্য নয়। যে ছেলেগুলি বসিয়া আছে, তাহাদের গায়ে গরম কাপড়ের লেশমাত্র নাই, একটি ছেলের গায়ে ত শুধু গেঞ্জি। যে উহার মধ্যে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন, তাহার গায়ে একটা মোটা খদ্দরের চাদর।

আমাকে দেখিয়াই ছেলেগুলি সসম্ভ্রমে মাদুর ছাড়িয়া মাটিতে সরিয়া বসিল। মাস্টার মহাশয় আলোটা নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, ওরে তোরা আজ যা বাবা, এই বাবুটি এসেছেন কল্‌কাতা থেকে—ওঁর সঙ্গে একটু কল্‌কাতার গল্প করব—

তাহার পর যেন আপন মনেই কহিলেন, কতকাল কল্‌কাতা দেখিনি যে! সেই বি-এ পাস ক'রে কল্‌কাতা ছেড়েছি, আর যাইনি। তবু বছর বছর আপনারা পাঁচজন আসতেন, তাও বন্ধ হয়ে গেল। ইস্কুলই নেই, কী জন্তে আসবেন বলুন না! তবু ভাগ্যি যে, আপনি খোঁজ ক'রে এলেন।

ছেলেরা সবাই নিঃশব্দে বই-খাতা গুছাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল, কেবল একটি ছেলে ভিতরে চলিয়া গেল, অনুমান করিলাম, সে উঁহারই পুত্র হইবে।

শেষ ছাত্রটি চলিয়া যাইতে কহিলেন, এবার এদের ফার্স্টক্লাস হয়েছিল কিনা, শুধু শুধু ক-টা মাসের জন্তে সারা জীবনটা মাটি হয়ে যাবে ব'লে আমিই ওদের নিয়ে বসি একটু—প্রাইভেট দেবে'খন—

তাহার পর সহসা নজর পড়িল আমার দিকে, ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, আরে, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে—বসুন, বসুন। তামাক চলে নাকি? চলে না? আচ্ছা তাহ'লে আমিই একটু সেজে নি, কিছু মনে করিবেন না।

ঘরের কোণে ভাঙ্গা বিস্কুটের বাক্সে তামাকের সরঞ্জাম, সেইখানে বসিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে কহিলেন, দুপুরের দিকে সেকেণ্ড্ ক্লাসের ছেলেগুলোও আসে—তা সবদিন সময় পাইনে। এই সময় আবার ধান কাটার সময়, বোঝেন তো! যা হোক্—মাস ছয়েকের ধানটা ঘরে আসে, এই সময়ে না দাঁড়াতে পারলে সব বরবাদ হয়ে যাবে—

তামাক সাজিয়া লইয়া কাছে আসিয়া বসিলেন, তাহার পরই কী মনে করিয়া অন্তঃপুরের উদ্দেশে হাঁক দিলেন, ও বাবা পদন—

সেই ছেলেটি আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল। মাস্টার মহাশয় কাছে গিয়া গলা খাটো করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন, পদন, তোমার দিদিকে গিয়ে বলো দেখি, বাবুটি এসেছেন, একটু চায়ের যোগাড় যদি হয়!

আমি ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলাম, কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন মাস্টার মশাই, চা আমি খেয়ে এসেছি। তা ছাড়া আমি বেশী চা খাইও না। আমাকে বড্ড লজ্জিত করছেন—

মাস্টার মহাশয় কহিলেন, মাস্টার আর নয় ভাই, ললিত, ললিত। বরং বয়সে বড় আমি—ললিতবাবুই বলতে পারেন—

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। আমি পুনশ্চ ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, কিন্তু চা-টা বারণ করে দিন—ও আর দরকার নেই।

তিনি আমার হাতের কব্জির কাছে খানিকটা চাপ দিয়া কহিলেন, কেন ভাই কুণ্ঠিত হচ্ছেন। আমাদের গরীবের ঘর, যদি আপনার দৌলতে একটু চায়ের জোগাড় হয়ই ত আমিও কোন্ না একটু পাবো। বুঝলেন না? চেপে যান, চেপে যান—

অপ্রস্তুত হইয়া অন্য কথা পাড়িলাম। কহিলাম, ইস্কুলটা উঠে গেল কেন, ললিতবাবু?

আর ভাই ইস্কুল! ছেলে ত ছিল মোটে একশ' সাতটি। মাইনে কিছুই উঠত না, আগে জমিদারের কিছু 'এড্'পাওয়া যেত, তাও বছর-তিনেক বন্ধ। আমার ষাট টাকা মাইনে, পঁয়তাল্লিশ টাকা পাবার কথা, কিন্তু ইদানীং কুড়ি টাকাও কোন মাসে ঘরে আনতে পারতুম না। কি করি বলুন, সবাইকে দিয়ে থুয়ে ত নিতে হবে! কোন কোন মাস্টার মশাই পাঁচ ছ' টাকার বেশী নিতেই পারতেন না।

আলোকটার দিকে চাহিয়া কী যেন ভাবিতে ভাবিতে চুপ করিয়া গেলেন। তাহার পর সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ঐ অবস্থা, কাজেই বাড়ীটা সারাতে পারিনি বহুদিন। বোর্ডিং-এর চালটা অনেকদিন গিয়েছিল, ইস্কুল বাড়ীতেই কোন রকমে কাজ চালাচ্ছিলুম, তারপর চালটা গেল ঝড়ে উড়ে। একটা দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ল—এ অবস্থায় আর কোথায় ইস্কুল করি বলুন!

সসঙ্কোচে কহিলাম, তা এখানে কোন রকম চাঁদা টাঁদা তুলে—

চাঁদা!—ললিতবাবু সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, কে দেবে বলুন ত চাঁদা। ছেলেদের ত দেখলেন, পেটে ভাত নেই, গায়ে কাপড় নেই। এদের বাপ-মা চাঁদা দেবে? গত বৎসর ধান হয়নি একদম, সারা গাঁ, বলতে গেলে, উপোস ক'রে আছে—এখন ইস্কুলের মাইনেই চাওয়া যেত না, তা চাঁদা! উপায় নেই ভাই, জমিদারের অবস্থাও সসেমিরে, নইলে না হয় দেখা যেতো! অবিশ্যি চেষ্টা আমি ছাড়িনি এখনও, কিন্তু—

এমন সময়ে চা আসিল। দুধ নাই, শুধু চা আর চিনি। সঙ্গে রেকাবিতে পুরাতন, বিবর্ণ দুটি রসগোল্লা। অতিথি-সৎকারের আনন্দে ভদ্রলোক দিশাহারা হইয়া কহিলেন, বা-রে! এরি মধ্যে বুঝি রসগোল্লাও এনে ফেলেছিস? বেশ, বেশ, তা ভদ্রলোককে মুখ-হাত ধোবার জল যে একটু দিতে হবে বাবা—

পদন ছুটিয়া গেল। আমি কহিলাম, এইটি বুঝি ছেলে আপনার?

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ললিতবাবু কহিলেন, না, ঠিক ছেলে নয়, তবে ছেলের মতই। ওটিও ছাত্র। বছর-দুই আগে ওর বাপ মরে যায়, আর কেউ নেই, আমার কাছেই রেখেছি। মাথাটি ভাল, আর বেশ ঠাণ্ডা। বড় সৎ ছেলে—

পদন জল লইয়া আসিল। বাক্‌বিতণ্ডা নিষ্ফল জানিয়া, উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিলাম, তাহার পর রসগোল্লা দুটির দিকে দেখাইয়া সবিনয়ে কহিলাম, আবার কেন পীড়ন করছেন বলুন ত—

ললিতবাবু ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিলেন, কিছুই করতে পারিনে ভাই, বড় গরীব। এ কি আর সবদিন জোটে ? আজ যদি মা কমল যোগাড় করতে পেরেছে ত আপনার সেবাতেই লাগুক্—ও আর দ্বিধা করবেন না।

অগত্যা আমার সেবাতে লাগাইতে হইল। প্রয়োজন ছিল না, তবুও। পাছে ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হন।

প্রশ্ন করিলাম, ছেলেরা কিছু কিছু দেয় ত ?

দেবে ? আপনি কি ক্ষেপেছেন ! দুবেলা পেটপুরে খেতেই পায় না। বই—তা-ও অর্ধেক ছেলের নেই। পালা ক'রে ক'রে পড়ে—

কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, কিন্তু আপনারই বা এমন ভূতের ব্যাগার দিয়ে চলে কি ক'রে ? ধানও ত শুনলুম পুরো বছরের পান না !

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, উনি চালান ! চলে যে কি ক'রে তা ভেবে দেখিনি। মেয়ে আমাকে কিছুই বলে না, যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, তখন ঘটি-বাটি বেচে চালায়। তাও আর বিশেষ রইল না !

তাহার পর সহসা যেন সব দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলিয়া কহিলেন, মরুক গে, আমার দুঃখের কান্না আর শুনে কাজ নেই। ততক্ষণ দুটো কলকাতার গল্প করুন—

নানাকথার মধ্য দিয়া গল্প জমিয়া উঠিল। ললিতবাবু যখন মেসে ছিলেন তখনকার কলিকাতার বিবরণ শোনাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যেই কত পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার কথাও শুনিলেন। তারপর সহসা লেখাপড়ার কথা উঠিতে প্রথম যেন মানুষটিকে চিনিতে পারিলাম। দেখিলাম, ভদ্রলোক সাধারণ ইস্কুল মাস্টার নহেন. পড়াশুনা বিস্তর করিয়াছেন। শিক্ষা সত্যসত্যই একসময়ে ইঁহার সাধনা ছিল।

ভাঙ্গা লণ্ঠনটা তুলিয়া দেওয়ালের পাশে একটা ভাঙ্গা শেল্‌ফের সামনে ধরিলেন। এই প্রথম লক্ষ্য করিলাম, সেখানে বিস্তর বই সাজানো রহিয়াছে। ধূলায় বিবর্ণ, কিন্তু তবু ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের কতকগুলি মূল্যবান বই চিনিতে বিলম্ব হইল না। বই-এর ব্যবসা করি সুতরাং তাহাদের আর্থিক মূল্যও যে কম নয় তাহাও বুঝিলাম।

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি এত লেখাপড়া শিখে এভাবে পড়ে আছেন কেন? যে-কোন যায়গায় আপনি অনায়াসে ভাল মাস্টারী পেতে পারতেন!

ঈষৎ যেন অপ্রতিভভাবে হাসিয়া ললিতবাবু কহিলেন, তা বটে। সে কথা আমি নিজেও ভেবে দেখেছি অনেকবার। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, গ্রাম থেকে যদি সবাই চলে যায়, তা' হ'লে গ্রামের কি দশা হবে ভেবে দেখুন ত! এখনই ত এই অবস্থা। গ্রামে এমন একটা শিক্ষিত লোক নেই যে, একখানা দরখাস্ত লেখে। চাকরী আমি ভালো পেয়েছিলুম ঢের কিন্তু গ্রামের ইস্কুলের মায়া কাটাতে পারিনি। আমারই চেষ্টাতে হাইস্কুল হয়েছিল—আবার আমারই চোখের সামনে চলে গেল। এখন আর বাইরে যেতে পারব না, বুঝলেন, too old for that।

চুপ করিয়া রহিলাম। ললিতবাবুও একটু নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভিতর হইতে পদন আসিয়া ললিতবাবুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি মাদুরের উপর মুড়ি দিয়া বসিয়া ললিতবাবুরই একখানা বই-এর পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। একটু পরেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন, এবার যে অনুগ্রহ ক'রে উঠতে হয়! কিছুই নেই, বলতে গেলে শুধু ভাত, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর মুখে দিতে পারবেন না।

আহারের প্রয়োজন ছিল না, বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না কিন্তু তবু উঠিতে হইল। কারণ ইতিমধ্যেই মানুষটিকে চিনিয়াছি, 'খাইব না' বলিলে উহাকে আঘাত দেওয়া হইবে।

ভিতরের দাওয়ায় জায়গা হইয়াছে। ভাত, ডাল ও একটা কুমড়ার তরকারী। দ্বিতীয় অবলম্বন নাই, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু ললিতবাবুর মুখের প্রসন্নতায় বুঝিলাম, ইহাও সম্ভব হইবে কিনা, সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল।

দু-টি মোটে আসন, আমি আর পদন বসিলাম। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বসলেন না?

ললিতবাবু অম্লানমুখে কহিলেন, আজ যে ভাই একাদশী, বিকেলে ত আমি কিছুই খাই না—

প্রথমটা অত মনে ছিল না। কিন্তু দুই-চারি গ্রাস ভাত খাইবার পরই সহসা মনে পড়িল যে, বোলপুরে যাহাদের বাড়ী ছিলাম, সেখানকার বিধবা গৃহিণী পরশু দিন একাদশীর উপবাস করিয়া কাল জল খাইয়াছেন। গোস্বামী-মতেও আর সময় নাই। ব্যস্ত হইয়া মুখ তুলিতেই সহসা চোখ পড়িল ললিতবাবুর কন্যার দিকে, রান্নাঘরের দরজার সামনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। চোখে তাহার করুণ মিনতি, আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা সে অনুমান করিয়া যেন আমাকে চুপ করিয়া থাকিবারই অনুরোধ জানাইতেছে। অগত্যা চুপ করিয়া গেলাম কিন্তু গলার কাছে ভাত যেন ডেলা পাকাইতে লাগিল।

ললিতবাবু সামনে বসিয়া তদারক করিতেছিলেন, কহিলেন, এ আপনাদের গলায় নামবার নয়, কিন্তু কোনমতে গর্তটা বুজিয়ে ফেলুন। না, না অমন ক'রে ঠেলে রাখবেন না, তা হ'লে আমার বড্ড কষ্ট হবে—

তাহার পর হাঁক পাড়িলেন, মা কমল, একটু অম্বল দেবে না এঁদের ?

কমলা দুটি ছোট পাথরের বাটীতে করিয়া আম্‌সীর অম্বল লইয়া বাহির হইয়া আসিল। এইবার ভাল করিয়া দেখিলাম মেয়েটিকে। বয়স কুড়ির বেশীই হইবে, দেখিতে কেমন তাহা বলা কঠিন—অর্থাৎ ভাল বা মন্দ কিছুই স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে না—নিতান্তই সাধারণ। দেহ একেবারে নিরাভরণ, বৈধব্যের বেশ।

অম্বল রাখিয়া প্রস্থান করিলে ললিতবাবু কহিলেন, মেয়েটার জন্যেই ভাবনা। আমার আর কি—ক-টা দিনই বা আছে! মেয়েটা যে কোথায় দাঁড়াবে, তাই ভাবি—

চুপি চুপি প্রশ্ন করিলাম, ওঁর শ্বশুরবাড়ী কোথায় ?

শ্বশুরবাড়ী! ওর ত বিয়ে হয়নি ভাই—।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, হাসিয়া কহিলেন, ও, ওর ঐ বেশভূষার কথা বলছেন ? মেয়েটা পাগল ভাই, ওর কথা বলেন কেন ? বলে, এ-ই বেশ, মিছিমিছি জবাবদিহি করতে হবে না যে, এত বয়স অবধি বিয়ে হয়নি কেন !······

কতখানি ব্যথায় ইহা সম্ভব হইয়াছে, ভাবিয়া কথাটা তুলিবার লজ্জাতেই

মরিয়া গেলাম। কোনমতে আরও দুইটি ভাত খাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। এবার আর ললিতবাবু বাহিরের ঘরে যাইতে দিলেন না, ভিতরের দু'খানি ঘরেরই একখানিতে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিলেন। একটা চৌকিতে কে আমারই বিছানাটা খুলিয়া পরিপাটী করিয়া পাতিয়া রাখিয়াছে, পাশে একটা জলচৌকীতে স্যুটকেস দুটি পর পর সাজানো। তাহার উপর এক গ্লাস জল ঢাকা, রেকাবীর উপর দুইখিলি পান। এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। বেশ একটা পরিচ্ছন্নতার চিহ্ন সর্বত্র।

ললিতবাবুও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া চৌকিতে বসিলেন। যেন পূর্ব কথারই জের টানিয়া বলিয়া চলিলেন, এই গ্রামেরই একটি ছেলে বিনয় ব'লে, কমলার সঙ্গে ছেলেবেলায় বড় ভাব ছিল ; ওঁর বড্ড ইচ্ছে ছিল, বিনয়ের সঙ্গে কমলার বিয়ে হয়। সেই জন্যে আমি যত্ন করে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, এইখান থেকেই পাস ক'রে কল্‌কাতায় আই-এসসি পড়তে যায়, তারপর ঢোকে মেডিকেল কলেজে। কমলার মায়ের যা দু'একখানা গহনা ছিল, তাই বেচে ওর খরচা চালিয়েছি। ভাবলুম যে আর ত পাঁচটা নেই—ওই একটা মেয়ে, সুখী হোক্। কিন্তু ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়তে পড়তে হঠাৎ তিনদিনের টাইফয়েডে বিনয় মারা গেল। আমাকেও ধনে প্রাণে মেরে গেল!

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনশ্চ বলিলেন, সবই আমার বরাৎ! সে বেঁচে থাকলে আজ আমার ভাবনা কি ছিল! অমন ছেলে জামাই হবে, এরও ত বরাত থাকা চাই।...কতকটা সেই থেকেই মা আমার হাতের রুলি দু'গাছা খুলে ফেলেছে। অবশ্য আর বিশেষ কিছু ছিলও না—

মুখে কোন সান্ত্বনার ভাষা আসিল না, অনেকক্ষণ পরে বলিলাম, কিন্তু বিয়ে ত আপনাকে দিতেই হবে—

কি জানি সে আর সম্ভব হবে কিনা। আমি ত কিছুই বুঝতে পারি না—

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তভাবে ললিতবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ যেন দিশাহারা হইয়া গেছেন, এম্‌নি তাঁহার দৃষ্টি! কতকটা আপন মনেই বলিলেন, কোথায় যাব, কি চেষ্টা করব, কিছুই বুঝতে পারি না। মেয়েটা সব দিন পেট ভরে খেতেও পায় না, সবই বুঝি—কিন্তু—

তাহার পর আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, বড্ড রাত হয়ে গেল, ঘুমোও ভাই তুমি—

উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুয়ার পর্যন্ত আসিয়া কহিলাম, কাল ভোরে ত আমার গাড়ী, লোকটাকেও আসতে বলেছি। তখন কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

নিশ্চয় হবে, সে কি কথা। আমি খুব ভোরেই উঠি। ঘুমই হয় না ভাল ক'রে—আচ্ছা ভাই ঘুমোও—

তিনি চলিয়া গেলেন। অতিথি-সৎকার শেষ করিয়া তিনি অনায়াসে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িলেন কিন্তু অতিথির চোখে নিদ্রা আসিল না। পদনও বোধকরি শুইয়া পড়িয়াছে, খালি জাগিয়াছিল একা কমলা। সে রান্নাঘরে কি কাজ সারিতেছিল। হয়ত তাহারও খাওয়া হইল না।

অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা কাহার মৃদু পদশব্দে চমক ভাঙিল। বাহির হইতে কমলা আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল, জল-টল কিছু চাই আপনার?

জল? না, কিচ্ছু না।

তাহার পর, সে চলিয়া যায় দেখিয়া, সব দ্বিধা জোর করিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ডাকিলাম, একবার শুনুন।

কমলা নিঃসঙ্কোচে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম, আচ্ছা, আপনার বাবা এখনও এমন ক'রে সবাইকে আশ্রয় দেন, আপনি বাধা দিতে পারেন না? পরকে খাইয়ে নিজে উপবাসী থাকারও ত একটা সীমা আছে!

কমলা নতমুখে অথচ দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, এই গ্রামের মধ্যে চিরকাল সকলে ওঁরই আশ্রয় নিয়েছে। এখন কি আর বাধা দেওয়া সম্ভব? অম্‌নিই ত উনি এখন আর কাউকে ভাল ক'রে আদর-অভ্যর্থনা করতে পারেন না, ছাত্রদের বই-খাতা যোগাতে পারেন না ব'লে মরমে মরে আছেন—তার উপর আর কত আঘাত দেব বলুন। আজ যদি আপনি এখানে আশ্রয় না পেয়ে ফিরে যেতেন, তাহ'লে যে ব্যথা ওঁর লাগত, তা ওঁর নিজের না-খাওয়া থেকে ঢের বেশী।

তা বটে! আর কোন উত্তরই খুঁজিয়া পাইলাম না। কমলা একটু অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। আমি তখন কতকটা মরিয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিলাম, একটা কথা বল্‌ছিলুম—

কমলা ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবার তাহার স্থিরদৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, আপনি কি আমাদের কিছু সাহায্য করতে চান?

লজ্জায় মরিয়া গেলাম। তবু চুপ করিয়া থাকা চলে না, বলিলাম, দেখুন এটাকে ওভাবে দেখবেন না। আপনার বাবা দেবতুল্য লোক, তাঁকে প্রণামী দিচ্ছি, তাই ভাবুন। নয়ত তাঁর ছাত্রদের জন্যেই যৎকিঞ্চিৎ—

সহসা ডান হাতখানা মেলিয়া কমলা বলিল, আমি এমনিই নিচ্ছি। দিন্—

ব্যাপারটা যেন অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ সুযোগ আর আমি ছাড়িলাম না। গাড়ীভাড়ার টাকা রাখিয়া যাহা কিছু ছিল সবই তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম।

টাকাটা হাতে পড়িতেও কিন্তু সে হাত সরাইয়া লইল না। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, তাহার দৃষ্টি কেমন একরকম অদ্ভুতভাবে দূরের জানালায় নিবদ্ধ, দুটি চোখ প্লাবিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে ধারায় ধারায়।

সে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, এ যে ওঁর কত বড় অপমান, তা আপনি কোন-দিন বুঝবেন না, তবু আমি আজ 'না' বলতে পারলুম না।···আজ সাত-আট দিন ধরে রাত্রিবেলা ওঁর খাওয়া হচ্ছে না। অথচ ক্ষিদে উনি একেবারে সইতে পারেন না—

উচ্ছ্বসিত রোদনে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কমলা দ্রুত প্রস্থান করিল।

বাহিরের অন্ধ প্রকৃতি এবং ঘরের কোণে স্তব্ধ প্রদীপ শুধু এই মর্ম্মন্তুদ অভিনয়ের সাক্ষী রহিল।

। ভাড়াটে বাড়ী ।

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থ নৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তা-ব্যক্তিরা ছেলে-ভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা যাঁরা কোনোগতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই-স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশী কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এরা পেতেন সব চেয়ে কম। শুনেছি কোনো কোনো ইস্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাশীর চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিত মশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নাই কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেন নি—পালপরব, শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাংলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা—ঘৃণা বললেও হয়ত বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজী হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনায় 'দোলা-লাগা' 'পাখীজাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা—সেদিন কাজে লেগে ছিল। এবং তার পর মুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু ক উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশী, এবং টেবিলের উপর পা দুখানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশী। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেড মাষ্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাষ্টার তার কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে 'লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গ-নিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিত মশাইকে খুশী করবার পন্থা দরকার হলে ঐ বিষয়টি নূতন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিত মশাই একটু বেশী স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই ; ঐ 'দোলা লাগা পাখী-জাগা-ই' আমার বর্ণাশ্রম-ধর্ম-পালনে একমাত্র গোমাংস-ভক্ষণ। পণ্ডিত মশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানাপ্রকার কটুবাক্য বর্ষণ করে। অনার্য, শাখামৃগ, দ্রাবিড়-সম্ভূত কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সম্বোধন করতেন না। তাছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিত মশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে বলতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে। এবং তার অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত স্নিগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মন স্থির করতে পারিনি যে সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি কোনটা বেশি হয়েছে।

পণ্ডিত মশায়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোঁকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাচানো থাকত—অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয় চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন। আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্রবারের মতন স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তার পর যে কোনো একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে দিন কোনো অজুহাতই পেতেন না—ধর্মসাক্ষী সে কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু'চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায়—আলোচনা করে উপসংহারে

বলতেন, কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মত নিষ্ফল নয় কি? তারপর কখন আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড় বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টানা-পাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিত মশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এ রকম দিনযামিনী সায়ং প্রাত শিশির-বসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান—এ কথা অস্বীকার করার জো নাই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজো যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তার যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা তোলা, মাথা একদিকে, ঝুলে-পড়া, টিকিতে দোল-লাগা, কাষ্ঠাসন-শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিত মশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন?

সে সময়ে আসামের চীফ-কমিশনার ছিলেন এন. ডি. বীটসেন-বেল। সায়েবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে, তাঁর নাম আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'। 'এন. ডি.' তে হয় নন্দদুলাল আর বীটসন্ বেল অর্থ বাজায় ঘণ্টা—

—দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে। ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সেই একদিন খবর দিল লাটসায়েব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে—পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের টুর-ক্লার্ক না কি; সে তাঁর কাছ থেকে পাকাখবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল-আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। এক দিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায়

পাদটীকা

খিটখিটে মাষ্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা পাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাষ্টার মশায়ের মেজাজ যখন সকলের প্রাণ ভাজা-ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল, শুক্রুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাষ্টার ইস্কুলে সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কীনাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সে দিকেই হেডমাষ্টার—নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজ ভাই আছে, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বলল 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন কি হয়েছে ?'

'দেখেই আয় না ছাই।'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাষ্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। আমাদের পণ্ডিত মশাই একটা লম্বা-হাতা আন্‌কোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদবাকি মাষ্টাররা কলরব করে সে গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন, নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন ; কেউ বলছেন পণ্ডিত মশাই কি বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা, পণ্ডিত মশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তিও ছিল না), কেউ বলছেন আহা, যা মানিয়েছে, (হাতী, পণ্ডিত মশাইকে সার্কাসের সঙের মত দেখাচ্ছিল), কেউ বলছেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট আউট কি ?) শেষটায় পণ্ডিত মশাইয়ের ইয়ার মৌলবী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভটচায, এ রকম উমদা গেঞ্জি, শ্রেফ দু'খানা তৈরী হয়েছিল, তারই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানী দেউলে হয়ে গিয়েছে ; আর কারো কপালে এরকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাশী নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেণ্ড পিরিয়াডে বাঙলা। পণ্ডিত মশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে

শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিত মশাই পাঞ্জাবী শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সাহেব আসছেন শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না, তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস; সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিত মশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিত মশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্য আমরা তখন তৈরী কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন-মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ডর-ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিত মশাই গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিত মশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিত মশাই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান, ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তরপায় শেষটায় পণ্ডিত মশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনো করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গব্বযন্ত্রণা' কখনো এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়মিড় খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন— লাট সাহেবের সামনে তো সর্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, পণ্ডিত মশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সাহেব এলে আমি জানালা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না হয় পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গব্ব-যন্ত্রণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।' আমি হাত জোড় করে বললুম 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিত মশাই; ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

পাদটীকা

আসলে পণ্ডিত মশাইয়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই; শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহভরা চোখে বললেন, 'তুই তো আস্ত মর্কট—শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম।

পণ্ডিত মশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তার টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশী ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্ত দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গে খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোন বিপদ ঘটল না। পণ্ডিত মশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম, কোন দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময় মত ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিত মশাই আবার তার 'গব্ব-যন্ত্রণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন, সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটার, ইন্‌সপেক্টর, হেডমাষ্টার, নিত্যানন্দ—আর লাট সাহেবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পান্‌ডিট' বলে সাহেব হাত বাড়ালেন। রাজ-সম্মান পেয়ে পণ্ডিত মশায়ের সব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সাহেবকে সেলাম করলেন—এই অনাদৃত পণ্ডিতশ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেয়েও যে কি রকম বিগলিত হতেন, তা তাদের সে সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নাই।

হেডমাষ্টার পণ্ডিত মহাশয়ের কৃৎ—তদ্ধিতের বাই জানতেন; তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাট সাহেব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম প্লীজ'। লাট সাহেব আমাদের বলল, 'প্লীজ, এ কী কাণ্ড! তখন আবার কেউ রা কাড়ে না। হেডমাষ্টার শুধালেন, 'বিহঙ্গ', আমরা চুপ,—তখন প্লীজের ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট

পাঁঠা বেতটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয় দেশে নাম করে ফেলল—আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সাহেব ততক্ষণ হেডমাষ্টারের সঙ্গে পণ্ডিত শব্দের মূল নিয়ে ইংরাজীতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাষ্টার কি বলেছিলেন জানিনে তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছেন, যার সব কিছু পণ্ড গিয়েছে সেই পণ্ডিত।

ইংরাজ-শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব-পণ্ডের ইতিহাস হয়ত রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,—না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়ত একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সাহেব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিত মশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড্ করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু'তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাশ বসেছে, পণ্ডিত মশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন না শুধু চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিত মশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ—যোগরূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর—ক্লাশরূঢ়ার্থে আমি। উত্তর দিলুম —'আজ্ঞে'।

পণ্ডিত মশাই শুধালেন, 'লাট সাহেবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাশী নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

'বললেন, হল না। আর কে ছিল?' বললুম, ঐ যে বললুম, এক গাদা এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেন নি।'

পণ্ডিত মশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরো গম্ভীর করে শুধালেন; 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূর্খ? আমি কালা না তোর মত অমানুষ।'

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিত মশাই, জিজ্ঞাসা করুন না কেন পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে।'

পণ্ডিত মশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা দিবান্ধ,—রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ-শক্তি নিয়ে—"

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ও তো এক সেকেণ্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিত মশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ এক গৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো।'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম 'আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরীতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকার মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে সেলাম টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা; লাট সাযেবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট দিতেন।

পণ্ডিত মশায় বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মত কাণা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সায়েবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে খবরটা ও গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিত মশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আট জনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মদনমোহন কি রকম আঁক শেখায় রে?'

মদনমোহন বাবু আমাদের অঙ্কের মাষ্টার—পণ্ডিত মশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান।'

পণ্ডিত মশাই বললেন; বেশ বেশ। তবে শোন। মিথ্যার উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়। এইবার দেখি, তুই কি রকম আঁক শিখেছিস। বলতো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে কি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?'

আমি ভয় করেছিলুম পণ্ডিত মশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।' পণ্ডিত-মশাই বললেন, 'সাধু, সাধু!'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধমাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবন-ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বলতো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে; এই ব্রাহ্মণ-পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের ক'টা ঠ্যাঙের সমান?' আমি হতবাক।

'বল না।'

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিত মশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

মূর্খের মত একবার পণ্ডিত মশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা ঘৃণায়, বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায় নি—পণ্ডিত মশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিত মশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস-শেষের ঘণ্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়' 'silence golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা পাই।'

। চাচাকাহিনী ।

বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ, আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

সবাইকেই হতাশ করতে হলো। বিলাসপুরের রেল-কলোনীর ছেলেরা বড় আশা করে আমার কাছে এসেছিল। তিন দিন ধরে থিয়েটার, নাচ, গান। চাঁদাও উঠেছে বহু টাকা। কোলিয়ারীর মালিকরাই দিয়েছে সাতশো। কলকাতা থেকে ড্রেসার পেণ্টার আসছে!

আবার বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ তোমরা, আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

কিন্তু ছেলেরা চলে যাবার পর হঠাৎ যেন নিজের অজ্ঞাতে চমকে উঠলাম। তবে কি ছেলেরা অন্তর্যামী! কী করে জানলে ওরা! আমি তো মিথ্যে কথাই বললাম। জানালার বাইরে দেখলাম বুধবারী-বাজারের দিকে ছেলেরা চলে যাচ্ছে। টাউনের রাস্তায় ইলেকট্রিক বাতিগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠলো। ডাউন বম্বে মেল আসবার সময় হয়েছে বুঝি। টাঙ্গাগুলো সওয়ারী নিয়ে ছুটে চলেছে স্টেশনের দিকে। নিজের প্রায়অন্ধকার ঘরটার মধ্যে বসে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।ওদের কাছে আমি মিথ্যে কথাই তো বলেছি। সত্যিই তো অভিনয় করেছি আমি। ছোট এক অঙ্কে সমাপ্ত একখানা নাটক। স্টেজ নেই, দৃশ্যপট নেই, ড্রেসার, পেণ্টার, রিহার্শাল কিছুই নেই। তবু তো সেদিন অভিনয় করতে আমার বাধেনি!

ছেলেদের ডাকা হলো না। সেইখানে বসেই যেন মল্লিক মশাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম চোখের সামনে। মল্লিক মশাই বললেন—কেমন জামাই দেখলে মুকুল?

বললাম—খাসা, চমৎকার—

মল্লিক মশাই আবার বললেন—আমি জানতুম জয়ন্ত রাজি হবেই, এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওই তো বয়েস, এর পর পরীক্ষাটা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে···কিন্তু তুমি খেয়েছো তো? পেট ভরেছে?

এবারও বললাম—হ্যাঁ—

—মাংসটা কেমন হয়েছিল?

এবারও বললাম—ভালো—কিন্তু এবার আমি আসি মল্লিক মশাই, এর পর গেলে আর ট্রেণ পাবো না হয়ত—

একজন কৃষাণ গোছের লোক বললে—এ হলো মালো পাড়া, মল্লিক মশাই থাকেন পুব পাড়ায়—এই বাঁশঝাড়ের পাশ বরাবর গিয়ে পড়বেন বারোয়ারীতলায়, তার ডান ধার পানে পুবপাড়া—

চলতে চলতে ভাবছিলাম—বলা নেই, কওয়া নেই, হয়ত মল্লিক মশাই খুব অবাক হয়ে যাবেন। একদিন কত পীড়াপীড়ি করেছেন এখানে আসবার জন্যে। তখন আসা হয়নি। সেই মল্লিক মশাই অফিস থেকে রিটায়ার করলেন, ফেয়ারওয়েল হলো তাঁর—তখনও কথা দিয়েছিলাম—যাবো মিনুর বিয়েতে, নিশ্চয় যাবো কথা দিচ্ছি—

মল্লিক মশাই বলতেন—আগের দিন খবর দিও, আমি পুকুরে ঝোরা দিয়ে মাছ ধরিয়ে রাখবো, আর উমেশ ময়রাকে কাঁচাগোল্লার বরাত দিয়ে রাখবো, তাই খাবে—শেষে মিনুর গানও শুনিয়ে দেব—

আশ্চর্য! এই এতখানি পথ হেটে বত্রিশ বছর ধরে কেমন করে একটানা চাকরী করে এসেছেন মল্লিক মশাই। ভোর বেলা সাতটা বাজতে না বাজতে বেরুতেন বাড়ী থেকে আর ফিরতেন রাত আটটায়। আর তারই মধ্যে ইট পোড়ানো, বাড়ী করা, পুকুর কাটানো—ক্ষেতখামারের তদারক…

আমার সঙ্গে কেমন করে যে অমন বন্ধুত্ব হয়েছিল কে জানে। অথচ আমি তো প্রায় তাঁর ছেলেরই বয়সী।

মনে আছে প্রথম দিন আমাকে বলেছিলেম—এটা ক্যামেরা নাকি মুকুন্দ? তুমি নিজে ছবি তুলতে পারো?

তারপর বলেছিলেন—তা দাওনা মিনুর একটা ছবি তুলে ভায়া, ওর ভারি ছবি তোলাবার সখ—একদিন তুমি চলো আমাদের দেশে—যা দাম লাগে আমি দেব—

ভুধরবাবু বলতেন—মল্লিক মশাই আপনি যে এত মেয়ে-মেয়ে করেন—মেয়ে তো বিয়ে হলেই পর হয়ে গেল—

ওপাশ থেকে সুধীরবাবু বলতেন—এই দেখনা আমার জামাই-এর আক্কেলটা যতবার ছেলে হবে আমার কাছে পাঠাবে, আর মেয়েও তেমনি হয়েছে—আসে আসুক কিন্তু একেবারে খালি হাতে—আমার তো এই মাইনে—সবদিক সামলাই কী করে?

সনাতনবাবু বলতেন—কথাতেই তো আছে—জন্-জামাই-ভাগ না তিন নয়

আপ্না—বুঝতে পারতাম মল্লিক মশাই কথাগুলো শুনে অপ্রসন্ন হতেন। চুপি চুপি বলতেন—জয়ন্ত আমার সেই রকম জামাই নাকি তোমরা ভাবো, অমন ছেলে হাজারে একটা মেলে না—

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মেয়ের কি বিয়ে হয়ে গেছে নাকি ?

মল্লিক মশাই বললেন—তা এক রকম হওয়াই বলতে পারো—শুধু দেরি হচ্ছে ওর চাকরীর জন্যে—সীতানাথ বাবুকে বলে আমিই তো ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ইছাপুরে, সেখান থেকে বদলি হয়েছে জব্বলপুরে, এইবার একটা প্রমোশন হলেই ফোরম্যান একেবারে—

বললাম—তা বলে বিয়েটা করে রাখলে দোষ কী ?

মল্লিক মশাই বলতেন—আমি তো তাই বলি—সেবার ছুটি নিয়ে সেই কথা বলতেই গিয়েছিলাম জব্বলপুরে, বেশ জায়গা, সাহেবদের বাঙলো পেয়েছে, চাকরবাকরে রান্না করে—আমি বললাম—কেন তোমার এ-সব হাঙ্গামা করা, মিনু এলে একদিনেই তোমার ঘর-সংসারের শ্রী বদলে যাবে—কেউ নেই তোমার সংসারে, তুমি কার পরোয়া করবে ? তা কী বলে জানো ?

বললাম—কী ?

বলে—টাকা জমাচ্ছি আমি, বিয়েতে আপনাকে এক পয়সা খরচ করতে দেব না কাকাবাবু।

—আপনি কী বললেন ?

—আমি আর কী বলবো, আমি চলে এলাম, তা তুমি কী ভাবছো আমি আমি কিছু খরচ না করে পারি ? আমার তো এদিকে সব তৈরী, সেদিন যে ইট পোড়ালাম, সে বাড়ী তো জামাই-এর জন্যেই—সব তৈরী মুকুন্দ, সব তৈরী,—খাট, আলমারী, ড্রেসিং আয়না, ষোল ভরির গয়না পর্যন্ত গড়িয়ে রেখিছি—দানের বাসন কিনেছি, এক একটা করে গায়ে হলুদের কাপড় পর্যন্ত কিনে রেখেছি—মিনুর মা নেই, আমাকেই তো সব করতে হবে—সাধে কি আর বলি, জামাই তো অনেকেরই দেখছো—আর বিয়ের সময় আমার জামাইকেও দেখো—খবর দেব তোমাকে—

সুধীর বাবু বলতেন—তুমি ওই বুড়োর কথা বিশ্বাস করো নাকি মুকুন্দ ? আজ পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি ওই এক কথা। আমি কতদিন বলেছি—একটা ভালো পাত্র আছে, আপনার মেয়ের সঙ্গে দিন বিয়ে, আপনার মেয়ে

সুন্দরী, একটা পয়সা নেবে না, তা উনি বলেন—না, মেয়ের আমার পাত্র ঠিক হয়ে আছে—

একদিন সরাসরি বলেই ফেলেছিলাম—আচ্ছা মল্লিক মশাই, ভগবান না করুন—যদি জয়ন্ত শেষ পর্যন্ত বিয়ে না-ই করে—এতদিন হয়ে গেল—

মল্লিক মশাই-এর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস। বলতেন—তুমি বলো কি মুকুন্দ, জয়ন্তকে আমি চিনি না! আমি ওকে মানুষ করলাম, ছোট বেলায় বাপ-ম মারা গিয়েছিল, আমি না দেখলে ও কি বাঁচতো? ইস্কুলের মাইনে দিয়ে পড়িয়ে চাকরীতে ঢোকানো ইস্তোক—সব যে আমি করেছি--নইলে ধর্মে ওর সইবে—মাথার ওপরে ভগবান বলে একজন আছেন তা মানো তো?

সুধীরবাবু সব শুনে বললেন—শুনলে তো, এখন কী জবাব দেবে দাও—

তারপর একটু থেমে বললেন—ওঁর মেয়েটি কিন্তু ভারী সুশ্রী ভাই, লক্ষ্মী প্রতিমার মত চেহারা, এমন চমৎকার তার ব্যবহার, একবার দেশে গিয়ে দেখেছিলাম। জয়ন্ত গান ভালোবাসে বলে মেয়েকে উনি মাস্টার রেখে গান শিখিয়েছেন, জয়ন্ত ভালো-মন্দ খেতে ভালোবাসে বলে নানান্ রকমের রান্না শিখিয়েছেন—

এক-একদিন দেখতাম মল্লিক মশাই মনোযোগ সহকারে চিঠি লিখছেন। আমি কাছে যেতে বললেন—জয়ন্তকে আর একটা চিঠি লিখলাম—

বললাম—আগেকার চিঠির উত্তর পেয়েছেন না কি?

বললেন—না, সেই জন্যেই তো লিখছি আবার—

—আপনার চিঠির উত্তর দেয়না এটাই বা কী রকম?

—তা ভাই এ তো আর আমাদের মত কেরাণীগিরির চাকরী নয়, অফিসে বড় খাটুনি ওর, সময়ই পায় না—

তবু কখনও মনে পড়ে না জয়ন্ত একটা চিঠিরও উত্তর দিয়েছে।

একদিন এমনি করে রিটায়ার করবার দিনও এল। চাঁদা তুলে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হলো মল্লিক মশাইকে। যাবার দিন মল্লিক মশাইএর চোখে জল এসে গিয়েছিল। বত্রিশ বছরের সম্পর্ক ছাড়তে কষ্ট হয় বৈ কি! আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—মিনুর বিয়েতে তোমার যাওয়া চাই কিন্তু ভাই—

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—দিন স্থির হয়ে গেছে না কি?

—ওই দিন স্থির করাটুকুই যা বাকি—নইলে বিয়ে ওদের একরকম হয়েই গেছে ধরে নিতে পারো, ওদের ছুটি পাওয়া খুব শক্ত কি না, বিয়ের ছুটি তাও দেবে না বেটারা, তা বলাও যায় না একদিন হয়ত হুট্ করে এসে বলতে পারে—এখুনি বিয়ে হয়ে যাক, একদিনের ছুটি হয়ত মেরে কেটে পেয়েছে।

বললাম—একদিনের মধ্যে সব যোগাড় যন্ত্র করতে পারবেন ?

মল্লিক মশাই এবার হেসে ফেলেছিলেন—যোগাড় তো সব করেই রেখেছি ভায়া, মায় ফুলশয্যার বন্দোবস্তও শেষ—শুধু কাঁচা বাজারটা, তা সে আমার ভাইপো আদিনাথ আছে, সব করে ফেলবে সে।

এ-সব পাঁচ বছর আগের ঘটনা। মল্লিক মশাই রিটায়ার করবার পরও পাঁচ বছর কেটে গেছে। আর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। জানি বেঁচে আছেন। এই পর্যন্ত।

ভাবছিলাম—এতদিন পরে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ আমাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন কে জানে !

কিন্তু পুবপাড়ায় পৌঁছে আর বেশি দেরী হলো না। ছাড়া ছাড়া বাড়ি চারদিকে গাছপালার জঙ্গল। বেশ ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। কাছাকাছি কোনও বাড়িতে ঢোল আর শানাই বাজছে। ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজও আসছে। বোধহয় কোনও উৎসব চলেছে কোথাও।

বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতেই একজন বেরিয়ে এল।

বললে—মল্লিক মশাই ? তাঁর তো অসুখ—

—অসুখ—মানে—

ছেলেটি যেন কেমন আমতা আমতা করতে লাগল।

তারপর বললে—আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

বললাম—কলকাতা। বলোগে মুকুন্দ এসেছে। বি-এন-আর অফিস থেকে—

অফিসের নাম শুনে যেন কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো ছেলেটি।

জিজ্ঞেস করলাম তোমার নাম কী ?

—আদিনাথ।

—তুমি কি মল্লিক মশাইয়ের ভাইপো ?

আদিনাথ আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে—আপনি জানলেন কী করে ?

বললাম—আমি জানি সব—কিন্তু মল্লিক মশাইএর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে—

—কিন্তু—

আদিনাথ তবু যেন কেমন দ্বিধা করতে লাগলো।

বললে—তিনি তো চোখে দেখতে পান না—

—সে কি? আমার বিস্ময়ের আর অন্ত নেই।

—হ্যাঁ, আজ চার বছর অন্ধ হয়ে গেছেন, শুধু চুপ চাপ বসে থাকেন নিজের ঘরে—

নিজের ঘরে—'

বললাম—তা' হোক, আমাকে তিনি অনেকবার এখানে আসতে বলেছেন—একবার দেখা না করে যাবো না—

আদিনাথ তবু যেন কোনও উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু এবার অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম তার মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে এল। হারিকেনের মৃদু আলোয় তার দু'চোখের পাতাগুলো কেমন যেন ছল্ ছল্ করছে।

হঠাৎ কান্নার মতন করে যেন আদিনাথ ককিয়ে উঠলো।

বললে—আপনি যেন কিছু বলবেন না তাঁ'কে—কাকাবাবুর হার্ট বড় দুর্বল। ডাক্তারে কেবল বিশ্রাম নিতে বলেছে—আপনার পায়ে পড়ি, আপনি……

হঠাৎ ছেলেটির এই ব্যবহারে কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই স্বল্পালোকিত পরিবেশে, চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ আর অদূরের ঢোল আর শানাইয়ের মূর্ছনার সঙ্গে এক মুহূর্তে সমস্ত অতীত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

আদিনাথ বললে—চলুন, নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, কিন্তু আপনি যেন কিছু বলবেন না—

আমি মন্ত্রচালিতের মত পেছন পেছন চলতে লাগলাম। সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ির অন্দর মহলেও কোন লোকজনের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। যেন মৃত্যুপুরীর অলিন্দ দিয়ে আমি কোন্ অনাবিষ্কৃত অনন্তের সন্ধানে চলছি।

আমি সামনে এগিয়ে একবার বললাম—বাড়িতে কোন বিপদ চলছে নাকি?

আদিনাথ হাতের সঙ্কেত করে বললে—চুপ, কাকাবাবু শুনতে পাবেন—

তারপর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। গলা নীচু করে বললে, উনি যা বলবেন আপনি হ্যাঁ বলে যাবেন—আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের বাঁচাবেন—

বললাম—কী হয়েছে? কিছুই বুঝতে পারছি না যে—

আদিনাথ তেমনি গলা নিচু করে বললে—আর চেপে রাখা যাচ্ছিল না—আপনাকে সব বলবো পরে—কাকাবাবুর মেয়ের আজকে বিয়ে—

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বললাম—কা'র? মিনুর?

আদিনাথ কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা পড়লো। ঘরের ভেতর থেকে মল্লিক মশাইএর গলা শোনা গেল—কে? কে ওখানে কথা কয়?

আদিনাথ আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। বললে—আমি কাকাবাবু।

—সঙ্গে কে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

—ইনি এসেছেন মিনুর বিয়েতে কলকাতা থেকে। আপনি বলেছিলেন নেমন্তন্ন করতে—বি-এন্-আর অফিসের লোক।

সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক মশাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—কে? সুধীর? সনাতন? মুকুন্দ?

এগিয়ে গিয়ে বললাম—মল্লিক মশাই, আমি মুকুন্দ।

আমার উত্তরটা শুনেই মল্লিক মশাই যেন উত্তেজনায় আনন্দে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বললেন—মুকুন্দ? মুকুন্দ, তুমি এসেছ?—আর ওরা এল না—সুধীর, সনাতন?

আদিনাথ এগিয়ে গিয়ে বললে—ইনি বলছিলেন ওঁদের আসবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অফিসে ছুটি পাননি।

এবার ঘরের ভেতরে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। মল্লিক মশাই একটা খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন। সমস্ত শরীরে চাদর ঢাকা। মাথার পেছনে একটা টেবিলের ওপর একটা হারিকেন জ্বলছে। কয়েকটা ঔষধের শিশি, জলের গ্লাস।

আমি কথা বলতে চেষ্টা করলাম—আপনার চোখ খারাপ হয়েছে জানতাম না তো!

মল্লিক মশাই হাসলেন। বললেন—বয়েস হয়েছে, যাবারও সময় হয়ে এল মুকুন্দ, কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখু নেই, আর মিনুর বিয়েটা যে শেষ পর্যন্ত হলো, তাতেই আমার সব দুঃখু মিটে গেছে ভায়া—

তারপর থেমে বললেন—তুমি যে এসেছ মুকুন্দ, আমি ভারি খুসী হয়েছি, চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলে ?

আদিনাথ আমার দিকে চাইলো।

আমি বললাম—হ্যাঁ, চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম, আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম মিনুর বিয়েতে আসবো—

মল্লিক মশাই এবার বললেন—আদিনাথ—মুকুন্দকে তুমি ফাস্ট ব্যাচেই খাইয়ে দেবে। ওর আবার ট্রেণের সময়—

আমি কেন জানি না বলে ফেললাম—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মল্লিক মশাই।

মল্লিক মশাই যেন তৃপ্তি পেলেন, শুনে বললেন—ভালোই করেছ—মাংসটা কেমন খেলে ? আর উমেশ ময়রার কাঁচাগোল্লা ?

বললাম—খাসা—চমৎকার।

মল্লিক মশাই বললেন—আদিনাথ, তুমি নিজে খাবার সময় কাছে ছিলে তো ?

আদিনাথ টপ করে বললে—হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি নিজে খাইয়েছি ওঁকে—

মল্লিক মশাই আবার বললেন—বর দেখলে মুকুন্দ—জয়ন্তকে দেখলে ? কেমন জামাই করেছি বলো ? তখন তো সবাই তোমরা ঠাট্টা করতে ? বলতে জয়ন্ত বিয়ে করবে না—কিন্তু মাথার ওপর একজন ভগবান আছেন এ কথা মানো তো ? তোমরা আজকালকার ছেলে ভগবান-টগবান মানো না—কিন্তু আমার অসীম বিশ্বাস ছিল ভাই ছোটবেলা থেকে।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—ওইযে যে-বাড়িতে বসে তুমি খেলে, ওই বাড়িটাতেই বিয়ের ব্যবস্থা করলাম ভাই, ওটা দিয়ে যাবো মেয়ে-জামাইকে, আর এই বাড়িটে হচ্ছে আমার পৈত্রিক, শরীরটা খারাপ বলে ওই সব হাঙ্গামার মধ্যে আমি আর গেলাম না—আমি আদিনাথকে বললাম—আমি নিরিবিলিতে এখানেই থাকবো—তা' আদিনাথ একাই সব করছে—

বললাম—ভালোই করছেন—

মল্লিক মশাই বললেন—দেখ ভাই, ভগবানের ওপর অসীম বিশ্বাস ছিল বলে, বরাবর আমি বিশ্বাস করতুম জয়ন্ত রাজি হবেই—এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওই তো বয়েস, এবার ফোরম্যান হয়েছে, এরপর একটা পরীক্ষা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে—তা জয়ন্তকে আমি কিছু খরচ করতে দিইনি—

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে আমি পনেরো হাজার টাকা পেয়েছিলাম জানো ত, সবই খরচ করলাম মিন্নুর বিয়েতে—

তারপর আদিনাথকে লক্ষ্য করে বললে—আদিনাথ, ওদিকে কোনও গোলমাল হচ্ছে না তো? সবদিকে নজর রাখবে, কেউ যেন না খেয়ে চলে যায় না—টাকার জন্যে ভেবো না—

আদিনাথ বললে—না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কাকাবাবু, আমি সব দেখছি—

আমি আব স্থির থাকতে পাবছিলাম না। বললাম—এবার আমি আসি মল্লিক মশাই, এরপব গেলে আর ট্রেণ পাবো না হয়ত—

মল্লিক মশাই বললেন—আচ্ছা এসো ভাই—খুব কষ্ট হলো তোমার—আদিনাথ, মুকুন্দর যাওয়াব বন্দোবস্ত কবে দিও—

সেই নিঃসঙ্গ ঘরের মধ্যে মল্লিক মশাইকে রেখে সোজা উঠে বাইরে এলাম। তারপর অন্ধকারে পা ফেলে ফেলে একেবারে সদব দবজার কাছে এসে পৌছুলাম। আমার যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। চেয়ে দেখি আদিনাথও হারিকেনটা নিযে সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁডিযেছে পেছনে।

আদিনাথও যেন আমাব মত নির্বাক হয়ে গেছে।

তার চোখে চোখ পডতেই দেখলাম আদিনাথ কাঁদছে।

মুখ দিয়ে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথা বেরুল না।

আদিনাথই মুখ খুললে। বললে—আপনি যেন কাউকে কিছু বলবেন না!

এতক্ষণে রাস্তায় নেমে এসেছি। বাইরে অন্ধকার। চারদিকে বাঁশঝাড় আর জঙ্গল। কোনও দিকে কিছু স্পষ্ট দেখা গেল না। শুধু অদূরের ঢোল-শানাই-এর শব্দ ভেসে আসছে। দু' একবার শাঁখও বেজে উঠছে। মনে হলো—শানাইটা বিনিয়ে বিনিয়ে কেবল বুঝি বিসর্জনের সুরই বাজাচ্ছে।

হঠাৎ মুখ ফেরালাম।

আদিনাথও আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁডালো।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না?

মনে আছে আদিনাথের হাত দু'টো চেপে ধরেছিলাম। বলেছিলাম—কিছু মনে করো না তুমি—কিন্তু এর পর খেতে আমাকে তুমি বোল না ভাই—

—অন্তত: গরীবের বাড়িতে ডাল-ভাত-চচ্চড়ি যা জোটে—

সেদিন অভুক্ত অবস্থায়ই চলে এসেছিলাম মনে আছে। বারোয়ারীতলা পর্যন্ত আদিনাথ আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আমাকে ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসছিল। কিন্তু আমি বারণ করেছিলাম।

বললাম—তোমাকে আর আসতে হবে না ভাই, তুমি মল্লিক মশাইকে গিয়ে দেখো—

আদিনাথ বলেছিল—কিন্তু কাকাবাবু জানতে পারলে রাগ করবেন—

—কিন্তু জানাবে কেন তাঁকে ?

এ-কথার উত্তরে আদিনাথ কোনও জবাব দেয়নি। আমার দিকে চেয়ে কেমন যেন কোনও নতুন প্রশ্নের অপেক্ষা করছিল।

আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম—জয়ন্ত কি চিঠি দিয়েছিল তোমাদের—শেষ পর্যন্ত ?

আদিনাথ বললে—না—কাকাবাবুর একখানা চিঠিরও জবাব দেয়নি—

—সে কি জব্বলপুরেই আছে ? একবার গেলে না কেন সেখানে ?

গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি—

—কেন ?

—তার চাকর ঢুকতেই দিলেনা বাড়ির ভেতর। দু'টো কালো কালো কুকুর তাড়া করে এল কামড়াতে—

—তার চাকর কী বললে ?

—চাকরটা বললে—মেম-সাহেব মানা করে দিয়েছে। আমিও শুনলাম, জয়ন্ত এক মেম-সাহেবকে বিয়ে করেছে, ছেলেও হয়েছে—

—তারপর ? যেন নিজেও হতবুদ্ধি হয়ে নির্বোধের মত প্রশ্ন করে বসলাম।

আদিনাথ বললে, তারপর আর কি, কাকাবাবুও অবুঝ. তাঁরও হার্ট খারাপ হয়ে গেছে, এ-খবর দিতে পারিনি তাঁর কাছে। ডাক্তারবাবু বারণ করেছিলেন—। কিন্তু আর বেশি দিন চেপে রাখাও যাচ্ছিল না—ওঁকে বাঁচাবার জন্যে এই পথ নিতে বাধ্য হলাম, এ-ছাড়া আর গতিও ছিল না—আমার মা এই বুদ্ধিই দিলেন—

বারোয়ারীতলার বিরাট বিরাট বট গাছের তলায় কেমন নির্বোধের মতন খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আশে পাশে চারদিকে পাকা-পাকা ফলগুলো টপ টপ করে পড়ছে। মনে হলো—যেন কারো চোখের জল পড়ার শব্দ ওটা।

তবে কি নির্জীব গাছটাও সব জানে। চেয়ে দেখলাম—আদিনাথ এখনও কাঁদছে। মনে পড়লো—মল্লিক মশাই বলেছিলেন—মাথার ওপর ভগবান বলে একজন আছেন তা মানো তো?

হঠাৎ বললাম—এবার আসি ভাই—

আদি নাথ হারিকেনটা উঁচু করে ধরলো।

সে-আলোয় সামনের পথটা একটু ঘোলাটে হয়ে এল।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালাম। যে-মেয়েটিকে নিয়ে এত কিছু কাণ্ড, এত মুখর অভিনয়, তার কথা তো এতক্ষণ একবারও মনে আসেনি। মল্লিক মশাইএর দিকটাই সবাই দেখেছে। কিন্তু তার কথা তো কেউ ভাবছে না। ওই ঢাক ঢোল শানাই-মূর্ছনা আব শাঁখের মঙ্গলধ্বনির অন্তরালে সে-ও কি একজন অন্যতম অভিনেত্রী হযেই আছে? জয়ন্তর জন্যে তার গান শেখা আর রান্না শেখার কৃচ্ছ্রসাধনেব ইতিহাস কি আজ এই পবিণাতব জন্যে প্রস্তুত ছিল? মনে হলো—ও বটফল নয়, ও যেন সেই মেয়েটিরই চোখের জল—আমাদেব আশে পাশে চাবদিকে টপ্‌ টপ্‌ করে ঝরে পড়ছে। ওকে শুধু জয়ন্তই উপেক্ষা করেনি—মল্লিক মশাই, আদিনাথ, আদিনাথেব মা সকলেব কাছেই সে উপেক্ষিতা।

আদিনাথ আলোটা উঁচু করে তখনও দাঁড়িয়েছিল।

কাছে গিয়ে বললাম—আর·· আর

আদিনাথ আমার দ্বিধা ভেঙে দিয়ে বললে—বলুন—

—আর সেই মল্লিক মশাইএর মেয়ে? সে জানে?

আদিনাথ বললে—মিনুর কথা বলছেন। তার মত আছে, সে তো কাকা-বাবুর মত অবুঝ নয়। তা ছাড়া এ পাত্রও তো খারাপ নয়, দেড়শো বিঘে ধানজমি আছে, এক বিঘের ওপর জমিতে বাস্তু বাড়ি, বছরেব খাবার ঘরেই হয়, শুধু আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে—তা এত কাণ্ডের পর একজন রাজি হয়েছে এই তো সৌভাগ্য বলতে হবে মিনুর পক্ষে—

॥ পুতুল দিদি ॥

মার কাছে মালতী মাসিমার গল্প দিনরাত শুনতাম।

অদ্ভুত সব গল্প, কি বিচিত্র সেই সব কাহিনী, আর আমরা চুপ করে শুনতাম। মাসিমাকে কখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু এমনই নিখুঁতভাবে তার গল্প শুনেছি যে মনে হত আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে আছেন।

এমন কি, এই যে 'মালতী মাসিমা' কথাটুকু, তার মধ্যেও যেন একটা আভিজাত্যের গন্ধ রয়েছে। আমার শিশু-মনে মালতী মাসিমা ছিলেন স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, ঐশ্বর্যের মহিমায় মহীয়সী। সব কাহিনীতেই আমার মাসিমা মুক্ত হস্তে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁর থলিতে থালি টাকা, খুচরো পয়সার বালাই নেই—সবই তিনি দু'হাতে ওড়াতেন।

আমরা অতি দরিদ্র, তাই আমাদের কোন আত্মীয় অর্থের প্রতি এমন মমতাহীন, একথা ভাবতেও ভাল লাগে। আমাদের নিদারুণ অর্থাভাব, তাই ভাবতাম এমন প্রচুর টাকা থাকলেই হয়ত আমাদের সব সমস্যা মিটে যেতো।

শীতের দিনে মোটা কাঁথা গায়ে দিয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মার কোল ঘেঁষে বসে শুনতাম মালতী মাসিমার গল্প আর হাতে টাকা এলে আমরা কি কি করব তার লম্বা ফিরিস্তি। এই শীতকালে মাসিমা হয় ব্যাঙ্গালোর, নয় গোপালপুর অনদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আগে দু'একবার বিদেশে গিয়েছেন সেবার শীতের সময় ছিলেন দিল্লীতে, মা বললেন, "মালতী নিশ্চয়ই বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবে, দেখিস তোরা।"

আমি বললাম—"মা, মাসিমা বড়লাটকে বলে আমাদের এই দুঃখ কষ্ট মিটিয়ে দিতে পারেন না?"

"তা পারে বৈ কি? মালতীর মুখের কথায় কি না হয়? ওর কথা কেউ ফেলতে পারে না।"

আমি তখন একটু বড় হয়েছি, শুনেছি বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর ভীষণ মতান্তর চলেছে। তাই বলিলাম—"মা বড়লাট মালতী মাসির কথা যদি কানে না তোলেন?

মা একটু রেগে বলে উঠলেন—"কি যে বলিস, মালতী মাসি স্বর্গে গেলে স্বয়ং যমরাজও দৌড়ে আসবেন।"

এর কিছুদিনের পরেই কুতুব মিনারের ছবি ছাপা এক পোষ্টকার্ড এল দিল্লী থেকে, তার পিছনে মালতী মাসিমা লিখেছেন মোটা মোটা অক্ষরে—"কাল বড়লাটের বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল।"

মা আমাদের সকলের চোখে যেন আঙ্গুল দিয়েই বললেন: "দেখলি? কি বলেছিলুম।"

এর পর সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমার কাটলো বিরাট প্রাসাদে। যেখানে সবাই কেবল সাটিন আর সিল্‌ক পরে।

অজস্র খেলনা, চকলেট আর লজেন্‌স্ ছড়ানো আছে, যখন খুশি তোলো আর খাও। কল্পলোকে এই কাণ্ড, বাস্তব জগতে কিন্তু কোনক্রমে ঝোল আর ভাত জুটছে। মনে মনে বলি, 'আর কদিন, এইবারই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শীতকাল কেটে গেল। স্কুলে বসন্তকালের কথা শুনতে লাগলাম। বাংলা ক্লাসের পণ্ডিত মশাই বসন্ত ঋতু সম্পর্কে রচনা লিখতে দিলেন। বললেন—এই সময় গাছ, ফুল, পাতা সব ঘুম ভেঙে উঠে। পাখী ডাকে, ফুল ফোটে ইত্যাদি। ক্লাস ঘরেও ফুলের ছড়াছড়ি, সবাই কিছু না কিছু ফুল হাতে স্কুলে আসে। মাঝে মাঝে ঝির-ঝিরে বৃষ্টি হয়।

ভাবি তৃষ্ণাকাতর ফুলের জন্য বিধাতা এই ফটিক জল পাঠিয়েছেন, ওদিকের করপোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগ লাল শালুর ওপর তুলো লাগিয়ে লিখেছেন চারিদিকে বসন্ত—টীকা লউন।"

আমরা কিন্তু সেই রকম দরিদ্রই আছি। মাকে একদিন বললাম: "নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন, না মা?"

"কি ভুলেছেন? কে ভুলেছে? কার কথা বলছিস্ খোকা?"

"মাসিমার যে বড়লাটকে আমাদের জন্য একটু বলবার কথা ছিল। আমাদের কিছু টাকা দেবার কথা।"

"দূর পাগলা, বড়লোকেরা কি গরীবের কথা ভাবে? স্বয়ং ভগবানই ভাবেন না।"

স্কুলের পাঠ্য হিসাবে মুখস্থ ছিল, তাই আবৃত্তি করলাম। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

আমি চিলেকুঠুরীর ঘরে গিয়ে ভগবানকে ডাকতে থাকি। মার কথায় আবার ভগবান যদি চটে যান তাহলে আমরা যে গরীব সেই গরীবই রইলাম। স্বর্গ ও

নরক, পাপ ও পুণ্য এইসব নিয়ে আমার মনে চিন্তার আর অবধি ছিল না। যারা সৎ এবং মহৎ তারা থাকবে একদিকে, আর যারা পাপিষ্ঠ তারা নরকে পুড়ে মরবে। আমি থাকবো ভালর দলে আর মা নরকে পুড়বে, কিন্তু আমি কি করব। কথাটা ভাবতে খারাপ লাগে। বরং খারাপদের দলে ভিড়ে আমি যদি নরকে যাই আর মার কাছাকাছি থাকি, তা'হলে মা একটু শান্তি পেতে পারেন। মা তবু বুঝবেন মার দুঃখে দুঃখিত হয়েই আমি নরকে এসেছি, তাঁকে আমি ভালবাসি। হয়ত মালতী মাসিমা কিছু করতে পারেন। পারেন না?

তাঁকে ত' যমরাজও খাতির করে·········

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, পথের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু ওখানেই বা এত বৃষ্টি কেন? ঐখানে কোন গাছপালা নেইত। কিন্তু তখনই মনে হল, পথের চারিপাশে কি পোকা-মাকড় রয়েছে। তারা নিশ্চয়ই তৃষ্ণার্ত, বিধাতা তাই হয়তো বৃষ্টি পাঠিয়েছেন। যদি পোকা মারতেও তাঁর এত করুণা তাহলে মার হয়ত শাস্তি হবে না।

সেই রাতে মা আমার মালতী মাসিমার গল্প সুরু করলেন:

"কি রূপকথার রাজকন্যা, এই পর্যন্ত ঘন কালো চুল, কি চোখ। মালতী ঠিক করল, এই চুলের কাঁড়ি আর বাড়িয়ে লাভ কি, এইবার একে ছেঁটে 'বব' করে নিই। সব ঠিকঠাক। তারপর কি মনে হল, ওর দাসীটাকে বলল, তুই আগে 'বব' ছেঁটে আয় ত কি রকম দেখায় দেখি। ভারি খামখেয়ালী কিনা, ঝিকে শেষ পর্যন্ত দশটা টাকা দিয়ে তবে ঠাণ্ডা করে। সে কান্নাকাটি সুরু করেছিল।"

সবাই হাসতে লাগল। আমি কিন্তু সেই হাসিতে যোগ না দিয়ে কেবল ভাবতে থাকি—মালতী মাসিমার কাছে থাকলে কত সহজেই না দশ টাকা রোজগার করা যেত, শুধু একটু কান্নাকাটি করলেই হল। মার গল্পেরও শেষ নেই। অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার। মালতী মাসিমার শাড়ি, ব্লাউজ, সিল্ক—সাটিন আর অলঙ্কারের হিসাব হচ্ছিল সেদিন। ও সে কি কাণ্ড! কখনও শুনিনি অত জিনিষের নাম একসঙ্গে। এমন নাকি এক ছড়া হার আছে যার বিনিময়ে একটা ছোটখাটো বাড়ি কেনা যায়। মালতী মাসিমার বাড়িতে আছে চমৎকার বাগান, ফলে-ফুলে ভরা।

গ্রীষ্মকালের জন্য আছে মুসৌরীতে বাংলো। গরমটা সেইখানেই কাটিয়ে দেন।'

একবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নাকি মালতী মাসিমার কাছে এসেছিলেন। ওর ছোট্ট খোকা স্মরজিৎ যখন মারা যায় তখন। শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখা দিয়ে নাকি বলেছিলেন—"আমার ময়ূরপুচ্ছের মুকুট বড় পুরাণ হয়েছে, তোর ছেলের চুলগুলো বেশ। ঐ সোনালী চুলের মোহন চূড়া ভারী চমৎকার হবে।" মাসি রাজি হয়ে গেলেন। তার জন্যেই স্মরজিতের মৃত্যুর পরও মালতী মাসিমা শোকে আকুল হয়ে পড়েন নি।

কিন্তু এক শত কাহিনীর ভীড় ঠেলে আমরা মালতী মাসিমার কাছাকাছি পৌঁছিতে পারলাম না কিছুতেই।

সেবার দেরাছুন থেকে চিঠি এল, বাড়ীতে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। মা বারবার চিঠিটা পডতে লাগলেন। আর আমাদের বলতে থাকেন—"তোদের মাসি আস্‌ছে, মালতী আসছে। আর সঙ্গে আস্‌ছেন সতীনাথ মেশোমশাই।"

ছুখানি শোবার ঘর বাড়িতে, সবচেয়ে যেটা বড় এবং ভালো, সেইটি ছেড়ে দেওয়া হবে মাসিমাদের জন্য। ছোট ঘরটায় মা সবাইকে নিয়ে থাকবেন, ওপরের চিলে কুঠুরিতেই শুতে হবে আমাকে।

ভারী রাগ হ'ল আমার; চিলে কুঠুরীতে একটাও জানালা নেই, আছে শুধু স্কাইলাইট। দেয়ালে সব যায়গায় বালি নেই, লোনা লেগে বালি খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। আমি খুঁৎ খুঁৎ করছি। মা শেষকালে চটে উঠে বললেন—"তুমি বড় হিংসুটে, মালতী মাসিকে কি দেখতে চাস না?"

আমিও চটে উঠে বললাম "চাই না।" এই বলেই ওপরের সেই চিলে কোঠায় গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মনে মনে প্রার্থনা কর্‌লাম, মালতী মাসীর যেন আসা না হয়। সবাই হতাশ হোক, জব্দ হোক্। মনে পড়ল মালতী মাসি বড়লাটের কাছে আমাদের দুঃখের কথা বলেন নি। আর আমরা আজো সেই গরীবই রয়েছি। আমি চিলে কুঠুরীতে মরে পড়ে থাকবো, আর শ্রীকৃষ্ণ এসে মাকে বলবেন, আমাকে তাঁর চাই। কারণ স্বর্গে·········তখন হঠাৎ মনে পড়ল, আমার ত সোনালি চুল নেই। বেশ ত' মালতী মাসিমা এলে তাঁকে দিয়েই করে নেব। একটু কান্নাকাটি করলেই দশটা টাকা পাচ্ছি। সেই টাকায় চুলটা সোনালী রঙে রাঙিয়ে নেব। তখন আমার কথা মনে করে সকলে কাঁদবে দুঃখ করবে। শ্রীকৃষ্ণ এসে বলবেন কি করবো বলো আমার যে সোনালী চুলের দরকার।

আমার ছোট বোন নিন্‌নিটা আবার না বলে দেয় যে আমার রঙ করা চুল। প্রবল ক্ষিধে পেয়েছিল, তাই অতি উদার মনে মা এবং আর সকলকে ক্ষমা করে নিচে নেমে গেলাম একটু চায়ের লোভে।

চা খেয়ে আবার উপরে উঠলাম, হঠাৎ মনে হ'ল নাইবা থাকলো জানালা; জানলা একটা তৈরী করতে কতক্ষণ। সিঁড়ির তলাকার খুদে ঘরটায় কিছু রঙ পড়েছিল। সেই রঙ নিয়ে এসে কুঠুরীতে জানলা আঁকতে সুরু করলাম— জানলা তৈরী শেষ হলে বুঝলাম আর একটা জিনিষের অভাব রয়েছে, জানলা দিয়ে কিছু একটা দেখা দরকার। তাই তার ওপর ফুল এঁকে দিলাম। তারপর বড় খুকীর একটা পুরাণো ফ্রক ছিঁড়ে নিয়ে পরদা খাটিয়ে দিলাম। খুব ভাল লাগল। বিছানায় বসে মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলাম। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে কেমন দেখাবে কে জানে? আমার ছোট বোন নিন্‌নি কিন্তু এক ফাঁকে এসে দেখে গিয়ে নীচের সবাইকে খবর জানিয়ে দিল।

মা বললেন : "আচ্ছা পাগল ছেলে ত" ?

কিন্তু নিন্‌নিটার বুদ্ধি আছে, বলল, "ঐতেই যদি ও খুশী থাকে তোমাদের কি মা!'

মনে মনে নিন্‌নিকে ধন্যবাদ দিলাম।

অবশেষে একদিন মালতী মাসিমা এসে পৌছিলেন। চমৎকার তাঁর চেহারা, কি রূপ, কি গড়ন। কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ কেশ। অনেক কথা বলেন দিনরাত। কথায় একটু টান আছে। যা বলতেন, তাই ভাল লাগত।

কেবলই মনে হ'ত ওর বুকে যদি একটু ঠাঁই পাই। কিন্তু ভারী লাজুক ছিলাম, তাই তাঁর সেই বিচিত্র গণ্ডীর বাইরেই রয়ে গেলাম।

সতীনাথ মেশোমশাই মানুষটি আমার মত, লক্ষ্য করলাম, মাসি কাছে থাকলে বড় কথা বলেন না। শুধু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সোনার হাত-ঘড়িতে দম দেন, আর মাঝে মাঝে সিগারেট টানেন। অর্ধেকটা থাকতেই ফেলে দেন। আমি সেই আধপোড়া সিগারেট, খালি দেশলাই-এর বাক্স আর রাঙতা কুড়িয়ে ওপরের ঘরে রেখে দিই। মনে মনে স্বপ্ন দেখি যেন মালতী মাসিমার মত বড় লোক হয়ে গেছি।

এক সন্ধ্যায় আমাদের সকলকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে গেলেন মাসিমারা।

ভেলভেট মোড়া সেই সব চেয়ার আমার মালতী মাসির চাইতে সুন্দর নয়।

সবই যেন তার, থিয়েটারের বাড়িটাও। স্টেজের ওপর একটা লোক ইনিয়ে বিনিয়ে গান সুরু করলো। দেখি মালতী মাসিমার চোখে জল। কি সুন্দর রুমাল, রঙীন লেশের পাড় বসানো চারধারে। মাসিমার কান্না দেখে আমারও কাঁদতে ইচ্ছা করে। বোধকরি বুঝতে পেরেছিলেন, আমার হাতে একটা চকলেট গুঁজে দিলেন তাড়াতাড়ি। ইতিমধ্যে থিয়েটারের সবাই হাততালি দিয়ে উঠল, কারণ স্টেজের লোকটার গান শেষ হয়েছে। আমার মনে হ'ল লোকটা যদি আবার গান গায়ত' বেশ হয়। তা'হলে মাসিমা আবার কাঁদবেন। কিন্তু আর হ'ল না।

একদল মেয়ে লাইন বেঁধে নাচতে নাচতে এসে দাঁড়ালো, তারপর সবাই কোরাস গান ধরলো।

সবাই হাসছে। মাসিমাও হাসতে থাকেন। মার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"দিদি, সেই নেপা বোসের নাচ মনে আছে ?

তারপর সেইখানে বসেই বাল্য-কাহিনী সুরু হ'ল।

থিযেটার ভাঙবার পর মেশোমশাই আমাদের একটা কাফেতে নিয়ে চা এবং কেক খাওয়ালেন। যে ছেলেটা আমাদের পরিবেশন করছিল, লক্ষ্য করলাম মাসিমা তাকে এক টাকা বকশিশ দিলেন। একটা ট্যাক্সী নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম—অন্ধকার পথে আমার হাতটা মাসিমার হাতের মুঠোয় ধরা রইল সারাক্ষণ। কিন্তু কেউ জানতে পারলো না, মা পর্যন্ত না। আমাকে বললেন—হাসির গানটা ত গুন্ গুন্ করে গাইছিলি, এখন গলা ছেড়ে ধর দেখি।

লজ্জায় চুপ করে রইলাম। মাসিমা নিজেই গাইতে সুরু করলেন, তারপর মাঝপথে থেমে হাসতে লাগলেন! এমন মধুর গলা, যেন পিয়ানো বাজছে,—আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, ওঁকে কাছে বসিয়ে সারাক্ষণ ঐ হাসি শুনতাম। কিন্তু ওঁদের আবার ফিরে যাওয়ার সময় হ'ল, একদিন সতীনাথ মেশোমশাই আর মাসিমা দেরাদুনের পথে পাড়ি দিলেন। ষ্টেশনে একটা পাঁচ টাকার নোট হাতে দিয়ে মাসিমা আমাকে চুমু খেলেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল। মনে ন প্রতিজ্ঞা করলাম ঐ নোটখানি তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দেব চিরকাল।

বাড়ি ফিরতেই মা সেটি কেড়ে নিয়ে একটী আধুলি হাতে দিয়ে বললেন,— "মাসি এখানে থাকলে আদর দিয়ে তোমার মাথাটা চিবিয়ে খেতেন।"

আবার সেই পুরাতন শোবার ঘরে সবাই ফিরে এসেছি। সারা বাড়িটা মাসিমার শোকে যেন মুহ্যমান। রাতে বিছানায় শুয়ে মনে হয় সারা বাড়িটা যেন কাঁদছে। আবার সেই পুরাতন খাদ্য, অর্থাৎ ঝোল এবং ভাত, পাওনাদাররা বাড়িতে এসে হানা দেয়, আর মার নির্দেশমত আমরা বলি—"মা বাড়ি নেই।"

শরৎকাল, সামনে পুজো, আমাদের একমাত্র আশা, মা অতীতে তাঁদের দিনাজপুরে কি ধরণের দুর্গা-পুজা হত তার কাহিনী শোনান। কি সব দিন গিয়েছে। পুজোর সময় দাদামশাই অনেক খরচ করতেন, সবাইকে কাপড় জামা দিতেন।

মা বলতেন—এ বছর পুজোয় আমি একটা কাণ্ড করবো, যা থাকে কপালে, এবার যা করবো কখনো তা হয় নি। সেই রাত্রে আমি পরমানন্দে ঘুমিয়ে পড়লাম, এবার পূজায় আনন্দের স্বাদ মিলবে।

কিন্তু যখন পুজো এল, সবই বানচাল হয়ে গেল, আমরা গভীর হতাশায় পড়লাম। যা কিছু পরিকল্পনা সব ফেঁসে গেল। যে টাকা পাওয়া যাবে আশা ছিল তা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। মার মনে কষ্ট হয়েছে বুঝলাম, তাই আমিও এমন ভান করলাম যে, এবার পূজায় আমরা খুব খুশি হয়েছি। মা পরবর্তী বছরের পূজার কথা বললেন, প্রতিজ্ঞা করলেন আসছে বছর কিছুতেই নড়চড় করবেন না কথার, যে করে হোক ভালো জামা জুতো কিনে দেবেনই। আমিও তা বিশ্বাস করি, কারণ আগামী পূজার তখনও এক বছর দেরি।

কিন্তু একবছর কাটার আগেই আমার মত পরিবর্তিত হ'ল। শীত প্রায় কেটে গেছে। গাছ-পালায় নতুন রঙ ধরেছে, পাতায় লেগেছে রোদের সোনালী রঙ। রাতে বেশ ঠাণ্ডা, আমরা সব দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের ভেতর চুপ করে বসে থাকি।

এমনই একদিন রাতে দরজায় প্রচণ্ড ঘা পড়লো। মা বললেন "কে রে বাবা,— এত জোরেই বা ধাক্কা কেন?"

আমার ছোট বোন নিন্‌নি উঠে দরজা খুলতে গেল। মা আমাদের সকলের মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একে একে তাকালেন, যদি আমরা কিছু বলতে পারি।

নিন্‌নি ফিরে এল। বলল: "পুলিশ এসেছে মা! তোমাকেই ডাকছে।"

সহসা সবাই ভয়ে অস্থির।

মা উঠে গেলেন। শুনতে পেলাম, মা বলছেন—"হ্যাঁ, আমার নামই বটে, ভেতরে আসুন।"

পুলিসের লোকটী ভেতরে এলেন—বললেন : "দেরাদুনে আপনার কোন বোন আছেন, মালতী চৌধুরী ?"

"হ্যাঁ, কি হয়েছে বলুন ?"

"খারাপ খবর !"

মা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন কি মনে করার চেষ্টা করছেন, এই ভাবেই তিনি থাকতেন, কখন কি বল্‌বেন—তা মনে পড়তো না।

"খারাপ খবর !" পুলিশের লোকটি এই বলে আমাদের সকলের দিকে একবার তাকালেন। যেন আমরা সব জানি।

"আপনার বোনটি মারা গেছেন।"

নোট বই খুলে পুলিসের লোকটী বললেন : "এখানে টেলিগ্রাম এসেছে, ওখানে লেকের জলে আজ সকালে তাঁর দেহ পাওয়া গেছে।" মার চোখে জল। "মালতী !" বলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আমার চোখেও লেকের সমস্ত জল যেন এসে জমেছে। "আপনাকে অবশ্য সনাক্ত করতে হবেনা, তাঁর স্বামী সে কাজ করেছেন" "সতীনাথ ?"

"না না, জয়পাল সিং।"

চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু দেওয়ালে ঘড়িটা টিক্‌টিক্‌ করে চলেছে।

"আচ্ছা নমস্কার।"

মা তাঁকে দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

মা ফিরে এসে আর কথা বলেন না। একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, আমরাও সেই শোকের অংশ নিলুম।

কি বিশ্রী রাত ! বিছানায় শুয়ে বার বার মালতী মাসিমাকে স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই মনে এল না তাঁর মুখ।

মা দেরাদুন রওনা হলেন।

ক'দিন পরে ফিরে এসে মাসিমার সব খবর বল্‌লেন। কত লোক, কত ফুল, সারা দেরাদুনের লোক নাকি সেই শোকযাত্রায় ভেঙে পড়েছিল, তাদের চোখের জল-বৃষ্টি ধারার মত বইছে।

আমি বল্লাম : "সতীনাথ মেশোমশাই কাঁদছিলেন ?"

মা বিরক্ত হয়ে বললেন "অত আজে-বাজে বোকো না।"

নিনুনি বললে—"তিনি ত' জেলে—"

মা চটে উঠে বল্লেন—"নিনুনি চুপ কর বল্‌ছি, বড় কথা শিখেছিস্, না ?"

নিনুনিত ছাড়বার পাত্রী নয়, বল্ল :—বারে! এ ত সত্যি কথা! তুমিইত' বল্‌ছিলে!"

আর কখনও যদি তোকে কিছু বলি, খুব মেয়ে তৈরী হয়েছিস্, বাবা!"

"আচ্ছা! আচ্ছা! আর কিছু বল্‌বোনা, এবার বলো।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "কেন জেল হয়েছে মা ?"

মা বললেন! "টাকার জন্যেই সব। পরের জিনিষ না বলে নিলে তোমাকেও একদিন সেইখানে যেতে হবে।"

"কিন্তু মালতী মাসিমা কি দুঃখে মারা গেলেন মা ?"

নিনুনি বলে ওঠে—"নিজেই জলে ডুবে মারা গেছেন।"

"না কথ্‌খনো নয়।"

নিনুনি আশ্চর্য হয়ে বলে—"বলো কি মা! নিজে ইচ্ছে করে ডোবেন নি ?"

মা এতক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

নিনুনি চুপি চুপি বললে : "জানিস্ দাদা গলায় নাকি সেই দামী হারটা ছিল।"

আমি কাঁদতে কাঁদতে চিলে কুঠুরীতেই উঠে গেলাম। মালতী মাসিমার শাড়ি জলে ভিজে কি রকম হয়েছে যেন কল্পনানেত্রে দেখতে পাচ্ছি।

যদি নিজেই মারা গিয়ে থাকেন তাহলে ত স্বর্গে যেতে পাবেন না। যমদূতেরা পথ আটকে দাঁড়াবে। ভিজে সাড়ি আর খোলা চুলে মাসিমাকে বরাবরই অমনতরো দেখতে। মনে করবে উনি কুৎসিৎ ও দুষ্টু স্ত্রীলোক। সোজা নরকের পথ দেখিয়ে দেবে। বিধাতার চুল চিরে হিসাব-করা বিচার-ব্যবস্থার কথা ভেবে মনে মনে রাগ হয়, মাসিমার চুল, সাড়ি শুকিয়ে নেওয়ার একটু সময় দিলেতো তিনি বুঝতেন ওঁর আসল রূপ। আমার মনে হ'ল, মাসিমাকে যদি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়, তাহ'লে বুঝবো বিধাতার করুণা নেই। তাঁর প্রিয়জন কেউ কষ্টে পড়ে দুঃখ পেলে হয়ত তাঁকে আমাদের মত কাঁদতে হয় না।

দেওয়ালের গায়ে আঁকা আমার সেই জানলাটি চোখে পড়লো। এর মধ্যেই কত বিবর্ণ হয়ে এসেছে যেন ছোট বেলার কোনও ক্ষীণ স্মৃতিরেখা। এই কাণ্ডটা অবশ্য ছেলেমানুষী, নিছক বোকামী। কোনদিনই ওটা প্রকৃত জানলা হবে না, কোনদিন কিছু দেখা যাবে না ঐ জানলায়। যে সব গাছপালা আর আকাশ ওর ভিতর দিয়ে দেখবো মনে করেছিলাম, আমার জীবনের পূজার আনন্দ-উৎসবের মত কোনদিনই তাকে নিবিড় করে পাবো না।

টেবিলের উপর একটা টুল রেখে উঠে দাঁড়ালুম—স্কাইলাইটটা বন্ধ ছিল, টেনে তাকে খুলে ফেললাম, বাইরে নূতন জগৎ। শুধু ছাদ আর ছাদ, ছোটবড় নানা বাড়ির নানা ধরণের ছাদ। কিন্তু গাছ, পাতা, ফুলের চাইতে তাদের বাহার কম নয়।

দীর্ঘক্ষণ ঐ ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নানা ধরণের ছাদ আর কারখানার চিমনি। হঠাৎ ভীষণ কান্না পেল আমার। মালতী মাসিমা আর কোন দিন এই বিচিত্র লোক দেখতে পাবেন না। অথচ আমার পক্ষে কত সহজ, কত সাধারণ কর্ম, যখনই খুশি এই ভাবে উঠে দেখতে পাবো।

নীচে নেমে নিজের আঁকা জানলার দিকে তাকালাম না,—মালতী মাসিমার মতো ওরও কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন আমি নতুন ভুবনের সন্ধান পেয়েছি—
—ছাদ আর কারখানার চিমনি।

এর কিছুকাল পরেই ঐ বাড়ি আমাদের ছাড়তে হয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবি, নতুন ভাড়াটেরা চিলে ঘরের দেওয়ালে আমার হাতে আঁকা জানলাটা দেখে কি মনে করছে। হয়ত মুছেই ফেলেছে দেওয়ালে চুণকাম করে।

॥ বন হরিণী ॥

শুধু বৃদ্ধ বলদের মতো ম্লান সংসারে দিনের পর দিন ঘোরা !

সেই জীর্ণ অট্টালিকার হয়তো একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। কিন্তু সে ইতিহাস নিয়ে তারাদাসবাবু মাথা ঘামান না। শুধু যখন দিনের আলোয় প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে নিতান্ত অকারণেই তাঁর শিরাগুলো দপদপ করে আর মাথায় অসহ্য চাপ অনুভব করেন তখন প্রায়ই মনে হয় এই অট্টালিকার সংগে তাঁরও বেশ মিল আছে।

কিন্তু সেকথা আজ কে মনে রাখে ? এই বৃদ্ধ জরাজীর্ণ অট্টালিকারও একদিন যৌবন ছিল। তখন এখানে গ্যাসের তীব্র উজ্জ্বল আলো জ্বলতো, গ্লাসের টুংটাং শব্দের সংগে বাইজীর গান ভেসে আসতো। চারপাশে স্বাস্থ্য ছিল, প্রাণ ছিল, দেয়ালে, দেয়ালে সম্পদের হরেক রং লেগে ছিল—তখন অট্টালিকার উজ্জ্বল যৌবন।

শ্লথ গতিতে বার্ধক্য এলো। আজ তারাদাসবাবুর চুলে পাক ধরেছে, দেহে এসেছে শৈথিল্য, গায়ের চামড়া গেছে ঝুলে। আর কি আশ্চর্য মাঝে মাঝে তিনি অবাক হয়ে ভাবেন চারপাশে যেদিকে তিনি তাকান সবদিকেই যেন বার্ধক্য নেমেছে। এই অট্টালিকায়, তাঁর নিজের দেহে-মনে, স্ত্রীর শরীরে, তাঁর সংসারে—সব দিকে। তারাদাসবাবুর যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

শুধু ছেলেটা একমাত্র ব্যতিক্রম। তার এখন জ্বলন্ত যৌবন, আর এত বেশী সেই যৌবনের উচ্ছলতা যে তারাদাসবাবু কপাল কুঁচকে ভাবেন বোধ হয় এই জরাজীর্ণ বাড়ী তাকে ধরতে পারে না, সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে তারাদাসবাবু শোভনলালের টিকিটিও দেখতে পান না। যাক্‌গে আর ওসব অভিভাবকগিরি করতে ইচ্ছে হয় না তাঁর। যা হয় হোক, আর একবার নিশ্বাস ফেলে তিনি ভাবেন, যা হবার তাতো হয়েই গেছে, কিছু কি আর বুঝি না, আমারই তো ছেলে তুমি ! কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলবে ! এই শুকনো জরা আর বার্ধক্য বহন করে ধুঁকতে ধুঁকতে এমনি করেই কি তিনি শেষ হয়ে যাবেন। দুত্তোর—তারাদাসবাবুর রক্তের চাপ বেড়ে যায়।

বাড়িটারও কি রক্তের চাপ বাড়ে ! ওটা বোধ হয় একেবারে কানাকালা আর স্থবির হয়ে গেছে—মনে মনে নাকি শোভনলালকে বাহবা দেয়। কিন্তু বাড়ির

বাহবা নিয়ে তারাদাস ছাড়া আর কে-ই বা মাথা ঘামায় আর তার দামই বা কি! কিছুই তো শেষ অবধি রাখা গেল না! বুলবুলি, ফুলমণি হাতছাড়া হয়ে গেল—এখন এই বুড়ো বাইজী বাড়ীটাকে রেখে লাভ কি। ওটারও তো সময় হয়ে এলো—খাওয়া পরা আর রঙ মাখার পয়সা না দিলে বাইজী থাকবে কেন! তবু শোভনলালকে দেখলে মনে হয় সবই আছে, সবই থাকবে, সবই রাখা যায়। আহা ছেলেটি আমার খাসা।

হঠাৎ বাড়িটাও যেন চমকে উঠলো। বাহবা দেওয়া ছেড়ে দিয়ে সত্যবতীর তীক্ষ্ণ স্বর শুনে সেও যেন বেশ বিচলিত হয়ে উঠল। তবু রক্ষে, সে শুধু শুনেই আসছে, তর্ক করে না, বাধা দেয় না—শুধু জমা করে রাখে, কত বছরের কত কথা প্রত্যেকটি দেয়ালের আনাচে-কানাচে জমা হয়ে আছে কে তার হিসেব রাখে!

কান্না মেশানো গলায় প্রায় চিৎকার করে সত্যবতী বলল, ছেলের বিছানার তলা থেকে মদের বোতল বেরিয়েছে তুমি কি এখনও বসে ঝিমোবে? জানো রাত্তিরেও সে আজকাল বাড়ী থাকে না—

আহা ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বয়সটা দেখতে হবে তো! থাক থাক্, কিছু বল না, আমরা তো ওর মত বয়সে—

থাক্. তোমার ইতিহাস আর নতুন করে শোনাতে হবে না। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ওই একটিমাত্র ছেলে আমার—

দীর্ঘজীবি হোক, গিন্নী, বেঁচে থাক্, ওকে যতই দেখি ততই যেন আমার আরও বেশি বাঁচতে ইচ্ছে করে।

তাতো করবেই। সাধে আর ছেলে বখেছে, রক্তের দোষ।

ঠিক বলেছো গিন্নী, রক্তের দোষ, ও বয়সের রক্ত বড় গরম।

থামো, আমারও যেমন পোড়া কপাল, তোমার কাছে এসেছি এইসব বলতে—মরণও হয় না আমার, বোধ হয় চোখের জল চেপে সত্যবতী চলে গেল। বাড়িটা বোধ হয় একটু অবাক হয়েছে। তার দরজায় কাবুলী লাঠি ঠোকে কেন! এই বোধ হয় প্রথমবার। তারাদাসবাবু চুপ করে বাহিরে তাকিয়ে আবার তাড়াতাড়ি মুখ লুকিয়ে নিলেন। না, কাবুলীর কথা তো তাঁর ঠিক মনে পড়ে না। এরা নাকি টাকা ধার দেয়। অনেক—অনেক টাকা, কত—যত চাওয়া যায় তত? তাহলে তো আবার নতুন করে বেঁচে ওঠা যায়। আবার ঠিক

তেমনি করে গরদের ধুতি—পাঞ্জাবী, আবার সেই, "বাহুর ডোরে ধরি আমি"—
বাড়িটা এবার যেন হেসে উঠল।

শোভনলাল সেজেগুজে বেড়িয়ে যাচ্ছে। টকটকে ফর্সা রঙ—স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। আহা, কী সুন্দর দেখাচ্ছে আজ ওকে! ধবধবে ধুতি আর কলার তোলা সিল্কের সার্ট দেখে তারাদাসবাবুর অনেক কথাই মনে পড়ে গেল। সেন্টের মিষ্টি গন্ধে এক মুহূর্তে যেন ঘরের হাওয়া বদলে গেল। তারাদাস বাবু তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

কী হে চলেচো কোথায়?

যাই একটু ঘুরে—টুরে আসি।

যাবেই তো যাবেই তো, কিন্তু রাত্তিরেও তুমি নাকি আজ কাল বাড়ি থাকো না—কোথা যাও?

এক বন্ধুর বাড়ি যাই, তাদের খোলা ছাদে শুতে ভাল লাগে—এখানে যা গরম? ফ্যান্—ট্যান্ তো আর নেই তোমাদের—

কিন্তু ছাদ তো এখানেও আছে।

তা' আছে, তবে এত বেশী নোংরা যে শুলে অসুখ করবে। বন্ধুর ছাদ একেবারে ঝকঝকে আর অনেক বেশী হাওয়া—আচ্ছা,—শোভনলাল গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল।

বাঃ সাবাস! তারাদাসবাবু বাহবা দিলেন—এই তো যুবক! হঠাৎ তাঁরও যেন এই বাড়িটার মধ্যে বড় বেশী গরম মনে হল।

ওদিকে বাড়িটা সত্যিই এবার হতভম্ব হয়ে গেছে। তারাদাসবাবু স্পষ্ট দেখতে পেলেন সেই কাবুলীওয়ালার গলা জড়িয়ে শোভনলাল চলেছে।

তবু অজান্তে কোন ফাঁকে যেন রঙ লেগে থাকে। তারাদাসবাবুর হঠাৎ নেশা লাগে—তিনি যেন কিসের গন্ধ পান। আস্তে আস্তে তিনি ওপরে উঠতে লাগলেন। জীর্ণ সিঁড়ি খুব সাবধানে চলতে হয় তাঁকে। বেশী ভার সহ্য করবার ক্ষমতা সিঁড়ির থাকবেই বা কেমন করে! অবশিষ্ট আছে তো শুধু হাড় ক'খানা।

এই অনধিকার-প্রবেশের জন্য সমস্ত বাড়িটা যেন হাঁ হাঁ করে উঠল, আঃ তুমি আবার এখানে কেন? সাবধান কেউ যেন দেখতে না পায়।

চোরের মত শোভনলালের ঘরে এসে তারাদাসবাবু থমকে দাঁড়ালেন। এ

ঘরের গন্ধ যেন জড়িয়ে ধরতে চায়। টেবিলের উপর রজনীগন্ধা; তার পাশে রূপোর ছাইদান আর ধবধবে টেবিলের চাদর। আর ওই ছবিটা কার—এই তো নীচে লেখা আছে, চামেলী। তারাদাসবাবুর বুড়ো রক্তে যেন নতুন করে বান ডাকলো। কোথায় লাগে বুলবুলি আর ফুলমণি। আহাহা, এই তো জিনিষ একখানি। বেঁচে থাক ছেলে আমার, বলিহারী তোমার নজরকে।

ওদিকে আপন মনেই যেন বাড়িটা বলে উঠলো, ফুলমণির কাছে এরা লাগবে কেন। দেখতে পাওনা হাওয়া বদলাচ্ছে—দেখতে পাওনা শোভনলালকে।

দেখতে পান বৈ কি তারাদাসবাবু, সবই দেখতে পান। কিন্তু তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন এদের মত সব আমাদের আমলে ছিল কোথায়!

এখনও তো আছে, যাওনা তারাদাস। না-হয় একটু বুড়োই হয়েছ। চুল পাকা কিছু নয়, সব ঠিক করে নেওয়া যায়। বাহারী হাতের লাঠিটা তো এখনও ভাঙ্গা আলমারীর মাথায় আছে—সেটা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়িটা কি তারাদাসবাবুর সংগে রসিকতা করছে? রসিকতা কেন। ঠিকই তো, বাহারী হাড়ের লাঠিটা এখনো আছে বটে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে চোরের মত তারাদাসবাবু ফ্রেমে রাখা চামেলীর ছবিটাকে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ এক সময় ড্রয়ারটা খুলেই তারাদাসবাবু আবার বন্ধ করে দিলেন। একি বিশ্বাস করা যায়! অনেক হবে, গুনতে গেলে বেশ কিছু সময়ের দরকার।

শুধু বৃদ্ধ বলদের মতো ম্লান সংসারে দিনের পর দিন ঘোরা। দুত্তোর তারাদাস বাবুর রক্তের চাপ বেড়ে যায়।

এই অট্টালিকার রূপ তো আজও বদলে দেওয়া যায়। চোখবন্ধ করে তারা দাস বাবু বাড়িটার আগাগোড়া চেহারা একবার ভাবতে চেষ্টা করলেন।

একেবারে বাইরে থেকেই ধরা যাক।

গেট্ দুটো ভেঙে পড়েছে। আজ ওটাকে আবর্জনার মতো মনে হয়। কিন্তু বিশেষ কিছুই নয়। শুধু যদি কয়েকজন মিস্তিরী একটু উৎসাহের সংগে কাজ করে তাহলে তো দু'ঘণ্টার মধ্যে ওটা আবার ঠিক হয়ে যায়। আবার তখন গেট্ পার হয়ে বড়ো বড়ো গাড়ি অনায়াসেই ভেতরে আসতে পারে। আর গাড়ি বারান্দার জন্য এমন কিছু পরিশ্রম করতে হবে না—একবার শুধু চুণকাম করে নিলেই চলবে। চোখ বুজে তিনি আরও কল্পনা করতে লাগলেন, আর জানালা

দরজার ভাঙা কাচগুলো বদলে দিয়ে সিঁড়ির রেলিঙে পালিস লাগাতে হবে। বাইরে যেখানে যেখানে ফাটল ধরেছে সমস্ত বুজিয়ে ফেলে তারপর আগা-গোড়া তাজা লাল রঙ মাখাতে হবে বাড়িটার গায়ে। ব্যস্, তাহলে ওটা আবার খাড়া হয়ে উঠবে—আবার ঠিক তেমনি ঝলমল করবে আর প্রাণের প্রাচুর্যে চারদিক যেন উছলে উঠবে।

তখন তারাদাসবাবুকে পাওয়া যাবে কোথায়? হয়তো ছাদের ঘরে। শোভনলালের ঘরের পাশে নতুন আর একটা প্রকাণ্ড ঝকঝকে ঘর উঠেছে সেই ঘরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে—না না তাকিয়া কেন, পুরু গদিওয়ালা সোফায় তিনি বসে আছেন। একটাও পাকা চুল দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে নোট আর টাকায় পকেট বেশ ভারী হয়ে উঠেছে আর—তারাদাসবাবু খুব সাবধানে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলেন, আর তার পাশে বসে চামেলী, সেই ছবির মতো কানে বড়ো বড়ো দুল—

ছি ছি ছি তারাদাস, বয়স হয়েছে না? শোভন কি ভাববে? তারাদাস-বাবুর মনের কথা জানতে পেরে বাড়িটাও যেন লজ্জা করতে লাগলো।

রাত কত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দুটো বিরাট পাশবালিশের মধ্যে শুয়ে তারাদাস বাবুর মনে হচ্ছে মাথাটা আজ যেন একটু বেশি দপ দপ করছে, আর সেই দপদপানি তাঁর মাথায় কেবলই ঘা মারছে। এক একটি আঘাত তারাদাস-বাবু স্পষ্ট অনুভব করছেন। হঠাৎ আজ যেন তাঁর অনুভূতিও বড়ো বেশী তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে একটা বিশেষ পোকা যেন তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরে ফিরে বার বার করর্ করর্ শব্দ করছে। জীর্ণ পুরানো নির্জন ঘরে একা তিনি শুধু ছটফট করছেন। ঘুমও আসেনা ছাই!

তবু বাইরে জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতায় ভরে উঠেছে। তারাদাসবাবু কখনও এমন তীক্ষ্ণ সজাগ ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করেন নি যে, এই প্রাণময় আলোর ফাঁকে ফাঁকে যেন লক্ষ প্রাণের দুর্বার স্পন্দন নিরন্তর তাঁকে ডাকে। তিনি সে আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু সাড়া দিতে পারছেন না। তিনি সমস্তই দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু চারপাশে কেমন যেন একটা ভাসা-ভাসা, ছাড়া-ছাড়া ভাব—কিছুই গ্রহণ করতে পারছেন না। শুধু মাথায় সেই পোকাটা করর্ করর্ করছে। সে শব্দ ছাড়া আর কোথাও যেন কোন শব্দ নেই। চার ধার নিঝুম। অসহ অব্যক্ত যন্ত্রণায় তিনি শুধু এধার ওধার করতে লাগলেন।

সেই গম্ভীর নিস্তব্ধ রাত্রেও বিশ্বাসী বৃদ্ধ প্রহরীর মতো শুধু যেন বাড়িটা জেগে আছে। না হলে এমন করে কে আর অভ্যর্থনা করবে। তারাদাস বাবু যেন স্পষ্ট স্বর শুনতে পেলেন, এসো এসো। বাড়ির সংগে সংগে স্তিমিত আলোয় প্রত্যেকটি কণিকা যেন কথা বলে উঠলো, এসো এসো, আয়—আয়—

তারাদাসবাবু বুঝতে পারলেন শোভনলাল ফিরেছে। রিক্সাওয়ালার স্বর শোনা গেল, নেহি বাবু ই নেহি লেগা—নেশায় জড়ানো স্বরে শোভনলাল বললো, কাহে? আট আনা যাস্তি হো গিয়া, নিকাল যাও উল্লু!

আউর চার আনা খুশিসে দিজিয়ে বাবু—

হাঁ, ওই বাত বলো, হাম খুশিসে দেগা। বহুৎ আচ্ছা আদমী হ্যয় তোম্, লেও, যাও ভাগো উল্লু—

রিক্সার ঠুন ঠুন শব্দ মিলিয়ে গেল। ঘরের দেয়ালগুলো ঝিমঝিম করে উঠলো যেন। তারাদাস বাবু বুঝতে পারলেন গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে শোভনলাল ভেতরে ঢুকলো। তিনিও মনে মনে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে।

কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ যেন ছন্দপতন হলো। সত্যি এসব ভাল লাগে না তারাদাসবাবুর। শোভনলালকে নিয়ে সত্যবতীর শুধু শুধু এই বাড়াবাড়ি করবার কি দরকার, তর্কাতর্কি এই বয়সে কারই বা ভাল লাগে। তবু তাদের এই প্রত্যেকটি কথা তাঁর কানে এসে লাগলো। তারাদাসবাবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

ছি ছি এই অবস্থায় রাত্তির বেলা মা-বাপের কাছে মুখ দেখাতে তোমার একটু লজ্জা করে না শোভন?

জড়ানো স্বরে শোভনলাল বললো, কে মুখ দেখবার জন্যে বসে থাকতে বলে তোমাদের?

থামো, অসভ্যের মতো কথা বললে থাবড়া মেরে মুখ ভেঙে দেবো তোমার, পাজী বদমাইস কোথাকার।

আঃ এই রাত্তিরে কেন গাল দিচ্ছ মা? অনেক তো দিয়েছ, শান্তি, শুধু শান্তি, আমাকে একটু নিরিবিলিতে যেতে দাও, এই আমি তোমার পায়ে পড়ি মা—আমার মা!

শোভনলাল নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল রাস্তা আটকে বাধা দিয়ে সত্যবতী বললো, মনে থাকে থাকে যেন—এই শেষবার ফের যদি এমন অবস্থায় তুমি বাড়ী

আস—তোমাকে আমি বের করে দেবো। এভাবে উচ্ছন্ন যেতে লজ্জা করে না তোমার? দেখতে পাওনা ভাবনায়—ভাবনায় তোমার বাবার হাড় বেরিয়ে যাচ্ছে? দেখতে পাওনা কিভাবে আমি দিন কাটাই? ধোপা খরচের ভয়ে পরিষ্কার কাপড় পর্যন্ত পরতে আমার বাধে আর তুমি যা-তা করে টাকা উড়িয়ে—

আ চুপ কর, সব কথা হয়তো শোভনলালের কানে যায়নি, কিন্তু বাড়ি থেকে বের করে দেবার কথায় প্রমত্ত অবস্থাতেও হঠাৎ যেন তার পৌরুষ জেগে উঠলো, বাড়ী থেকে বের করে দেবে? কে চায় এই ভাঙ্গা মরচে-ধরা পচা বাড়িতে থাকতে? থাক তোমরা এখানে, আমার যাবার অনেক জায়গা আছে, দরকার মতো ছুটো টাকা দিতে পারো না, আবার কথা বলতে আস। মুখ সামলে কথা বল শোভন, অকাট মুখ্যু হয়ে আছ, সেকথা ভুলে যেও না, বাড়ী থেকে বের করে দিলে জামা জুতো পরে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফেরা চলবে না—উপোস করে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে হবে—বাঃ, অনেক জেনেছ দেখছি, রাগে শোভনলালের চোখ ছুটো দপ করে উঠলো, অকাট মুখ্যু হয়ে তোমাদের পয়সা দিয়ে কাপ্তেনি করি না, তোমাদের—পয়সা ছুঁতে আমার ঘেন্না হয়, একটি মাত্র ছেলেকে কি-না রাজা করে রেখেছ সব—

অনেক হয়েছে, রাত্তির বেলা চেঁচামেচি কর না, এই শেষবার তোমাকে আমি এমন অবস্থায় বাড়ি ফিরতে বারণ করলাম, নইলে ফল ভাল হবে না—যাও আমার সামনে থেকে—

যাচ্ছি কিন্তু শোন, তোমাদের ভুল ধারণা ভেঙে নাও? তোমাদের টাকা সত্যি আমি ছুঁই না, আমার যা সাতদিনের খরচ তোমাদের তাতে বোধ হয় ছু'মাস চলে যায়—

চুরি করতে আরম্ভ করেছ?

না, উপার্জন কবতে শিখেছি। আমার কাবুলী আছে—রেস আছে· তোমরা আমাকে আর কখনও টাকা দেখাতে এসো না—টলতে টলতে শোভনলাল নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল।

আর সেই অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে সত্যবতী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তার শিরগুলো যেন মোচড় দিচ্ছে আস্তে আস্তে কপালের হঠাৎ—আসা ঘাম মুছে ফেলে ঘরের চারপাশে সে একবার তাকিয়ে দেখলো। কেউ কোথাও নেই।

যাক অবশেষে শেষ হলো। তারাদাসবাবু এতক্ষণ লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছিলেন। সত্যিই কি সত্যবতীর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। শোভনলালকে বের করে দিতে চায়।

প্রাণ চলে গেলে কি নিয়ে থাকবে বাড়ি! এই সম্ভাবনার সঙ্কেতে যেন চার দিক থমথম করছে। তারাদাস বাবু মনে মনে ঠিক করলেন সত্যবতীর সংগে আর তিনি কথা বলবেন না। সে জানে না কার সংগে কি ভাবে কথা বলতে হয়—ছিছি!

সত্যি যদি চলে যায়? তারাদাস বাবুই বা কাকে নিয়ে থাকবেন তাহলে—এই শুকনো গহ্বরে কে বহন করে আনবে সূর্যের আলো। অনেক কষ্টে তিনি চোখ বোজবার চেষ্টা করলেন—যদি ঘুম আসে!

এতক্ষণে তাঁর মাথাটা বেশ হাল্কা হয়ে আস্‌ছে। আর কি একটা বিরাট সম্ভাবনার প্রচণ্ড তোড়ে পোকাটাও মাথার মধ্যে করর্‌ কর‍র্‌ করছে না। আর একবার তারাদাস বাবু উঠে বসলেন, এইবার তিনি নিশ্চিন্ত। শোভনলাল তাঁকে যেন বাঁচবার মন্ত্র বলে দিয়েছে, আমার কাবুলী আছে, রেস আছে। আজ অনেক দিন পর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তারাদাস বাবু দেখলেন স্তিমিত আলোর উজ্জ্বল কণিকা সেই বাড়ীকেও খেয়াল—বিলাসী রূপবান পুরুষের মতো করে তুলছে, আর সে যেন তারাদাসবাবুর তালে তাল মিলিয়ে বলছে, আছে আছে, শোভন আছে, কাবুলী আছে, রেস আছে, আর তুমিও থাকবে তারাদাস!

ফোকলা দাঁতে বাড়িটা হাসছে।

দাঁড়াও তারাদাস, গম্ভীর ভাঙা গলায় দেয়াল ভেদ করে স্বর ভেসে এলো, বাঃ বেশ মানিয়েছে তোমাকে? না না না, সঙ্কোচ ক'রো না, তোমাকেও রঙ লাগিয়ে খাড়া করা যায়। বুঝতে পার না তোমার রক্তে আজও বান ডাকে! শোভনকে দেখে শেখো—আবার চাকা ঘুরবে। যাও বেড়িয়ে পড়, সোজা রাস্তা তো জেনে গেছ!

আবার একবার চিরুণী চালিয়ে তারাদাসবাবু বেরোতে যাবেন এমন সময় সত্যবতী জিজ্ঞেস করলো, এই শরীর নিয়ে কোথায় বেরোচ্ছ এখন?

যাই একটু ঘুরে-টুরে আসি—

খুব সাবধান, দিনকাল খারাপ, একটু সাবধানে রাস্তা চলো। হেসে তারাদাস বাবু উত্তর দিলেন, সাবধানেই চলবো, রাস্তা তো আমার জানা, আর ভাবনা কি গিন্নী?

কী যে হেঁয়ালী কর সব সময় বুঝি না, বাপ-বেটা দুই-ই সমান ?

বেটার সমান যদি হতে পারতাম গিন্নী—মনে মনে সেই চেষ্টাই তো করছি।

হ্যাঁ, ওটাই তো শুধু এখন বাকি আছে দু'জনে এক সংগে মদ গিলে বাড়ি ফেরো—

আঃ কী যে বল, মদ—টদে আর রুচি নেই, দেখা যাক কী হয়! ভাঙ্গা গেট পেরিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় পেছন ফিরে তারাদাস বাবু আর একবার তাকালেন।

বাড়ির মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

বাড়ির গম্ভীর মুখ থম থম করছে। দিনের আলোয় তার চার পাশ ঘিরে যে হাসির ছটা ছিল রাত্রের অন্ধকারে তার চিহ্ন মাত্র নেই। তারাদাসবাবুর মুখে আবার চিন্তার রেখা স্ফীত হয়ে উঠেছে। আরার সেই পোকার উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে—সেই একটানা করর্ করর্ শব্দ।

প্রথমে তারাদাসবাবু ভেবেছিলেন শোভনলালের কাছ থেকে নেয়া নতুন মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করে আজই সত্যবতীকে তিনি একেবারে হতভম্ব করে দেবেন। কিন্তু ঘোড়দৌড়ে তাঁর এমন হার হবে সে কথা কে ভেবেছিল।

সত্যবতীকে দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, শোভন ফেরেনি এখনও ?

এ সময়ে সে কোনদিনও বাড়ি ফেরে না, কিন্তু চুলোয় যাক ও, এখন উপায় ?

কিসের গিন্নী ?

আমার সারা মাসের খরচ ক্যাশ বাক্স খুলে নিয়ে গেছে, কালকের বাজারের টাকা অবধি নেই। এমন করে আর তো ওর সংগে বাস করতে পারি না, ওকে চলে যেতে বল তুমি।

যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সত্যবতী তাহলে তাঁকে সন্দেহ করেনি। তারাদাস বাবু ভেবেছিলেন যে-টাকা আজ বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছিল তার দ্বিগুণ টাকা আবার ক্যাশবাক্সে রেখে দেবেন। কিন্তু হঠাৎ সমস্ত যেন গোলমাল হয়ে গেল। শূন্য পকেটে বাড়ি ফেরবার সময় তাঁর শুধু মনে হচ্ছিল শহরের রাস্তায় যদি অনেক টাকা পড়ে থাকতো তাহলে ইচ্ছে মতো তিনি কত টাকা কুড়িয়ে নিতে পারতেন ?

সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে তারাদাস বাবু বললেন, দরকারের সময় নিয়েছে আবার রেখে দেবেখন, পরের কাছ থেকে তো আর নেয় নি।

কিন্তু এই শেষ বার, আর যদি কখনও এমন হয় তাহলে তোমাদের দুজনকে এ বাড়িতে রেখে যে-দিকে দুচোখ যায় আমি চলো যাবো।

এমন কথা সত্যবতী প্রায়ই বলে। তারাদাস বাবু এসব কথায় কান দেন না। আর আজ তাঁর যেন কোন কিছুতেই মন লাগছে না। শুধু মাথার মধ্যে সেই পোকাটা কর্‌র্‌ কর্‌র্‌ করছে।

আজকাল আর বোধ হয় সেই অট্টালিকায় চমক লাগে না। না হলে তারাদাস বাবুও কাবুলীর গায়ে হাত দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করবেন কেমন করে! কিন্তু কাবুলিরা এমন কেন! হ্যাঁ, অনেক টাকা তারা দেয় বটে কিন্তু এই শোভনলাল তো কখনও বলেনি যে সময়ে-অসময়ে ঘন ঘন লাঠি ঠুকে তারা অমন কর্কশ ব্যবহার করে। না হয় সুদটা তারাদাসবাবু ঠিক সময়ে দিতে পারেন নি। কিন্তু তাতে এমন বিচলিত হবার কী আছে! ঘোড়ার নাড়ি-নক্ষত্র এবার তিনি ভালো করেই জেনে গেছেন—আর ভাবনা কী! শুধু আর সামান্য কিছু টাকা তার চাই।

টাকার জন্যে এত ভাবনা হয় কেন মানুষের? সর্বত্র টাকা ছড়ানো থাকে না কেন—তাহলে শুধু নিচু হযে কুড়িয়ে নিলেই পকেট ভরে যেতো। শোভন বোধ হয় টাকা কুড়িয়ে নেয় কোথাও থেকে। সে তো এমন গালে হাত দিয়ে বাড়ির মধ্যে বসে ভাবে না। আর আশ্চর্য সে কি মন্ত্র জানে, কই কোন কাবুলী তো তার কাছে এসে এমন অসভ্যের মত চেঁচামেচি করে না।

টাকাটা চাই, অনেক টাকা চাই। তারাদাস বাবু চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, ওই দেয়াল ফুটো করলে যদি টাকার থলি বেরিয়ে আসতো—এই বিছানার গদি যদি তুলোর বদলে টাকা দিয়ে তৈরি হোত—ওই মশারির ওপব যদি নোট উড়ে এসে পড়তো—টাকা,—টাকা, টাকা—ডান দিকে—বাঁদিকে—এদিকে, ওদিকে চার পাশে টাকা!

পোকা মাথার মধ্যে কর্‌র্‌ কর্‌ব করছে।

ওই বাড়িটাকেই তারাদাসবাবুর যত বেশী ভয়। পাবে, পাবে, তোমার টাকা তুমি পাবে, অনেক টাকা তুমি পাবে, আর কয়েকটা দিন সবুর কর—

নেহি নেহি, আভি্ভি নেকালো রূপেয়া—কিছুতেই তারাদাস বাবু এই বেয়াড়া কাবুলীটাকে শান্ত করতে পারলেন না।

আহা, আস্তে, আমি কি তোমার টাকা মেরে দোব? কেয়া বোলতা হায়? জোরে লাঠি ঠুকে কাবুলী বললো, দো মাহিনাকা সুদ দে আও—

তারাদাস বাবুর মুখ থেকে কথা সরলো না। তিনি যেন ভূত দেখলেন, যা ভয় করেছিলেন তাই। সত্যবতী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তুমি, তুমি!

গম্ভীর মুখে ভারী বালাটা হাত থেকে খুলে সত্যবতী বললো এটা ওকে দিয়ে তুমি ভেতরে চলে এসো, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, সত্যবতী মুখ ঘুরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

করর্ করর্ করর্ করর্—মাথার মধ্যে শুধু সেই একটান শব্দ! শোভনলাল ওরে শোভন, তোর মাথার মধ্যেও কি এমন পোকা করর্ করর্ করে রে? তুই শুধু একবার আমার সামনে দাঁড়া, আমি তোর দিকে দু'চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি।

বাড়িটা যেন একটু ঘাবড়ে গেছে!

একটু পরেই ঘোড়া ছুটবে। আজ আর তারাদাসবাবুর মার নেই। শোভনের ঘরে গিয়ে তিনি বই দেখে এসেছেন। সাতটা প্লেটের সাতটা ঘোড়া ফার্স্ট হবেই। শোভন ঘোড়াগুলোর নামের তলায় লাল দাগ দিয়ে রেখেছে।

বাড়ি-বন্ধকী টাকা দিয়ে আজ তিনি নতুন বাড়ি তোলার টাকা পকেটে ভরে বাড়ি ফিরবেন। বাহবা শোভন, সাবাস: আগে বলিসনি কেন বাপ!

চার পাশে লোক গিজ গিজ করছে। প্রত্যেকের চোখের তারায় আর সব জায়গায় টাকা ছাড়া যেন তারাদাস বাবু আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। এতো টাকা, আকাশে—মাটিতে টাকার ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে!

তারাদাস বাবু শুধু পকেটে হাত দিচ্ছেন। আর বিড়বিড় করে কী বলতে বলতে আপন মনেই হাসছেন। শোভন, শোভন রে!

ট্যাক্সির হর্ণ হুইসেল আর সমস্ত ছাপিয়ে শুধু এক শব্দ উঠেছে—ঝন ঝন ঝন! আর তারাদাসবাবুর নাকে এসে লাগছে নতুন নোটের গন্ধ—টাকা টাকা টাকা!

রেস আরম্ভ হলো। মাত্র কয়েক মিনিট। প্রথম প্লেট শেষ হলো। আরও কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় দৌড়ও হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সব কটা প্লেট একে একে শেষ হয়ে গেল।··· ·····

······গিন্নী তুমি কোথায়? আমায় ধরো—আমি যে এখুনি পড়ে যাব? ··

নিলেরে? আমার সব টাকা কে ছিনিয়ে নিলে? নিজের চোখে দেখেছি
লার বদলে ঘোড়ার খুর থেকে টাকা উড়ছিলো—লেজে ইয়া বড়ো বড়ো
ল বাঁধা ছিল।……শোভন, দে টাকা, সব টাকা আমার। তোকে আমি
র করবো আমার টাকাটা—সব টাকা আমার!

এই বৃদ্ধ জরা-জীর্ণ অট্টালিকা আজ এই চৈত্রের মন্থর শেষ অপরাহ্নে যেন
নিঃশ্বাস ছাড়ছে! তাও বোধ হয় ছাপিয়ে উঠেছে সত্যবতীর নিঃশ্বাস।

কে জানে কোথায় শোভনলাল? তার এখন উচ্ছল যৌবন—এই বাড়ি
কে ধরতে পারবে কেন!

আর তারাদাসবাবু?

পয়সা ছড়াতে ছড়াতে কারা যেন শব নিয়ে যাচ্ছে—রাস্তায় অনেক পয়সা।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় তিনি তাই কুড়োচ্ছেন—পাছে আবার তাঁরও আগে
উ কুড়িয়ে নেয়, সব সময় সেই ভয়!

॥ নতুন বাসর ॥

———